অগ্নিকন্যা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

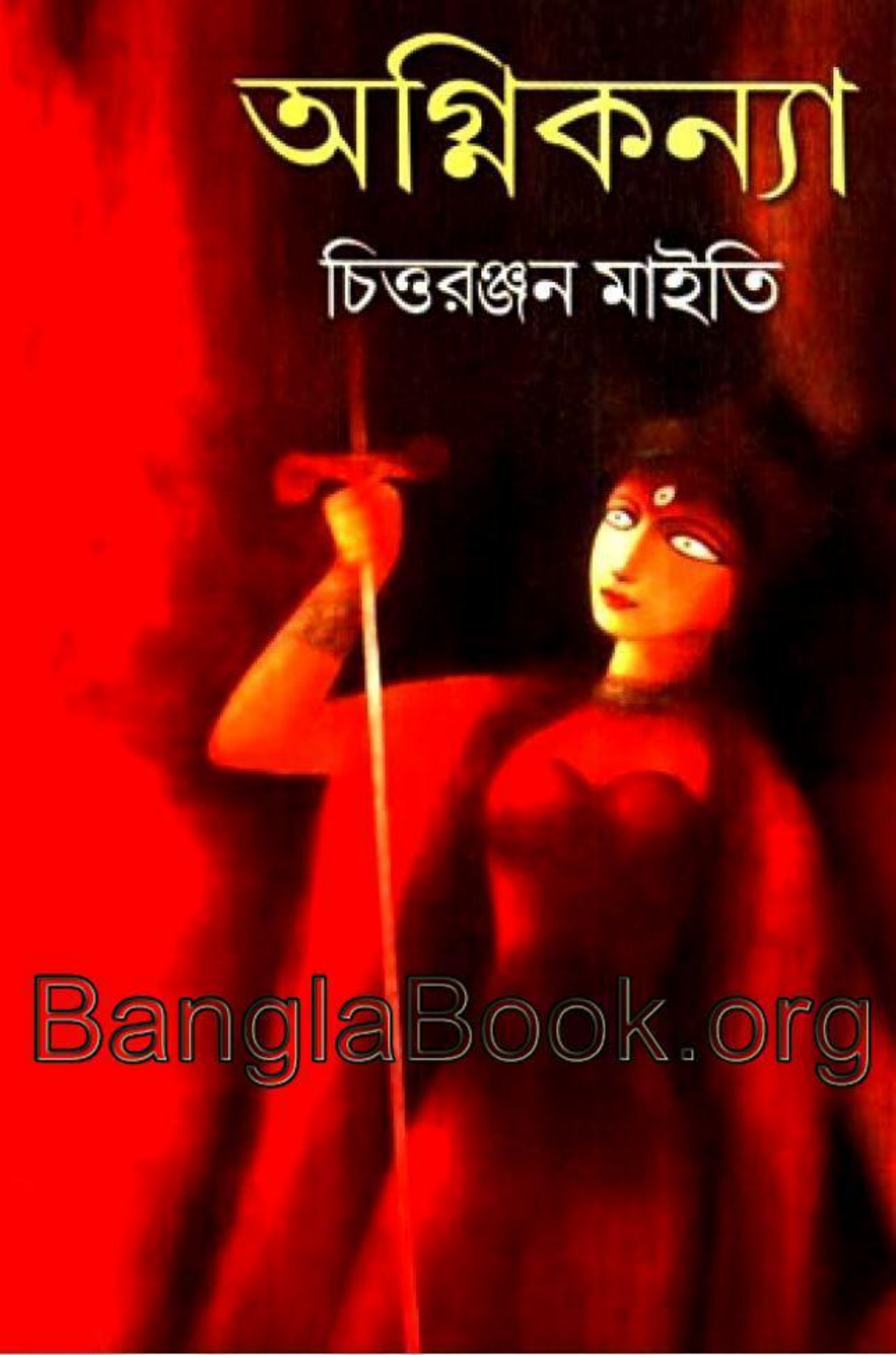

BanglaBook.org

অগ্নিকন্যা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অগ্নিকন্যা

পুরুষতন্ত্র নির্মম যখন
অবিচারের কালো মেঘ আকাশ গেছে ছেয়ে...
অত্যাচারে নিষ্প্রাণ বাতাস
নিঃশব্দ কান্নায় অবরুদ্ধ,
একটা প্রলয় বা ভূকম্পের শুধু অপেক্ষা।
এমনসময়
বজ্র, তুমি দাহিকা হয়ে জ্বলে ওঠো!
প্রতিবাদী স্ফুলিঙ্গ দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তোলো
অনন্য এক নারী।
প্রেমাতুরা দয়িতারূপে নয়
কল্যাণী ভগ্নীরূপে নয়
স্নেহময়ী জননীরূপেও নয়
এবারে আসুক সেই তিলোত্তমা নারী...
অগ্নিকন্যা হয়ে,
দহনের মধ্য দিয়ে করুক সে আগামীর
শুদ্ধ সৃজন।

দীপাঞ্জন বসু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উপন্যাসগুলির প্রকাশক ও প্রকাশকাল

সিংহবাহিনী	শারদীয় নবকল্লোল, ১৪১৩
দহন (সাইক্লোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)	বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৮৮
ঝঞ্ঝাবর্ত (সাইক্লোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)	বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৮৮
ইস্পাতের তলোয়ার (প্রথমে ডাঃ জনসনের ডায়েরি, পরে শনিচারি নামে প্রকাশিত)	গ্রন্থশ্রী প্রাঃ লিঃ ১৩৬৮
সমুদ্রের স্বর	শারদীয়া মাতৃশক্তি, ১৪১৩

এতে আছে

সিংহবাহিনী/১৭
দহন/৫৯
ঝঞ্ঝাবর্ত/১১৩
ইস্পাতের তলোয়ার/১৭৩
সমুদ্রের স্বর/২৪৫

শিরোমণির জমিদারির একের তিনভাগ জুড়ে ছিল পাইকান জমি। এই জমি ভোগের জন্য কোনো খাজনা লাগত না। রানির পাইকরা এইসব জমি বহুকাল যাবত ভোগ করে আসছিল।

জমির ওপর অন্যায়ভাবে কর চাপিয়ে দেওয়ায় প্রজারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল।

তাদের পূর্ব অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য ইংরেজের কাছে আবেদন নিবেদন না করে সরকারি কর্মচারীদের আক্রমণ করতে লাগল। অগ্নিসংযোগ করল থানায়, লুঠ করল সরকারি গোলা। রানি শিরোমণি প্রজাদের এই কাজে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানালেন।

রানির নায়েব ছিলেন নাড়াজোলের চুনীলাল খাঁন বাহাদুর। কয়েকখানি বলদের গাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে কর্ণগড়ে পাঠিয়ে দিলেন।

বিদ্রোহী গোবর্ধন দিক্‌পতি কর্ণগড়ের রানির আশ্রয়ে থেকে মেদিনীপুর শহরে সরকারি অফিস আক্রমণের পরিকল্পনা করতে লাগল।

কর্ণগড়ের আশপাশ থেকে কয়েকশত বিদ্রোহী জমায়েত হল রানির গড়ে এসে। তাঁর নির্দেশে দলে দলে বিদ্রোহীরা বেরিয়ে পড়ল সরকারি অফিস কাছারি আর ঘাঁটিগুলো আক্রমণের জন্য।

সরকারি ফৌজ এলে যাতে কোনোরকম খাদ্য না পায় সেজন্য তিনি দোকানে মজুত সমস্ত রকম রসদ তালাবন্ধ করে রেখে দেবার নির্দেশ দিলেন।

শুরু হল সংগ্রাম।

এই পটভূমিতেই রচিত হয়েছে সিংহবাহিনী উপন্যাসটি।

রানি শিরোমণি তাঁর রাজপ্রাসাদে দেবী সিংহবাহিনীর পুজো করতেন। তাঁর চরিত্রেও সঞ্চারিত হয়েছিল দেবীর অসীম শক্তি।

BanglaBook.org

দহন :

এই উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র এক আজীবন সংগ্রামী নারী। কাঁথি মহকুমার এক প্রায় অখ্যাত গ্রামে কৃষককুলে তার জন্ম।

তমলুকের চিরবিদ্রোহিণী নারী মাতঙ্গিনী হাজরার মতো এই নারীও সংগ্রাম করে গেছেন আজীবন।

মাতঙ্গিনী বরণ করেছেন মহনীয় মৃত্যু।

থানা আক্রমণের সময় পতাকা হাতে তিনি পরিচালনা করছিলেন একটি দল। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার সময়েই তিনি তার হাতের পতাকাটিকে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে রেখেছিলেন। অন্তরে মাতৃভূমির প্রতি তীব্র আকর্ষণ না থাকলে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পতাকাদণ্ডটিকে এমন করে ধরে রাখা সম্ভব হত না।

অন্যদিকে পদ্মা পাল একজন সাধারণ গৃহস্থ রমণী।

মেদিনীপুরের মুকুটহীন সম্রাট বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছাসেবীর দলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

তরুণী জীবন থেকেই দেশজননীর মূর্তি তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কখনও কোনো সংগ্রাম থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেননি।

আমি জননী পদ্মাকে দেখেছি স্কুল জীবনে। তখন বিয়াল্লিশের আন্দোলনে উত্তাল সমস্ত দেশ।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, আইনজীবী, —নরনারী নিবিশেষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশ স্বাধীন করবার এই মহাযজ্ঞে।

আমি ছাত্রাবস্থায় আন্দোলনের প্রবাহে গ্রাম থেকে কাঁথি শহরে এসে পড়েছিলাম।

সেখানে প্রায় বৃদ্ধা জননী পদ্মাকে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

ছাত্রদের সমাবেশে আগুন ঝরা বক্তৃতা দিতে দিতে একসময় জননী পদ্মা উত্তেজিত হয়ে টেনে খুলে দিতেন তার ঊর্ধ্বাঙ্গের বাস।

চিৎকার করে বলতেন, দেখ্ দেখ্, আমার পিঠের ক্ষতগুলো দেখ্। বাইরে ঘা শুকিয়ে গেছে কিন্তু ভেতরে দগদগ করছে সবসময়। আমি ছ' মাস হাসপাতালে পড়ি থাইলি। তোর মনে ওউ গুলামের বাচ্চাগুলাকে আচ্ছা করি ঠ্যাঙ্গাইতে পারবুনি?

তখন অন্যান্য নেতাদের মতো পদ্মা ছিল এক জ্বলন্ত প্রেরণা।

উত্তেজিত কৃষক আর ছাত্র জনতা বাধ কেটে কেটে মিলিটারি গাড়ির পথ রোধ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে ঝাঁকঝাঁক গুলি। লুটিয়ে পড়েছে কত তাজা প্রাণ।

আহত, মৃত, অর্ধমৃতদের ট্রাকে বোঝাই করে সরকারি সৈন্যবাহিনী নিয়ে গেছে হাসপাতালে। টেনে টেনে ফেলে দিয়েছে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। আবার গাড়ি ছুটেছে আহত সংগ্রামীদের বয়ে আনার জন্য।

এস. ডি. ও-বাহাদুর তাঁর অধস্তনকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন,—আজ কটা পাখি শিকার হল।

আহতদের জায়গা দিতে পারা যায়নি হাসপাতালের ভেতরে। গাদাগাদি হয়ে পড়ে আছে সব বারান্দায়, উঠোনে। তখনও কোনো কোনো মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে 'বন্দেমাতরম' 'ভারতমাতা কী জয়'—ধ্বনিত হচ্ছে।

অদূরে 'খড়্গচণ্ডী'—শ্মশানক্ষেত্র কর্ডন করে রেখেছে পুলিশবাহিনী। একসঙ্গে ট্রাকবোঝাই মৃতদেহ গিয়ে পড়ছে সেখানে। জনতাকে বহুদূরে হটিয়ে দিয়েছে আর্মড ফোর্স।

পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালানো হয়েছে স্তূপীকৃত শবে।

রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানক্ষেত্র থেকে সরে গেছে পাহাড়াদারেরা। পেছনের জঙ্গল চিরে উঁচু ঢিবির মাটি আঁচড়ে কামড়ে উঠে এসেছে একটা ছায়ামূর্তি।

শ্মশান থেকে হাতড়ে হাতড়ে কি যেন সংগ্রহ করে নিয়ে যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে।

পরদিন মিছিলের জন্য জমায়েত হয়েছে ছাত্র আর কৃষকের দল। অমনি তাদের দিকে এগিয়ে এল অগ্নিকন্যা পদ্মা। রাতের অন্ধকারে শ্মশান থেকে সংগ্রহ করা চিতাভস্ম নিয়ে নির্ভীক সংগ্রামীদের ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়ে বলল, এরা গুলির মুখে ভয় পায়নি, পিছিয়েও যায়নি। এই তিলকের ভেতর দিয়ে ওরা রইল তোদের সঙ্গে। কটালের বানের মতো ভাসিয়ে লিয়ে যা ওউ গুলামের বাচ্চাগুলাকে।

কাঁথি মহকুমা ওড়িশা সংলগ্ন, তাই কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে ভাষা প্রয়োগে ওরা ওড়িষ্যার দ্বারা প্রভাবিত। তাই আমার দহন উপন্যাসের নায়িকা পদ্মার মুখে আমি প্রাচীন কাঁথি অঞ্চলের ভাষা প্রয়োগের চেষ্টা করেছি। যদিও আমাদের খেজুরি থানা অঞ্চলে ওই ভাষার চলন নেই বলে আমার পক্ষে পদ্মার মুখে বাংলা মিশ্রিত ওড়িয়ার সঠিক প্রয়োগ সম্ভব হয়নি।

আমার অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখাটি পড়ে আমাকে চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, আঞ্চলিক ভাষায় উপন্যাসটি রচনার জন্য।

ঝঞ্ঝাবর্ত :

মেদিনীপুরে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার সূচনা হয় উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের ষোলোই অক্টোবর। তখন আমি স্কুলের ছাত্র।

BanglaBook.org

জ্ঞাতিদের বাড়িতে দুর্গোৎসবের সমারোহ। ভোরের সানাই বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিছানা থেকে লাফ দিয়ে ছুটে যাই ঠাকুরদালানে। তখন প্রভাত আরতি শুরু হয়।

সেদিন সপ্তমী। আমরা দরজা খুলে বেরোনো মাত্র একটা ঘূর্ণিঝড় আমাদের প্রায় বাঁশপাতার মতো ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তায় এনে ফেলল। কিছু পথ হামা দিতে দিতে, কিছু পথ বা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আমরা ঠাকুরদালানে এসে হাজির হলাম।

দেবীমূর্তি বসানো রয়েছে প্রশস্ত মন্দিরের ভেতর। সংলগ্ন দালান জুড়ে পুজোর আয়োজন।

সামনের প্রাঙ্গণে দর্শনার্থীরা ভিড় জমায়। যাত্রাগানের আসর বসে।

প্রাঙ্গণের ওপর প্রায় সাতদিন ধরে টাঙানো থাকে বিশাল সামিয়ানা। সামিয়ানার ভেতরে রং বাহারি পিপলির কাজ। চক্রাকারে ঘুরছে হস্তী, হংস, পদ্ম, অশ্ব। মাঝে পাপড়ি তোলা সহস্রদল পদ্ম।

ঠাকুরমশায় মন্দিরের ভেতর বসে রয়েছেন, সামনে নর্তকীর হাতে ধরা পেতলের পঞ্চপ্রদীপ্ত।

শুনলাম, যতবার দীপ জ্বালানোর চেষ্টা করেছেন ততবারই দমকা হাওয়ায় নিভে গেছে।

তিনতলার মতো উঁচু পাকা ছোট্ট সরু সানাই ঘর। চারজন বসে বাজায়। বাইরে লম্বা বাঁশের সিঁড়ি। সেটা বেয়ে উঠতে হয়।

ভোর চারটেতে সানাইবাদকেরা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে ঝড়ের ঝাপটায় ছিটকে পড়েছে সিঁড়ি সমেত। ভাগ্যিস ওরা পড়েছিল সামিয়ানার ওপর তাই বেঁচে গেছে।

ক্রমশ ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। আমরা কজন ছুটলাম বাড়ির দিকে। মিনিট তিনেকের পথ। বাতাস ঠেলে এগোতে হচ্ছে। সজোরে কেউ যেন থাপ্পড় মেরে যাচ্ছে গালে।

দোতলা পর্যন্ত জানালা দরজা সব বন্ধ। হাওয়ার হুঙ্কারে আমাদের হাঁকডাক ওপরওয়ালাদের কানে পৌঁছচ্ছিল না।

শেষে সামান্য খড়খড়ি তুলে বাইরের অবস্থা দেখতে গিয়ে মায়ের চোখে পড়ে যাই আমরা।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে নিষ্কৃতি পাই।

স্নানের প্রশ্ন নেই, এমনিতে ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ একটা ভয়ংকর রাক্ষস যেন আর্তনাদ করে উঠল। সারা বাড়িটা কেঁপে উঠল তার হাতের ধাক্কায়। পঁচিশ ইঞ্চি চওড়া দেওয়ালের বাড়ি ভিত সমেত তুলে নিয়ে অন্ধ দৈত্যটা শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে। শাল সেগুনের মোটা চওড়া দরজা জানালায় যেন বাইরে থেকে ঘুসি মেরে চলেছে কেউ।

সামান্য সময় বিরতির পর শুধু শোনা যাচ্ছে একটা গোঙানির আওয়াজ।

হঠাৎ মায়ের মনে হল, আমার এক কাকা-কাকিমার কথা। কয়েক বছর আগে একটু দূরে উঠে গিয়ে তাঁরা টালি ছাওয়া একটা বাংলো বাড়িতে বাস করছেন।

এই ঝড়ে তাঁরা কি রকম আছেন তা জানার জন্য আকুল হল মা।

আমরা তিনভাই রেডি। বেরিয়ে পড়লাম। বাইরের দরজা খুলেই দেখলাম, যাওয়া অসম্ভব। হাওয়ায় বৃষ্টিতে মিলে যেন চাবুক চালাচ্ছে। শেষে মেজদা ওপর থেকে তিনখানা তোষক নিয়ে এলো। তাই পিঠে চাপিয়ে প্রায় হামা দিতে দিতে এগোলাম।

মুখ একটুখানি তুললেই দেখতে পাই, লম্বা লম্বা নারকেল গাছগুলো পাটকাঠির মতো ভেঙে পড়ছে।

ওদের ঘরের সব কটা টালিই উড়ে গিয়েছিল। নীচের ঘরের একটা কোণে সবাই জড়ো হয়ে বসেছিল। আতঙ্ক চোখে মুখে। বেশ উঁচু সিমেন্ট বাঁধানো দাওয়া। উঠোনের জল প্রায় কাণা ছুঁয়েছে।

BanglaBook.org

আমাদের ব্যবস্থা মতো ওদের পিঠেও তোষক চাপিয়ে আমরা সবাই এসে উঠলাম আমাদের আদি বাড়িতে। তোযকগুলো গা থেকে নামাতে গিয়ে দেখি, বৃষ্টির চাবুক খেয়ে প্রায় সব তুলোই বেরিয়ে গেছে।

সারা রাত ধরে চলল ঝড়ের তাণ্ডব। বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে গেল সমুদ্রের তুফান।

নীচের তলায় তখন হু হু করে জল ঢুকছে। ঝড়ের গর্জনে মিশেছে গৃহহারা গ্রামবাসীদের হাহাকার।

মায়ের ইচ্ছায় আমরা সদর দরজা খুলে দিয়েছি। অসহায় মানুষগুলো ঢুকছে পাকাবাড়িতে আশ্রয়ের আশায়। সঙ্গে নিয়ে এসেছে গৃহপালিত গরু ছাগল। এমনকি অসহায় কুকুর ছানাকেও কোলে করে বয়ে এনেছে।

শেষ রাতের দিকে ঝড়ের তাণ্ডব ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো।

ভোরে জানালা খুলতেই অবাক দৃশ্য। সামনে অনন্ত জলরাশি সমুদ্রের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। নির্মেঘ নীল আকাশ। জলের ওপর জেগে উঠেছে গোলাকার লাল সূর্যটা।

কিন্তু জলস্রোতে ভেসে চলেছে সংগ্রামে বিধ্বস্ত শত শত গবাদি পশু আর মানুষজন।

সমুদ্রতীরে পুরোনো দু-চারটি ঝাউগাছের ওপর আত্মরক্ষার জন্য উঠে নিজেদের জড়িয়ে বেঁধে রেখেছিল কেউ কেউ। সকালে দেখা গেল চামড়া ছাড়ানো তাদের দেহগুলো গাছের কাণ্ডে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে। রাতে বৃষ্টির চাবুক ছিঁড়ে তুলে নিয়েছে তাদের চামড়া,—দেখা যাচ্ছে শুধু দগদগে মাংস। ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে আছে মাথাগুলো।

এই বিধ্বংসী সাইক্লোনের দুপ্রান্তে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার আবর্ত। একদিকে উনিশশো বিয়াল্লিশের আটই আগস্ট 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাকে উত্তাল জনজীবন। ছাত্র শিক্ষক, কৃষক মজদুর, সর্বশ্রেণীর নরনারী মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ছুটে চলেছে রক্তস্নাত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। অন্যদিকে বিধ্বংসী বন্যার পর ইংরেজ শাসকের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। অগণিত ক্ষুধার্ত মানুষের গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে ভুখা মিছিল। একবিন্দু ফ্যানের জন্য কাতর আর্তনাদ।

এই ছবিগুলির প্রত্যক্ষদর্শী আমি। আমার অভিজ্ঞতাই এই উপন্যাসের উপাদান।

ইস্পাতের তলোয়ার

ভারতের বহুখ্যাত এক বনভূমি 'সারান্দা'। সিংভূম জেলার এক পার্বত্য অরণ্যভূমি। এখানে হো, মুণ্ডা, ওরাওঁ প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠী স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। বনভূমির পশুপক্ষী কন্দমূল ফল তাদের আহারের জোগান দিচ্ছে।

কোয়েল, কোয়না, কারো নদী তিনটি এই বনভূমিকে স্পর্শ করে আছে। নদীগুলির মাছও বনবাসীদের অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য।

সাতশো তরঙ্গিত পাহাড় নিয়ে সারান্দা দাঁড়িয়ে আছে স্বমহিমায়।

গ্রীষ্মের তীব্র রৌদ্র দগ্ধ করে দেয় পাহাড়ের দেহ।

লৌহমিশ্রিত শিলাখণ্ড নীচে গড়িয়ে পড়লে ঝলসে ওঠে আগুন। তখন জ্বলে ওঠে শুকনো পাতার রাশ।

রাতে দূর থেকে সেই আগুন দেখলে মনে হয় দীপান্বিতার সারি সারি দীপ কেউ জ্বেলে দিয়েছে।

তখন বনরক্ষীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা আগুনের আঁচ থেকে সরিয়ে ফেলতে থাকে অন্য পাতাগুলি। তাদের মূল লক্ষ্য থাকে কোনো নদীর দিকে আগুনের প্রবাহকে চালিত করা। আগুন

BanglaBook.org

নদীতে নামলেই সে শক্তিহীন হয়ে পড়বে।

বর্ষায় ঘনঘোর মেঘ জটার মতো জমতে থাকে পাহাড়ের মাথায় মাথায়। শুরু হয় মেঘের গর্জন। পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে সেই ভয়ংকর শব্দ। মনে হয় আধুনিক কোনো রণাঙ্গনে ক্রমাগত বোমার বর্ষণ হচ্ছে।

তীক্ষ্ণ অসির মতো ঝলকাচ্ছে বিদ্যুৎ।

বর্ষণ শুরু হলে প্রান্তরের বুকে জলধারা অজগরের মতো এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়। স্নান করে সঞ্জীবিত হয় কোটি কোটি বৃক্ষের সংসার। বনস্পতি থেকে ক্ষুদ্র তৃণগুল্ম পর্যন্ত।

শরতে সারান্দার বনভূমিতে আগমনীর সুর বাজে। বাঁশরিতে সুর তোলে আদিবাসী যুবকেরা। নদীচরে কাশের চামর দোলায়। নীলাকাশে ভাসে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ। দিগন্তে উড়ে যায় নীলকণ্ঠ পাখি।

হেমন্তে মসলিনের আঁচল ওড়ায় হেমন্ত লক্ষ্মী।

শীতে শুরু হয় পাতা ঝরা। পত্রশূন্য শাখাগুলো মনে হয় বুভুক্ষু মানুষের মতো হাততুলে হাহাকার করছে।

দক্ষিণ থেকে হাওয়া বয়ে আসে। অদৃশ্য কোনো নারীর সোহাগ ডালে ডালে নবকিশলয়ের জন্ম দেয়।

দিনে দিনে পুষ্পিত হয়ে ওঠে অরণ্য। শালমঞ্জরি আমন্ত্রণ জানায় মধুকরকে। শিমুল কৃষ্ণচূড়া পলাশের ডালে ডালে ওড়ে ঋতুরাজের রক্তবর্ণের উষ্ণীষ।

জ্যোৎস্নারাতে মাদলের বোলে, বাঁশির সুরে ঘুরে ঘুরে নাচে বাহা পরবের নর্তক-নর্তকীরা।

এই বনভূমিতে একসময় দিনে রাত্রে বিচরণ করেছি আমি। এর ওপরে আমি লিখেছি একাধিক উপন্যাস। যার ভেতর আমার সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাস, 'ডাক্তার জনসনের ডায়েরি'।

এক রাজপুত ইজারাদারের কন্যা আর হো সম্প্রদায়ের এক তরুণ যুবকের অসম মিলনের ফলে যে কন্যা ভূমিষ্ঠ হয় তার নাম শনিচারি।

সে রাজপুত রমণীর মতো নির্ভীক, বীর্যবতী বীরাঙ্গনা। অশ্বচালনায় সে অত্যন্ত পটু।

ইংরেজের শাসনে বনভূমির আদিবাসী মানুষজন তাদের অরণ্য-অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। তাদের সংঘবদ্ধ করেছিল যে যুবতী তার নামই শনিচারি।

এই নির্ভীক সংগ্রামী, সংগঠক নারীকে নিয়ে আমি লিখেছিলাম 'ডাক্তার জনসনের ডায়েরি'। পরবর্তীকালে একটি সংকলনে 'শনিচারি' নামে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

এ বছর ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রমণীদের নিয়ে 'সিংহবাহিনী' নামে নতুন একটি সংকলন প্রকাশিত হল।

শনিচারিকে স্বাভাবিক কারণেই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত না করে পারিনি। নতুন সংকলন সিংহবাহিনীতে 'শনিচারি'র নামকরণ করা হয়েছে ইস্পাতের তলোয়ার।

ছোট নাগরাতে একটা লুপ্ত রাজধানীর ছড়ানো ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ওই ছোট নাগরার রাজপরিবারের কাহিনি আজও লোকমুখে শোনা যায়।

শনিচারির কাহিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে আদিবাসীদের সংগ্রামের কাহিনি।

এখানে উদ্ধতপ্রকৃতির ইংরেজ শাসকদের পাশে মানবদরদী এক ডাক্তারের চরিত্র আঁকা হয়েছে। জন্মসূত্রে তিনি ইংরেজ, নাম জনসন। আদিবাসী উৎপীড়িত জনগণের তিনি পরমবন্ধু। সেই সূত্রে নেত্রী শনিচারির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব।

এরপর কাহিনির আবর্তে উদ্বেলিত সারান্দা বনভূমি।

BanglaBook.org

সমুদ্রের স্বর

একসময় কাঁথি এবং তমলুক মহকুমাকে স্পর্শ করেছিল সমুদ্র।

তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সমুদ্রপথে জাহাজ যেত দেশদেশান্তরে। এখন তাম্রলিপ্ত বা তমলুক থেকে সমুদ্র দূরে সরে গেছে।

এখন প্রবলভাবে কাঁথিকে স্পর্শ করে আছে সমুদ্র।

বারেবারে বিধ্বংসী সামুদ্রিক বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে গ্রাম শহরকে।

অতীতে বন্দর-নগরী খেজুরিকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই সামুদ্রিক প্লাবন।

এই সমুদ্রের বিধ্বংসী রূপের প্রভাব ইংরেজ বিতাড়নের সময় প্রতিটি মানুষের অন্তরে গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল।

কেবল তাই নয় সমুদ্রের প্রবাহের মধ্যে কেমন একটা প্রেরণা সবসময় সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষকে প্রভাবিত করে রেখেছে।

এখানকার মানুষ বিশেষভাবে উদারমনস্ক।

দেশব্যাপী যখন হিন্দু মুসলমানের সংঘাত শুরু হয়েছিল তখন কিন্তু এই সমুদ্র তীরবর্তী মানুষদের ভেতরে সেরকম কোনো জাতিদাঙ্গা হয়নি।

জাতি-ধর্ম-বর্ণের একটা সহাবস্থান সবসময় এখানে লক্ষ্য করেছি।

ব্রাহ্ম মন্দির, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের পাশাপাশি হিন্দু হাইস্কুল এবং সংস্কৃত কলেজ, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি একই সঙ্গে বিরাজ করছে।

উৎসব-অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমানের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দহন উপন্যাসে যে পদ্মাকে পেয়েছি, তার একটা বিরাট ভূমিকা আছে সমুদ্রের স্বর উপন্যাসে।

BanglaBook.org

●

* ঝঞ্ঝাবর্ত এবং ইস্পাতের তলোয়ার উপন্যাস দুটি সাইক্লোন এবং শনিচারি নামে অন্যদুটি সংকলনে স্থান পেয়েছে।

বর্তমান সংকলনে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী নারীদের নিয়ে পাঁচখানি উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছি।

এদের ভেতর রাজরানি থেকে জমিদার ঘরনি, কৃষক বধূ থেকে অরণ্যবিহারিণী, —সর্বশ্রেণির সংগ্রামী রমণীর চিত্র আঁকা হয়েছে।

ইতিহাসের প্রসারিত পথে বিচরণ করেছেন উপন্যাসের কন্যারা।

'ঝঞ্ঝাবর্ত' আর 'ইস্পাতের তলোয়ার' নতুন নামে অনিবার্যভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই সংকলনে।

সিংহবাহিনী

প্রথম স্ফুলিঙ্গ

জঙ্গলের সামনে এসে পুরো দলটা কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়াল। এখানে জঙ্গল প্রস্থে প্রায় আট-দশ মাইল আর লম্বায় উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে শতাধিক মাইলের মতো বিস্তৃত।

পুব দিকে জঙ্গলের মাথায় রুপোর থালার মতো ঝকঝক করে জেগে উঠল চাঁদ। সাদা দুধের মতো জ্যোৎস্নার আলো গড়িয়ে পড়ল চারদিকে। অদূরে ডলং নদীটা হাঁসুলির মতো বাঁক নিয়ে খরবেগে বয়ে চলেছে। জলে ঝিলিক দিচ্ছে জ্যোৎস্নার আলো।

রতন সিং শিবিকার কাছে গিয়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানিয়ে বলল, রানিমা, এই বনটুকু আমাদের নিঃশব্দে পেরিয়ে যেতে হবে । লেঠেল দস্যুরা ওত পেতে বসে থাকে।

রানি মৃদু হেসে বললেন, এখানকার জঙ্গলের কুর্মী, সাঁওতাল, মুণ্ডারা তাদের রানিকে ভালোবাসে। আমাকে ওরা আটকাবে না, তোমরা নির্ভয়ে বন পার হয়ে যাও, তবে বেহারাদের বলে দাও, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা যেন ডাক না দেয়।

সামনে চলেছে পাইক রতন সিং। মাথায় শিমুল ফুলের মতো টকটকে লাল পাগড়ি, গায়ে সাদা মেরজাই। আট হাত একখানা ধুতি হাঁটু ছুঁয়ে পাক দিয়ে কাছায় বন্দি হয়েছে। ডানহাতে পাকা বাঁশের একটা লাঠির মাথায় বর্শার ফলাটা চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে।

তার পেছনে ওই পোশাকে আরও দুজন ষণ্ডামার্কা লেঠেল। পালকির পেছনে খাস দাসী দুজন, তাদের পেছন পেছন আসছে আরও তিনজন বর্শাধারী পাইক সেনা।

বনের ভেতরে যে সব বনবাসী ঘর বেঁধে থাকত, যাত্রাপথে তাদের কারুরই সাড়া না পেয়ে রতন সিং বিস্মিত হল। সে বেহারাদের একটি গাছের তলায় শিবিকা নামাতে বললে তারা রতন সিং-এর আদেশ পালন করল।

রানি সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, শিবিকা থামামাত্র তিনি জেগে উঠলেন। ততক্ষণে রানির কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসেছে রতন সিং।

রানিমা, কিছু সময় এখানে বেহারারা বিশ্রাম করুক। আপনার পরিচারিকারাও পরিশ্রান্ত, তারাও কিছু সময় বিশ্রাম করে নিক। আমি বনের ভেতরে একা একটু ঘুরে দেখতে চাই।

রানি উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, এত রাতে এই গভীর জঙ্গলে তুমি একা একা কোথায় ঘুরবে! তোমাকে চিনতে না পেরে অতর্কিতে যদি কেউ তীর ছোঁড়ে তাহলে তুমি আত্মরক্ষাই বা করবে কী করে?

রতন সিং বলল, মা, বনের পথে আসতে গিয়ে আমি অবাক হয়ে একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম। এখানে আদিবাসীদের অনেক কুটিরই রয়েছে, কিন্তু সেই কুটিরের ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বড় অবাক ঠেকছে। রাতে সবাই ঘুমোলেও কোলের বাচ্চাদের চিৎকার উঠবেই, তাছাড়া আমাদের মতো অপরিচিত যাত্রীদের দেখলে পোষা কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে থাকবে, কিন্তু অবাক কাণ্ড! ঝিল্লির ডাক ছাড়া আর সমস্ত শব্দ যেন ভয় পেয়ে কেমন থমকে গেছে। আমি এদিক-ওদিক একটু দেখে আসি, বাড়িঘর ছেড়ে মানুষগুলো কোথায় সেঁধোল!

রানি বললেন, শিবিকার ভেতরে থেকে এতটা আমি খেয়াল করিনি, রতন। তোমার ওপর আমার অগাধ ভরসা, তবে একা না গিয়ে সঙ্গে দরকার মতো দু' একজন লেঠেল নিলে ভালো হয়।

তাই হবে মা,—বলে রতন একজন লেঠেলকে সঙ্গে নিয়ে আলো-আঁধারি বনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রানির শিবিকার কাছে এসে তৃণশয্যায় বিশ্রামের জন্য গা এলিয়ে দিল দাসী দুজন। অদূরে কিন্তু চোখ-কান সজাগ রেখে জেগে রইল রানির লেঠেলরা।

একা শিবিকার ভেতর বসে চিন্তায় ডুবে রইলেন কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি। ছবির পর ছবি ভেসে উঠছিল তাঁর চোখের সামনে। দৃশ্যগুলির ধারাবাহিকতা ছিল না। বিচ্ছিন্ন স্মৃতির খণ্ড খণ্ড রূপ।

সম্মুখে দণ্ডেশ্বর শিবমন্দির ও তার পাশে ভগবতী মহামায়ার মন্দির।

মন্দিরে পুজো দিতে আসে অগণিত নরনারী। অচ্ছুতরা দূর থেকে প্রণাম করে দণ্ডেশ্বর শিব আর মহাদেবীকে। উচ্চবর্ণের মানুষ মন্দির চত্বরে গিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করে আসে।

কর্ণগড়ের মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই মন্দিরটি নির্মাণ করে নিজে বড় পরিতৃপ্ত হয়েছেন। তাঁর পরিতৃপ্তির আরও একটি কারণ, এই মন্দিরে বসে ভক্তকবি রামেশ্বর চক্রবর্তী রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত শিবায়ন কাব্য।

রানি শিরোমণির চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর বালিকা বয়সের একটা ছবি। তখন তিনি নবমবর্ষীয়া এক কন্যা। অদূরে একটি গ্রামে পিতার কুটিরে সে বাস করে। সারাদিন খেলাধুলো, ফলপাকুড় আর ফুল তোলার কাজ তার। সামান্য গৃহস্থের অঙ্গন—দু' একটি আম-কাঁঠাল আর নিত্যপূজার ফুলের গাছ।

আমার খেলার সাথী বলতে পাশের মুণ্ডাপাড়ার দু'চারটি মেয়ে। বড় আনন্দে কাটত আমাদের দিন।

বাবা দণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরে ঘৃত-ছানা-ক্ষীর ইত্যাদি জোগান দিত।

একদিন খেলার ছলে মুণ্ডাদের তিনটি মেয়েকে নিয়ে আমি দণ্ডেশ্বর মন্দির দেখতে গেলাম। দেবস্থানে গেলে পুজো দিতে হয় দেবতার। আমরা পুজোর ফুল তুলে চললাম মন্দিরের পথে।

মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দেখি মন্দিরের দ্বার খোলা, ভেতর থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে।

আমরা ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু পরে মন্দিরের পুরোহিতকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

আমি বললাম, শালপাতায় আমরা ঠাকুরের জন্য এই ফুলগুলি এনেছি, আপনি দয়া করে শিবের পায়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

এখনও স্পষ্ট মনে আছে, পুরোহিত আমাদের দিকে তাকালেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার বাবার নাম কী?

আমি বাবার নাম বলতেই তিনি বললেন, তুমি ভূতনাথের মেয়ে? বৈকালির ক্ষীর-ছানার জোগানদার?

আমি মাথা নাড়লাম।

পুরোহিত আমার হাত থেকে ফুলের ঠোঙাটি ধরে নিলেন।

আমার বন্ধুরা ফুল নিয়ে পুরোহিতমশায়ের দিকে তুলে ধরল, অমনি পুরোহিত বললেন, কী জাতের লোক তোরা?

আমি ওদের হয়ে বললাম, ওরা মুণ্ডাপাড়ার মেয়ে, আমার বন্ধু।

পুরোহিতমশায় ওদের ফুল না নিয়ে শুধু আমার ফুলের ঠোঙা নিয়ে মন্দিরের দরজার দিকে চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললাম, ঠাকুরমশায়, এদের ফুল নিলেন না?

পুরোহিতমশায় ফিরে দাঁড়িয়ে রূঢ় গলায় বললেন, এ মন্দিরে নীচুজাতের লোকের পুজো দেওয়া চলবে না। ওরা যাবে 'সারনা'-র থানে।

BanglaBook.org

বন্ধুদের জন্য আমার কেমন কান্না পেল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, আমার ফুলগুলোও তবে ফিরিয়ে দিন, ঠাকুরমশায়।

তুমি তো নীচুজাতের মেয়ে নও।

আমি জেদ করে বললাম, আমি জাতপাত বুঝি না, পুজো না দিলে বন্ধুরা কষ্ট পাবে, আমি একা তাই পুজো দিতে চাই না।

পাশে মহামায়ার মন্দির থেকে শিবমন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছিলেন দুটি মানুষ। তাঁরা দণ্ডেশ্বর মন্দিরের চাতালে কোলাহল শুনে এগিয়ে এলেন।

দুজনেই বেশ বয়স্ক, মাথার চুলগুলি প্রায় পাকা। তাঁদের মধ্যে একজন অতিশয় সুদর্শন। তিনি এগিয়ে এসে পুরোহিতমশায়ের কাছ থেকে ঘটনাটি জেনে নিলেন। শেষে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, কী সুন্দর ফুল নিয়ে এসেছ তোমরা! আমাকে দেবে না?

মানুষটিকে দেখে আর তাঁর মিষ্টি গলার স্বর শুনে আমরা দণ্ডেশ্বর শিবের কথা ভুলে ছুটে গেলাম তাঁর দিকে।

তিনি তাঁর গায়ে জড়ানো ফর্সা একটা উড়ুনির এক প্রান্ত এগিয়ে ধরে বললেন, দাও এখানে।

আমরা তাঁকে সব ক'টা ফুল উজাড় করে দিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালাম। উনি তাঁর পাশে দাঁড়ানো মানুষটিকে দেখিয়ে বললেন, এঁকে প্রণাম করো, ইনি মস্ত বড় সাধক আর কবি। তোমরা যে দেবতার জন্য ফুল নিয়ে এসেছিলে ইনি তাঁরই মহিমাকীর্তন করেছেন।

এখনও মনে পড়ে, বলেছিলাম, মহিমাকীর্তন কী?

পাশে দাঁড়ানো কবি বলেছিলেন, শিবঠাকুরের গান লিখেছি আমি।

বলেছিলাম, কই গান শোনাও, আমরা তোমার লেখা গান শুনব।

সুদর্শন উজ্জ্বল পুরুষটি যে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ তা তখন জানতাম না।

তিনি বললেন, পরশু সন্ধ্যায় মন্দিরের চাতালে পূজ্যকবি রামেশ্বর চক্রবর্তী তাঁর লেখা পালাগান করবেন, তোমরা পাড়াপড়শিরা মিলে সকল জাতের মানুষ এখানে পালাগান শুনতে এসো।

সেদিন ঘরে ফেরার আগে মহারাজ আমাদের নিজের হাতে ঠাকুরের প্রসাদ পরিবেশন করে খাওয়ালেন।

BanglaBook.org

আমরা মহা আনন্দে সেদিন ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরলাম। পথে মুণ্ডা সাঁওতাল লোধা ভূমিজদের বাড়ি বাড়ি হাঁক দিয়ে বলে গেলাম, পরশু সন্ধ্যায় শিবমন্দিরে পালাগান হবে। তোমরা সবাই সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে যাবে, রাজার নিমন্ত্রণ।

নির্দিষ্ট দিনে সাজানো হয়েছিল মন্দির চত্বর। মাথার ওপর সামিয়ানায় পিপলির রংবাহারি কাজ। পদ্ম হংস হস্তীর সারি। বাঁশের খুঁটিগুলিতে রঙিন কাগজ সাঁটা, গায়ে ফুলের মালা জড়ানো।

গায়ক ওপরে একটা বাঁধা বেদীতে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা চৌকিতে হাতে লেখা একখানা পুঁথি। খোল, করতাল, বাঁশি আর ডুগডুগি নিয়ে তাঁকে ঘিরে রয়েছেন কয়েকজন বাজনদার।

আট দিন ধরে চলল গান। গানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করে সকলের সামনে ভাবটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন গায়ক। সবটাই শিবের মহিমা গান। পালা শুনে মনে হচ্ছিল শিবঠাকুর আমাদেরই ঘরের লোক। তিনি ভিক্ষে করেন, লাঙল দিয়ে চাষ করেন, মাছ ধরেন আবার শাঁখাও পরিয়ে দেন।

পালা ভাঙলে আমি ঘরে ফেরা মানুষদের বলতে শুনেছি, এ ঠাকুর তো আমাদের। প্রভু ভোলা মহেশ্বরের জাতপাতের বালাই নেই।

পালাগান শেষ হয়ে গেছে। বড় আনন্দে কেটে গেছে কয়েকটা দিন। এরপর ক'দিন ধরে চলল শিবায়নের আলোচনা। তারপর একদিন যে যার রোজকার কাজের ভেতর ডুবে গেল।

একদিন সন্ধ্যার মুখে আমি আমাদের কালো গাইটাকে নিয়ে মাঠ থেকে ফিরছিলাম। পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের লাল আভা মেঘে মেঘে ছড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া আমাদের তাড়া করে এনে ফেলল ঘরের উঠোনে।

আমি তো অবাক। দাওয়ায় একটা উঁচু পিঁড়ির ওপর বসে রয়েছেন মহারাজ স্বয়ং! হাঁটু গেড়ে তাঁর সামনে হাতজোড় করে বসে রয়েছে আমার বাবা। আরও দেখলাম, দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে আমার মা।

আমাকে দেখেই কপাটের আড়াল থেকে মা আমাকে হাতছানি দিয়ে ভেতরে ডাকল। আমি দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম। আমাদের কালো গাইটা গোয়াল ে ন। সে উঠোনের একপাশ দিয়ে গিয়ে গোয়ালে ঢুকে পড়ল।

আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই মা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। আমি তো তাজ্জব বনে গেছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ দেখি মা আমাকে একটা লাল রঙের শাড়ি পরিয়ে দিল। চুল বেঁধে কপালে টিপ দিয়ে আমাকে এনে দাঁড় করাল দরজার মুখে। একসময় বাবা উঠে এল ভেতরে। আমাকে ধরে বলল, চল্, রাজামশাইকে প্রণাম করবি চল্।

আমি তখন কিছুই বুঝিনি। গড় হয়ে প্রণাম করতেই মহারাজ আমাকে ধরে তাঁর সামনে বসিয়ে দিলেন।

কী মধুর দৃষ্টি, আজও তাঁর সেই প্রসন্ন মুখখানা মনে পড়ে। তিনি আমার গলায় মুক্তোর একটি মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি সেদিন আমাকে সাদা বেলফুল উপহার দিয়েছিলে, তাই তোমাকে আজ আমি বেলকুঁড়ির মতো এই মালা পরিয়ে দিলাম।

মহারাজ যশোবন্তের একমাত্র পুত্র অজিত সিংহের সঙ্গে আমার মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেল।

পরে শুনেছিলাম, কবিবর রামেশ্বর চক্রবর্তী মহারাজকে বলেছিলেন, এ কন্যা অতি সুলক্ষণা, এর অন্তর সমস্ত মানুষের জন্য কাঁদে। এত অল্পবয়সে সাধারণ মানুষের জন্য ওর যে করুণা দেখেছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যে ক্ষমতা দেখেছি, তাতে আমি অভিভূত হয়েছি, মহারাজ। কর্ণগড়ের রানি হওয়ার সমস্ত গুণ এর ভেতর বর্তমান। আপনি অবশ্যই একে পুত্রবধূ করতে পারেন। আপনার রাজবংশের নাম এই কন্যাই একদিন উজ্জ্বল করবে।

ছোট্ট একখানা কুঁড়েঘর থেকে বিশাল রাজপ্রাসাদে উঠে এসেও আমার মনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমার ছোটবেলার কুঁড়েঘরটি, উঠোনের শিউলিফুলের গাছ, পেছনে বড় একটা জামগাছের ছায়া আমার কাছে ছিল এক আনন্দের স্বর্গ। খোলামেলা মাঠ আর দূরে নীলাকাশ দিগন্ত ছুঁয়ে আছে দেখলে আমার ডানা মেলে পাখি হয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছে করত। বৈশাখী ঝড় উঠলে আমি ঝরাপাতা আর ধুলোর ঘূর্ণির সঙ্গে আনন্দে নাচতে নাচতে কতদূর চলে যেতাম।

ঘরে ফিরে এলে মা বলত, ডাকাত মেয়ে। আমি সাঁওতাল-কুর্মী-মুণ্ডা-লোধা সকলের সঙ্গে মিশতাম বলে ওরা আমাকে খুব ভালোবাসত। ওদের প্রতিটি পরবে থাকত আমার নিমন্ত্রণ।

ওরা যখন নাচতে নাচতে জাওয়া পরবের গান গাইত, আমি ওদের সঙ্গে মিশে নাচতাম আর গান ধরতাম

কাঁসাই লদীর বালি আইনব
জাওয়া পাইতব ঘরে লো।
আমাদের জাওয়া উঠাই লিব
করম গাছের তলে লো...

এই মুহূর্তে সেই নাচগানের দৃশ্যগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

বিয়ের পর পাকস্পর্শের দিন আমি ঘোমটা দিয়ে নিমন্ত্রিতদের অন্ন পরিবেশন করতে লাগলাম। সারা দিনরাত্রি জুড়ে ভোজপর্ব চলল। আমি কেবল আত্মীয়স্বজনকেই পরিবেশন করলাম না,

BanglaBook.org

নিমন্ত্রিত আদিবাসীদেরও মহানন্দে পরিবেশন করতে লাগলাম। আমার একটুও শ্রান্তি ছিল না। অন্দরমহলে কথা উঠেছিল, কিন্তু আমার সংস্কারমুক্ত উদার হৃদয় শ্বশুরমশায় আমার কাজে সমর্থন জানিয়ে সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আমার এ ধরনের কাজের জন্যে যে আমি এতখানি প্রশংসা কুড়োব তা একেবারেই ভাবতে পারিনি। জঙ্গল-মহালে ঘরে ঘরে আমার কাজের জন্য নাকি ধন্য ধন্য রব পড়ে গিয়েছিল।

শ্বশুরমশায় একদিন সবার সামনে আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, আমরা প্রজাদের শাসন করে যে কাজ করতে পারিনি, আমার বধূমাতা তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছে তার ভালোবাসার ছোঁয়া দিয়ে।

আমার আগে আমার স্বামী প্রথম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে মেয়েটির সঙ্গে তিনি আমার থেকে প্রায় পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। রাজবাড়িতে এই সতীন দিদিটিই বধূবরণের দিন অমাকে বরণ করে নেন। আমার শাশুড়িমা ছিলেন না। তিনিই আমাকে মায়ের স্নেহে আগলে রাখতেন।

রাজবাড়িতে রানি ভবানীকে সকলেই একটু ভয়ের চোখে দেখত। জাতিবর্ণের ক্ষেত্রে উচ্চনীচ ভেদাভেদ ছিল তাঁর। জমিদার বাড়ির কন্যা ছিলেন তিনি, তাই তাঁর দাপটও ছিল রাজরানির মতো। কিন্তু আমার কোনো কাজেই তিনি বাধা দিতেন না। আমার সব দোষ-ত্রুটি তাঁর স্নেহের জোয়ারে ভেসে যেত।

মহারাজ যশোবন্ত সিংহ গত হওয়ার পর আমি বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। আমার কিশোরী মনটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়েছিল। সেই কষ্ট আজও মাঝে মাঝে আমার মনকে উদাস করে দেয়।

তাঁর কয়েকটি উপদেশ আজও আমাকে শক্তি জোগায়।

তিনি একদিন জ্যোৎস্নারাতে ভেতর গড়ে প্রাসাদসংলগ্ন জলশূন্য পুষ্করিণীর বাঁধানো ঘাটে বসে বলেছিলেন, আক্রমণকারীকে চিহ্নিত করার পরে তাকে আক্রমণের প্রথম সুযোগ দিতে নেই, ঝড়ের মতো প্রথমেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আরও বলতেন, শত্রুকে চেনা যায় কিন্তু ছদ্মবেশী বন্ধুকে চেনা যায় না। যতদূর সম্ভব তাকে এড়িয়ে চলবে। তার মতলব সিদ্ধির আগেই তাকে বিদেয় করে দেবে।

আমি জানি তোমার মধ্যে মা সিংহবাহিনীর শক্তি আছে, কেউ তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সংকট এলে সেই শক্তি প্রয়োগ করতে কালবিলম্ব করবে না।

এই মুহূর্তে রানি শিরোমণি ভাবতে লাগলেন, কত দুঃখের সাগর তাঁকে পার হতে হয়েছে। একের পর এক চলেছিল মৃত্যুর মিছিল।

স্নেহময় শ্বশুর চলে গেলেন। দণ্ডেশ্বর মন্দির প্রাকারের বাইরে রচিত হল তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ।

পিতার সিংহাসনে বসলেন আমার স্বামী, কিন্তু সাড়ম্বর অনুষ্ঠান হল না। অশৌচ চলছিল তখন।

পরে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের সভাকবি, পণ্ডিত ও হিতাকাঙ্ক্ষী শিবায়ন রচয়িতা রামেশ্বর চক্রবর্তী ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁকেও সমাহিত করা হল তাঁর গুণগ্রাহী মহারাজ যশোবন্ত সিংহের সমাধির পাশে।

আমি কখনও কোনো বস্তু থেকে ভয় পেতাম না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত রাজপুরী সুষুপ্ত তখন আমি আমার কোনো প্রিয় পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে মূল প্রাসাদ থেকে দূরে দণ্ডেশ্বর মন্দির এলাকায় চলে যেতাম।

BanglaBook.org

জ্যোৎস্নারাত্রে সমাধিক্ষেত্রের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হত দু'বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে পরস্পরের অন্তরের কথা বলছেন। আমি কান পেতে তাঁদের কথা শোনার চেষ্টা করতাম কিন্তু তাঁদের একান্ত গোপন আলাপন আমার কানে এসে পৌঁছোত না।

আমি দুই সাধক ও প্রেমিক বন্ধুকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে আসতাম রাজপ্রাসাদে।

সহসা একটি কথা মনে পড়ল। রানি হাত বাড়িয়ে অন্ধকার শিবিকার ভেতর কোষবদ্ধ তরবারিটি স্পর্শ করলেন।

মৃত্যুর আগে মহারাজ সংগোপনে একদিন তাঁর বিজয়-তরবারিটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এটি তুমি ঊর্ধ্বে উত্তোলন করো। আমি তাঁর কথামতো তাই করেছিলাম। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে সেই শাণিত তরবারি ঝলমল করে উঠেছিল। তিনি বেশ কিছু সময় আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আজ থেকে রাজ্যরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব তোমাকে বহন করতে হবে, মা। তোমার ভেতর আমি শস্ত্রপাণি মহামায়ার মূর্তি দেখতে পেয়েছি। এরপর তিনি নতমুখে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। একসময় আমার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে বললেন, আমার একমাত্র পুত্র বর্তমান, সে অত্যন্ত পিতৃভক্ত এবং সুযোগ্য, তবু বলছি, গণকের গণনা অনুসারে দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই বলছি, প্রস্তুত থেকো। সর্বপ্রকার বিপদ তোমাকে ঘিরে থাকবে কিন্তু তুমি মেঘমুক্ত চন্দ্রকলার মতো উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজ করবে।

প্রাসাদের বাইরে যাওয়ার সময় সেই মন্ত্রপূত তরবারি কখনও তিনি সঙ্গে নিতে ভোলেননি।

সামান্য কয়েকটি বছর মাত্র রাজ্যসম্পদ ভোগ করতে পেরেছিলেন মহারাজা অজিত সিংহ। রাজ্যপ্রাপ্তির পর সপ্তম বর্ষে আমাদের দ্বিতীয় দুর্গপুরী আবাসগড় থেকে এক সন্ধ্যায় একাকী অশ্বারোহণে ফেরার পথে মহারাজ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে অশ্ব থেকে কঙ্করময় ভূমিতে পড়ে গেলেন। পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আমার সতীনদিদি তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন।

মহারাজ কোনোদিন আমাদের দুই সতীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেননি। যখন তিনি তীর্থযাত্রা করতেন তখন সেখান থেকে যে কোনো বস্তু আনতেন তা জোড়ায় জোড়ায়। একজোড়া বস্ত্র হলে তার রং হত একই রকম। অলংকারের গঠনও হত অবিকল একরকম।

তিনি পালাক্রমে এক রাত অন্তর আমার এবং আমার সতীনদিদির মহলে প্রবেশ করতেন।

আমি একদিন পরিহাসছলে বলেছিলাম, মহারাজ আপনাকে দুই রানির কাছে দু'রকম প্রেমের কথা বলতে হয়।

আমার কথা শুনে মহারাজ বলেছিলেন, তুমি শুধু পরিহাসপ্রিয় নও, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

আমাদের দাম্পত্যজীবন অতি অল্পকালের মধ্যেই যে শেষ হয়ে যাবে তা ভাবতে পারিনি।

মহারাজ গত হওয়ার পর রাজ্যের সমস্ত দায়-দায়িত্ব এসে পড়ল আমাদের ওপর।

আমি দিদিকে ডেকে বললাম, তুমি এ রাজ্যের মহারানি। রাজ্যশাসনের পুরো দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।

দিদি বললেন, তা কী করে হয়! এতবড় রাজ্যের ভার আমি কী করে বইব?

কেন, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তাছাড়া দেওয়ানমশায়, দক্ষ রাজকর্মচারীরা সকলে রয়েছেন। তোমার একটুও অসুবিধে হবে না। আমি তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে আমার চোখের সামনে কতকগুলি ঘটনা ঘটতে দেখলাম।

মহারানি ভবানীর জমিদার পিতৃকুল থেকে আত্মীয়স্বজন সকলে এসে জড়ো হলেন। তাঁরা দিদিকে নানারকম পরামর্শ দিতে লাগলেন।

BanglaBook.org

আমার দরিদ্র পিতা কিন্তু একদিনের জন্যও পরামর্শ দিতে এলেন না। আমার সততা এবং বুদ্ধিমত্তার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখলাম, রাজকোষ থেকে সমস্ত দপ্তরের ভার আমার সতীনের পিতৃকুলের আত্মীয়েরা দখল করে বসেছেন।

আমি প্রমাদ গণলাম। রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেওয়ালে রক্ষিত আমার শ্বশুরমশায় এবং স্বামীর প্রতিকৃতির উদ্দেশে প্রণাম জানালাম। আমার চোখ বন্ধ ছিল, মনে হল আমার মাথায় মহারাজ যশোবন্ত সিংহ হাত রেখে বললেন, রাজ্যের অধিকার তুমি ত্যাগ করবে না। এই মুহূর্তে রাজ্য দু'ভাগে ভাগ করে তোমরা দুজনে শাসন করো। অল্পকালের মধ্যে তোমার হাতেই এই রাজ্যের শাসনক্ষমতা এসে পড়বে।

আমি চোখ মেলে তাকালাম, কেউ কোথাও নেই। আমি সে রাতে বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলাম, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি কি সত্যিই শুনেছি!

প্রথমে আমাদের আত্মীয় দেওয়ান চুনিলাল খান মশায় রাজ্য দু'ভাগে ভাগ করে দিলেন। কর্ণগড়ে রইলেন রানি ভবানী আর আমি রইলাম আবাসগড় দুর্গপুরীতে।

আবাসগড় দুর্গ আমার বড় প্রিয় ছিল। বড় রাস্তার ওপরে বিরাট প্রাসাদ। তার সিংহদ্বারের পাশেই ছোট ছোট কয়েকটি অতিথিনিবাস। যে সব তীর্থযাত্রী ওই পথে পুরীর জগন্নাথদর্শনে যেতেন, আমি তাঁদের ওই অতিথিনিবাসে রেখে সেবা-যত্ন করতাম।

মহারাজ যশোবন্তের ভবিষ্যদ্বাণী অল্পকালের মধ্যেই সত্যে পরিণত হল। রানি ভবানী ইহলোকের সমস্ত কর্ম অসমাপ্ত রেখে পরলোকে যাত্রা করলেন। আমি সিংহাসনে রাজমুকুট রেখে তার পাশে অনুচ্চ একটি সাধারণ আসনে বসে বিশাল রাজ্যের দায়দায়িত্ব পালন করতে লাগলাম।

প্রতিমাসেই আমি রাজ্যের প্রজাদের একবার রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানাতাম। তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতাম এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করতাম। আমি চেষ্টা করতাম দোষীদের শাস্তিবিধান না করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে বিষয়গুলির চিরস্থায়ী সমাধান করতে।

আমার রাজ্যে কুড়িজন সর্দার ছিল। তারা প্রত্যেকে তাদের অধীনে পাইক এবং চুয়াড় সৈন্যদের নিয়ে কয়েকশত গ্রামের সুবিধে-অসুবিধে তদারক করত। চোরডাকাত-লুঠেরার হাত থেকে তাদের রক্ষা করত।

রাজকোষ থেকে এদের কোনো অর্থ দেওয়া হত না। নিষ্কর ভূমিতে এরা ফসল উৎপাদন করত এবং ইচ্ছামতো ভোগ করত। জঙ্গলমহাল থেকে নামমাত্র খাজনা জমা দিত ওরা রাজভাণ্ডারে। সে খাজনাও ছিল উৎপন্ন ফসলের সামান্য একটি অংশ।

রাজবাড়ির গোলায় সেই ফসল বছরের পর বছর জমা হত। তাতেই নিষ্পন্ন হত রাজ্যের ব্যয়ভার। দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, মহামারিতে রাজার গোলায় সঞ্চিত ফসল অকাতরে দীনদুঃখীদের বিলিয়ে দেওয়া হত।

মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বোধহয় চিরস্থায়ী হয় না। কর্ণগড়ের ক্ষেত্রেও তাই ঘটতে দেখলাম। আমাদের উত্তরে জঙ্গলমহালে বগ্‌ড়ি রাজ্য ছিল বিশেষ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। অন্যদিকে সুবর্ণরেখার তীরে ধলরাজারা ছিলেন মহাবিক্রমী। আমরা ছিলাম দুই শক্তির মাঝখানে ভারসাম্য রক্ষা করে।

মানুষ যখন ক্ষমতাবান হয় তখন তাদের লালসা বেড়ে যায়। তারা পার্শ্ববর্তী রাজ্যে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করে।

বগ্‌ড়ি রাজ্যের পরাক্রান্ত এক সর্দার গোবর্ধন দিগ্‌পতি আমাদের কর্ণগড় আক্রমণে উদ্যত হল।

BanglaBook.org

অনেক পরে বিশ্লেষণ করে জেনেছিলাম, দিগ্‌পতির কর্ণগড় আক্রমণের পেছনে আমাদের কিছু দুর্বলতা ছিল।

মহারাজ অজিত সিংহ যতখানি হৃদয়বান ছিলেন ততখানি দূরদর্শী ছিলেন না।

তিনি রাজ্যের উন্নতির জন্য পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করেছিলেন। পথনির্মাণ, পাঠশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অভাবগ্রস্তদের জন্য তাঁর ছিল বিপুল খয়রাতি ব্যবস্থা। অবস্থাপন্ন প্রজাদেরও অসুবিধার কথা শুনলেই তাদের করের হার হ্রাস করে দিতেন।

মানুষ হিসাবে মহারাজ অজিত সিংহ সর্বশ্রেণির প্রজাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু যেখানে কঠোর শাসনের প্রয়োজন সেখানে বহু ক্ষেত্রে নীরব হয়ে থাকতেন। তাঁর হয়তো ধারণা ছিল, এই উদ্ধত প্রজারা একদিন নিজেদের অপরাধ বুঝতে পেরে শান্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু এ ধারণা যে তাঁর ভুল ছিল তা তাঁর মৃত্যুর পরেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

জঙ্গলমহালে অনেকগুলি ছোট ছোট জমিদার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তারা বাঁশ আর মাটি দিয়ে তৈরি কেল্লায় বাস করত। জঙ্গল কেটে জমি হাসিল করে চাষ-আবাদ শুরু করে দিয়েছিল। রাজার আদায়কারী গেলে তাদের হটিয়ে দিয়ে বলত, এ আমার হাসিল করা জমি, এতে খাজনা হয় না।

এই সব উঠতি জমিদারদের অধীনে বেশ কিছু চোর-ডাকাত আর চুয়াড় বাহিনীর লোকজন ছিল। বগড়ির গোবর্ধন দিগ্‌পতি বেশ জাঁদরেল সর্দার ছিল। তার অধীনে দক্ষ লেঠেলবাহিনী আর তীরন্দাজরা কাজ করত। সেই সর্দার জঙ্গলমহালের বহু উঠতি জমিদারের সঙ্গে যোগাযোগ করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল দস্যু আর লেঠেলরা।

এবার বিপুল বাহিনী নিয়ে সর্দার গোবর্ধন দিগ্‌পতি আক্রমণ করল কর্ণগড়।

অল্পকাল আগেই গত হয়েছিলেন মহারাজ অজিত সিংহ। তখনও রাজ্যের সর্বত্র প্রজাদের অন্তরে শোকের প্রবাহ চলছিল। দিগ্‌পতি ভাবল এটাই কর্ণগড় আক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ।

সেটা ছিল শুক্লপক্ষের রাত। তিনদিক থেকে অশ্বারোহী বাহিনী আর তীরন্দাজরা ঘিরে ফেলল কর্ণগড়। তারা পারাং নদীর কুলে বড় বড় গাছের ওপর উঠে ঝাঁক ঝাঁক তীর চালাতে লাগল রাজপুরীর অন্দরে।

রক্ষীরা হতচকিত। কেউ যে অতর্কিতে কর্ণগড় আক্রমণ করতে পারে সে ধারণা স্বপ্নেও তাদের মনে স্থান পায়নি।

বড় একটা আক্রমণ প্রতিহত করতে গেলে যে প্রস্তুতির দরকার, কর্ণগড়ের দুঃসময়ে তা আমাদের ভেতর ছিল না। দুর্গের রক্ষী ছাড়া অন্য সর্দার এবং তাদের অধীনের পাইক সেনারা যে যার এলাকায় তখন নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। তাদের আহ্বান করে জড়ো করতে গেলে যেটুকু সময় প্রয়োজন তার সামান্য মাত্রও ছিল না আমাদের হাতে।

রাজ-অন্তঃপুরের মানুষরা তখন ভয়ে বিহ্বল।

জননী সিংহবাহিনীকে স্মরণ করে আমি চিন্তা করতে লাগলাম, সম্মুখ যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পারলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে। অতএব সুকৌশলে পশ্চাৎ অপসরণই আত্মরক্ষার উপায় বলে মনে করলাম।

গোপনে গড়ের সৈন্যদের কাছে আদেশ পাঠালাম, তারা যেন পেছনের দ্বার দিয়ে আবাসগড়ে দ্রুত চলে যায়। প্রায় দু'ক্রোশ পথ অতিক্রম করে হস্তী, অশ্ব নিয়ে পাইক বেরিয়ে গেল। রাজপুরীর মহিলাদের হাতির পিঠে এবং শিবিকায় আবাসগড়ের দুর্গের দিকে রওনা করিয়ে দিলাম।

ভোরের আলো ফোটার আগেই প্রায় সবাই দুর্গান্তরে চলে গেল।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন সেনানায়ক তীর ছুঁড়ে শত্রুপক্ষকে বাধা দিচ্ছিল। শেষে আমার ইঙ্গিতে তারা এসে জড়ো হল পশ্চাতের দ্বারদেশে। অবশিষ্ট রক্ষীদের নিয়ে অশ্বারোহণে আমি দুর্গত্যাগ করে ছুটে চললাম আবাসগড় দুর্গের অভিমুখে।

BanglaBook.org

আলোকিত প্রভাতে প্রতিরোধহীন দুর্গে প্রবেশ করল গোবর্ধন দিগ্‌পতি।

নিঃসন্দেহে বিস্মিত হয়েছিল বগ্‌ড়ির সর্দার। কিন্তু সম্পূর্ণ ঘটনাটি উপলব্ধি করার আগে রক্তপাতহীন এই দুর্গজয়ে সে অনুচরদের নিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল।

কর্ণগড় থেকে রাজকোষ সরিয়ে আনতে পারলেও গোলাভরা ধান এবং অন্যান্য শস্য সরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। তবে আবাসগড়ে শস্যের সঞ্চয় কম ছিল না।

ভাবলাম, এখন থেকে আবেগ আর দুঃখের স্রোতে ভাসলে চলবে না। সর্বক্ষণ সজাগ থাকতে হবে। যে দিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ হানার সম্ভাবনা, সেদিকে পালাক্রমে অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করলাম। সাতটি হাতির পিঠে রইল তীরন্দাজরা। সতর্ক রইল দুই শতাধিক অশ্বারোহী। সামান্য সংকেতেই যেন তারা শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

আমি প্রায় নিদ্রাহীন নিশিযাপন করতাম। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের উন্মুক্ত তরবারি হাতে আমি দুর্গশীর্ষে নিশাকালে ঘুরে বেড়াতাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতাম শত্রুদের গতিবিধি।

ইতিমধ্যে নাড়াজোলের মহারাজের কাছে কর্ণগড়ের বিপর্যয়ের সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল।

তাঁরা আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। রাতের অন্ধকারে শতাধিক গরুর গাড়ি বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র চলে এল।

যখন আমরা দুর্গ উদ্ধারের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত তখন অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনা ঘটল।

এক ব্রাহ্মণবেশী আগন্তুক সূর্যাস্তকালে এসে পৌঁছলেন আবাসগড় দুর্গে।

রক্ষীরা তাঁকে তীর্থযাত্রী ভেবে সিংহদ্বার সংলগ্ন অতিথিনিবাসে থাকবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

আগন্তুক বললেন, আমি মহারানির সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে জলস্পর্শ করব না।

দুর্গের অন্দরমহলে সংবাদ পৌঁছে গেল। আমি সভাগৃহের পার্শ্বে একটি কুটিরে অতিথিকে ডেকে পাঠলাম।

অনাবৃত দেহে একটি শুভ্র উপবীত স্বচ্ছ উত্তরীয়র ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণের বলিষ্ঠ আকর্ষণীয় দেহ। বয়স অনুমানে পঞ্চাশোর্ধ্ব।

অত্যন্ত বিনীতভাবে নত হয়ে ব্রাহ্মণ আমাকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

আমি বিব্রত বোধ করে করজোড়ে বললাম, আপনি এই গৃহে উপবেশন করুন, আপনার অভিপ্রায় জানলে আমি সেই মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

উনি আসন গ্রহণ না করে করজোড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জননী, আপনার কাছে আমার সামান্য একটি প্রার্থনা আছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, সাধ্যমতো আমি তা পূরণের চেষ্টা করব। আমার এই দুর্গে অতিথিই ভগবান। আপনাদের সেবা করতে পারলে আমি ধন্য হব।

আমাকে বিস্মিত হতবাক করে দিয়ে ব্রাহ্মণ করজোড়ে বললেন, আপনাকে কর্ণগড় ফিরিয়ে দিতে এসেছি জননী।

তখনও বিস্ময় কাটেনি, বললাম, কে আপনি?

অধম গোবর্ধন দিগ্‌পতি, মহারানি, আপনার দাসানুদাস।

আমি তখন বিহ্বল, মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না।

দিগ্‌পতি বললেন, ইতিমধ্যে আমি আপনার রাজ্যের প্রায় প্রতিটি গৃহে প্রবেশ করে জেনেছি, প্রজারা আপনাকে নিজ নিজ জননীর মতো ভালোবাসে। তাদের মুখে শুনেছি আপনার উদারতা আর দেবীমহিমার কথা।

সামান্য সময় থেমে দিগ্‌পতি বললেন, আমি নিজেও আপনার দেবীমহিমার প্রত্যক্ষদর্শী।

মুখে আমার বাক্যস্ফূর্তি হল না, আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

BanglaBook.org

এই দুর্গ আক্রমণের পরিকল্পনা আমার ছিল, তাই কয়েকরাত্রি ছদ্মবেশে আমি আবাসগড় দুর্গ পরিক্রমা করেছি।

কাল ছিল পৌর্ণমাসী রজনী। রাত্রি চতুর্থ প্রহরে আমার চোখের ওপর ফুটে উঠল দেবীমহিমা। কেল্লার ওপর দাঁড়িয়ে দেবী তাকিয়ে ছিলেন নীল আকাশের কোলে পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে। দক্ষিণহস্তে উত্তোলিত অসি চন্দ্রলোকে ঝলমল করছিল। আমি অনুমানে নিশ্চিত হয়েছিলাম, ইনিই কর্ণগড়ের মহীয়সী মহারানি দেবী শিরোমণি।

ভূলুণ্ঠিত হয়ে আপনার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করেছিলাম। জননী, আজ এসেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে।

আমি বললাম, যখন জননী বলে ডেকেছ তখন মায়ের স্নেহ আর আশীর্বাদ চিরদিনই পাবে তুমি।

আরও বললাম, কর্ণগড় দুর্গ থেকেও তুমি আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। তোমার আপত্তি না থাকলে আজ থেকে তুমি আমার সেনানায়কের কাজে যোগ দাও।

আধো ঘুমে আধো জাগরণে রানি স্মৃতির মহল পার হয়ে চলেছিলেন, হঠাৎ মনে হল, কারা যেন তাঁর শিবিকাকে ঘিরে অনুচ্চে কথা বলে চলেছে।

সম্পূর্ণ সাজগ হয়ে শিরোমণি শিবিকার দ্বার সরিয়ে দেখলেন, পুবদিকে জ্বলজ্বল করছে শুকতারা। তাঁর দুজন পরিচারিকা ইতিমধ্যে উঠে রতন সিং-এর সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মৃদুকণ্ঠে আলাপ শুরু করেছে।

শিরোমণি শিবিকা থেকে বেরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। রতন সিং এবং সঙ্গের লেঠেলরা তাঁকে প্রণাম জানাল।

রানি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, সারারাত তোমরা কোথায় ছিলে রতন?

রতন বলল, আমরা কাল রাতে প্রায় আদ্দেক বন ঘুরে এসেছি।

কোনো বনবাসীর দেখা পাওনি?

অনেক খোঁজার পর কিছু সন্ধান পেয়েছি, মা।

বলো কী খবর পেলে?

সর্দার বলল, কয়েক ক্রোশ ব্যাপী বনবাদাড় ঢুঁড়ে আমরা অনেকগুলি কুঁড়ের সন্ধান পেয়েছি কিন্তু সেগুলোর ভেতর একজন মানুষও ছিল না।

রানি অবাক হয়ে বললেন, গেল কোথায় সব!

তাদের হদিস পাইনি, মা। তবে ফিরে আসার সময় মনে হল বনের ভেতর কোথাও কোনো গর্ত খোঁড়া আছে কিনা দেখা যাক।

এবার আমরা সারা বনে গর্তের সন্ধান করে ফিরতে লাগলাম।

দুটি গর্ত আবিষ্কার করা গেল। বনের ভেতর এই গর্তগুলি হল সুড়ঙ্গ। একটা পত্রবহুল গাছের ডাল দিয়ে এই সুড়ঙ্গের মুখ ঢেকে রাখা হয়। আমরা ডাল সরিয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

হাতে আলো ছিল না, সেই চাপা অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে অনেক গভীরে চলে গেলাম।

আমি সামনে ছিলাম,আমার পায়ের চাপে একটা বাচ্চা ছেলে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। তখন সুড়ঙ্গের ভেতরে অনেকগুলো মেয়ের আর্ত গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমি মহারানি শিরোমণির কাছ থেকে তোমাদের খবর জানতে এসেছি।

BanglaBook.org

ওরা আপনার নাম শোনামাত্র আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ওদের কাছ থেকে যেটুকু খবর জোগাড় করতে পেরেছি তাই আপনাকে নিবেদন করছি, মা। ভোরবেলা বনের পুরুষমানুষগুলো রাস্তার ওপারে চাষের কাজ করতে গিয়েছিল। এসময় বনের প্রায় প্রতিটি মানুষ মাটি কুপিয়ে চাষের কাজে লেগে পড়ে। মেয়েরা পাতা কুড়োয়, মধু ভাঙে, মাটির তলা থেকে কন্দমূল সংগ্রহ করে।

যে যার কাজে লেগে গিয়েছিল, হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেল।

ক্রমাগত গুলির আওয়াজ উঠছে।

একসময় গুলির শব্দ থেমে গেল। যে ক'জন পুরুষমানুষ রোগে ভুগে কুঁড়ের ভেতর ছিল, তারাও ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মেয়েরা বলল, তোমরা বনের আরও গভীরে চলে যাও, আমরা এখানে চাষের মানুষগুলো না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমাদের জন্য তোমরা কিছু ভেবো না। যে সব ছেলে ফাঁদ পেতে পাখি ধরছে তাদেরও তাড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও।

মেয়েরা প্রায় সারাটা দিন বনের ভেতর থেকে উঁকিঝুঁকি মেরেছে, কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও ওদের একটি মরদও ফিরে আসেনি। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে মনে করে সন্ধ্যা নামতেই ওরা সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। কোলের বাচ্চাগুলো কেবল থেকে গেছে ওদের সঙ্গে।

আমরা, মা, চলে আসার সময় বলে এসেছি, বনের ভেতরে থেকে তোমাদের যে কাজ তা করে যাবে। দা, হাঁসুয়া সবসময় হাতের কাছে তৈরি রাখবে। রানিমার নির্দেশ, হাতিয়ার নিয়ে তৈরি থাকতে হবে সর্বদা। ভয়ংকর সব দুশমন ঢুকে পড়েছে আমাদের এলাকায়। তারপর চলে এসেছি, মা।

কী হতে পারে? নিশ্চয়ই মানুষগুলোর ভয়ংকর কোনো বিপদ ঘটেছে। রানি পালকিতে গিয়ে বসলেন আর বললেন, তোমরা বনের বাইরে লোক চলাচলের রাস্তা ধরে রাজপুরীর দিকে এগিয়ে যাও।

রানির নির্দেশমতো বাহকরা পালকি কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে লাগল। পাহারাদাররা যে যার জায়গায় থেকে ছুটে চলল পালকির সঙ্গে সঙ্গে।

সূর্যোদয় হয়নি, তবে ভোরের আলোয় ভরে গিয়েছিল চরাচর। পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছিল মাথার ওপর দিয়ে।

নিঃশব্দে ফাঁকা রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল রানি শিরোমণির পালকি।

রানি পালকির ভেতর থেকে পাখি তুলে বনের দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা মানুষকে গাছের ডাল থেকে ঝুলে থাকতে দেখলেন।

চাপা গলায় বললেন, পালকি নামাও।

বেহারারা রানির নির্দেশ পালন করল।

রানি পালকির পাল্লা খুলে ভালো করে দেখলেন, লোকটি শালগাছের ডাল থেকে দড়িতে ফাঁসে ঝুলছে।

প্রথমে মনে হল, কেউ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

আবার চলতে হুকুম করলেন। পাখিগুলো তুলে বনের দিকে তাকিয়ে চলতে লাগলেন।

এ কী দেখছেন!—প্রতিটি গাছের ডাল থেকে একটি করে মানুষ গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে আছে!

সমস্ত দলটাই দ্রুত পায়ে চলছিল। এই ভয়ংকর দৃশ্যগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেরিয়ে যেতে চেয়েছিল তারা।

সামনে পড়ল সৈন্যদের একটা তাঁবু। লালমুখো কয়েকটা গোরা সেনা বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁবুর সামনে।

BanglaBook.org

হেঁকে জানতে চাইল, পালকি কার? কোথায় চলেছে?

সাহেবদের সঙ্গে এদেশীয় যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল সেই স্থানীয় ভাষায় গোরা সৈন্যের প্রশ্নটা উচ্চারণ করল।

রতন ঘাবড়াবার লোক নয়। সে সহজ গলায় উত্তর দিল, এ মহারানি শিরোমণির শিবিকা। আমরা কর্ণগড়ের প্রাসাদে চলেছি।

রাস্তার ধারে ধারে এমনই চার-পাঁচটা তাঁবু তাঁদের পেরোতে হল। একই প্রশ্ন উঠল, জবাবও একইরকম দেওয়া হল।

অদূরে কংসাবতী দেখা যাচ্ছে। এদিকের বনও শেষ হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচশত মানুষকে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা গেছে। রানি শিরোমণির পালকি নদী পেরিয়ে ওপারে চলে যাবে।

হঠাৎ পাশের ঝোপটা নড়ে উঠল। একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় ঝোপটা বেশ খানিকটা জায়গা ঘিরে রেখেছে। এখানেও তাঁরা একটা মানুষকে গাছের ডাল থেকে ঝুলে থাকতে দেখলেন।

রতন বলল, মা, ঝোপের ভেতর একটা মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। রানি পালকি নামাতে বললেন।

রতন ততক্ষণে বনের ভেতর ঢুকে গেছে।

এদিকে গোরা সেনাদের কোনো ছাউনি নেই। রানি পালকি থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

মনে হল কাউকে ধরার জন্য রতন বনের ভেতর দৌড়ে চলেছে।

রতনের গলার একটা আওয়াজ পেলেন, ভয় নেই, ভয় নেই, আমি মহারানি শিরোমণির লোক, তুমি রানিমার কাছে চলো।

ছেলেটি পায়ে পায়ে রতনের সঙ্গে বনের বাইরে বেরিয়ে এল।

রানি দেখলেন, তেরো-চোদ্দ বছরের হৃষ্টপুষ্ট একটি ছেলে, একমাথা কোঁকড়া চুল, চোখ দুটোতে আতঙ্কের ছোঁয়া।

সাঁওতাল আদিবাসীদের ছেলে বলে মনে হল। তাকে কাছে টেনে নিতেই সে রানির হাঁটু জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

তার মাথাটা জড়িয়ে ধরে রানি বললেন, কী হয়েছে বলো তো?

সে যা বলল, তাতে জানা গেল, ওরা চাষের কাজে এসেছিল। হঠাৎ দেখল, বনের ভেতর দিয়ে সাদা লোকগুলো কখন এসে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর সমানে গুলি চালিয়ে গেছে গোরা সৈন্যগুলো। ছেলেটাকে তার বাবা হামা দিয়ে বনের ভেতর ঢুকে যেতে বলে নিজে লাফ দিয়ে ঢুকতে চেয়েছিল কিন্তু গুলি খেয়ে অন্যদের মতো আছড়ে পড়ে।

তারপর ওই গোরাদের জোগাড় করা এদেশীয় লোকজন গাছের ওপর উঠে এদের সব ক'জনকে ঝুলিয়ে দেয়।

ছেলেটা গতকাল থেকে এ পর্যন্ত বাড়ি না গিয়ে বাবাকে পাহারা দিয়ে ঝোপের আড়ালে বসে আছে।

রানি রতনকে বললেন, তোমরা পালকি নিয়ে নদীর ধারে এসো, আমি আগে নেমে যাচ্ছি।

রতন বলল, মা, আপনি একা পেরোতে পারবেন না।

শিরোমণি বললেন, না, আমি পেরোব না। নদীর জল স্পর্শ করব।

ছেলেটিকে নিয়ে রানি নদীর ধারে নেমে গেলেন।

জবাকুসুম রঙের সূর্যোদয় হচ্ছে। নদীপ্রবাহে সেই রঙের ছোঁয়া লেগেছে।

দূর থেকে মনে হচ্ছে রক্তের প্রবাহ।

BanglaBook.org

রানি নদীর কূলে নতজানু হয়ে বসে অঞ্জলি ভরে জল তুললেন। তার ইঙ্গিতে কিশোরটিও তাই করল। রানি জল হাতে মৃতদের উদ্দেশে তর্পণ করলেন। সূর্যপ্রণাম করে বললেন, আমাদের চাষাভুষো সাধারণ মানুষগুলোর অন্তরে তোমার বিপুল শক্তি সঞ্চার করো, যাতে তারা পাপীদের ধ্বংস করতে পারে।

দ্বিতীয় স্ফুলিঙ্গ

অন্দরমহলে প্রতীক্ষা-কক্ষে বসেছিলেন জমিদার চুনিলাল খান। কর্ণগড় এবং আবাসগড়ের সম্মানীয় দেওয়ান তিনি। অদূরে একটি আসনে বসেছিল নতমুখী এক তরুণী, অনুমান অষ্টাদশী।

কন্যা লাবণ্যময়ী, পৃষ্ঠদেশে পড়ে আছে প্রপাতের মতো কৃষ্ণবর্ণের কেশগুচ্ছ। শ্যামবর্ণা সুঠাম সৌষ্ঠবের অধিকারিণী কন্যাটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

দ্বার পর্যন্ত রানিকে এগিয়ে দিয়ে গেল প্রধানা পরিচারিকা।

রানি করজোড়ে নায়েব চুনিলাল খানকে নমস্কার নিবেদন করলেন।

মধ্যবয়স্ক চুনিলাল নায়েব হলেও কর্ণগড়ের রাজবংশের আত্মীয়। তিনি ঈষৎ গাত্রোত্থান করে পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন।

রানি তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসে আগন্তুক তরুণীটির দিকে তাকালেন।

কন্যাটি মুখ তুলে একদৃষ্টে মহারানির দিকে তাকিয়েছিল।

চোখ দুটি আয়ত কিন্তু দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত করুণ বিষণ্ণতার ছাপ।

রানি শিরোমণি বললেন, নায়েবমশায়, এই নতুন মেয়েটিকে কোত্থেকে নিয়ে এলেন? এর পরিচয়ই বা কী?

আগে তোমাকে একটা কথা দিতে হবে যে, মা।

বলুন।

এই কন্যাটিকে তোমার কর্ণগড়ে আশ্রয় দিতে হবে। এর পরিচয় পেলে তুমি নিশ্চয়ই অমত করবে না।

রানি শিরোমণি মেয়েটির পরিচয় জানার জন্য নায়েব চুনিলাল খানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নায়েব মুখবন্ধটা এভাবে করলেন, মহারাজ অজিত সিংহের সৌভাগ্য যে, তাঁকে পলাশির যুদ্ধ দেখে যেতে হয়নি।

রানি বললেন, তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পরে ঘটেছিল পলাশির যুদ্ধ। আর ওই যুদ্ধে জয়ী হয়ে বণিক ইংরেজ এখন আমাদের দেশ শাসনের স্বপ্ন দেখছে।

এর জন্যে দায়ী মা আমাদের দেশেরই মানুষ।

রানি বললেন, মিরজাফরদের বিশ্বাসঘাতকতাই এর জন্যে দায়ী।

নবাবকে সরিয়ে সেই সিংহাসনে বসাবার টোপ দিয়েছিল ধূর্ত ইংরেজরা। তাই প্রধান সেনাপতি হয়েও মিরজাফর আক্রমণের মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনী যেন এক এক সার পুতুল। তিষ্ঠ বলে দুর্ভাগ্যের শয়তান তাদের অচল করে রেখে দিল।

নায়েবমশায়, বিশ্বাসঘাতককে তো তার ফল পেতে হয়েছে। বেনিয়ারা মিরজাফরকে মসনদে বসিয়ে কামধেনুর মতো রাজকোষের সব অর্থ, হিরে-জহরত দোহন করে নিয়ে একসময় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

চুনিলাল বললেন, আজ আমাদের দেশীয় রাজা, মহারাজা, জমিদার, পাইক-বরকন্দাজ, চাষা-ভুষোদের যে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে তার মূলে কিন্তু নবাব মিরকাশেম।

BanglaBook.org

রানি একথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পেরে নায়েবমশায়ের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন।

নায়েব বললেন, কথাটা ভেবে দেখো, মা। আমরা বাদশাহি ফরমান বলে সামান্য কিছু কর দিয়ে স্বাধীনভাবে জমির উপস্বত্ব ভোগ করতাম। আমাদের নামে যে নিষ্কর ভূমি রয়েছে, তার জন্যে বাদশাকে কোনো কর দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। সেই নিষ্কর জমি, আমরা আমাদের জমিদারিতে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চুয়াড় আর পাইক-বরকন্দাজদের ভেতর বিলিয়ে দিয়েছিলাম। বন কেটে, খেত চষে যে সব প্রজারা আমাদের খাজনাবাবদ শস্য দেয়, সেটাই ছিল আমাদের সম্পদ। কিন্তু রাজকোষ থেকে কোনো অর্থ দিতে না পেরে মিরকাশেম ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছে মেদিনীপুর, বর্ধমান আর চট্টগ্রামের দেওয়ানি। ইংরেজরা এই জেলাগুলো থেকে কর আদায়ের নামে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। বাদশাহি কোষাগারে যে অর্থ দিতাম তার বহুগুণ রাজস্ব চাইছে এই বেনিয়ারা। ফরমান জারি করেছে নিষ্কর জমি বলে কিছু থাকবে না। সবই আসবে করের আওতায়।

রানি বললেন, ইংরেজদের এই হুজ্জোতির মোকাবিলায় তাই জমিদার থেকে চুয়াড়, চাষা, পাইক, সর্দারদের বিভেদ ভুলে এক আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে লড়াই চালাতে হবে। উড়ে এসে আমাদের দেশে জুড়ে বসতে চাইছে যে বেনিয়া তাদের কালবিলম্ব না করে নির্মূল করতে হবে।

সামান্য সময় চিন্তা করে চুনিলাল বললেন, আমাদের অসুবিধে কোথায় জানো মা, ওরা উন্নতধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে, আর আমাদের অস্ত্র বলতে তীরধনু, ঢালতলোয়ার।

উত্তেজিত রানি বললেন, দেশটা আমাদের, এর অন্ধিসন্ধি আমাদের জানা। আমরা বিভেদ ভুলে যদি সংঘবদ্ধ হতে পারি তবে ওদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে তাড়ানো অসম্ভব নয়।

আসল সত্যটা বলি মা, দেশভক্তি শব্দটা আমাদের কাছে প্রায় অজানা। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আমরা আর কিছু বুঝি না।

রানি শিরোমণি বললেন, মিরজাফরের মতো ঘোরতর স্বার্থপর, লোভী মানুষদের ভেতর নিঃস্বার্থ দেশপ্রাণ দুটি মানুষকে তো আমরা পেয়েছি। বীর মোহনলাল আর মিরমদন, প্রধান সেনাপতি মিরজাফরের মতো যুদ্ধ না করে তো নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা বিদেশিদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তাই বিপুল গোলাবর্ষণকে উপেক্ষা করে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শত্রুদের সংহার করতে। মৃত্যুবরণ করেও তাঁরা কিন্তু অমর হয়ে গেছেন। আমাদের যুদ্ধে এখন ওঁরাই প্রেরণা। প্রতিদিন সূর্যপ্রণাম করতে গিয়ে আমি ওঁদের স্মরণ করি।

সহসা নায়েবমশায় আসন ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলেন নবাগত মেয়েটির দিকে।

মেয়েটি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

নায়েবমশায় তরুণীটির হাত ধরে নিয়ে এলেন রানি শিরোমণির কাছে। বললেন, কয়েক মুহূর্ত আগে আপনি যাকে শ্রদ্ধা জানালেন দেশভক্ত বলে, এই তরুণীটির দেহেও একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

হতচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন রানি শিরোমণি। তখনও কথাটা স্পষ্ট হয়নি তাঁর কাছে।

নায়েবমশায় বললেন, এই কন্যা বীর মোহনলালেরই ভগ্নী। মুর্শিদাবাদে আমার এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আশ্চর্যভাবে আমি এই কন্যাটির সন্ধান পাই। আমার বন্ধুর বাড়িতে অত্যন্ত দুর্দিনে এই নিরাশ্রয় মেয়েটি আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু এই কন্যাটিকে আশ্রয় দিয়ে বন্ধুটি তটস্থ হয়ে থাকত। ইংরেজ পক্ষের গুপ্তচরেরা তখন খুঁজে ফিরছিল মোহনলাল মিরমদনের আত্মীয়দের।

বিধাতার শুভ যোগাযোগ মনে করে আমি এই কন্যাটিকে বিপদের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে চলে এসেছি।

BanglaBook.org

রানি শিরোমণি বললেন, আপনি আমাকে আজ মহামূল্য এক রত্ন উপহার দিলেন, নায়েবমশায়। আমার প্রাণ থাকতে এর কোনো অসম্মান হবে না।

উঠে দাঁড়ালেন নায়েব চুনিলাল খান। বললেন, কাছারিবাড়িতে গোমস্তাদের সঙ্গে আমার কিছু কাজ আছে। আমি কাজ সেরে ওই পথেই বাড়ি ফিরে যাব। নাড়াজোলে আমার জরুরি কিছু কাজ আছে, তাই মধ্যাহ্নভোজ এখানে সারা সম্ভব হবে না। পরে জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিভৃতে তোমার সঙ্গে আমি আলোচনা করব।

নায়েবমশায় বাইরে বেরিয়ে গেলেন, —বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটিকে বিদায় জানাতে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রানি।

এবার মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে বললেন, তুমি কোনো দুঃখ কোরো না। তুমি জানবে ভগবতী মহামায়ার পূজারি আমরা, তিনিই কর্ণগড় আর আবাসগড় রক্ষা করছেন। তুমি আমার কন্যা, তুমিও দেবীর আশ্রয় আর কৃপালাভ করবে।

মহারানি নতুন পাওয়া এই মেয়েটিকে নিয়ে অন্দরমহলে নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন।

কি নাম তোমার?

আনন্দী।

রানি বললেন, তা হলে এত নিরানন্দ কেন? ঘন কালো মেঘ আকাশের চাঁদকে ঢেকে ফেলে ঠিক কিন্তু একসময় কালো ঢাকাটা ধীরে ধীরে সরে যায়। তখন চাঁদ তার নিজের মহিমায় প্রকাশ পায়। তোমার ওই চাঁদের মতো কোমল মুখে আমি কোনোরকম কষ্টের ছোঁয়া লাগতে দেব না।

দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল আনন্দীর গাল বেয়ে,—রানি ত্রস্তে আঁচলের প্রান্ত দিয়ে সে জল মুছে নিলেন।

আমার ছেলেমেয়ে কেউ নেই আনন্দী, জানবে আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে।

আবার হাতের পাতায় দু'চোখ ঢেকে ফেলল আনন্দী,—রানি তাকে বুকে টেনে নিলেন।

মৃদু গলায় বললেন, তোমার দেশ কোথায়?

রানিমা, আমি তখন খুব ছোট। অসুস্থ মা বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আমাকে দেখভাল করার ক্ষমতা ছিল না তার। বাবা খেতে-খামারে সারাদিন কাজ করত। সন্ধেবেলায় ঘরে ফিরে আমাকে বুকে করে উঠোনে ঘুরতে ঘুরতে গান করত—এইটুকু স্মৃতি বাবার সম্বন্ধে আজ আমার মনে পড়ে।

এর পর একদিন সন্ন্যাস রোগে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেল। দু-চারদিন পরে দাদা এসে নিয়ে গেল মা আর আমাকে মুর্শিদাবাদে।

কথাপ্রসঙ্গে জেনেছিলাম, আমাদের আদি বাড়ি ছিল মেদিনীপুরে। একটি শাখা চলে গিয়েছিল হুগলিতে। কিন্তু বলতে পারেন জ্ঞান হাওয়া থেকে আমি মুর্শিদাবাদেই মানুষ।

ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার দাদা যখন শহীদ হয়ে যান তখন তোমার মা কি জীবিত ছিলেন?

না রানিমা, মা যুদ্ধ শুরু হওয়ার বেশ কয়েকমাস আগে গত হয়েছিল। তাই তাকে পুত্রশোক সইতে হয়নি। কিন্তু দাদা প্রাণাধিক ভালোবসত আমাকে। তার মৃত্যুর দুঃখ সইতে কেবলমাত্র আমিই বেঁচে রইলাম রানিমা।

দুঃখের বদলে আগুন ঝলসে উঠল রানির চোখে। তিনি বললেন, যারা তোমার দাদার প্রাণ নিয়েছে, এই মেদিনীপুরের মাটিতে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তুমি লড়াই চালিয়ে যাও, আমি এখন সেই কাজই করে চলেছি। ধূর্ত ইংরেজ ছলে বলে কৌশলে দেশটাকে শুষে নিতে চাইছে, আমরা আমাদের সংঘবদ্ধ শক্তি দিয়ে তাদের পরাস্ত করব। এ যুদ্ধে তুমি আমার পাশে থাকবে।

রানি শিরোমণি আশ্চর্য হলেন এই অল্পবয়সি তরুণীর নানা গুণের পরিচয় পেয়ে। যেমন বিনয়ী তেমনই প্রবল আত্মসম্মানবোধ।

BanglaBook.org

একদিন আনন্দী রানিমার সঙ্গে প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে দূর প্রান্তরের দিকে তাকিয়েছিল। অপরাহ্ণের রং ধরেছিল সূর্যের আলোয়। আনন্দীর দৃষ্টি আটকে গেল দূরের একটা দৃশ্যের ওপর।

কতকগুলি ঘোড়সওয়ার দিগন্তরেখা থেকে দৌড়ে আসছিল দুর্গের দিকে। তারা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তারা তলোয়ার আর বর্শা উঁচিয়ে আস্ফালন করতে করতে ছুটে আসছিল।

আনন্দী রানিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেঁচিয়ে উঠল, দেখুন মা, একদল ঘোড়সওয়ার দুর্গ আক্রমণ করতে ছুটে আসছে।

রানি শিরোমণি আনন্দীর মাথায় হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, ওরা আমারই দুর্গের একদল রক্ষী। নিয়মমতো ওরা প্রতিদিনই ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের মহড়া দেয়।

সেদিন রানিমার কথায় আশ্বস্ত হয়েছিল আনন্দী। সে হঠাৎ বলে উঠল, আমিও ভালো ঘোড়সওয়ার, রানিমা।

রানির চোখেমুখে বিস্ময়, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পার?

আমার যখন ন'দশ বছর বয়স তখন থেকেই দাদা আমাকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছে। নিয়মিত অভ্যাস করেছি আমি। পলাশির আমবগানের পাশে প্রায় জনহীন একটা প্রান্তরে ছিল আমাদের আস্তানা।

দাদা থাকতেন সেনাছাউনিতে, আমরা মা, মেয়ে দুজনে ওই বাড়িতে থাকতাম। আমার বাড়ির সামনে দাদার দু'দুটো ঘোড়ার জন্য একটা আস্তাবল ছিল। সে ঘোড়া দুটোর পরিচর্যা করতাম আমি। দাদা মাঝে মাঝে এসে আমাকে ঘোড়াচালানোর তালিমও দিত। আমরা একেবারে মুর্শিদাবাদের শহরাঞ্চলে থাকতে পারতাম কিন্তু দাদা সেটা চায়নি।

রানিমা জানতে চাইলেন, কেন আনন্দী?

দাদা বলত, বাদশাহি হাওয়া গায়ে লাগুক এটা আমি চাই না। আমি ভুলিনি আমরা চাষাভুষো বাড়ির ছেলে। যুদ্ধের কাজ নিয়েছি তাই আমাকে সেনা-ছাউনিতে থাকতে হয় কিন্তু আমার দেশের হাওয়ার ছোঁয়া আজও আমি শ্বাস টানলে অনুভব করি—সেই লাল মাটির রাস্তা সেই পাকা ধানের বাস।

তবে দাদা অশ্বারোহী সেনা ছিল বলে ঘোড়ার ব্যাপারে সব কিছু জানত।

মা অসুস্থ ছিল তাই একটা কাজের মেয়ে আমাদের সাহায্য করত। সপ্তাহে অন্তত দু'একবার সময় পেলেই দাদা বাড়িতে চলে আসত। আমি চেয়ে থাকতাম পথের দিকে—দাদা কখন আসবে।

দূরে দেখতে পেলেই আস্তাবল থেকে আমি ঘোড়াটাকে বাঁধন খুলে নিয়ে এগিয়ে যেতাম।

দাদা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে আমাকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করত। দাদার কাছ থেকে ঘোড়া চালানোর নানা কৌশল আমি শিখে নিয়েছিলাম।

দূর প্রান্তর লক্ষ্য করে আমি ঘোড়া নিয়ে ছুটে যেতাম, কখনও বা ঝোড়ো বাতাস চিরে ছুটে যেতে হত। কানে শন-শন শব্দ বাজত। মনে হত, শত শত অদৃশ্য ঘোড়া ছুটে চলেছে।

ফাঁকা প্রান্তরে যখন ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে দাঁড়াতাম তখন নিজেকে বাদশাজাদি বলে মনে হত।

দাদার কাছে বায়না ধরে আমি বর্শা ছোঁড়া আর তলোয়ার চালানোও শিখেছিলাম।

দাদা বলত, তুই আমার ভাই হলে এতদিনে একজন দক্ষ সেনাপতি হয়ে যেতিস।

দাদার রসিকতায় আমি কান্নার অভিনয় করতাম। অমনি দাদা বলত, তোকে খ্যাপাবার জন্য বলছি নারে, আসল মনের কথাটাই বলেছি।

রানিমা, আমি তীর ছোঁড়া, তলোয়ার চালানো, বর্শা ছোঁড়াতে তেরো-চোদ্দো বছরেই পাকা ওস্তাদ বনে গিয়েছিলাম।

রানি বললেন, তুমি আমার ইস্পাতের তৈরি তলোয়ার। প্রয়োজনে তুমি শত্রুর রক্ত ঝরাতে পারবে।

banglabook.org

জ্যোৎস্নারাতে দুর্গের ভেতরগড়ে 'জলহরি' পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে রানি বসে থাকতেন। ঘাটের কাছে শিমুল গাছে বাঁধা থাকত একটা কালো রঙের বেশ তেজী ঘোড়া। নাম ছিল চৈতক।

রানি বলতেন, আনন্দী, তুমি এই ঘোড়ায় চড়ে দীঘির চারদিকটা চক্কর দিয়ে এসো, আমি এখানে বসে বসে তোমাকে দেখি।

আনন্দী সহজেই ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠতে পারত। তারপর তার পায়ের ধাক্কায় আর রাশটানার কৌশলে ঘোড়াটা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে আরম্ভ করত।

দীঘির পর গড়খাই দুর্গকে বেষ্টন করে ছিল। দীঘির সঙ্গে সাত-আট হাত একটা নালার মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল গড়খাই-এর।

রানি ভেবেছিলেন, আনন্দী ওখান থেকেই আবার ফিরে এসে উল্টোদিক দিয়ে দীঘিটার পরিক্রমা শেষ করবে। কিন্তু সে যখন ছুটন্ত ঘোড়াটার রাশ টেনে ধরে পেটে ধাক্কা দিল তখন ঘোড়াটা উড়ন্ত পক্ষীরাজ হয়ে ওই আট হাত নালিটাকে অনায়াসে টপকে গেল। আনন্দী উল্টোদিক দিয়ে বাঁধানো ঘাটের দিকে আসতে আসতে দেখল, রানি ঘাটের পারে দাঁড়িয়ে তার দিকে গালে হাত দিয়ে তাকিয়ে আছেন।

আনন্দী রানির কাছে ফিরে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল।

রানি এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগে তাঁর চোখের জল চিকচিক করছিল। বললেন, আমার স্বামী মহারাজ অজিত সিং আমাকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছিলেন। আমি কয়েকবার জ্যোৎস্নারাতে প্রান্তর পেরিয়ে তাঁর সঙ্গে কংসাবতী নদীর চরে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু তোমার মতো কোনোদিনও আমি ওই আটহাত নালাটা ডিঙিয়ে যাওয়ার সাহস পাইনি।

একটু থেমে বললেন, মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরই কাউকে পাঠিয়ে দেন, তুমি আমার মহামায়ার সেই দান।

প্রতিরাতে প্রাসাদের ওপরে বসে রানি শিরোমণি আনন্দীর সঙ্গে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা করতেন। অতি অল্প দিনের ভেতরেই সে স্বামির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

একদিন মুর্শিদাবাদের স্মৃতি-রোমন্থন চলছিল।

রানি বললেন, মুর্শিদাবাদে এমন কাউকে পেয়েছ, যে তোমার স্মৃতিতে আজও জেগে আছে? এই ধরো, যাদের সঙ্গে খেলাধুলো করেছ, আনন্দ গল্পে কাটিয়েছ?

গ্রামের মেয়েরা আসত মাঝে মাঝে। তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতাম, গাছে উঠে ফল পাড়তাম। একটা শালুক-ভরা পুকুর ছিল, সেখানে নেমে শালুক তুলতাম, ডুব সাঁতার দিয়ে পুকুর পার হয়ে যেতাম।

এক এক করে তাদের অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেল। আমাকে পালকি পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিয়ে গেছে ভোজ খাওয়ার জন্য।

তাদের কথা এখন তোমার খুব মনে পড়ে তাই না?

আনন্দী বলল, তা মনে পড়ে, রানিমা। তবে ভয়ংকর যুদ্ধের স্মৃতিটা এখনও আমার মন থেকে মুছে যায়নি।

আনন্দী থেমে গেল। কিন্তু চোখের জল আটকাতে পারল না।

তুমি কাঁদছ কেন?

রানি তার গায়ে হাত রাখতেই আনন্দীর চোখ ভেঙে অঝোরে জল ঝরতে লাগল।

রানি তাকে তাঁর ডানহাতে জড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, অতীতের কী এমন স্মৃতি যা তোমাকে এতখানি আহত করেছে!

আনন্দী তাঁর স্নেহের আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে শুধু মাথা নাড়তে লাগল।

BanglaBook.org

রানি তার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি আমার কাছে নিশ্চয়ই এমন কোনো কথা গোপন করছ যার স্মৃতি আজও তুমি ভুলতে পারনি। অবশ্য দাদার স্মৃতি চির-অম্লান হয়ে থাকবে।

এই স্নেহময়ী-জননীর কাছে হার মানল আনন্দী। কান্নাভেজা গলায় উপচে এল অবরুদ্ধ বেদনা

তরুণ একটি ছেলে আমার দাদার সঙ্গে কোনো কোনো সপ্তাহে আমাদের বাড়িতে আসত। সে শুধু দেখতেই বলিষ্ঠ সুন্দর ছিল তা নয়, তার মনটাও ছিল অনেক বড়।

আমার দাদা তখন বিশহাজারি মনসবদার। ছেলেটি আমার দাদার পাশে পাশে থেকে তার দেহরক্ষীর কাজ করত।

মায়ের কাছে দাদা হেসে বলত, রামানন্দ আমার পাশে থাকলে শত্রু তো দূরের কথা স্বয়ং শমনও আমার কাছে ঘেঁষতে ভয় পাবে। দাদা আমাকে বলত, একটা তীর যদি আমার দিকে ছুটে আসে তাহলে ও ঝাঁপিয়ে ওই তীরটাকে নিজের বুক পেতে ধরে নেবে।

আমার সঙ্গে মিষ্টি হেসে রামানন্দ কথা বলত। আমার ঘোড়ায় চড়ার কসরত দেখে ও তারিফ করে বলত, তুমি তো একদম আমার মনিবের মতো ঘোড়া চালাচ্ছ।

ও চলে গেলে আমার মনটা কেমন ভারী হয়ে উঠত। সব কাজের ভেতরে আমি কেমন যেন একটা শূন্যতা বোধ করতাম।

দূর থেকে দাদাকে কোনো সপ্তাহে একা আসতে দেখলে আনন্দের সঙ্গে কেমন একটা হতাশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত।

রানিমা, আপনার কাছে আজ আমার বলতে কোনো সঙ্কোচ নেই, একদিন দুজনে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিলাম। দাদা দাওয়ায় বসে থেকে বলল, ওই দূরের আমবাগানটাকে বেড় দিয়ে তোমরা কে এখানে আগে এসে পৌঁছতে পার আমি সে পরীক্ষা করতে চাই।

আমবাগানের আড়ালে পৌঁছে কিন্তু ছবিটা অন্যরকম হয়ে গেল। মন্থর হয়ে গেল আমাদের চলা। সেই প্রথম ওর বাড়ানো হাতে আমি হাত রাখলাম। আর কোনো কথা নয়, সেদিন অতি অল্প সময় হাতে হাত রেখে দুজন দুজনকে অনুভব করেছিলাম। এরপর প্রকাশ্যে এসে আমি ঘোড়া ছুটিয়েছিলাম দ্রুত। আমি আগে দাদার কাছে পৌঁছেছিলাম। ও যেন সেদিন ইচ্ছে করে হেরে আমার মনের ভেতর বিজয়ীর আসনে বসেছিল।

BanglaBook.org

কথায় ছেদ ফেলে আনন্দী কিছুটা সময় উদাস হয়ে বসে রইল।

রানি এবার কথা বললেন, ওই তরুণটিকে কি তুমি ভালোবাসতে?

আনন্দী মাথা নীচু করল।

সঙ্কোচ কী মা, মনের মতো মানুষকে তুমি ভালোবেসেছ এতে অপরাধ কোথায়? তারপরের ঘটনা আমাকে অসঙ্কোচে বলে যাও।

অসুস্থ হয়ে মা প্রায় মাসাধিক কাল শয্যাশায়ী ছিল। ঠিক সেই সময় ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের কলকাতার অধিকার নিয়ে মতবিরোধ চলছিল। দাদাকে সারাক্ষণ সৈন্যশিবিরে যে কোনো আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়েছিল।

মাঝে মাঝে অসুস্থ মাকে দেখতে চলে আসত দাদা, কিন্তু দু'এক ঘণ্টার বেশি থাকতে পারত না। কবিরাজি চিকিৎসা চলছিল। বাজার থেকে অথবা বনবাদাড় থেকে গাছগাছালি সংগ্রহ করে রস তৈরি করতে হত অনুপান হিসাবে ওষুধের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য। আমার একার পক্ষে সেসব সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। বিশ্বস্ত কাউকে সে সময় আমাদের প্রয়োজন ছিল।

সবদিক বিবেচনা করে দাদা বলল, কয়েকদিন রামানন্দ এ বাড়িতে থাক। ও এই অঞ্চলেরই ছেলে। গাছগাছালি শেকড়বাকড় সবই ওর চেনা। দরকারে ও যে কোনো সময় সেনাছাউনিতে গিয়ে আমাকে খবর দিতে পারবে।

দাদার এই ব্যবস্থা আমি বেশ খুশিই হয়ে উঠলাম। রামানন্দকে একান্ত কাছে পাওয়া আমার কাছে স্বপ্নের মতো ছিল।

রাত জেগে মায়ের সেবা করতে হত। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে ও জোর করে আমাকে বিশ্রামের জন্য অন্যখানে পাঠিয়ে দিত। নিজে কিন্তু রাত জাগত নিষ্ঠাবান সৈনিকের মতো।

একদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা অন্যদিকে ভালোবাসার রোমাঞ্চ আমাদের দিনরাত্রিকে আকুল করে তুলেছিল।

আমরা সেবা দিয়ে মাকে সুস্থ করে তুলতে পারলাম না। মৃত্যুর আগে রামানন্দের মাথায় হাত রেখে মা আশীর্বাদ করে গিয়েছিল। মুখে কিছু বলার আর শক্তি ছিল না তার।

মা যখন মৃত্যুর আগে অস্থির হয়ে উঠছিল, সারাদেহ আক্ষেপে বেঁকে চুরে যাচ্ছিল তখন রামানন্দ তার বলিষ্ঠ দুটো হাতের ভেতরে মাকে জড়িয়ে ধরেছিল। রামানন্দের কোলেই ধীরে ধীরে মা মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে।

সেনাছাউনিতে ছুটে গিয়ে দাদাকে দুঃসংবাদটা দেয় রামানন্দ।

মাকে দাহ করার সময় দাদার নির্দেশে একই সঙ্গে দুজনে মায়ের মুখাগ্নি করি।

এরপর ভোরবেলা যে কাজের মেয়েটি আসত সে রাতে কিছুদিন আমার কাছে থেকে যায়।

এরপর ঘনঘন রামানন্দের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সুযোগ আমার আর হত না।

এবার সারা মুর্শিদাবাদ জুড়ে ভয়ংকর একটা ঘূর্ণিঝড় দিগ্‌দিগন্ত তোলপাড় করে বইতে লাগল। তখন যুদ্ধের সাজো সাজো রব। দাদাকে আর দেখতেই পেতাম না। সামান্য সময়ের জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের বাড়িতে আসত রামানন্দ। দাদার পাঠানো কিছু অর্থ দিয়েই সে উধাও হয়ে যেত।

দু'এক টুকরো কথা থেকে জানতে পারছিলাম, যুদ্ধ অনিবার্য এবং আসন্ন।

পলাশির আম্রকাননের কাছ থেকে একদিন আমাকে বেশ দূরে একটি ছোট ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

পলাশি প্রাঙ্গণে তখন বন্দুকধারী ইংরেজদের রাতদিন কুচকাওয়াজ চলছিল। আমি চলে আসার দিন দেখেছিলাম আমবাগানের ভেতর অনেকগুলি কামান বসানো হচ্ছে।

কাছে-পিঠে যে সব গ্রাম ছিল, সেখান থেকে ভয়ে লোকজন পালাচ্ছিল যে যেদিকে পারে।

আমি যে ঘরে আশ্রয় পেয়েছিলাম তার চারদিকের বাড়িঘর থেকে কয়েকদিনের মধ্যেই লোকজন উধাও হয়ে গেল।

রামানন্দ দাদার নির্দেশে ওই বাড়িতে আমাকে রেখে যাওয়ার সময় প্রচুর খাবারদাবার মজুত করে রেখে যায়।

আমি খুব সাহসী ছিলাম। কিন্তু ঘটনার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমি কোনোরকম আন্দাজ করতে পারছিলাম না।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে জানতে পারলাম তখনই যখন পলাশির আম্রকানন থেকে ঘন ঘন কামান গর্জন শোনা গেল।

হারজিতের কোনো ছবিই আমার চোখের সামনে ছিল না। দুর্ভাবনায় আমার রাত্রি-দিন এক হয়ে গিয়েছিল। আমি রাতেও ঘুমোতে পারতাম না।

তখন রাত প্রায় শেষ প্রহর, আমার দরজায় কড়া নড়ে উঠল। ভয়ে ভয়ে আমি দরজাটা খুললাম। বাইরে জ্যোৎস্না। তরুণটিকে চেনা গেল, সে একদিন রামানন্দের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

বলল, আপনি কি সাহস করে আমার সঙ্গে যেতে পারবেন একবার?

কোথায়?

যেখানে গোরা সৈন্যদের সঙ্গ নবাবি ফৌজের যুদ্ধ হয়েছিল।

BanglaBook.org

আমি আর কোনো প্রশ্ন না করে তরুণটির সঙ্গে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে গেলাম।

পথে শুনলাম, নবাব পরাজিত হয়েছেন। সেনাপতি মিরজাফর বিপুল সৈন্য নিয়ে কেবল কালক্ষেপ করে গেছে। লড়াই চালিয়েছে কেবল দুজন,—আপনার দাদা মোহনলাল আর সেনাপতি মিরমদন।

আমি আতঙ্কিত হয়ে বললাম, আমার দাদা কোথায়?

চলুন, আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে মানুষের প্রাণহীন দেহ। কারও বা হাত উড়ে গেছে, কারও ধড় থেকে মুণ্ড।

এরপর শবদেহ পেরোতে পেরোতে আমরা যেখানে এসে থামলাম সেখানে দেখি দুটি মৃতদেহ জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। তাদের ওপর ঢাকা দেওয়া আছে সপত্র ছোট একটি ডাল।

ছেলেটি হাঁটু গেড়ে বসল, আমিও তার পাশে ঠিক তেমনই ভাবে বসলাম।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম কিছু ফুল কেউ ছড়িয়ে রেখে গেছে মৃতদেহ দুটির ওপর।

আরও দেখলাম, কামানের গোলার টুকরোয় দেহ দুটি ক্ষতবিক্ষত।

শেষ মুহূর্তে আমার দাদা মোহনলালকে বুক দিয়ে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণও উৎসর্গ করেছে রামানন্দ।

আনন্দী আর কিছু বলতে পারল না, শুধু মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রানি তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, তুমি কাঁদছ আনন্দী! আগুন কই তোমার চোখে, যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে লুঠেরাদের সমস্ত সঞ্চয়—ধন, মান, প্রাণ।

হাঁ রানিমা, আমি তেমনি একটা শপথ মনে মনে নিয়েছিলাম, কিন্তু মুর্শিদাবাদে আমাকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হচ্ছিল শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। ধরপাকড়, খোঁজাখুঁজি চলছিল সমানে।

আমার দাদা মুর্শিদাবাদের মানুষের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিল। শুনেছি, তার মৃত্যুর খবর পেয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল সারা শহরবাসী।

হাওয়ায় উড়ছিল খবর। নবাব আত্মগোপন করে পালাচ্ছেন জলপথে। মিরজাফরের ছেলে মিরণ তাঁকে ধরার জন্য ধাওয়া করেছে।

যুদ্ধে হতাহত অত্যন্ত অল্প। নবাব পক্ষের প্রধান সেনাপতি, তাঁর সঙ্গে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সৈন্য রেখেছিল। তারা মিরজাফরের নির্দেশে যুদ্ধে একেবারেই অংশগ্রহণ করেনি। তাই দাদা আর মিরমদনের পাঁচশো সেনা যেখানে নিহত হয়েছিল, সেখানে ইংরেজ সেনা নিহত হয়েছিল মাত্র পনেরো জন।

দাদাদের সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনী ছিল না তাই বিপর্যয় হয়েছিল চরম।

আনন্দী থামলে রানি বললেন, বিধাতার নির্দেশে নায়েবমশায় মুর্শিদাবাদ গিয়ে ঠিক তোমাকে পেয়ে গেছেন। উনি জহুরি তাই আসল জওহর চিনে নিতে ওঁর ভুল হয়নি।

আপনি আমাকে যে কাজ করতে বলবেন, তাই করব, যেভাবে চলতে বলবেন, সেভাবেই চলব।

রানি কিছু সময় চিন্তামগ্ন রইলেন। সহসা মুখ তুলে বললেন, ইংরেজরা এখন নতুন তহশিলদার নিযুক্ত করেছে। তারা সিধে চলে যাচ্ছে কৃষকদের কাছে। খাজনা আদায় হচ্ছে শস্যে। আমরাও শস্যে খাজনা ধার্য করতাম কিন্তু তার পরিমাণ ছিল অনেক কম।

চুয়াড়, পাইকরা এখন বিদ্রোহী হয়েছে। তাদের নিষ্কর জমিগুলোতে বিপুল খাজনা চাপিয়েছে। জমিদারদেরও একই হাল। খাজনা না দিতে পারলে নিলামে উঠবে জমিদারি।

আনন্দী বলল, সকল জমিদারের যদি একই অবস্থা তাহলে কে কিনবে জমিদারি?

BanglaBook.org

রানি বললেন, কলকাতার উঠতি বড়লোকেরা। তারা এখন অঢেল টাকা ঢেলে মফস্‌সলে জমিদারি কিনতে চায়। নতুন একটা জীবনের স্বাদ পেতে চায় আর কি।

তাহলে এখন আমরা কী করব, রানিমা?

রাজা, জমিদার, পাইক আর কৃষকরা মিলে আমরা ওদের ক্রমাগত সব কাজে বাধা দিয়ে যাব। দরকার হলে লড়াই চালাব। অতিষ্ঠ করে তুলব ওদের।

রাতের অন্ধকারে সভা বসল কর্ণগড় দুর্গপ্রাঙ্গণে।

ভুক্তভোগী সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষই সমবেত হয়েছে।

রানি মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন সিংহাসনে। সভা পরিচালনা করছেন কর্ণগড়ের নায়েব চুনিলাল খান।

তিনি বলতে লাগলেন, আমাদের সকল সম্প্রদায়ের মানুষই আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছি। উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র আর কূটবুদ্ধির দৌলতে বেনিয়াগুলো দেশটাকে শুষে খেতে চাইছে।

রানি বলে উঠলেন, কেবল দেশের সম্পদ লুঠ করেই সন্তুষ্ট নয়, সারা দেশটার দখল নেবার মতলব এঁটেই এগোচ্ছে।

সমবেত জনতার ভেতর থেকে একজন পাইক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আমাদের জননী, এই ঘোর বিপদে আপনি আমাদের বলে দিন, কোন পথে এগোব।

রানি বললেন, অস্থিরতা সৃষ্টি করুন চতুর্দিকে। অনেক ছোটখাটো জমিদার এখন কৃপালাভের জন্য ইংরেজদের দলে ভিড়ছে। তাদের চিহ্নিত করে সমূলে ধ্বংস করুন। আমাদের তহশিলদারদের সরিয়ে যেসব নতুন তহশিলদার নিয়োগ করেছে ইংরেজরা তাদের দূর করে দিন এলাকা থেকে। তাদের সঙ্গে বন্দুকধারী রক্ষী থাকলে বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের হত্যা করুন।

ইংরেজ পক্ষের জমিদারদের গোলা লুঠ করে গরিব চাষাভুষোর ভেতর বিলিয়ে দিন। রাতে এমন হুঙ্কার ছাড়বেন যাতে সে শব্দ মেদিনীপুর শহরে বসবাসকারী ইংরেজদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

শুরু হল দিকে দিকে লুঠতরাজ। নতুন যে সব জমিদার নিলামে জমিদারি কিনেছিল তাদের গোলা লুঠ হয়ে যেতে লাগল।

পাঁচ ছ'শো অশ্বারোহী সেনা এক এক সময় সংঘবদ্ধ হয়ে সরকারি গোলা লুঠ করত। দাউ দাউ করে জ্বলত আগুন চতুর্দিকে।

মেদিনীপুর শহরে বসে সে আগুনের শিখা দেখতে পেত স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তীব্র চিৎকারও জেলাশাসকের কানে গিয়ে পৌঁছত।

রানির নির্দেশ ছিল, সরকারি গোলার ধান পুড়িয়ে ধ্বংস করবে কিন্তু এক মুঠো ধানও বাইরে নিয়ে যাবে না।

ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা ভিখিরি নই, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। এ শস্যে তোমাদের কোনো অধিকার নেই।

'শিরোমণি' গ্রামে শ'খানেক বিদ্রোহী জড়ো হয়েছিল। ওখানে ঘাঁটি গেড়েছিল ইংরেজদের রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্মচারীর দল। তারা অশ্বারোহী বিদ্রোহীদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাদেরকে ঘিরে বর্শা গেঁথে খুন করা হয়।

এইসব বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য শহর থেকে একদল সশস্ত্র সেপাই গ্রামের ভেতর ঢুকে ঘাঁটি গাড়ল। কিন্তু গ্রামবাসীদের ভেতর কেউই তাদের শিবির স্থাপনের কাজে সাহায্য করল না। এমনকি বেনেরা তাদের রসদ সরবরাহ করতে অস্বীকার করল।

BanglaBook.org

কৃষ্ণ ভঞ্জ নামে এক ব্যক্তিকে সরকার পক্ষ থেকে জমিদারি ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু বিদ্রোহী কৃষকরা নবনিযুক্ত জমিদারটিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়।

'শিরোমণি' গ্রাম আক্রান্ত হলে সেখানে খুন হয় সরকার পক্ষের দণ্ডীরাম পালিত, মোহন পালিত এবং রাজেন দে প্রমুখ।

ঠিক এমনইভাবে সাহাপুর পরগনার আমোদপুর গ্রামে লক্ষ্মীচরণ, কালীচরণ পাল এবং রূপচরণ মহাপাত্র আক্রান্ত হল।

রূপচরণ অন্ধকারে কোনোরকমে পালিয়ে এসে মেদিনীপুরে এই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের খবর দেয়।

এ ধরনের খবরে দুর্ধর্ষ ইংরেজ সরকারও বিচলিত হয়ে পড়ল।

যখন জঙ্গলমহালে এমনই সব ঘটনা ঘটছিল তখন এক রাতে রানির কাছে এসে আনন্দী বলল, মা, বিদ্রোহীদের ভেতরে সবাই দেখছি পুরুষ, আপনি অনুমতি করলে আমিও আপনাকে ওই ধরনের কিছু কাজ করে দেখাতে পারি।

রানি বললেন, বেশ তো, আমার দেশের মেয়েরা দেশের জন্য কিছু কাজ করতে পারলে আমার থেকে খুশি বোধহয় বেশি আর কেউ হবে না। তবে তুমি কী কাজ করতে চাও?

যখন গোরা সৈন্যরা দলে দলে আদিবাসীকে গাছের ডালে ফাঁসিতে লটকেছিল তখন আপনি ভোলা কিস্‌কুকে জঙ্গলের ভেতর থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। সেই ভোলা এখন গোরা সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য খেপে উঠেছে। আমি তাকে সাহায্য করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, অবশ্য আপনার অনুমতি পেলে।

রানি বললেন, নিশ্চয়ই জানবে তোমাদের কাজে আমার সমর্থন রয়েছে, তবু আমি তোমাদের পরিকল্পনার কথাটা সবিস্তারে জেনে নিতে চাই।

আনন্দী বলল, যে পথ দিয়ে আসার সময় আপনি মৃতদেহগুলিকে গাছের ডালে ঝুলতে দেখেছিলেন, সেই পথের ওপর আজও পাঁচটা পুলিশ চৌকি আছে। আমি আর ভোলা রাতের অন্ধকারে ওই চৌকি জ্বালিয়ে দেবার পরিকল্পনা নিয়েছি।

রানি একটু চিন্তা করে বললেন, তোমরা বয়সে অনেক ছোট, তোমরা দুজনেই আমার বুকের দুখানা পাঁজর। এতবড় একটা কাজে অনেক ঝুঁকি আছে জানবে। তবুও যদি একাজে সফল হতে পার তাহলে জানবে, আমার আনন্দ আর গর্বের শেষ থাকবে না।

আনন্দী রানিমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভোলা রানিমা আর আনন্দীর সব কথা শুনছিল। সে এবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রানিমার পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করল।

রানি শিরোমণি ভোলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার বাবাকে যারা হত্যা করেছিল তাদের যদি তুমি শাস্তি দিতে পার তাহলে জানব, তুমি পিতৃঋণ শোধ করতে পেরেছ। তবে এতবড় একটা কাজে স্থির বুদ্ধি প্রয়োজন। তুমি আনন্দী দিদির পরামর্শ মতো পা ফেলবে।

অমাবস্যার রাত্রি। পৌষের পাথুরে শীতে থরথর করে কাঁপছে চরাচর। সরকারি রক্ষীরাও কুর্শিতে বসে আধো ঘুমে আধো জাগরণে পাহারা দিচ্ছিল।

প্রায় নিঃশব্দে কালো দুটো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আনন্দী আর ভোলা কিস্‌কু নদী পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকল।

অনেকদিন ধরে ভোলা পুলিশের ছাউনিগুলিতে কতজন করে রক্ষী আছে তা দেখে রেখেছে।

যে শিবিরটার পাশের গাছে ভোলার বাবাকে ঝোলানো হয়েছিল সেইগাছের আড়ালে গিয়ে প্রথমে দুজনে দাঁড়াল। হামা দিতে দিতে একসময় রক্ষীদের ছাউনির কাছে চলে গেল ভোলা কিস্‌কু। সে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল শিবিরের বাইরে রাস্তার ওপর একটা মশাল জ্বলছে। মশালের আলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

BanglaBook.org

ভেতরে দেখা গেল দুটো মানুষ কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। একজন একটা কুর্শিতে বসে আছে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। তার হাতে ধরা বন্দুকটা তখন তার কাঁধে এসে ঠেকেছিল। মশালের আলোটা বাতাস লেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠতেই বোঝা গেল লোকটি এদেশীয় সেপাই নয়, গোরা সৈনিকদের একজন।

এবার বনের গভীরে দাঁড়িয়ে দুজনে পরামর্শ করে নিল।

আগে স্থির করেছিল পাঁচখানা চৌকিই ওরা জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ে জ্বালিয়ে দেবে কিন্তু এখন পরিকল্পনার পরিবর্তন হল।

শিবির জ্বালিয়ে দিলে রক্ষীদের সবাইকে দগ্ধ হয়ে মারা যাবে না, কেবল শিবিরগুলোই পুড়বে। কিন্তু নতুন পরিকল্পনায় সামনের শিবিরটাকেই ওরা তাক করল।

প্রথমে দুটো বল্লম নিয়ে ওরা মোক্ষম চালিয়ে দিল ঘুমন্ত রক্ষী দুজনের দেহে। বর্শা দিয়ে গাঁথলে সাপগুলো যেমন এঁকেবেঁকে ভেঙেচুরে স্থির হয়ে যায়, প্রায় সেইভাবেই রক্ষী দুজন এঁকেবেঁকে স্থির হয়ে গেল।

ততক্ষণে গোরা সৈনিকটা জেগে উঠেছে। কিন্তু সে তার হাতের বন্দুকটা বাগিয়ে ধরার আগেই একটা দড়ির ফাঁস পেছন থেকে এসে তার গলায় জাপটে বসে গেল।

লোকটা ছটফট করছিল, আনন্দী আর ভোলা তাকে মাটিতে ফেলে দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধল।

এরপর পরিকল্পনা মতো ওরা দুজনে লোকটাকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেল গাছের গুঁড়ির কাছে।

মোটা দড়ির একটা প্রান্ত কোমরে জড়িয়ে কাঠবেড়ালির মতো তিরতির করে গাছে উঠে গেল ভোলা কিস্কু। এরপর একটা মোটা ডালে দড়িটা পেঁচিয়ে ওপরে তুলতে লাগল ফাঁসির আসামী ওই গোরা সৈন্যটাকে।

ততক্ষণে লোকটার প্রাণ বেরিয়ে গেছে। পুরো দড়িটা গাছের ডালে বেড় দিয়ে বেঁধে এবার নীচে নেমে এল ভোলা।

এখন ওরা একটা শক্ত কাজের ঝুঁকি নেবে।

আগুন লাগিয়ে দিল শিবিরে। মশালের ছোঁয়ায় ছাউনিটা দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল।

আগগুনের শিখা তখন অনেকখানি ওপরে উঠেছে।

ওরা জঙ্গলের মোটামোটা দুটো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল বিষাক্ত তীর ধনুকে জুড়ে।

কিছুক্ষণ পরে অন্য শিবিরগুলো থেকে হল্লার আওয়াজ ভেসে এল।

ওরা শুনতে পেল কতকগলো মানুষ ছুটে আসছে। তারা দু'একবার আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ল। হয়তো আদিবাসী ডাকাতগুলোকে ভয় দেখাবার জন্য।

প্রায় বারো-চোদ্দোজন সেপাই জড়ো হয়ে গেল অগ্নিদগ্ধ শিবিরটা ঘিরে।

বিষাক্ত তীরগুলো কালনাগিনীর মতো হিসহিস করে ছুটে গেল বাতাস চিরে। বিভ্রান্ত দশ বারোজন রক্ষী গুলি চালাবার সুযোগই পেল না। তারা প্রাণফাটা আর্তনাদ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ রাত্রি পরিশ্রম করে ওরা তীরবিদ্ধ সেপাইগুলোকে এক একটা গাছের কাণ্ডে জড়িয়ে বাঁধল। এরপর পুবদিকে আলোর আভাস পেয়ে ওরা ঘোড়ার ওপর লাফিয়ে উঠে কর্ণগড়ের দিকে উধাও হয়ে গেল।

পরের দিন পথচলতি মানুষের মুখে মুখে এই ভয়ংকর ঘটনার কথা কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

চুনিলাল খান মেদিনীপুর শহরের কাজ সেরে দ্রুত এসে পৌঁছুলেন কর্ণগড়ে। তিনি গতরাতের বিপর্যয়কর ঘটনার কথা শুনে এসেছেন মেদিনীপুর শহর থেকে। এই খবরটা রানিকে জানাবার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

রানি এলেন পরামর্শ কক্ষে।

ভয়ংকর সমাচারটা পরিবেশন করার জন্য তখন নায়েবমশায় উদ্‌গ্রীব।

রানি নিরুদ্বিগ্ন মুখে তাকালেন চুনিলাল খানের দিকে। বললেন, আপনাকে কেমন যেন উদ্বিগ্ন দেখছি নায়েবমশায়।

নায়েব বললেন, আমি নাড়াজোল থেকে কাল সন্ধ্যায় মেদিনীপুর শহরে এসে পৌঁছেছিলাম। কোর্টে কাজ ছিল কিন্তু দেরিতে পৌঁছনোর ফলে কোনো কাজই হল না।

তুমি জানো রানিমা, আমাদের জমিদারির অন্যতম উকিল ছিলেন মৈতানা গ্রামনিবাসী কাশীনাথ নন্দমশায়। আমি মেদিনীপুরে পৌঁছে তাঁর ডেরাতেই উঠতাম। আমি দেখতাম, আমার আসার আগেই তিনি সব কাজ সেরে রেখেছেন।

রানি বলে উঠলেন, ওকালতিটা ওঁর ছদ্মবেশ। আসলে উনি মনে-প্রাণে একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক। তাছাড়া বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ওড়িয়া, উর্দু—সব ভাষাতেই উনি সমান দক্ষ ছিলেন। পণ্ডিত বংশের সন্তান বলে সংস্কৃত শাস্ত্র ওঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

দেওয়ান বাহাদুর বললেন, প্রায় দশ বছর উনি ইংরেজের কয়েদখানায় কাটিয়ে গতমাসে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে বন্দিদশায় মারা গেলেন।

বীরের মৃত্যু নায়েবমশায়। চুয়াড় বিদ্রোহীদের পক্ষে মামলা লড়তে গিয়ে ইংরেজদের কুনজরে পড়ে তিনি দীর্ঘ এতগুলো বছর জেলবন্দি রইলেন, শেষে দেশভক্ত মানুষটি কারাগারেই বীরের মৃত্যুবরণ করলেন।

গত সপ্তাহে আমাদের আবাসগড় দুর্গে প্রায় দু'হাজার চুয়াড় প্রজা সমবেত হয়ে শপথ নিয়েছে, মহাত্মা কাশীনাথের মৃত্যুর বদলা নেবে ওরা।

এদিকে আর এক কাণ্ড রানিমা। আদালতের কাজ সেরে ফেরার পথে দেখলাম, ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেগরি সাহেব মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে তিন-চারশো গোরা পল্টন। তাদের বন্দুকের বেয়নেটগুলো রোদের আলোয় ঝলকাচ্ছিল। ওরা গ্রেগরি সাহেবের আদেশ পেয়ে মার্চ করতে করতে জঙ্গলমহালের দিকে এগিয়ে গেল।

ঘটনা যা শুনলাম তা সত্যিই রোমহর্ষক।

তুমি জানো মা, জঙ্গলের গা ঘেঁষে একটা চওড়া রাস্তা উত্তরে বগড়ির দিকে চলে গেছে। সেই রাস্তায় পাঁচ-ছটা পুলিশ চৌকি আছে। সেই পুলিশদেরকে কারা যেন রাতের অন্ধকারে তীরবিদ্ধ করে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে গেছে।

ওই দলে একজন গোরা পাহারাদার ছিল, তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে একটা সেগুন গাছের ডালে। অন্য সেপাইদের বুক তীরের ঘায়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। তাদেরও বেঁধে রেখে গেছে এক একটা গাছের কাণ্ডে।

তোমার হয়তো মনে পড়বে, মা, বেশ কিছুকাল আগে ইংরেজরা ওই গাছের ডালে প্রায় হাজার আদিবাসীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মেরেছিল।

নায়েবমশায়ের কথা থামলে রানি শিরোমণি বললেন, এ ঘটনা আমার আগেই জানা হয়ে গেছে নায়েবমশায়।

বিস্মিত নায়েব বললেন, এই তো কিছুক্ষণ আগে শহরের মানুষ জানতে পেরেছে, তুমি এরই মধ্যে কী করে জানতে পারলে, মা?

রানি তালি দিয়ে তাঁর খাস দাসীকে ডাকলেন।

BanglaBook.org

দাসী এলে তাকে বললেন, আনন্দী আর ভোলা কোথায়?

দাসী বলল, আনন্দী এইমাত্র স্নান সেরে পুজোয় বসেছে আর ভোলা এত বেলা অবধি গোয়ালের দাওয়ায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। তার গায়ে জলের ছিটে দিয়েও ঘুম ভাঙানো যায়নি।

রানি বললেন, ওকে আর এখন জাগাবার চেষ্টা কোরো না। তুমি এখন তোমার কাজে যাও।

দাসী ভেতরে চলে গেলে রানি বললেন, আমার বাড়িতে দুটো ডাকাত পুষেছি, নায়েবমশায়। তারাই কাল রাতে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

সবিস্ময়ে নায়েব বললেন, কীরকম!

আনন্দী আর ভোলা কাল রাতে আমার অনুমতি নিয়ে এই অসাধ্য সাধন করেছে।

নায়েব চুনিলাল খান গালে হাত রেখে তাকালেন, তাঁর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, সত্যি!

রানি এবার সমস্ত ঘটনাটি আনুপূর্বিক নায়েবমশায়কে সবিস্তারে বলে গেলেন।

সব শুনে চুনিলাল খান বললেন, সত্যি মা, তুমি ভানুমতী! বিরাট একটা দল নিয়ে যারা ওই সেপাইদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস পায় না, তোমার দুটো ছেলেমেয়ে সেই অসাধ্য সাধন করে ফেললে!

রানি বললেন, ওদের ভেতর আগুন ছিল নায়েবমশায়, আমি শুধু উসকে দিয়েছি।

নায়েব বললেন, এখন ওই গোরাগুলো খ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে গেছে। হন্যে হয়ে এদিক-ওদিক ছুটবে আর যাকে সামনে পাবে তাকেই কামড়াবে।

আমার লোকেরা সকাল থেকেই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বেরিয়ে গেছে। তারা যাতে তীরধনুক বল্লম টাঙি ইত্যাদি নিয়ে সমস্ত রকমের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তৈরি থাকে সে কথাও বলে দেওয়া হয়েছে। শুধু মূল ঘটনাটা যারা ঘটিয়েছে তারা দুজন এবং আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না। আমিও গড়ের পাহারাদারদের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছি।

চুনিলাল বললেন, আমরা যে এ ঘটনার বাইরে রয়েছি, মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এ বার্তাটা পৌঁছে দিলে কেমন হয়?

রানি বললেন, আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে গেলে ওদের সন্দেহ আমাদেরই ওপর এসে পড়বে।

তাহলে?

বরং একটা কাজ করা যাক। আপনি সদরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত পেশ করুন। তাতে জানান,—দেশজোড়া এ ধরনের ভয়ংকর ঘটনায় আমরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। প্রায় প্রতিরাতে আমরা লক্ষ করি, পারাং নদীর ওপারে আদিবাসী মানুষগুলো জড়ো হচ্ছে। ওদের উদ্দেশ্য বিশেষ ভালো বলে মনে হচ্ছে না। যে কোনো রাতে ওরা গড় আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং কিছু বন্দুকধারী সেপাই যদি আমাদের দুর্গে পাঠান তাহলে আমরা নিশ্চিন্তে এবং নির্ভয়ে দিন কাটাতে পারি। তাদের সমূহ ব্যয়ভার রাজকোষ থেকে নির্বাহ করা হবে।

নায়েব বললেন, এই বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার জন্য তোমাকে এত ভালোবাসি আর শ্রদ্ধা করি, মা।

রানি বললেন, আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে এই বেনের জাতটা। ওরা ভীষণ সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। জানি না কতদিন ওদের ছলনা করে ঠেকিয়ে রাখতে পারব।

নায়েবমশায় কর্ণগড় থেকে পরিকল্পনা-মাফিক আবেদনপত্র রচনা করে সদরে পাঠালেন।

সেই দরখাস্তের উত্তর আসতে বিলম্ব হল না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি আনুগত্যের পরিচয় পেয়ে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। দেশের এই দুর্যোগের সময় আপনাদের মতো সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের কাছে আমরা সর্বপ্রকার সহযোগিতা কামনা করি।

BanglaBook.org

আমরা মেদিনীপুরের শাসক নই, রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত শুধুমাত্র দেওয়ান। কাজের সুবিধের জন্য ফোর্ট তৈরি করে কিছু সৈন্য রাখতে হয়েছে। নির্ভয়ে থাকুন, কয়েকদিনের মধ্যেই কিছু সেপাই কর্ণগড়ে আপনাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

স্বাক্ষর

মি. গ্রেগরি।

সত্যিই ইংরেজরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ধূর্ত। তারা রানিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। এই আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের জন্য তারা রানিকে দায়ী না করলেও ইংরেজ বিদ্বেষের এই দিনে তাঁকে একেবারে সন্দেহের ঊর্ধ্বেও রাখতে পারল না।

কয়েকদিনের ভেতরেই একদঙ্গল সেপাই এসে গেল কর্ণগড় দুর্গে। তাদের কাছে গোপন নির্দেশ ছিল, রানির গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার।

তারা রানির পরামর্শ কক্ষে যেতে না পারলেও লক্ষ রাখছিল বিভিন্ন শ্রেণির আগন্তুকদের ওপর। রাতেও তাদের সজাগ দৃষ্টি প্রাসাদ ও গড়ের চারদিকে ঘুরে বেড়াত।

ওরা জ্যোৎস্নারাতে আশ্চর্য একটা দৃশ্য দেখতে পেত,—নীলবাসনা এক নারী শাণিত কৃপাণ ঊর্ধ্বে তুলে দুর্গশীর্ষে পদচারণা করছেন।

ওরা জেনেছিল, রানি সিংহবাহিনীর পূজারি। তাই কখনও তাদের মনে হত, রানি স্বয়ং ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আবার কখনও মনে হত, সিংহবাহিনী কৃপাণ হস্তে দুর্গরক্ষা করছেন।

তৃতীয় স্ফুলিঙ্গ

বেজে উঠল ঢোল, ধামসা, মাদল। সুর উঠল শিঙা, বাঁশি, কেঁদরিতে। শুরু হল তালে তালে নাচ। যৌবনবতী কন্যারা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচতে লাগল ঘুরে ঘুরে। একটানা সুরের গান বাজতে লাগল মেয়েদের গলায়।

পুরুষরা হুংকার দিচ্ছে। তীর, ধনুক, বর্শা, টাঙি, তাবলা, কাঁসা ওপরে তুলে। মাঝে মাঝে তাদের গলার স্বর সপ্তমে উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে দিগ্‌দিগন্তে।

শুরু হয়েছে 'শারহুল' উৎসব। শাল, মহুল, কুসুম, আসন গাছে জেগে উঠেছে নবপল্লব। এই ফাগুনে আদিবাসীজন জড়ো হয়েছে বনদেবীর পুজোয়। পুজোশেষে ওরা ঢুকবে বনের গভীরে পাতা, কাঠ, মধু, কন্দ সংগ্রহে।

রাজ্যচ্যুত রাজা জগন্নাথ ধল বসে রয়েছেন একটা টিলার ওপর। তাঁর পেছনে নিষ্পত্র বিশাল একটা শিমুলগাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝলকে ঝলকে বুকের রক্ত উগরে সে ডালে ডালে ফুটিয়েছে অজস্র লাল ফুল। ও যেন রাজা জগন্নাথ ধলের প্রতীক। উত্তেজনায় বুকের রক্ত বেরিয়ে আসতে চাইছে রাজা জগন্নাথ ধলের।

রাজাকে ঘিরে বসেছিল যে চুয়াড় সর্দাররা তাদের ভেতর লখিন দিগর বলে উঠল, মহারাজ, নদীর ওধারে ছাউনি ফেলে রয়েছে বহুত গোরা সেনা। এপারেও অনেকখানি জয়গা তাদের দখলে। 'শারহুল'-এর হল্লা শুনে ওরা আমাদের সন্ধান পেয়ে যাবে। ছুটে আসবে বন্দুক উঁচিয়ে, কামান থেকে ছুঁড়বে গোলা।

জগন্নাথ বলে উঠলেন, উৎসবের দিনে বনবাসীরা কি মুখ বন্ধ করে বসে থাকবে! এটা আমাদের এলাকা, আমাদের মুল্লুক। এখানে কারও জারিজুরি চলবে না।

ঘাটশিলার বৃদ্ধ রাজা প্রাণপণ লড়াই করে পরাজিত হয়েছেন ইংরেজদের কাছে। তিনি চলে গেছেন সিংহাসন ছেড়ে। ইংরেজরা সেই সিংহাসনে বসিয়েছিল রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ ধলকে, অধিক খাজনা দেবার প্রতিশ্রুতিতে। গরিব প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে বেশি খাজনা আদায়ের চেষ্টা করলেন না জগন্নাথ ধল। শেষ পর্যন্ত তাঁর অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল। কিন্তু হার মানলেন

BanglaBook.org

না জগন্নাথ। অগণিত বিদ্রোহী চুয়াড় আর পাইক প্রজাদের নিয়ে তিনি আত্মগোপন করলেন পাহাড় ও অরণ্যের গভীরে।

জগন্নাথ সমবেত সর্দারদের বললেন, আমাদের মাদল-ধামসার আওয়াজ শুনে ওই ধলা কুত্তাগুলো এখুনি ঘেউ ঘেউ করে ছুটে আসবে। আমরা হটে যাব না, লড়াই চালাব সমানে সমানে। হয় মরব নয় মেরে তাড়াব, এর মাঝখানে অন্য কোনো রাস্তা খোলা থাকবে না।

প্রথমে সুবর্ণরেখা নদীর ওপার থেকে কামানের দু'একটা গোলা বনের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। অমনি বেজে উঠল ড্রাম, বিউগল। লাল-সাদা পোশাকে সজ্জিত ইংরেজ ঘোড়সওয়াররা ভাঙাচোরা পাথুরে রাস্তা দিয়ে ওপরে টিলার দিকে উঠে আসতে লাগল। তাদের পেছনে রন্দুক উঁচিয়ে পদাতিক বাহিনী।

ততক্ষণে রাজা জগন্নাথের ইঙ্গিতে থেমে গেছে আদিবাসীদের অনুষ্ঠান। দু'তিনজন সর্দার মেয়েদের সরিয়ে নিয়ে গেছে বনের গভীরে নিরাপদ আশ্রয়ে।

এবার বর্শা হাতে হুংকার দিয়ে উঠলেন মহারাজ জগন্নাথ ধল। বিপুল হুংকার তুলল তাঁকে ঘিরে থাকা চুয়াড় সর্দারের দল। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করতে লাগল তাদের হাতে ধরা টাঙি-বল্লমের ফলাগুলো। তীরন্দাজরা ততক্ষণে নিজের নিজের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। প্রথমে বড় বড় গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকা তীরন্দাজরা তীরধনুক বাগিয়ে ধরল লক্ষ্যভেদ করার জন্য—কেবল আদেশের অপেক্ষা।

সর্দার দলপতি ময়ূরভঞ্জের ধনঞ্জয় ভঞ্জ ততক্ষণ লক্ষ রাখছিল ইংরেজ বাহিনীর অগ্রগমনের দিকে। ইংরেজদের শেষ সৈন্যটি তীরের নিশানার ভেতর ঢুকে এল, অমনি অরণ্য-পর্বত কাঁপিয়ে শিঙার ধ্বনি তুলল সর্দার।

ঝাঁক ঝাঁক বিষ মাখানো তীর বাতাস চিরে ছুটে গেল শত্রুসৈন্যের দিকে। অব্যর্থ লক্ষ্য তীরে বিদ্ধ হতে লাগল দলে দলে ইংরেজ সৈনিক। অশ্বারোহীরা লুটিয়ে পড়তে লাগল মাটিতে। হ্রেষাধ্বনি তুলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো খুর ঠুকতে লাগল অশ্বগুলি।

যে সব পদাতিক গোরা সৈন্য গুলি ছুঁড়ছিল পাহাড়ের দিকে, তারা ব্যর্থ হচ্ছিল প্রতিপক্ষকে চোখের সামনে দেখতে না পেয়ে।

তীরবিদ্ধ ইংরেজ সৈন্যরা তখন ভূমিশয্যায় শুয়ে কাতরাচ্ছিল। যে ক'জন অবশিষ্ট ছিল, পাহাড় থেকে টাঙি-বল্লম নিয়ে মার মার করে তাদের ঘিরে ফেলল চুয়াড় আর পাইক সৈন্যরা।

ওদিকে গোলন্দাজরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে গোলাবৃষ্টি করতে পারছিল না, কারণ দূর থেকে তারা লাল পোশাক পরা ইংরেজদের দেখতে পাচ্ছিল জটলার ভেতর।

অতি অল্পসংখ্যক চুয়াড় আর পাইক সৈন্য ইংরেজদের গুলিতে প্রাণ হারাল, কিন্তু সেই যুদ্ধে নিহত হল বহু ইংরেজ সৈন্য।

যুদ্ধশেষে বনের গভীরে রাজা জগন্নাথ ধল ঢুকে গেলেন তাঁর গেরিলা সৈন্যবাহিনী নিয়ে। সৎকারের জন্য বয়ে নিয়ে যাওয়া হল আদিবাসী অল্পসংখ্যক যোদ্ধাকে।

রাজা জগন্নাথ ধলের নির্দেশে গাছের ডাল দিয়ে একটা ক্রশ তৈরি করে পুঁতে দেওয়া হল মাটিতে, যেখানে ইংরেজ সৈন্যদের মৃতদেহগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল।

বিচক্ষণ ও হৃদয়বান রাজা ছিলেন জগন্নাথ ধল। অল্পদিনের ভেতরেই তিনি ইংরেজদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে নিয়েছিলেন। তাদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে মৃতদেহগুলির শেষ সৎকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে প্রায় দুশো মাইল বিস্তৃত জঙ্গলমহাল। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত ঘাটশিলা থেকে এই জঙ্গল উত্তর-পশ্চিমে বগড়ি রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নিবিড় গভীর জঙ্গলে তখন কেবল ডাক শোনা যাচ্ছিল নিশাচর প্রাণীকুলের। পাহাড়ি ঝিঁঝিদের ডাকে অনুভব

BanglaBook.org

করা যাচ্ছিল বনভূমির প্রাণের কম্পন। জোনাকির ঝাঁক নিবিড় অন্ধকারের বুকে আলোর রোশনাই জ্বালবার চেষ্টা করছিল।

জঙ্গলের ভেতর মালভূমির পাথুরে মাটি খুঁড়ে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গটি বহুপূর্বে আদিম বনবাসী জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি। রাজা জগন্নাথ ধলকে নিয়ে এই নিশ্চিন্ত নির্ভয় আশ্রয়ে ঢুকে পড়েছিল চুয়াড় সর্দাররা।

বনবাসীরা গাছের আড়ালে যে যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরে রাতের আশ্রয় নিয়েছিল। উত্তেজনার অবসানে যেমন একটা অবসাদ ঘিরে ধরে, সেই অবসাদে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল বনবাসী মানুষজন।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে ঘন ঘন গর্জে উঠল কামান। লেফটেন্যান্ট ফার্গুসনের নির্দেশে ইংরেজবাহিনীর গোলন্দাজরা অবিশ্রাম গোলবর্ষণ করতে লাগল। নিরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রিতে চরাচর প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকলেও জঙ্গলবেষ্টিত টিলার ওপরে জ্বলন্ত গোলাগুলি এসে পড়তে লাগল সশব্দে।

শীতের ঝরাপাতায় ভরে উঠেছিল সমস্ত বনাঞ্চল। সেই শুকনো পাতায় অগ্নিগোলকগুলি এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

ততক্ষণে চুয়াড় সর্দাররা সুড়ঙ্গ থেকে বের করে এনেছে রাজা জগন্নাথ ধলকে।

এবার সসৈন্যে জগন্নাথ ধল দ্রুতবেগে আত্মগোপনের জন্য বনের আরও গভীরে প্রবেশ করলেন।

পশ্চিম থেকে উত্তরে বনভূমির গায়ে আগুনের একটা মালাকে শেষ রাত্র পর্যন্ত দুলতে দেখা গেল।

রাজা জগন্নাথ ধল জানেন ইংরেজরা পিছু হটার জন্য এদেশে আসেনি। তারা ছলে বলে কৌশলে কার্যসিদ্ধির জন্যই এদেশে এসেছে। বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে খাজনা। জমিদারদের রক্ষিত পাইক আর চুয়াড়রা নিষ্কর জমি ভোগ করে এসেছে এতকাল। প্রয়োজনে তারা জামিদারের পক্ষে লড়াই করে এসেছে। কিন্তু ইংরেজদের ব্যবস্থায় নিষ্কর ভূমি বলে কিছু রইল না। তারা চাষযোগ্য এবং অরণ্য সকল ভূমিসম্পদের ওপরেই কর নির্ধারণ করল। সে কর এত উচ্চহারে ধরা হল যে কোনো জমিদারের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তার ফলে ইংরেজরা ঘন ঘন জমিদার পরিবর্তন করতে লাগল। এই অবস্থায় জমিদার, চুয়াড়, পাইক এবং কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

দিনের আলো ফুটলে দেখা গেল বনের অনেকখানি অংশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে গেছে।

জগন্নাথ ধলের সর্দার যোদ্ধারা এই গোলাবর্ষণের ভেতরেই একটি কাজ সম্পন্ন করেছিল। রাতের অন্ধকারে বিরাট বিরাট গাছ কেটে গুঁড়িগুলোকে টেনে গড়িয়ে ফেলে দিয়েছিল নীচে রাস্তার ওপর। তারা বুঝেছিল, গোলাবর্ষণের পর ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুত এগিয়ে এসে যুদ্ধক্ষেত্রের দখল নিয়ে নেবে। যাতে তারা সহজে এগিয়ে আসতে না পারে সেজন্য গোলাবর্ষণের মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও শত্রুদের পথ অবরোধ করে রাখল। যদিও টিলার ওপর অরণ্যের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার যে সুবিধেটুকু ছিল তা গোলাবর্ষণের ফলে একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন দূর অরণ্যের গভীরে থেকে শত্রুর ওপর তীরবর্ষণেরও সুযোগ হারিয়েছিল তীরন্দাজরা। কিন্তু শত অসুবিধের ভেতরেও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল না তারা। দীর্ঘরাত ধরে আদিবাসীরা রাস্তার ওপরে টিলার মাথায় বড় বড় পাথরের চাঁই সাজিয়ে রেখেছিল।

একসময় চুয়াড় সর্দারদের রণকৌশল কাজে লেগে গেল।

ভোর হতে না হতেই শোনা যেতে লাগল ইংরেজদের রণবাদ্য। দূর থেকে উচ্চবৃক্ষের ওপরে আত্মগোপনকারী পাইকরা ইংরেজ সৈন্যসামন্তদের কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসতে দেখল।

BanglaBook.org

অমনি সংকেত চলে গেল আদিবাসী সৈন্যদের ভেতর। তারা দেখল, অশ্বারোহী সৈন্যরা টিলার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। ঘোড়াগুলো বড় বড় ছড়ানো গাছের গুঁড়ি ডিঙিয়ে এগিয়ে আসতে পারছে না।

এরপর পদাতিক বাহিনীর পালা। তারা টিলার গা ঘেঁষে সরু লাইন করে বন্দুক উঁচিয়ে এগোতে লাগল। অমনি শুরু হল শিলাবৃষ্টি। বড়-ছোট অজস্র পাথর ধাক্কা খেয়ে লাফাতে লাফাতে এসে পড়তে লাগল ইংরেজ সৈন্যদের মাথার ওপর।

মাটিতে কেউ লুটিয়ে পড়ল, কেউ বা আশপাশে বড় বড় পাথরের চাঁই-এর আড়ালে লুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। কোনো কোনো গোরা সৈন্য টিলা লক্ষ করে হাঁটু গেড়ে বসে অবিরাম বন্দুক চালিয়ে গেল। কিন্তু এবারও পরাজয় মেনে নিতে হল তাদের। যারা এসেছিল তাদের ভেতর অতি অল্পসংখ্যকই প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে লাগল। আহতের আর্তচিৎকার নদী-অরণ্য-টিলায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সুকৌশলী-বুদ্ধিমানের জাত এই ইংরেজ সম্প্রদায়। তারা ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করতে লাগল টিলা লক্ষ্য করে, যাতে শত্রুপক্ষ পিছু হটে যায় আর সেই সুযোগে ছাউনিতে ফিরে আসতে পারে অবশিষ্ট সৈন্যেরা। আহতদেরও তারা তুলে নিয়ে গেল সৈন্যদের ব্যারাকে।

রাজা জগন্নাথ ধলকে রাজ্যচ্যুত করলেও যে একটি কপর্দকও খাজনা আদায় হবে না সে সত্য বুঝে গিয়েছিল ইংরেজরা, তাই তারা পরামর্শ করে রাজার কাছে দূত পাঠাল। দূতের মুখে প্রস্তাব গেল, রাজাকে সসম্মানে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে, পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে রাজা জগন্নাথ ধলকে।

ইংরেজদের এই শর্ত মেনে নিলেন ঘাটশিলার নির্ভীক মহারাজ।

BanglaBook.org

সতেরোশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্বে শুরু হল দেশব্যাপী মন্বন্তর। প্রথমে অজন্মা, পরে মহার্ঘ্য হল চালের দাম। সাধারণ মানুষ পড়ল অন্তহীন ক্লেশের মধ্যে। ইংরেজরা কিন্তু সম্বরণ করতে পারল না তাদের লোভ। তারা জমিদারদের উচ্চহারে খাজনা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। এ অবস্থায় বহু জমিদার একত্রিত হয়ে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। এর ফলে ইংরেজদের অত্যাচার গেল বেড়ে। ঘাটশিলার জমিদার জগন্নাথ ধল, শিলদার জমিদার মানগোবিন্দ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। চতুর্দিকে জ্বলল বিদ্রোহের আগুন। চলল লুঠতরাজ, হাঙ্গামা আর অশান্তি।

ঘাটশিলার সুরক্ষিত দুর্গ ছেড়ে বামনঘাটি থেকে বিদ্রোহ পরিচালনা করতে লাগলেন ঘাটশিলার জমিদার জগন্নাথ ধল। এদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল মানভূমেও। ডানসাহেব সৈন্য নিয়ে গিয়ে সেখানে বিদ্রোহীদের বন্দি করলেন। অনুগত প্রজাদের ভেতর বন্টন করতে লাগলেন জমি।

অম্বিকানগর ও বরাহভূমের জমিদাররা জমিহারানো চুয়াড়দের উৎসাহ দিতে লাগলেন যাতে তারা খাজনা বসাবার উদ্দেশ্যে জমি জরিপ করতে না দেয়।

ক্যাপ্টেন ক্রফোর্ড ও ক্যাপ্টেন ব্রিস্কো পাতকুম আর বরাহভূমের রাজাকে আক্রমণ করলেন। উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাস্ত হলেন দুই রাজা। কিন্তু পরের বছর আবার বিদ্রোহী হলেন তাঁরা। এইভাবে চতুর্দিকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলে সিদ্ধ হল না ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য।

পর পর অজন্মা আর প্লাবনে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল জঙ্গলমহাল। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় দিশাহারা হয়ে পথে-প্রান্তরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল মানুষ। রাজা জগন্নাথ ধলের ভক্ত প্রজারা তাদের রাজাকে জঙ্গলমহালের গভীরে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। তারা প্রায় অভুক্ত

রাজা জগন্নাথ ধল কিন্তু আহারের সময় এত আয়োজন সামনে দেখে মুখে তুলতে পারতেন না। কোনোরকমে প্রাণধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাই তিনি গ্রহণ করতেন,—তাও অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে।

পাশে বসে সর্দাররা তাঁকে প্রয়োজনীয় খাদ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালে রাজা বলতেন, যে রাজা প্রজাদের রক্ষা করতে পারে না, মুখে অন্ন তুলে দিতে পারে না, বিদেশি বেনিয়াদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না, তার পক্ষে পরিতৃপ্তি সহকারে ভূরিভোজ কি সম্ভব?

সর্দাররা বলত, মহারাজ, আপনাকে ঘিরে আমরা স্বপ্ন দেখি আগামী দিনের। আমরা একদিন না একদিন যুদ্ধে জয়ী হবই আর সে যুদ্ধে আপনাদের মতো নির্ভীক দেশপ্রেমিকদের সামনে রেখেই আমরা লড়ব।

প্রতিদিন খবর আসে পথে-ঘাটে কঙ্কালসার মানুষরা খাদ্যের অভাবে মরে পড়ে আছে। রাজা জগন্নাথ ধল নীরবে অশ্রুবর্ষণ করেন। প্রকৃতির রুদ্ররোষ, বণিকের সংহার-মূর্তি তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল।

এক শুক্লারাত্রির মধ্যযামে রাজা পত্র-শয্যায় নিদ্রা যাচ্ছিলেন, সহসা নিশাচর পেচকের ডাকে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি শয্যাত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। অজানা কোনো বনকুসুমের গন্ধে তিনি আবিষ্ট হলেন।

মনে হল বনের আড়াল থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে। ক্রমে সে শব্দ নিকটবর্তী হতে লাগল। রাজা উৎকর্ণ হয়ে ভাবতে লাগলেন, কোনো বন্যজন্তুর দল নয় তো!

অল্পক্ষণের ভেতর ভুল ভাঙল তাঁর। সেনাদের প্রধান সর্দার লখিন দিগর এগিয়ে এসে নত হয়ে প্রণাম নিবেদন করে বলল, মহারাজ, দেখুন কারা সব এসেছে। গভীর বনের আড়াল সরিয়ে মহারাজ বেরিয়ে এসে দেখেন, প্রায় দেড়শত জনের মতো নারী-পুরুষ বনের ভেতর জড়ো হয়েছে। তাদের সামনে রাখা আছে বড় বড় এক-একটি মুখবন্ধ বস্তা।

রাজা জগন্নাথ ধলকে দেখে তারা মাথা নত করে প্রণাম জানাল।

লখিন দিগর বলল, প্রায় তিনদিন ধরে এই দলটি রানি শিরোমণির কর্ণগড় থেকে এখানে এসে পৌঁছেছে। সমস্ত পথটাই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আত্মগোপন করে আসতে হয়েছে এদের।

সর্দারের কথা শেষ হতে না হতেই বাহকদের মুখিয়া এগিয়ে এসে রাজাবাহাদুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানাল। উঠে দাঁড়িয়ে সে একখানি পত্র বের করে রাজার হাতে তুলে দিয়ে বলল, রানিমার এই পত্রে আপনি সমস্ত কিছু অবগত হবেন।

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে জগন্নাথ ধল পত্রটি পাঠ করতে লাগলেন।

পরম সম্মানীয় রাজাবাহাদুর, এই পত্রে আপনি আমার সবিনয় নমস্কার গ্রহণ করবেন। ছ'মাস পূর্বে আপনার সঙ্গে ঘাটশিলার অরণ্যভূমিতে আমার যে সাক্ষাৎকার হয়েছিল সে স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে আছে। আপনার মধ্যে যে দেশভক্তি এবং তেজ দেখেছি তা আমার গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

নিরন্তর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে কাটছে আপনার দিন। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও আপনি কখনও হতোদ্যম হননি। আপনার এই সংগ্রামী মনোভাব জানবেন আমাদের সকলেরই প্রেরণা।

আমি জানি আপনি বারবার সিংহাসনের অধিকার পেয়েও ভাগ্যবিপর্যয়ে রাজ্যচ্যুত হচ্ছেন। এখন আপনি যে অরণ্যের সেই আশ্রয়ে রয়েছেন সে সংবাদও আমি পেয়েছি।

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আমাদের দেশটাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। পথে-ঘাটে অন্নের জন্য বুভুক্ষু কঙ্কালসার মানুষের মিছিল। ঈশ্বর সদয় না হলে কোনো রাজা-মহারাজার পক্ষেই এই ভুখামিছিলের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু আমি আমার ক্ষুদ্র চেষ্টায় সামান্য সেবাকার্য

BanglaBook.org

চালিয়ে যাচ্ছি। মাসাধিককাল একটি অন্নসত্র খোলা হয়েছে কর্ণগড়ে, জানি না কতদিন এই সেবাকার্য পরিচালনা করতে পারব।

আমার হৃদয়বান সুযোগ্য নায়েব চুনিলাল খান মহাশয় নাড়াজোলে তাঁর জমিদারি থেকে কয়েকশত গরুর গাড়ি বোঝাই চালের বস্তা আমার কর্ণগড়ের গোলায় এনে তুলেছেন। তারও পূর্বে প্রায় পাঁচ বছরের ধান আমার গোলায় সঞ্চিত আছে।

মা সিংহবাহিনীর পূজা উপলক্ষ্যে এই দুর্ভিক্ষের দিনেও অন্নসত্র বসিয়েছি। আপনার প্রজাদের জন্য মায়ের ভোগের কিছু চাল পাঠালাম। এই চালকে মায়ের প্রসাদ বিবেচনা করে যদি আপনার প্রজাদের মুখে তুলে দেন তাহলে আমি ধন্য আর কৃতার্থ হব।

আপনার একান্ত গুণগ্রাহী সিংহবাহিনীর সেবিকা রানি শিরোমণি।

রাজা জগন্নাথ ধল পত্র পাঠ করে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি রানির পত্রটিকে কপালে ছুঁইয়ে নত হলেন। পরে স্থির হয়ে বসে সর্দারদের বললেন, বাহকেরা দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসেছে, তোমরা এদের যথাযোগ্য পান-ভোজন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। দুই দিবস এই বনপ্রদেশে কাটিয়ে এরা আবার রানিমার রাজ্যে ফিরে যাবে। যেমন বনের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে এসেছিল তেমনই অরণ্যের আড়াল দিয়ে ওরা ফিরে যাবে নিজের রাজ্যে। তোমরা দেবী সিংহবাহিনীর এই চাল একান্ত গোপনে প্রজাদের ভেতরে অল্প অল্প করে কিছুদিন ধরে বিতরণ করবে।

এবার মহারাজ লখিন দিগরের দিকে ফিরে বললেন, আমার পত্ররচনার সরঞ্জাম ওই বৃক্ষমূলে আমার পোশাকের সিন্দুকে রাখা আছে, তুমি আমার কাছে সেগুলি নিয়ে আসবে কাল প্রভাতে।

পরদিন প্রভাতে রাজা পত্ররচনা করলেন।

অশেষ সম্মানীয় রানিমাতা,

—আপনার অনুগ্রহে দেবী সিংহবাহিনীর প্রসাদ পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। অবশ্যই এই প্রসাদ আমাদের নিরন্ন প্রজাদের মধ্যে সংগোপনে বিতরণ করা হবে। তারা জানবে কর্ণগড়ের জননীস্বরূপা রানির মহিমার কথা। আমাদের দেশের এই দুর্ভাগ্যের কবে অবসান হবে তা জানি না, শুধু জানি আমাদের সমস্ত দুর্যোগের ভেতর নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতে হবে। আমার বিশ্বাস আছে, সত্যের জয় একদিন হবেই। আমাদের এই দুঃখ-তপস্যা বিফলে যাবে না। আমাদের চরম দুঃখের দিনে আপনি একবার এসেছিলেন, সে স্মৃতি আজও অক্ষয়।

আমার বিনীত নমস্কার ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

—ঘাটশিলার ভাগ্যহত সংগ্রামী-সেবক
জগন্নাথ ধল।

রানির প্রসাদ-বাহকেরা ফিরে যাওয়ার সময় রাজা তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে রৌপ্যমুদ্রা দান করলেন। পথে খরচের জন্য তারা কয়েক বস্তা চাল সঙ্গে এনেছিল, সেগুলি বয়ে নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে প্রত্যেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে রাজাকে প্রণাম নিবেদন করল। রাজা আবেগতাড়িত হয়ে বললেন, ভিখিরি রাজার আজ তোমাদের হাতে আর দেবার কিছু নেই শুধু আশীর্বাদ করি মনে-প্রাণে দেশভক্ত হও। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলো আর বিদেশি শত্রুকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত হানো।

রানি শিরোমণির প্রেরিত বাহকেরা চলে যাবার পর রাজা জগন্নাথ ধল যেন সংগ্রামের নতুন শক্তি ফিরে পেলেন। তিনি সর্দারদের উদ্দেশ্যে বললেন, জানবে আমরা একা নই। উত্তর-পশ্চিমে রয়েছেন যদুসিংহের পুত্র রাজা ছত্রসিংহ। তিনি দেশভক্ত আর বীর। আর আমরা আমাদের সাধ্যমতো বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছি। আমাদের দুজনের মাঝে রয়েছেন প্রখর বুদ্ধিমতী এবং দেশভক্ত রানি শিরোমণি। তিনি সিংহবাহিনীর ভক্ত সাধিকা। শত্রু বিনাশে তিনি

BanglaBook.org

সিংহবাহিনীরই মূর্তি ধারণ করেছেন। তাঁর করুণা, তাঁর কৌশল, তাঁর দেশভক্তি আমাদের সকলের আদর্শ। একজন নারী হয়েও তিনি আমাদের এই দুর্দিনে পথপ্রদর্শন করছেন। সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তোমরা সেই দশপ্রহরণধারিণী রানি শিরোমণিকে স্মরণ করবে। তাঁর প্রেরণা এই যুদ্ধে আমাদের মনে বিপুল শক্তির সঞ্চার করবে।

চতুর্থ স্ফুলিঙ্গ

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন, আগুন ঝরাচ্ছিল আকাশের গনগনে সূর্য। জলহীন ধূ ধূ প্রান্তর। মাঠের পর মাঠ ফেটে গিয়ে তৃষার্ত ধরিত্রী অদ্ভুত এক বিদীর্ণ মানচিত্র তৈরি করেছিল।

ফাটা মাঠে কান পাতলে ধরিত্রীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

আনন্দী শুকনো কাপড় তুলে আনার জন্য ছাদে গিয়েছিল। দূরে চোখ পড়তেই সে দেখল, দিগন্তরেখা থেকে একটা কালো বিন্দু যেন ছুটে আসছে কেল্লা লক্ষ্য করে। তীব্র রৌদ্রদাহে কষ্ট হলেও সে সেই কৃষ্ণবিন্দুর ওপর থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারেনি।

ধীরে ধীরে সেই বিন্দু স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং আকার গ্রহণ করল।

আনন্দী দেখল, একজন অশ্বারোহী দুর্গ লক্ষ্য করে তার ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

আরও কাছে এলে দেখা গেল মাথায় একটা লাল পাগড়ি বেঁধে, সাদা কুর্তা আর মেরজাইতে শরীর ঢেকে মানুষটি সিংহদ্বারের দিকে ঘুরে গেল।

আনন্দী দ্রুত নেমে গেল দোতলায় রানিমহলে। খবরটা সে পৌঁছে দিতে চায় রানির গোচরে।

সবেমাত্র মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে রানি শিরোমণি তাঁর পালঙ্কে এসে বসেছেন। দুটি দাসী নিয়মমতো ব্যজন করছে তাঁকে।

আনন্দী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

রানি চোখ তুলে বললেন, মনে হচ্ছে কোনো জরুরি খবর নিয়ে এসেছ, আনন্দী।

হ্যাঁ রানিমা। ছাদে শুকনো কাপড় তুলতে গিয়ে দেখলাম, একজন বেশ সম্ভ্রান্ত ঘোড়সওয়ার বহুদূর থেকে দৌড়ে এসে আমাদের সিংহদরজায় ঢুকল।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন রানি শিরোমণি। দাসী দুটিকে বললেন, নীচে নেমে যা। ভোলাকে বল ওই মানুষটিকে সভাঘরে নিয়ে এসে বসাতে। ওখানে পাখাওয়ালা রয়েছে, সে যেন ওকে বড় তালপাতার কাজ করা পাখা দিয়ে বাতাস করে।

কিছু পরে ওঁর জন্য জালার ঠান্ডা জলে তৈরি সরবত নিয়ে যাবি। মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করবি, তিনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান। খবরটা জেনেই আমাকে জানিয়ে যাবি।

আনন্দী ছাড়া রানিমার ঘরে এখন আর কেউ নেই।

শোন আনন্দী, মানুষটি তো অভুক্ত থাকতে পারেন। ওরা খবর নিয়ে এলে তুমি একবার নীচে নেমে গিয়ে উনি অভুক্ত কিনা জেনে নেবে। দ্বিপ্রহরের আহার না হলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে অভুক্ত মানুষটির আহারের বন্দোবস্ত করবে।

আনন্দী সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

কিছু পরে ভোলা ঢুকল ঘরে।

উদ্বিগ্ন রানি বললেন, কী খবর, ভোলা?

মানুষটি বহুদূর থেকে আসছেন। ঘামে একেবারে নেয়ে গেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান তাই আমি তাঁকে সভাঘরে এনে বসিয়েছি। পাখাওয়ালা হাওয়া করছে। আমি ওপরে উঠে আসার সময় দেখলাম, বিজলীদিদি সরবত নিয়ে সভাঘরের দিকে যাচ্ছে।

রানি চঞ্চল হয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালেন। বললেন, তুই এখন তোর কাজে যা, ভোলা।

BanglaBook.org

ভোলা নতুন লোকটিকে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। লোকটি কী কারণে এসেছে তা জানার জন্য আগ্রহ ছিল তার কিন্তু রানিমা তাকে সরিয়ে দেওয়ায় সে যেন কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হল। তবে মুহূর্তে তার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসে গেল। স্নান-খাওয়া হয়ে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে 'জলহরি' পুকুরের দিকে চলে গেল দ্বিতীয়বার স্নান করার ইচ্ছা নিয়ে। ওখানে রাজবাড়ির হাঁসগুলো খেলা করছে। রাজহাঁস, পাতিহাঁসের দল ঢেউ তুলছে জলে। ওস্তাদ সাঁতারু সে। হাঁসগুলোর পেছনে তাড়া করে যাবে, আবার কখনও ডুবসাঁতার দিয়ে ভুস করে মাথা তুলবে হাঁসগুলোর ঠিক মাঝখানে

আনন্দী ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছিল দর্শনার্থীর কাছে। সে সবিনয়ে জানতে চাইল, তাঁর মধ্যাহ্নভোজন হয়েছে কিনা।

আগন্তুক বলল, আমার মধ্যাহ্নভোজের কোনো প্রয়োজন নেই, পথে আমি চটিতে ফলার সেরে এসেছি। রানিমা যদি বিশ্রামে না গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।

আনন্দী বলল, আপনি বসুন, উনি যথাসময়ে এসে আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন।

রানি শিরোমণি সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।

উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুক নত হয়ে রানিকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

রানি সৌজন্যমূলক নমস্কার বিনিময় করে মানুষটিকে নির্দিষ্ট আসনে বসতে বললেন। নিজেও মুখোমুখি আর একটি আসনে বসলেন।

মহাশয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

বগড়ি রাজ্য থেকে কাল প্রভাতে আমি বেরিয়েছিলাম। রাজধানী মঙ্গলাপোতা ছাড়ার পর একটানা ঘোড়ায় এসে রাত্রিবাস করেছি শিলাই নদীর কূলে এক পারঘাটের মাঝির আস্তানায়। সেখান থেকে আবার আজ সকালে রওনা হয়ে এই কিছু আগে আপনার রাজ্যে এসে পৌঁছেছি। পথে মধ্যাহ্নভোজের জন্য সামান্য সময় ব্যয় হয়েছে।

রানি কোমলকণ্ঠে বললেন, আপনি কি জাতিতে রাজপুত?

আপনার অনুমান সত্য, রানিমা। তবে লায়েক রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আমার পূর্বপুরুষরা এদেশে এসেছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই বাঁধাভাবে রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করতেন। আমি মহারাজ ছত্রসিংহ-এর সময় থেকে বগড়ির রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত আছি। অবশ্য এখন ইংরেজ-দেওয়ান বসে গেছে সেসব কাজ দেখাশুনা করার জন্য। আমরা যে নিষ্কর ভূমি এতকাল ভোগ করে এসেছি এখন দশসালা বন্দোবস্তে সে জমির ওপর কর বসানো হয়েছে অস্বাভাবিক হারে।

রানি বললেন, ইংরেজদের এই অস্বাভাবিক রাজস্ব বৃদ্ধির কথা আমার অজানা নয়।

একটু থেমে আবার বললেন, মহাশয়ের নাম?

গুর্জর সিংহ।

রানি বললেন, সম্প্রতি মহারাজ যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদ আমি পেয়েছি। দুর্ভাগ্য, ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দি অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পাইক-বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি আজ থেকে বারো বছর আগে বন্দি হয়েছিলেন। মেদিনীপুরের বিদ্রোহী মানুষদের তিনি ছিলেন প্রেরণার অন্যতম উৎস।

রানিমা, তাঁর পুত্র মহারাজ ছত্রসিংহ এখন বগড়ি রাজ্যের রাজা, যদিও ইংরেজরা তাঁর অনেকখানি ক্ষমতা হ্রাস করেছে। এখন উনি কেবলমাত্র বেহালা পরগনার উপস্বত্ব ভোগ করছেন। আমি এসেছি মহারাজ যাদবচন্দ্রের শ্রাদ্ধের পত্র নিয়ে।

রানি একটু চিন্তা করে বললেন, মহারাজ অজিত সিংহের পারলৌকিক কাজে বগড়ি থেকে

BanglaBook.org

মহারাজ ছত্রসিংহ-এর দেওয়ানজি এসেছিলেন। অবশ্যই কর্ণগড় থেকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাঠানো হবে।

মহারাজ ছত্রসিংহ-এর প্রেরিত পত্র ইতিমধ্যেই পাঠ করা হয়ে গেছে রানি শিরোমণির। এখন তিনি বগ্‌ড়ি রজ্যের খুঁটিনাটি কিছু কথা জেনে নিতে চান।

চুয়াড় আর নায়েকরা কি এতখানি কর দিতে রাজি হয়েছে?

তারা কোম্পানির তহশিলদারদের বলে দিচ্ছে, রাজার লোক ছাড়া কাউকে আমরা কর দেব না।

ওই প্রজাদের কি মহারাজ ছত্র সিংহই গোপনে পরিচালনা করছেন?

রানিমা, মহারাজের সৌভাগ্য, অচল সিংহের মতো একজন দেশভক্ত বিচক্ষণ সর্দার তিনি পেয়েছেন। অচল সিংহই ইংরেজদের বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে পাইকদের বিদ্রোহ উসকে দিচ্ছে।

তাহলে এখন বগ্‌ড়ির পরিস্থিতি কী রকম?

রানিমা, আমরা সামান্য কর্মচারী, আমাদের সবকিছু প্রকাশ করা সমীচীন নয়। তবে আপনি জঙ্গলমহালের সব থেকে শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় নেত্রী, আপনাকে বিদ্রোহীরা জননীর মতো ভক্তি করে। তাই একটি গোপন তথ্য আপনার কাছে প্রকাশ করে যাচ্ছি, মা।

শ্রাদ্ধকর্মের জন্য ক'টা দিন ইংরেজরা অপেক্ষা করে আছে। শ্রাদ্ধের ঠিক পরেই শোনা যাচ্ছে মহারাজ ছত্রসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে। ইতিমধ্যেই তাঁর রাজা উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এতে বগ্‌ড়ির সমস্ত প্রজা নিজেদের অপমানিত মনে করছে।

অচল সিংহের মনোভাব কী?

তিনি যথার্থই একজন দেশপ্রেমিক। বিদেশিদের তিনি কোনোভাবেই সহ্য করতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত সংঘাতের রূপ কীভাবে প্রকাশ পায় তা দেখার জন্য আমরা গভীর উদ্বেগে রয়েছি, রানিমা।

রানি বললেন, দেবী সিংহবাহিনীর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

সামান্য সময় কিছু ভেবে নিয়ে বললেন, ওই দেশপ্রেমিক মন্ত্রীটির সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হলে ভালো হত।

কার কথা বলছেন, রানিমা?

অচল সিংহ।

রানি ও বিষয়ে আর কথা বাড়ালেন না। তিনি শুধু বললেন, আজ রাতে আপনি বিশ্রাম করে যান, পথশ্রমে আপনি বিশেষ ক্লান্ত।

সবিনয়ে পত্রবাহক বলল, আপনার করুণার কথা ভুলব না, মা জননী। তবে সামনে অফুরন্ত কাজ পড়ে আছে। দু'দণ্ড কোথাও বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশ নেই।

পত্রবাহক গুর্জর সিং অশ্বারোহণে দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বগ্‌ড়ি রাজ্য লক্ষ্য করে।

বিশ্রামকক্ষে গিয়ে রানির আর বিশ্রাম নেওয়া হল না। তিনি কেবলই ভাবতে লাগলেন বিশাল বগ্‌ড়ি রাজ্যের পরিণতির কথা।

খাস দুজন দাসীকে তিনি ছুটি দিয়ে দিলেন। ঘরে রইল একমাত্র আনন্দী।

আপনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন, মা?

আমি বগ্‌ড়ি রাজ্যের পরিণতির কথা ভাবছি। আমাদের কর্ণগড়ের থেকেও বহু প্রাচীন এই বগ্‌ড়ির রাজবংশ। সেই পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জঙ্গলমহালের এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গজপতি সিংহ। তারপর কেটে গেছে অনেক অনেক বছর। পালাবদল ঘটেছে বহু রাজার।

শেষে প্রতিষ্ঠা হল 'লায়েক' রাজবংশের।

আনন্দী জানতে চাইল, এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? আর কত সালেই বা এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল?

BanglaBook.org

রানি বললেন, যতদূর জানি আঠারো শতকের গোড়ার দিকে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। দাশরথি লায়েক ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজকীয় নাম হল শামশের বাহাদুর সিংহ। কেউ কেউ বলেন, এরা প্রাচীন বগ্‌ড়ি রাজবংশেরই লোক। রাজা দাশরথি লায়েকের বাবা ছিলেন তেজচন্দ্র। একসময় প্রবল পরাক্রান্ত দস্যুসর্দার খয়রামল্ল বগ্‌ড়ি রাজ্য দখল করে নেয়। প্রাণরক্ষার কোনো উপায় না দেখে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে রাজপুরীতে রেখে রাজা তেজচন্দ্র নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

রানি এ পর্যন্ত বলে নীরব হয়ে গেলেন দেখে আনন্দী উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তেজচন্দ্রের রাজপুরী থেকে পলায়নের পর তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্রের কী পরিণতি হল রানিমা?

একসময় রানি তাঁর পুত্রটিকে বুকে নিয়ে পথ চলতে চলতে পৌঁছে গেলেন ময়ূরভঞ্জের রাজার রাজধানীতে। ওই দেশের রাজা ছিলেন তাঁর স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

রানি খবর নিয়ে জানলেন, রাজা তেজচন্দ্র বন্ধুর রাজ্যেও আসেননি। তখন রানি নিজের পরিচয় গোপন রেখে রাজপুরীতে দাসীবৃত্তি করতে লাগলেন।

ময়ূরভঞ্জের রাজার ছেলের নাম ছিল দাশরথি। আবার তেজচন্দ্রের ছেলের নামও ছিল দাশরথি। হয়তো বন্ধু দুই রাজা কোনো সময় নিজেদের ছেলের নাম দাশরথি রাখবেন এরকম পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

দাশরথি নাম কেন মা?

রাজা দশরথের পুত্র বলে শ্রীরামচন্দ্রের নাম ছিল দাশরথি। তাই দু'বন্ধু হয়তো ভুবনবিখ্যাত রাজার নামেই পুত্রদ্বয়ের নাম রাখবেন ভেবেছিলেন।

একই বয়সি দুই দাশরথির ভিতর দিনে দিনে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। একই সঙ্গে দুজনে খেলাধুলো, শিকার, অশ্বচালনা প্রভৃতি করতে লাগল।

আনন্দী বলল, দাসীপুত্রের সঙ্গে রাজপুত্রের এই মেলামেশাকে কেউ বিরূপ চোখে দেখেনি?

রাজামশায় ভেবেছিলেন, তাঁর ছেলের যেহেতু কোনো বন্ধু নেই, এই সুদর্শন দাসীপুত্রটি রাজপুত্রের খেলার সাথী হলে ক্ষতি কী?

তারপর কী হল, রানিমা?

একদিন দু'বন্ধু খেলা করছে এমন সময় মহাকালীর মন্দিরে পূজারত রাজার কাছ থেকে ডাক এল, রাজপুত্র যেন শীঘ্র মন্দিরে চলে আসে। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্যরকম।

রানি এখানে এসে আবার থামলেন।

আনন্দীর ঔৎসুক্য তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। সে কী ঘটতে চলেছে তা জানার জন্য রানিকে বলল, মা, রাজা তাঁর ছেলেকে ডেকেছেন তাতে নতুন ঘটনা কী ঘটতে পারে?

আসল রাজপুত্র এক কাণ্ড করে বসল। সে তখন পাখি শিকারের জন্য কতকগুলো তীরের ফলা ঘষে ঘষে তীক্ষ্ণ করছিল। তাই সে বন্ধু দাশরথিকেই মন্দিরে পাঠিয়ে দিল। রাজা তখন পূজাশেষে ঘোরের মধ্যে ছিলেন। ভাবী রাজার জন্য মন্ত্রপূত তরবারি ছেলের হাতে তুলে দিতে তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন। এদিকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল তেজচন্দ্রের পুত্র দাশরথি।

রাজা তাকে নিজসন্তান ভেবে তার হাতে তুলে দিলেন ওই তারবারিটি। তরবারির এমন গুণ ছিল যে, কোনো রাজা অথবা রাজপুত্র ছাড়া সেই তরবারি অন্য কেউ ধারণ করতে পারবে না।

রাজা তেজচন্দ্রের পুত্র তো আর সত্যিকার দাসীপুত্র নয় তাই অবলীলায় সে তরবারিটি ধরে রইল।

রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন কিন্তু চমৎকৃত হলেন এক দাসীপুত্রের এই দিব্যশক্তি দেখে।

উৎসুক আনন্দী রানিকে আর থামতে দিতে চায় না, সে ঘটনার পরিণতি কী হল তা দ্রুত জানতে চায়।

BanglaBook.org

রানি বলতে লাগলেন, ময়ূরভঞ্জের রাজা অনুসন্ধানে সব সত্য জানতে [illegible]। তখন বন্ধুপত্নী এবং তাঁর পুত্রকে পরম সম্মানে ও সমাদরে রাজপুরীতে রাখলেন।

একসময় বিশাল সৈন্যবাহিনী দিয়ে বন্ধুপুত্র দাশরথিকে বললেন, তুমি নিজের শক্তিতে দস্যু খররামল্লকে পরাজিত করে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার কর।

তাই হল। মহা বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করল দাশরথি। তারপর [illegible] সিং নাম গ্রহণ করে মহাসমারোহে নতুন রাজধানী মঙ্গলাপোতায় [illegible] করতে [illegible]। সেই মহাপুত্র তরবারিটি থেকে গেল রাজপুরীতে।

এরপর শুরু হল বগড়ি রাজ্যের নতুন অধ্যায়। শামশেরের মৃত্যুর [illegible] তাঁর ছেলে বৈষ্ণবচরণ সিংহ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করলেন। অত্যন্ত সুশাসক ছিলেন তিনি। এই কমই শুনেছি।

কালে মৃত্যু হল বৈষ্ণবচরণের। পুত্র যাদবচন্দ্র সিংহ বগড়ির শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। আর সেই সময় থেকে শুরু হল রাজ্যব্যাপী অশান্তি আর বিক্ষোভ। কেবল বগড়ি জুড়ে বলি কেন সমস্ত জঙ্গলমহাল জুড়ে অশান্তির আগুন জ্বলতে লাগল।

আনন্দী জানতে চাইল, এ ধরনের অশান্তির সৃষ্টি হল কেন রানিমা?

এর মূল কারণ তোমার অজানা থাকার কথা নয়, আনন্দী।

বুদ্ধিমতী আনন্দী বলল, মুর্শিদাবাদে ইংরেজদের বিজয়ের পর সারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা জুড়ে তাদের শোষণের পরিণতিই সৃষ্টি করেছে এই অশান্তির।

রানি বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছ, যাদবচন্দ্রকে ওরা বারো বছর কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি কারারুদ্ধ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর ছেলে ছত্রসিংহ পিতার অবর্তমানে বগড়ি রাজ্য শাসন করছিলেন। তিনি পাইক এবং চুয়াড়দের আন্দোলনকে তীব্র করে তুলেছেন এই অজুহাতে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করার পরিকল্পনা নিয়েছে ইংরেজরা। কেবল মহারাজ যাদবচন্দ্রের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ হওয়ার অপেক্ষা।

বিস্মিত আনন্দী বলে উঠল, আপনি এসব কথা অনুমান করেছেন কী করে, রানিমা?

অনুমান নয়, এ সত্য আনন্দী। বগড়ি থেকে গুর্জর বংশ শ্রাদ্ধের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিল, তার মুখেই আমি সমস্ত ঘটনা শুনেছি।

আনন্দী বলল, তাহলে তো আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে।

রানি বললেন, চারদিকে যত আগুন জ্বলবে আমাদের ততই আহুতি দিয়ে যেতে হবে। থামলে চলবে না, তাহলে একসময় নিভে যাবে আগুন। ওই আগুনেই দগ্ধ করতে হবে বিদেশি পঙ্গপালগুলোকে।

রাজ্যচ্যুত হলেন ছত্রসিংহ। পাইক, চুয়াড় বিদ্রোহীরা উপযুক্ত মানুষের অভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিল কিন্তু সেই সময় যোগ্য হাতে বিদ্রোহ পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন, বগড়ি রাজ্যের প্রধান সর্দার অচল সিংহ। এই নিঃস্বার্থ মানুষটি বুক দিয়ে আগলে রাখতে চাইলেন বিদ্রোহীদের।

সর্দার অচল সিংহ অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন গেরিলা যুদ্ধে।

যখন রাজস্ব সংগ্রহ করতে আসত ইংরেজ নিযুক্ত তহশিলদারেরা তখন দেখতে পেত কৃষকদের উঠোনে কোনো রকম ফসলের সঞ্চয় নেই। আসলে ফসলের মরশুমে নিজেরা খেত থেকে ফসল কেটে নিয়ে জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ের চূড়ায় জমা করে রাখত। সেখানে যাতে ইংরেজ ফৌজরা যেতে না পারে সেজন্য পাহাড়ে ওঠার পথটাকে বড় বড় পাথর ইত্যাদি ফেলে দুর্গম করে রাখত। ইংরেজ বাহিনী কৃষকদের পিছু ধাওয়া করলেও এইসব আঁকাবাঁকা দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের ওপর উঠতে পারত না।

BanglaBook.org

বিদ্রোহী পাইক, চুয়াড়, চাষাভুষোদের দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে লাগলেন সর্দার অচল সিংহ। ইংরেজরা বগড়ি রাজ্যে নানাভাবে পর্যুদস্ত হতে লাগল।

দেহে এবং মনে অত্যন্ত বলশালী ছিলেন সর্দার অচল সিংহ। নিঃস্বার্থ দেশভক্ত মানুষটি ইংরেজ বিতাড়নের শপথ নিয়েছিলেন কিন্তু এই সময় রাজা ছত্রসিংহের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটল।

ছত্রসিংহ ভাবলেন, এই বিদেশি বণিক সম্প্রদায় অতি অল্পকালের মধ্যে যেভাবে আমাদের দেশকে দখল করে নিচ্ছে তাতে এদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে এঁটে ওঠা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া এদের অস্ত্রবল, বুদ্ধিবল আমাদের থেকে অনেক বেশি। অতএব এদের সঙ্গে একটা রফা করতে পারলে আখেরে আমারই লাভ হবে।

রাজার এই দোলাচল-চিত্তের আঁচ পেয়ে গেলেন বিদ্রোহী নেতা অচল সিংহ। তিনি রাজার মুখোমুখি হয়ে সবিনয়ে বললেন, মুসলমান রাজত্বে বগড়ির রাজারা রাজ্যের সার্বভৌম অধিকার ভোগ করে এসেছে, এখন ইংরেজরা সেই অধিকার অধিবাসীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে কেড়ে নিচ্ছে। আপনি কোনো ভাবেই নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না। মুর্শিদাবাদের যুদ্ধে মিরজাফরের দল ইংরেজদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের ভয়ংকর পরিণতির কথা আপনার অজানা নয়। সুতরাং আপনি নিজেকে ওই শঠদের কাছে বিকিয়ে দেবেন না।

কিন্তু অশুভ শক্তি যার ওপর ভর করে, তার চিন্তা থেকে শুভবুদ্ধি উধাও হয়ে যায়।

রাজা ছত্রসিংহই একমাত্র জানতেন সর্দার অচল সিংহের গুপ্ত আস্তানার সন্ধান।

তিনি ভাবলেন, ইংরেজদের যদি ওই আস্তানার সন্ধানটা তিনি দিয়ে দেন তাহলে উপঢৌকন হিসেবে তিনি সমস্ত বগড়ি রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। তাঁর রাজ্যপাট অটুট থাকবে।

স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে কত নীচে নিয়ে যেতে পারে তার পরিচয় দিলেন এককালের বিদ্রোহীদের নায়ক রাজ্যচ্যুত ছত্রসিংহ।

BanglaBook.org

নিরন্ধ্র অন্ধকারে ডুবে গেছে চরাচর। পাহাড়ি ঝিঁঝিগুলো প্রবল শব্দে রাত্রিকে যেন করাত চালিয়ে টুকরো টুকরো করে চিরে ফেলছে। সহস্র নক্ষত্রের চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে আকাশ। ধরিত্রীর একজন বিশ্বাসঘাতকের পদচারণা অবলোকন করছে নীরবে।

মানুষটির পেছনে প্রায় নিঃশব্দে চলেছে একঝাঁক বন্দুকধারী গোরা সৈন্য।

ছত্রসিংহ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে ইংরেজ সেনাপতিকে ইঙ্গিত করলেন। সেনাপতির ইঙ্গিতে ছায়া ছায়া সৈন্যরা স্থানটাকে প্রায় চক্রাকারে ঘিরে ফেলল।

এতদিন এই গুপ্তস্থানের সন্ধান শত্রুপক্ষের একেবারে অগোচরে ছিল, তাই প্রায় নিশ্চিন্তে রাত্রিযাপন করছিলেন সঙ্গীদের সঙ্গে নায়ক অচল সিংহ। শিবিরের বাইরে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল মশালের আলো।

ছত্রসিংহের সাহায্যে দুরন্ত সিংহকে ঘুমন্ত অবস্থায় পিঞ্জরাবদ্ধ করে ফেলল ইংরেজ সৈন্য।

প্রতিরোধের কোনো উপায় ছিল না, আর কোনোভাবেই সে চেষ্টাও করলেন না দেশভক্ত অচল সিংহ। ওই অন্ধকারেও অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা রাজা ছত্রসিংহকে চিনতে পেরে তিনি শুধু বলে উঠলেন, বিশ্বাসঘাতকরাই আমাদের এই সোনার দেশটাকে বিদেশিদের হাতে তুলে দিল। হায় মহারাজ, আপনারও এই পরিণতি!

অচল সিংহ ইংরেজদের হাতে বন্দি হয়ে এগিয়ে চললেন তাঁর মহাপরিণতির দিকে।

ইংরেজরা বুঝেছিল, অচল সিংহকে বন্দি করে রাখলে বগড়ির চুয়াড়, পাইকরা খেপে উঠবে। এমনিতে পাইক আর চুয়াড়রা রাজ্যরক্ষার বিনিময়ে রাজাদের কাছ থেকে যে নিষ্কর ভূমি ভোগ

করত, তার ওপর বিপুল পরিমাণে কর চাপানো হয়েছে। তাতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছে প্রবলভাবে। এখন তাদের নায়ককে বন্দি করে রাখলে অশান্তি ইংরেজদের পিছু ছাড়বে না।

কোম্পানির পরিচালকরা পরামর্শে বসল। তারা হিসেব করে দেখল বিদ্রোহ দমনের জন্য যত গোরা সেনা আর দেশি সেপাই মজুদ করা হয়েছে তাদের খরচ ভূমি রাজস্ব থেকে একেবারেই তোলা যাচ্ছে না। কোম্পানি নিযুক্ত তহশিলদারদের দেখলেই বিদ্রোহীরা খুন করে ভাসিয়ে দিচ্ছে নদীতে অথবা পুঁতে দিচ্ছে মাটিতে।

খাজনা আদায় বাবদ যে সব ফসল সরকারি গোলায় তোলা হয়, তাও আজকাল জ্বালিয়ে দিচ্ছে বিদ্রোহীরা।

স্থির হল, পাইক আর চুয়াড়দের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। নামমাত্র খাজনা ধার্য করা হবে তাদের ওপর।

এই পরিকল্পনা নিলে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়বে।

কিন্তু যেসব মানুষ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করছে তাদের বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। বিষবৃক্ষকে উৎপাটিত করতে হবে সমূলে।

দেশভক্ত বিদ্রোহী পুরুষ অচল সিংহকে বিচারকরা ফাঁসি দিয়ে চিরতরে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা নিল।

ফাঁসির জন্য নির্ধারিত দিনের আগে একটি ঘটনা ঘটল।

গুর্জর সিং অশ্বারোহণে এলেন কর্ণগড়ে।

রানি শিরোমণির কাছে একটি আবেদন নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

সর্দার অচল সিংহ বিদ্রোহীদের কাছে বলতেন, তোমরা জানবে আমাদের সকল প্রেরণার মূলে রয়েছেন জননী মহামায়া সিংহবাহিনী। সেই দেবী সিংহবাহিনীর মানবী মূর্তি কর্ণগড়ের মহারানি জননী শিরোমণি। আমি যদি কোনোদিন তোমাদের ভেতর না থাকি, তাহলে তোমরা একমাত্র তাঁরই পরামর্শ মতো কাজ করে যাবে। আমি প্রতিদিন কাজ শুরুর আগে তাঁরই চরণ স্মরণ করি।

রানি খবর পেয়েছিলেন, সর্দার অচল সিংহের ফাঁসি হবে। এই কথাটি ঢোল পিটিয়ে হাটে বাজারে, দূর-দূর গ্রাম পর্যন্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন রানি শিরোমণি। অদূরে বুকে দুটি হাত চেপে মাথা নীচু করে বসেছিলেন গুর্জর সিং।

গুর্জর ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললেন, আমাদের বিদ্রোহী নায়ক আজ খাঁচায় বন্দি। ক'দিন পরেই আমরা তাঁকে হারাব। কেবল আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি যদি একখণ্ড বস্ত্রে আপনার চরণচিহ্ন এঁকে দেন তাহলে জননীর সেই আশীর্বাদ যে কোনো রকমে মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে পৌঁছে দেব আমরা।

কথাটা শুনে সহসা কোনো মন্তব্য না করে তদ্‌গত চিন্তায় ডুবে রইলেন রানি।

একসময় বললেন, আপনি জঙ্গলমহালের বিদ্রোহীদের জানিয়ে দেবেন, ইংরেজের ফাঁসির দড়িতে মৃত্যু হবে না দেশভক্ত অচল সিংহের। তিনি দেবী মহামায়া প্রদত্ত অমৃতবিন্দু পান করে অমরত্ব লাভ করবেন। তাঁর নশ্বর দেহের বিলয় হলেও তিনি অবিনশ্বর মহিমায় বিদ্রোহীদের হৃদয়ে চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

গুর্জর সিং চলে গেলে মহারানি তাঁর নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষে আনন্দীকে ডেকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন।

আলোচনা শেষে সিংহবাহিনীর মন্দিরদ্বারে দুজনে বসলেন প্রার্থনায়। সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি শুনে ধ্যানভগ্ন হল তাঁদের।

BanglaBook.org

প্রণামান্তে চরণামৃত পান করে, বিল্বপত্রে দেবীর সিন্দূর সংগ্রহ করে তাঁরা একসময় প্রবেশ করলেন অন্দরমহলে।

পরদিন অপরাহ্নে দেখা গেল কর্ণগড় থেকে অবগুণ্ঠনবতী এক গ্রাম্য বধূ সদর মেদিনীপুর লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে। হাতে একটি পোঁটলা। শাঁখা পরা মেয়েটির কপালে মস্ত বড় টকটকে সিঁদুরের টিপ।

সন্ধ্যার আগে সে কোতোয়ালিতে পৌঁছে থানা চত্বরে একটা নিমগাছের তলায় বাঁধানো বেদিতে বসে রইল।

মেয়েটি সুদর্শনা, স্বাস্থ্যবতী। পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ি।

আগন্তুক মেয়েটির ওপর থানার সেপাইদের দৃষ্টি পড়তে বিলম্ব হল না।

খবর পেয়ে এগিয়ে এলেন থানার মেজো দারোগাবাবু।

কী চাই? এটা সদর থানা।

মেয়েটি ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

মেজবাবু আগেই মেয়েটিকে এক ঝলক দেখেছিলেন। চাঁদের টানে সাগর উথলে ওঠে, চাঁদপানা মুখের টানে মেজো দারোগার হৃদয় উথলে উঠল।

বাইরে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি কেন, যা বলবার তা থানার ভেতরে এসে বল।

বধূটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দারোগাবাবুর সঙ্গে থানায় গিয়ে ঢুকল।

একটা বেঞ্চে দারোগাবাবুর মুখোমুখি বসেছে মেয়েটি। মেজো দারোগা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মেয়েটির মুখ।

কান্নায় করুণ হয়ে উঠেছে ভারি সুশ্রী মুখখানা।

হাতে ওটা কীসের পোঁটলা?

আমার সোয়ামির জন্য কটা পিঠে এনেছি, হুজুর।

সোয়ামি! কী নাম তার?

মুখখানা একটুখানি পাশে ঘুরিয়ে মৃদু গলায় বলল মেয়েটি, সোয়ামির নাম লিতে নাই গো।

না জানলে কাকে দেব তোমার ওই পিঠে?

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, যেনাকে কাল ঝুলানো হবে দড়িতে।

কথাটা শেষ করেই মেয়েটি ঘুরে পড়ে গেল মেঝেতে।

দারোগা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ফাঁসির আসামি অচল সিং-এর বউ!

হাঁকে ডাকে সেপাইরা জড়ো হয়ে গেল।

ভেতরে দারোগাবাবুদের কোয়ার্টার থেকে আনা হল একটি আদিবাসী কাজের মেয়ে। সে জলের ঝাপটা দিতে মূর্ছা ভাঙল বউটির।

এবার মেজোবাবু ছুটলেন বড়বাবুকে খবর দিতে। দুজনে মিলে বুট বাজাতে বাজাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে গিয়ে ঢুকলেন।

তিনজনে মিলে বহু পরামর্শের পর স্থির হল, অচল সিংহের স্ত্রীকে এই রাতটুকুর জন্য তার স্বামীর কাছে একই ঘরে থাকতে দেওয়া হবে। তাতে সাধারণ মানুষ জানবে, দোষীকে শাস্তি দিলেও ইংরেজ জাতটা অমানুষ নয়।

ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠি থেকে দারোগা দুজন বেরিয়ে আসার পর বড় দারোগা বললেন, সাবধানের মার নেই। এক টুকরো পিঠে অন্তত বেড়ালকে খাইয়ে পরীক্ষা করে নেবেন। বিষ মেশানো থাকলে আমরাই ফেঁসে যাব।

মেজো দারোগা একা ওই দায়িত্বটা নিতে চাইলেন না, বড় দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলে গেলেন।

BanglaBook.org

বউটি ততক্ষণে অনেকটা সুস্থ হয়ে বেঞ্চে পা মুড়ে শুয়ে আছে।

বুটের আওয়াজে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে থুতনি অবধি ঘোমটা টেনে দিল।

বড় দারোগা বললেন, আমার হাতে একটুকরো পিঠে দাও তো মেয়ে, কেমন সোয়াদ হয়েছে চেখে দেখি।

বউটি হাঁটু গেড়ে বসে পোঁটলা খুলল।

কয়েক রকমের পিঠে। মিষ্টি খুশবু ছড়িয়ে পড়ল।

বড় দারোগা হাত পেতে বললেন, বেশি নয়, এক টুকরো।

বউটি সসংকোচে একটি পুলি পিঠে তুলে দারোগাবাবুর হাতে দিয়ে দিল।

সন্তর্পণে বড়বাবু পিঠেটা মেজোবাবুর হাতে চালান করে দিলেন। মেজোবাবু পিঠে হাতে অন্দরমহলে ঢুকে গেলেন।

ক'দিন আগে কয়েকটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল একটা বেড়াল। খিদের জ্বালায় সে প্রায়ই হেঁশেলে ঢুকে হাঁড়িকুঁড়ি ভাঙত আর চুরি করে সবকিছু খেয়ে পালাত। টের পেলেই লাঠি-ঝাঁটা ছুঁড়ে মারা হত তাকে।

আজ সাঁঝ রাতে মহাসমারোহে তাকে আহ্বান জানিয়ে পুলি পিঠে পরিবেশন করা হল, সঙ্গে অন্যান্য খাবার।

প্রথমে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিল আর খেতে খেতে চমকে উঠছিল। পরে বিশ্বাস জন্মে গেলে সে তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বেড়ালটিকে চোখে চোখে রেখে মেজো দারোগা নিশ্চিন্ত হয়ে বড়বাবুকে খবর দিতে ছুটলেন।

বড়বাবু ততক্ষণ কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন মেয়েটির সঙ্গে।

মেজো দারোগা ইঙ্গিতে সবকিছু ঠিক আছে জানালে বড় দারোগা বউটিকে বললেন, তুমি এখন তোমার সোয়ামিকে শুধু পাশে বসে খাওয়াবে না, আজ রাতে তার কাছে থাকতেও পাবে। দয়ালু ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব তোমাকে সে সুযোগ দিয়েছেন।

বউটির কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। সে ছুটে গিয়ে বড় দারোগাকে গড় হয়ে প্রণাম করল।

পাশেই পাঁচিল-ঘেরা জেলখানা। সেখানে শতাধিক বন্দুকধারী সেপাই পাহারায় নিযুক্ত।

বড় দারোগা বউটিকে নিয়ে জেলারের ঘরে ঢুকলেন। জেলার ইংরেজ। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ফরমান দেখে এক সেপাই-এর সঙ্গে বউটিকে পাঠিয়ে দিলেন অচল সিংহের জন্য নির্দিষ্ট কুঠরিতে।

ছোট্ট এক চিলতে কুঠরির এক কোনায় একটি প্রদীপ জ্বলছিল। সেদিকে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ধ্যানমগ্ন ছিলেন অচল সিংহ। কুঠরির দরজা খোলাবন্ধ হলেও তিনি অনড় ছিলেন তাঁর আসনে।

সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ হলে অচল সিংহ প্রণাম জানালেন তাঁর ঈষ্টদেবের চরণে।

উঠে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে দেখলেন, জগদম্বার মূর্তি ধরে এক নারী ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। জ্বলজ্বল করছে তার কপালে বড় আকারের একটি সিন্দুর টিপ।

রমণী চোখ মেলে তাকাতেই বিস্মিত অচল সিংহ করজোড়ে প্রশ্ন করলেন, কে তুমি মা? কী করেই বা এই কুঠরিতে প্রবেশ করলে!

আপনার একান্ত আপনজনের পরিচয় দিয়ে অনেক কষ্টে এবং কৌশলে আজ রাতটুকুর জন্য এই কুঠরিতে থাকার অনুমতি পেয়েছি।

তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি মৃত্যুপথযাত্রী অচল সিংহের।

এবার সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে রমণী বলল, কর্ণগড় থেকে জননী শিরোমণির দেওয়া ভোগ-প্রসাদ নিয়ে এখানে এসেছি। রানিমা নিজের হাতে এই পিঠেগুলি তৈরি করে দেবী

BanglaBook.org

সিংহবাহিনীকে নিবেদন করেছেন। আমাকে ডেকে বলেন, আনন্দী, একদিন নিজের হাতে ছেলেকে পাশে বসিয়ে খাওয়ানোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে সাধ আমার পূর্ণ হল না। তুই যদি আমার বীর ছেলেকে খাওয়াতে পারিস তাহলে আমার পোড়া মনটা শান্তি পায়।

মেঝেতে একটি দশ বছরের বালকের মতো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অচল সিংহ। দু'হাত অঞ্জলি করে বলল, দাও দাও, মায়ের প্রসাদ দাও। জননী শিরোমণির হাতের তৈরি পুলি-প্রসাদ।

আনন্দী একটি একটি করে পিঠে খাওয়াল অচল সিংহকে। যতক্ষণ নিঃশেষ না হল ততক্ষণ নির্বাকে খেয়ে গেল সে। শেষে একখণ্ড কলার পাতা চিবিয়ে খেতে গেলে আনন্দী বাধা দিয়ে বলল, ওটুকু আমার জন্য থাক ঠাকুর।

বসে বসে দীর্ঘ রাতটুকু কাটাতে লাগল দুজনে। ইংরেজ বিতাড়নের অফুরন্ত পরিকল্পনা রচনা করে চলল তারা।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখের আলো নিভে যাবে চিরতরে, কিন্তু এই নির্মম সত্যটিকে কোনোরকম গুরুত্ব না দিয়ে তারা ছক সাজাতে লাগল আগামী বিদ্রোহের দিনগুলির জন্য।

কথার মাঝে উঠে দাঁড়াল দুজনে। গোল একটা ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে ঝলকে ঝলকে শেষ রাতের ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছিল।

ওইটুকু ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অনন্ত তারাভরা আকাশ। যুগ-যুগান্ত ধরে ঋষি, ব্রহ্মর্ষিরা বসে আছেন ধ্যানমগ্ন হয়ে।

অচল সিংহ ফিরে তাকালেন প্রায়ান্ধকার ছোট্ট ঘরটির দিকে। গৃহকোণে দীপ নির্বাপিত হয়েছে।

কী জ্বলছে জোনাকির মতো ঘরের ভেতর! কাঁপছে না, নড়ছে না, উড়ছে না!

কুঠির ভেতর একটি আওয়াজ ধ্বনিত হল, জননী শিরোমণির ইচ্ছা নয়, তাঁর মহাবীর সন্তান ফাঁসির দড়ি গলায় পরে মৃত্যুবরণ করেন।

অচল সিংহ বললেন, এটাই আমার ভবিতব্য, আনন্দী।

সিংহবাহিনীর ইচ্ছা তা নয়। কূটকৌশলী ইংরেজরা আগাম ঢোলশোহরত করে মানুষ জড়ো করছে। সবার চোখের সামনে তাদের নেতা যখন দড়ির ফাঁস গলায় পরে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করবে তখন সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে যাবে। তারা ভাববে ইংরেজদের কত শক্তি।

আনন্দী থামলে অচল সিংহ বললেন, তবে?

এবার রানি শিরোমণির দেওয়া একটি বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় অচল সিংহের হাতে তুলে দিয়ে আনন্দী বলল, ওই হিরেটি তুললে তার তলায় একটি ক্ষুদ্রপাত্রে একবিন্দু অমৃত পাওয়া যাবে। জননী শিরোমণি তাঁর বীরপুত্রকে ওই অমৃত-বিন্দু পান করে অমরলোকে যাত্রা করতে বলেছেন।

ঢং ঢং করে রাত্রি শেষ প্রহরের ঘণ্টা বাজল। বুটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এখুনি আসামিকে স্নানাদি করিয়ে ফাঁসির জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

কুঠরির দরজা খোলার আওয়াজ হতেই নারীকণ্ঠের আকুল ক্রন্দনরোল উঠল।

মেজো দারোগা কুঠরিতে ঢুকে বললেন, মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের অশেষ কৃপায় তুমি মেয়ে একরাত্রি স্বামী-সান্নিধ্য লাভ করেছ, এখন তুমি ঘরে যাও, শেষ কাজটুকু নির্বিঘ্নে আমাদের করতে দাও।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একজন সেপাই-এর সঙ্গে ঘর থেকে একেবারে বাইরে বেরিয়ে এলো গ্রাম্য বধূটি।

এ কী দেখছে আনন্দী! পৌষ অমারাত্রির শেষ প্রহরে দিগন্ত ব্যাপ্ত অন্ধকারের প্রবাহে নক্ষত্রের মতো লক্ষ লক্ষ আলোককণিকা ভেসে উঠছে।

BanglaBook.org

দূর থেকে একটা শব্দতরঙ্গ ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে এগিয়ে আসছে কোতোয়ালির দিকে।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিকদিগন্ত ভরে জনতার মশাল-মিছিল এগিয়ে আসছে শত্রু নিধনের হুংকার-ধ্বনি তুলে।

এদিকে সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল কোম্পানি কর্তাদের। সর্বসমক্ষে ফাঁসিতে লটকাবে যাকে, সে যেন ইচ্ছামৃত্যু বরণ করল ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে।

এখন জনতাকে কী কৈফিয়ত দেবে কোম্পানি?

দ্রুত পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল তারা, জনতার হাতে তুলে দেবে অচল সিংহের দেহ। ঘোষণা করবে, বিদ্রোহী ফাঁসির মঞ্চে না উঠে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছে।

জনতার সম্মুখে সুসজ্জিত হস্তীর হাওদার ওপর বসেছিলেন এক দিব্য রমণী-মূর্তি। তাঁর সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট এক কিশোর সূর্য-লাঞ্ছিত বিজয়পতাকা ওড়াচ্ছিল।

জনতা অচল সিংহের নিশ্চল দেহটি বহন করে এনে হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রমণীর কোলে স্থাপন করল। পরম করুণাময়ী সন্তানের ললাট চুম্বন করে ধ্বনি তুললেন, জয় চিরবিদ্রোহী অচল সিংহের জয়।

সমুদ্রতরঙ্গের মতো সে ধ্বনি জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে ঢেউ তুলতে তুলতে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

ভোরের উদয় হচ্ছে। রাজহস্তীর ওপর উঠে দাঁড়ালেন মূর্তিমতী ঊষা। উন্মুক্ত কৃপাণ তুলে ধরলেন ঊর্ধ্বে। সঙ্গে সঙ্গে অরুণের রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে।

মনে হল, দেবীর তরবারির আঘাতে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে ঝরে পড়ছে মহিষাসুরের রুধির।

উদ্বেল হয়ে উঠল জনসমুদ্র।

'জয় রণরঙ্গিণী অসুরবিনাশিনী জননী শিরোমণির জয়।'

বাতাসে তরঙ্গিত হতে হতে সে ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সারা মেদিনীপুরের জনমানসে। দাবাগ্নির মতো বিস্তার লাভ করল সমগ্র বঙ্গদেশ তথা আসমুদ্র হিমাচলে।

BanglaBook.org

দহন

এক

বেলা রিন্ রিন্ করছে পশ্চিমপাড়ার গাছপালাগুলোর ঠিক মাথায়। পুব পাড়ায় বাঁশ বনের ফাঁকে বাঁ হাতে ঘোমটা একটু ফাঁক করে মাঠের দিকে চেয়ে আছে চৌকিদার বুড়া দাসের বউ পদ্মমণি। পাশের গাঁয়ে দারোগাবাবুর সঙ্গে গেছে দুজন দফাদার আর চৌকিদার বুড়া দাস। খাজনা আদায়কারী তহশীলদারকেও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। যে খাজনা দিতে চাইবে না তাকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে যেন তেন প্রকারে আদায় করতে হবে। কড়া সরকারি হুকুম বেরিয়েছে।

যত ঝামেলা বাঁধিয়েছেন শাসমল সাহেব। ব্যারিস্টারীতে ইস্তফা দিয়ে এখন দেশের মানুষজনকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেউ সরকারকে ট্যাক্স দিও না। ইউনিয়ান বোর্ড আমরা চাই না। ওতে চৌকিদারী ট্যাক্সের জায়গায় ইউনিয়ন রেট সাতগুণ বেড়ে যেতে পারে। ওটা হবে সরকারি আমলাদের আনাগোনার ঘাঁটি। আন্দোলন দমন করার জন্যে ইউনিয়ন বোর্ডগুলো হবে এক একটা ঘুঘুর বাসা।

লোকটি বলতে কইতে পারেন বটে। মুখ দিয়ে যেন আগুন ছোটে। মাঠ ময়দানে মিটিং করে বলেছেন, তোমরা প্রাণ গেলেও ট্যাক্স দিও না। অন্যায় করবে না, অন্যায় সইবে না।

সব্বাই এক কাট্টা, শাসমল সাহেব যখন বলেছেন, আমরা তখন জান থাকতে ট্যাক্সো দিব না।

গোপীনাথ দারোগা আজ গেছে নাচিন্দার পাশের গাঁয়ে। গোপীনাথের নামে খুনে দাগী ডাকাতগুলো বাঁশপাতার মত থর থর করে কাঁপে। আর গোপীনাথ কটা ছাপোষা সংসারী মানুষকে কাৎ করতে পারবে না। সরকারের ট্যাক্স গোপীনাথ আদায় করবেই। নিমক খাচ্ছে সে রাজার। তাঁর কাজ না করে দিতে পারলে সেতো নিমকহারামীর সামিল হল।

চৌকিদার বুড়া দাসের বাড়িটা নাচিন্দা গাঁয়ে। মা বাপ মরে গেছে, শুধু বউ নিয়ে সংসার। বউ নয়তো যেন একটা লক্‌লকে আগুনের শিখা। কি করে যে এ তল্লাটে এমন দশাসই চেহারার সুন্দরী মেয়ে ভূমিষ্ট হল, তা কে জানে। আশপাশে এমন কোন মেয়ে মিলবে না, যে তার ধারে কাছে দাঁড়াতে পারে। তিন চারখানা গাঁয়ের ওপারে একেবারে সমুদ্রের কাছ বরাবর বুড়া দাসের বউ পদ্মমণির বাপের বাড়ি। পদ্মমণির বাপ যখন দেখল ছেলেটা সরকার বাহাদুরের কাজ পেয়েছে তখন কোনদিকে না তাকিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বুড়া দাসের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে। আর বুড়া দাস বেশি দাম না চড়িয়েই পদ্মমণিকে ঘরে তুলে নিল। কি জানি, যদি এমন চেহারার মেয়েটা হঠাৎ বেশি চাপ দিলে হাত ফস্‌কে যায়।

পদ্মমণি ঘোমটার ফাঁকে দেখল, মাঠ পেরিয়ে বড় বাঁধের দিকে আসছে পাঁচ জনের একটা দল। তার ঘরের মানুষটি সবার আগে। মাথায় করে বয়ে আনছে বিরাট একটা বস্তা। এতবড় জোয়ান মরদটা কুঁজো হয়ে যেন এতটুকু হয়ে গেছে। পেছনে খাঁকির জামা, হাফপ্যান্ট পরা, মাথায় টুপি আঁটা দারোগাবাবু। তাঁর পেছনে লাল পাগড়ী জমাদার দফাদার মিলে জনা তিনেক।

পোস্তা বাঁধের ওপর এসে কি যেন কথা হল ওদের ভেতর। তারপর একা তার মানুষটা বাঁধ থেকে নেমে ঘরের দিকে আসতে লাগল ওই পেল্লাই বস্তাখানা নিয়ে। বাকী দলটা পোস্তা ধরেই হেঁটে চলল কাঁথি শহরের দিকে।

BanglaBook.org

পদ্মমণি সামনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে চোখে কৌতূহল, বস্তাখানার ভেতর কি এমন বস্তু আছে! কিন্তু পরক্ষণেই মানুষটার কষ্টের কথা ভেবে পদ্মমণির মনটা কেমন হু হু করে উঠল।

বুড়া দাস ওপর দিকে মুখ তুলে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ঘাড় ঘোরাবার সাধ্যিও নেই। কেবল সামনের দিকে কিছুটা জায়গায় দৃষ্টিটা ছড়িয়ে আছে, আর তাই দেখে সে হাঁটছে।

পদ্মমণিদের ঘরের চারপাশে কোন পড়শী নেই। বুড়ো দাসের ঠাকুর্দা একটু তফাতে মাঠ দেখে পুকুর কেটে বাস্তু পত্তন করেছিল। সেই থেকে একটু নিরিবিলিতেই বুড়া দাসের পরিবার তিন পুরুষ কাটিয়ে আসছে। ঠাকুর্দার এক ছেলে অঘোর দাস আর অঘোরের একটিমাত্র সল্‌তে এই বুড়া। কিন্তু পদ্মমণি বুড়া দাসকে আজও কোন উত্তরাধিকারী দিতে পারেনি। ষোল বছরে বউ হয়ে এসেছিল, আজ পদ্মমণি বাইশে পড়েছে, কিন্তু ছেলে এখনও আকাশের চাঁদ হয়ে আছে। আয় চাঁদ আয় বলে ডাক দিলেই চাঁদ কিন্তু নেমে আসে না কোলে। এ নিয়ে দুঃখ আছে দুজনের, কিন্তু অশান্তি নেই। আর অনেকগুলো ছেলেপিলে হলে মেয়েদের শরীরের যে ভাঙনটা ধরে তার কোন চিহ্ন নেই পদ্মমণির দেহে। বুড়া দাসের চোখে তার পদ্মমণি সেই যোল বছরেরটি। পদ্মমণি আজও গালে টোল ফেলে চোখ দুটো আধবোজা করে যখন হাসে তখন বুড়া দাসের শরীরের রক্ত চল্‌কে ওঠে।

ওদিকে প্রায়-রাতে একা থকতে হয় পদ্মমণিকে। চৌকিদারের কাজ হল, রাত-পাহারা। দু'তিনখানা গাঁ গস্ত করে হাঁক পেড়ে পেড়ে হাঁটা। পৌষ মাসে ফসল ভরা গৃহস্থের ঘরে চুরির হিড়িক। তখন ধানবেচা টাকা পয়সাও বেশ কিছু থাকে গৃহস্থের হাতে। এ সময় চোখে মুখে দেখতে পায় না বুড়া দাস। বেলা দশটায় থানায় হাজিরা। কেস থাকলে মহকুমা কাচারীতে ছোটা। সেখানে তীর্থের কাকের মত বসে থাকা। এজলাসে কখন কেস উঠবে, আবার কখন সাঙ্গ হবে। তারপর আছে হররোজ ছোটবাবুর ফাইফরমাস খাটা।

বুড়া দাসের দুঃখ হয় পদ্মমণির জন্য। তাকে সে কতটুকু সময় দিতে পারে। সোমত্ত বউ স্বামীর সোহাগে ডুবে থাকতে চায়। কিন্তু হায়, পদ্মমণির বুকে যখন হাহাকার তখন মাঠঘাট ভেঙে রাতের অন্ধকারে হাঁকার ছেড়ে হাঁটছে বুড়া দাস। তবে হাঁ, চরিত্তির বটে পদ্মমণির। স্বামী ছাড়া পরপুরুষের প্রসঙ্গই নেই তার মুখে।

বুড়া দাস উঠে এসেছে উঠোনে। পদ্মমণি ছুটে এসে হাত লাগাল বস্তায়। দুজনে ধরাধরি করে তুলে আনল ঘরের ভেতর।

থকে গিয়েছে পাটঠা জোয়ান মরদটা। কুকুরের মত ফ্যা ফ্যা করে দম নিচ্ছে।

শালা, কুচ করছে তোর গোভরমেন্টর চাকরি। ছাড়ি দিব।

ছাড়ি দিব তো কি খাবা গো? ঘরের ভেতর হাত চালিয়ে বুড়া দাসের খাবার গোছ করতে করতে বলে পদ্মমণি।

খাবা গুষ্টির মাথা। খাবা ছোট দারগার মুণ্ডু।

হাসল পদ্মমণি। শব্দ করে না। সারাদিন খায়নি লোকটা। এদিকে মাথায় বয়ে এনেছে তিনমণি বস্তাখানা। মাথা খারাপ হবারই কথা।

ওড়িষ্যা সংলগ্ন অঞ্চল, তাই এখানকার লোকেদের কথ্য ভাষায় ওড়িয়া শব্দেরই আধিক্য। তাছাড়া সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল, তাই খাদ্যের অভ্যেসটাও ভাগীরথী তীরের মানুষ জনের থেকে আলাদা।

খাবার গোছ করে পদ্মমণি বলল, হাতমুখ ধুই আইস, আমি তুমার খাবার জাইগা করি।

গামছাটা হাতে ধরিয়ে দিতেই গা তুলল বুড়া দাস। আড়মোড়া ভেঙে চলল পুকুর ঘাটের দিকে।

এদিকে সাঁঝের পিদিম জ্বেলে মনসাতলায় বসিয়ে দিয়ে তিনবার শাঁখ ফুঁকল পদ্মমণি। শেষে গলায় আঁচলখানা জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে উঠে এল ঘরে।

BanglaBook.org

লম্ফ জ্বালা হয়েছে। আলোর শিখার ধূসর শীষ উঠছে বুলবুলিয়ে। পাশে চাটাই পেতে সামনে কাঁসার থালায় ভাত চুড়ো করে বেড়ে রেখেছে পদ্মমণি। থালার ধারে তরকারি। পাশেই একটা কলাপাতের বাটিতে তেঁতুলের অম্বল।

বুড়া দাস সাঁঝের বাতি জ্বালা হলেই খেয়ে নেয়। এ অঞ্চলের চাষাভূষো লোকদের অভ্যেসটা ঠিক এ রকমই। সারাদিন মাঠে ঘাটে খাটাখাটনি করে সাঁঝ নামলে ঘরে ফিরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাতের খাবার খেয়ে নেয়। তাছাড়া রাত করে কেরোসিন তেল পোড়াবে, সে রেস্ত কজনের আছে।

বুড়া দাসের ঘরে তাড়াহুড়ো করে সাঁঝের বাতি জ্বলতে না জ্বলতেই খাবার কারণটা কিন্তু পুরোপুরি তা নয়। তার কেরোসিন জ্বালবার রেস্তও আছে। সন্ধ্যায় সে যে খেয়ে নেয় তা শুধু ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নেবার জন্যে। তারপর আছে রাত জেগে হাঁক।

রাতে প্রথম প্রথম পদ্মমণির বড় একা ঠেকত। কাছে পিঠে পাড়াপড়শী নেই, তাই ছ্যাৎ ছ্যাৎ করে বুকটা ভেঙে যেত। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। তাছাড়া এমন ঘোঘ কে আছে যে বাঘের ঘরে বাসা বাঁধার সাহস করবে। ফাঁকার বাড়ি হলেও পদ্মমণি তাই নিশ্চিন্তে শুতে পারে। সে এমনিতেই সাহসী, তার ওপর মাথার কাছে নিয়ে শোয় একখানা হাসুয়া।

একদিন খুব শিক্ষা পেয়ে গিয়েছিল বুড়া দাস। বউকে মজা দেখাবার জন্যে বাঁশের গরাদ দেওয়া ঝোরকার ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল চুপি চুপি। আর যায় কোথা, এক মোক্ষম কোপ এসে পড়ল অন্ধকারে ঝোরকার ওপর। ভাগ্যিস অন্ধকার, আর বরাত জোর বুড়া দাসের। এক চুলের জন্যে হাতখানা তার বেঁচে গেল। কিন্তু গরাদের ক খানা বাঁশ কেটে দু ফাঁক।

পরের দিন ঝোরকা মেরামত করতে করতে বুড়া দাস বলল, কপালটা আমার ভালা রে বউ। কাল যে কাণ্ডটা ঘটল তাউতে চাক্‌রী আর হাত, দুটাই খুইতি।

সে তুমার দোষ। চোর সাইজা আইল কেনি কও।

বুড়া দাস গর্বের সঙ্গে বলল, হুঁ, দেখলি হিম্মৎ আছে বটে তোর। আমার বদলে চাকরীটা সরকার তোকে দিলে ঠিক করত।

ভাতের থালায় এসে বসল বুড়া দাস। মনের ভেতরে একটা কৌতূহল পুরে রেখে পাশে বসে রইল পদ্মমণি। লোকটা আগে ত খাক্ তারপর সব কথা সে জেনে নেবে।

খেতে খেতে প্রথম কথা বলল বুড়া নিজেই, তেলতাপ্‌ড়ির ঝাল দিকি পুরা থালা উঠি যাবে বউ। কি সুয়াদ। পাইলা কি করি?

লাগার হাট যাইথ্‌লা কুমর জেনা, অরু হাত দি কিরি আনিইছি।

খেতে খেতে সোজা হয়ে উঠে বসল বুড়া দাস। একটু ঝাঁঝাল গলায় বলল, তোকে কইছি না কুমার জেনার সঙ্গে কথা কইবুনি, শালা মেনিমুয়া, মায়া দ্যাখলে ছুকছুক করে।

পাল্টা ঝাঁঝ পদ্মের গলায়, খাই পকিইবে নেকি গো? অমন মরদ আছে নেকি এ দেশে যে পদ্মের চোখে চোখ রাখিকি কথা কইতে পারে?

পদ্মমণির তেজ দেখে মনে মনে বিগলিত হয় বুড়া দাস। না, তার পদ্মর চরিত্রে কোন দোষ নেই।

তবু বলে, একটু নরম গলাতেই বলে, লোকটা ভালা না রে বউ। উবগার করার ছল করিকি ঘরে ঢুকে। তামুক খাবার আছিলায় ঘন ঘন আইসে। তারপর সব্বনাশ করিকি পলায়।

পদ্মমণি বলে, হাটে যাবার রাস্তায় হাঁক পাড়ি কইল, পদ্মদি, কি আনতে দিব নেকি গো?

তুমি তেলতাপ্‌ড়ি ভালবাস, তাউ পুয়াটায় আনি নিলি। লোককে লোক দ্যাখবেনিত, পাকপাখালি দ্যাখবে নাকি গো।

বুড়ার মুখে কথা নেই, এখন কুমারের আনা তেলতাপ্‌ড়ির ঝালের স্বাদে মুখ ভরা।

এবার আসল কথা পাড়ল পদ্ম, বস্তায় কি ধনরত্ন আনল কও? ঘাড়টা ত ভাঙি পেকিইল।

BanglaBook.org

আর কউ কেনি, ধপার গাধা, মোট বইকি দিনটা গেলা। কুন শালা ট্যাঙ্কো দিবেনি। বলে কি, শাসমল সাইব না কইছে। আরে শালামনে তোন্নকে যদি কয়, খবরদার দেশবাসী, তুমার মনে বাপ, হবনি, তা হিলে কি সক্কলে সন্ন্যাসী হই যিব?

পদ্মমণি এবার ধমক দিয়ে উঠল, কার কথা কও তুমি! অমন লোক আর গুটে দ্যাখাও ত দেখি। বালেস্টরী ছাড়িকি দেশের লোকের উবগার করছে।

কে তোর কানে ফুস্‌মন্তর দিলা রে? চাকরী করি কি আর খাইতে হবে নি।

পদ্ম এবার বলল, আসল কথা কও ত দেখি, বস্তায় কি?

বাটি ঘটি, থালা, গিলাস। ট্যাঙ্কো দিবুনি তাহিলে দে শালামনে কাঁসা পিতোল যা অছি। পাঁচজন মিলিকি বাসনগুলো টানি পকিইলি। বস্তায় পুরা হিলে গোপী দার্‌গা লোকমনকে কইলা, মাথায় মোট তুলিকি চল্‌ থানায়।

চারুবাড়ে লোক খাড়া হি আছে। কো নড়লানি, গুটে কথা বি কইলানি।

দার্‌গা ছড়ি ঘুরিলা, রা নেই মুয়ে। তখন আর কে বইবে, আমি শালা অছি। চাপা মোট বুড়া দাসের মাথায়।

পদ্ম বেশ কিছুক্ষণ গুম্‌ মেরে বসে রইল। কিছু পরে মুখ খুলল, পাপ বিদায় কর। অতগুলো লোকের শাপ ঘরে বইকি লি আইল। মুখ পুড়া মনে থানায় লি যাইতে পারলানি। আমার ঘরে যত উৎপাত।

আরে চুম্‌মার বউ চুম্‌মার। গোপী দার্‌গার কান সব জেইগায় আছে। শুনতে পাইলে বুড়া দাসের বউ বলিকি তোর ইয়াদ রাখবেনি।

পদ্ম বলে, একবার আসিকি দেখুনা আমার কোতরে হাসুয়ার ধারটা কিধ্‌রা।

এবার সত্যি বুড়া দাস ভয় পায়। সে অকারণে হলেও ভীত চোখে চারদিকে তাকায়। বাঁ হাতখানা পদ্মর মুখ চাপা দেবার ভঙ্গীতে এগিয়ে দিয়ে বলে, চাকরী খাবু রে তুই, চাক্‌রী খাবু। আমাকে কুনদিন ফাঁসির লটকিবু।

পদ্ম বলে, বাজে কথা রখি দিকি খাও ত তুমি। কাল সকাল সকাল পাপ বিদায় কর।

এবার ক্ষোভের সঙ্গে বলে বুড়া দাস, হিসাবপত্তর নেই, ভাবলি কষ্ট করিকি বই আনলি যখন দু চার খানা থালা ঘটি রখি দিবা ঘরে। অখন ভারী বাগড়া লাগিইলু ত তুই।

আইজ সারারাত চোখ কষা করতে পারব নি। তুমার মনে ডাকাইত ধর। এ ত ডাকাইতির বাড়া গো। ভগবান যখন শস্তি দিবে তখন তাঁর মার বোড়ো মার। দেখ, কুনদিন গোপী দার্‌গার মথায় না চড়কা পড়ে।

ভীত বুড়া দাস কথা আর বাড়তে দিতে চায় না। বলে, তুই কি শাস্তি করিকি দুটা খাইতে দিবুনি বউ?

পদ্মমণিও আর কথা না বাড়িয়ে হাঁটুতে থুত্‌নি গুঁজে বসে থাকে। চোখ দুটো তার বুড়া দাসের ভাতের থালার দিকে, কিন্তু মনটা তার উদাস।

বুড়া দাস খাওয়া শেষ করে উঠোনে আঁচাল। তারপর নিয়ম মত ঢুকল শোবার ঘরে। সেখানে বসে বসে সে এখন তামাক খাবে। তামাকটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে সে গড়িয়ে নেবে ঘণ্টা তিনেক। এ সময় হেঁসেলের কাজ সারবে পদ্ম। তারপর রামায়ণখানা কুলুঙ্গী থেকে নামিয়ে এনে পড়বে। জোরে জোরে নয়, মনে মনে। তারপর এক সময় মাথায় ছুঁইয়ে বইটা ফের রেখে দেবে কুলুঙ্গীতে। এই রামায়ণ, বেহুলা-লখিন্দর, আনন্দমঠ সে নিয়ে এসেছে বাপের বাড়ী থেকে। বাপ সচ্ছল গৃহস্থ। মেয়েকে নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা অব্দি পড়িয়েছিল। কিন্তু পদ্মর শরীরের বাড় হল বড় তাড়াতাড়ি।

BanglaBook.org

তবু আজও তার পড়া শেষ হয়নি। আনন্দমঠখানা সে সংগ্রহ করেছিল বিয়ের কিছু আগে। পড়শীদের একটি ছেলে পড়ত কলকাতায়। ছুটিতে এসেছিল। পদ্মের বই পড়ার নেশা দেখে তাকে আনন্দমঠখানা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, ভাল লাগলে তাকে আর ফেরৎ দিতে হবে না।

আজও যখন সে বইখানা পড়তে বসে তখন কোথা দিয়ে রাত কেটে যায় তা সে বুঝতে পারে ন। মনে মনে সে বইটির দাতাকে নমস্কার জানায়। কিন্তু সেই তার পড়শী, ছোটবাবুদের ভাগ্নে বসন্তদা কোথায় গেল। তার বিধবা মা কেঁদে অন্ধ। কলকাতা থেকে কত বছর আর ঘরে আসেনি। কেউ বলে বেঘোরে মারা পড়েছে, আবার কেউ বলে গোপনে দেশের কাজ করছে।

পদ্ম যখনই বসন্তদার কথা ভাবে তখনই মনটা কেমন হয়ে যায়। চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে। আনন্দমঠখানা বার বার কুলুঙ্গী থেকে নামিয়ে কপালে ঠেকায়। তার মনে হয় বসন্তদাকে সে যেন প্রমাণ জানাচ্ছে। আস্তে, আস্তে বলে, ভালা রও বসন্তদা। বুড়া মাটাকে একবার দেখি যাও।

আজ কেন জানি না পদ্মমণি থালায় ভাত বাড়তে গিয়েও থালাখানি সরিয়ে রাখল। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল শোবার ঘরের সামনে। কান পাতল।

মানুষটা জেগে নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পদ্ম বাইরে বেরিয়ে এল। অন্ধকার চরাচর। শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। পায়ে পায়ে পদ্ম এসে দাঁড়াল কলা ঝাড়ের সামনে। আন্দাজে হাসুয়া চালিয়ে দুখানা পাতা কেটে আনল। ফিরে এসে লম্ফের আলোয় সেই পাতা পেতে তারই ওপর ভাত বেড়ে নিল।

আজ পদ্ম কিছুতেই থালা বাটিতে খাবার বেড়ে গ্রাস তুলতে পারবে না। গলা দিয়ে নামবে না সে খাবার। যাদের থালা বাটি সরকারি লোক কেড়ে এনেছে তারা সবাই আজ খাচ্ছে কলার পাতা সংগ্রহ করে। তাই পদ্ম কলার পাতায় খেতে খেতে নিজের সোমায়ীর হয়ে মনে মনে প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগল।

পরের দিন সন্ধ্যায় বুড়া দাসের মুখেই শুনল ঘটনাটা। আর শুনে আহ্লাদ চেপে রাখতে পারছিল না পদ্ম।

নিলাম ডাকা হয়েছিল থানার সামনে। বিষ্যুদ্‌বার ছিল বাজার বার। লোক জমায়েৎ হয়েছিল একটা মেলার মত। কিন্তু কি আশ্চর্য, সরকারি ডাক হয়ে যাচ্ছে তবু একটা লোকও নিলাম ধরছে না। শেষে থানার দাওয়ায় পড়ে রইল বাসনের স্তূপ, কেউ এগিয়ে এসে একবার ছুঁয়ে দেখল না।

এক সময় আকাশ কাঁপিয়ে উঠল শাসমলের জয়ধ্বনি। বীরেন শাসমল কী—জয়।

দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল পদ্মমণি। কাকে জানাল সঠিক তা সে নিজেও জানে না। শাসমল সাহিবকে না আজকের সমস্ত ব্যাপারটাকে। পদ্মমণি বোধহয় প্রণাম জানাল মানুষের মনের সেই শক্তিকে যে শক্তি সাংসারিক সমস্ত দুঃখ, প্রলোভন, নির্যাতনকে তুচ্ছ করে সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

দুই

এ অঞ্চলের মানুষ রাতে সমুদ্রের ডাক শোনে। সারাদিন ছোট্ট মহকুমা শহর কাঁথির বুক জুড়ে কর্ম চাঞ্চল্য। কোর্ট-কাছারীতে লোকজনের আনাগোণা। বাজারে কেনাকাটা। ইস্কুলে, খেলার মাঠে ছেলেমেয়েদের হৈ চৈ। কিন্তু রাত নামলেই চারদিক নিস্তব্ধ। এ অঞ্চলের মানুষ প্রধানতঃ জমির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিকর্মই প্রধান উপজীবিকা। তাই দিনে ক্ষেত-খামারের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকে পড়ে। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে শয্যা নেয়। কোন কোন রাতে শহরের হরিসভা গৃহে বাইরের বড় কোন কথক বা কীর্তনীয়া এলে আশপাশের গাঁ ভেঙে লোক জড়ো হয়। অনক রাত অব্দি সেদিন চলে জাগরণের পালা। তাছাড়া জমিদার বা সম্পন্ন জোতদারের বাড়ি কোন উৎসব উপলক্ষে যাত্রা-গান হলে চাষাভূষোরা রাত জেগে কাটিয়ে দেয়।

BanglaBook.org

অবশ্য এসব উৎসব অনুষ্ঠান সব সময় বড় একটা লেগে থাকে না। তাই সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর নিরানন্দ জীবনে ঘুমের মাঝে শান্তি খোঁজে মানুষগুলো।

কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন চারদিক নিঝুম হয়ে যায় তখন সমুদ্রটা যেন কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসে। কখনো মনে হয়, উঠোনে সগর্জনে আছড়ে পড়ল ঢেউ, পরমুহূর্তেই সরে সরে চলে যায় দূর থেকে দূরে। তখন অতি ক্ষীণ একটা শব্দ ওঠে—কোন অভিমানী নারীর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মত তা মনে হয়।

সমুদ্র তীরের মানুষ বলে বোধহয় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা একটু বেশিমাত্রায় ভাবপ্রবণ। জীবনের শুভ অশুভ, প্রায় সব ক্ষেত্রেই এরা বুদ্ধির চেয়ে আবেগের দ্বারা বেশি পরিচালিত হয়। কোন একটা ঘটনার সঙ্গেও তারা যখন যুক্ত হতে চায় তখন বিচারের অপেক্ষা না রেখে সরাসরি অন্তরের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটায়।

পদ্মপণির ঘুম আসে না। বুড়া দাস রাতের টহলে বেরিয়ে গেলে সে কোন কোনদিন বই পড়ে। আবার কোনদিন বা জানালার গরাদ ধরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে থাকে। সে কান খাড়া করে শোনে সমুদ্রের ডাক। আশ্চর্য একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে তার প্রতিটি কোষে।

জ্যোৎস্না রাতে অনুভূতিগুলো আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। জানালার বাইরে দিগন্ত ছোঁয়া মাঠ। মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মত গাছপালা নিয়ে এক একটা বসতি। দু'মাইল দূরে সমুদ্র। হঠাৎ দমকা হাওয়া বয়ে আসে। গাছপালার মাথা কাঁপিয়ে সে বাতাস ছুটে আসতে থাকে। মনে হয়, জ্যোৎস্না রাতে রহস্যময় একদল ঘোড়সওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। তারা এক সময় পদ্মমণির বাস্তু সংলগ্ন গাছগাছলি কাঁপিয়ে চারদিকটা পরিক্রমা করে আবার কোথায় চলে যায়।

তার মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ারের দলে তার বসন্তদাও আছে।

কোন কোনদিন এমনি বসে থাকতে থাকতে তার চোখ ছাপিয়ে জল নামে। কেবলি মনে হয় সে বন্দী হয়ে আছে। একটা ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে তার বাড়ি। আশপাশে কোথাও জন মনিষ্যি নেই। সে বুক ফাটিয়ে কাঁদলেও কারু কানে গিয়ে সে কান্না পৌঁছবে না। চারদিকে থৈ থৈ করছে সমুদ্রের জল।

কাজ থেকে রাতে বুড়া দাস ফিরে এলেই এক একদিন তাকে জড়িয়ে ধরে পদ্ম। কতক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না।

বুড়া সুন্দরী বউকে বুকে চেপে ধরে বলে, কি হিলা তোর পদ্ম। ভয় মাড়ছে? তোর আবার ভয়। তুই ত গুটে ডাকাত।

পদ্মকে আদরে আদরে ভরে দেয় বুড়া দাস।

পদ্ম ঠিক বোঝাতে পারে না। তার নিঃসঙ্গতা যে কি তা বুঝিয়ে বলার নয়। সে ভূত-প্রেত, চোর-জাকাত, কোনও কিছুর থেকেই ভয় পয় না, তার ভয় শুধু নিঃসঙ্গতাকে। কিন্তু কে সঙ্গ দেবে তাকে? বুড়া দাস? না, বুড়া দাস যদি চাকরি নাও করত তাহলেও সে পদ্মমণিকে সঙ্গ দিতে পারত না। সঙ্গ কে দিতে পারে? দেহসঙ্গী তো সঙ্গ দিতে পারে না, সঙ্গ দিতে পারে সে, যে একমাত্র মনের দোসর। অনেক সময় ভাবে পদ্ম, যদি একটা ছেলে থাকত তার। তাহলে সে ওই ছেলেটাকে নিয়ে হয়ত ভুলে থাকতে পারত। তাকে মনের মত করে লেখাপড়া শেখাতে পারত সে। তার ইস্কুলে যাওয়া কোন অজুহাতেই বন্ধ হয়ে যেত না। তার ছেলে ইস্কুলের পড়া শেষ করে একদিন বসন্তদার মত কলকাতায় পড়তে যেত। সে দেশের কাজে যোগ দিত ঠিক তার বসন্তদারই মত।

হঠাৎ বুকখানা ছ্যাঁৎ করে ওঠে পদ্মমণির। তার ছেলে যদি আর তার কাছে না ফিরে আসে! বসন্তদাও তো তার মায়ের কাছে আর ফিরে আসেনি।

মনে মনে বড় দুঃখের একটা হাসি হাসে পদ্মমণি ছেলে নেই, তার আবার মুখে ভাতের চিন্তা।

BanglaBook.org

—নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে পদ্মর। সমুদ্র তাদের বাড়ি থেকে এক ছুটের অনেক ছোটবেলায় পাঠশালা ছুটি হয়ে গেলে পদ্ম তার প্রাণের বন্ধু কিশোরীকে নিয়ে দৌড় দৌড়তে সমুদ্রের ধারে চলে যেত। যতদূর চোখ যায় কুলকিনারা নেই। ঢেউএর ওপর ঝিলিমি জলপরীদের নাচ। দু'দশখানা জেলে নৌকো বালুর জমিনে কাৎ হয়ে শুয়ে রোদ্দুর পোহাত। কোন দিন লোভী গাং-শালিকগুলো ফলারে বসে যেত সমুদ্রের ধারে। ওরা দু'বন্ধু লাফ দিতে দি ছুটত। অমনি মাথার ওপর চড়বড় করে ডানা মেলে উড়তে শুরু করে দিত পাখিগুলো। ও দু'হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ধরার চেষ্টা করলেই পাখির ঝাঁক উঠে যেত আরও ওপ তাদের সাদা সাদা ডানায় ঝিলিক দিত শেষ বেলার সোনার মত রোদ।

কখনো বা ওরা গুটিগুটি পায়ে এগোত সমুদ্রের জলের দিকে। যেখানে আধভেজা বালু ম হয়ে জেগে আছে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে থাকত হাজার হাজার লাল গোলাপের পাপড়ি। ওরা টিপে টিপে কাছে গেলেই দমকা হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার মত অদৃশ্য হয়ে যেত পাপড়িগু আসলে, হাজার হাজার ক্ষুদে লাল কাঁকড়া ছড়িয়ে পড়ে থাকত বালুর জমিনে। কারু পায়ের সা পেলেই আশপাশে তৈরি করা ছোট ছোট গর্তে পলকে অদৃশ্য হয়ে যেত। কি আশ্চর্য উন্মাদন ভরা ছিল এসব খেলা।

আর একটা খেলা ছিল বালুর পাহাড়ের ওপর বসে সর্ সর্ করে নীচের দিকে নেমে যাও তারপর সমুদ্রের দমকা বাতাস চিরে ভেজা বালুর ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে জল ছোঁয়া। এসব শেষ হয়ে গেলে পড়ন্ত বেলায় বালিয়াড়ি দিয়ে ফিরত দু'বন্ধুতে। বালুতে ডুবে যেত পায়ের পা বুনো জাম আর বাদাম বনের ভেতর দিয়ে ছায়া ছায়া পথে ফিরে আসত বাড়িতে।

বিয়ের আগে অব্দি, পদ্ম খেলেছে এমনি খেলা। কিশোরীর চোদ্দ বছর বিয়ে হয়ে যায় ষোল বছরে পদ্মর। কিশোরী শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার পর দু'দুটো বছর পদ্মর একা একা কেটে মা মরেছে তার অনেক কাল আগেই। একা মেয়ে বাপের ঘরে। অবস্থাপন্ন না হলেও খাওয়া পর অভাব নেই। মেয়ে বড় হয়েছে তাই পদ্মমণির বাবার অন্ত ছিল না ভাবনার। একা একা বে উঠেছে। মেয়ে হয়েছে ডাকাবুকো। সংসারের সব কাজ সে গুছিয়ে করে। তদারকি চাববাসের। বাপের সেবা যত্ন করে। কিন্তু এত কাজকর্মের মাঝে থেকেও সে নিঃসঙ্গ। বাবা য বেরিয়ে যায় কাঁথি শহরে বাজারবার গুলোতে তখন সে একা একা বালিয়াড়ির নির্জন পথ ধ এগিয়ে যায় সমুদ্রের দিকে। আজকাল সে সমুদ্রতীরের খোলামেলা জায়গায় একা একা বেড়ি বেড়ায় না। বাড়ন্ত শরীরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে জেলে নৌকোর মাঝিরা। এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। তাই বালিয়াড়ির শেষপ্রান্তে কেয়া ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে নির্জ বসে সে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে। গর্জন করছে সমুদ্র, ভেঙে পড়ছে সমুদ্র। মিশে গেছে সমুদ্রের সঙ্গে দিগন্তে। পাখি উড়ছে ডানা মেলে। ঢেউএর ফণায় ফণায় আলোর মণি। কলার মোচার মত দুলে দুলে মাছ ধরছে জেলে নৌকোগুলো। দমকে দমকে হা বয়ে এসে এলোমেলো করে দিচ্ছে মাথার চুল, গায়ের কাপড়।

বড় কষ্ট হয়েছিল পদ্মর বিয়ে করে স্বামীর বাড়ি আসার পর। এখনও বাবা তার শক্তসম লোকজন রেখে চালিয়ে নিচ্ছে কাজকর্ম। বাজার যাবার পথে হপ্তায় দু'বার করে মেয়েকে দে যায়। কিন্তু পদ্মর দুঃখ, সমুদ্রকে নিয়ে। শিশুকাল থেকে সে শুনে এসেছে সমুদ্রের গান। করেছে সমুদ্রের হাওয়ায়। মন চলে গেছে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর সাওয়ার হয়ে দিগন্তে। সে স এখানে কই। বাপের বাড়িতে থাকার সময় পড়শীরা যখন ঝগড়া করত নিজেদের ভেতর তখন চলে যেত সমুদ্রের ধারে। কত সহজে সে ভুলে যেত মানুষের তুচ্ছতাকে।

পদ্মমণি রাতের বিছানায় শুয়ে আজও ঘুমের মাঝে হঠাৎ জেগে ওঠে। দূর থেকে সমুদ্রের গ ভেসে আসে। যেন তাকে ডাক দিয়ে বলে, হাঁরে পদ্ম, সংসার পেয়ে ভুলে গেলি আমাকে!

থানায় কি একটা জরুরী কাজ পড়েছিল বুড়া দাসের। ভোর ভোর বেরিয়ে গিয়ে ফিরল সে রাত প্রায় বারটা বাজিয়ে।

পদ্ম ঘর বার করছিল, গেল কোথায় মানুষটা! সেই গেছে সূয্যি ওঠার আগে, এত রাতেও ফেরার নাম নেই।

বুড়া দাস ঘরে ঢুকলে পদ্ম তাকে ঘরে পরার কাপড় এগিয়ে দিল। চৌকিদারের পোশাক খুলে ফেলে হাতে গামছা নিয়ে ঘাটে গেল বুড়া দাস। পদ্ম আগে আগে চলল আলো দেখিয়ে। এ সময় পদ্ম কোন কথা বলে না। মানুষটা ক্লান্ত। আগে খানিক জিরিয়ে নিক, তারপর খাওয়া দাওয়া করুক, সবশেষে কথা।

খেতে বসে কয়েক গ্রাস মুখে তুলে থামল বুড়া দাস। পদ্ম মানুষটাকে লক্ষ্য করছে তীক্ষ্ণ নজরে।

বুড়া দাস এবার পদ্মের দিকে চেয়ে বলল, ইংরাজের রাজত্বে তেনার কাজ করি, কত পতিপত্তি, কত মান। অত বোড়ো বোড়ো জমিদার বাবুমনে গোবরমেন্টের চৌকিদার বলিকি কত খাতির করে। কিন্তু তোর গোপী দারগা আর তার চেলা সিপাইটা আমাকে খাটিই মারলা।

পদ্ম বলে, কেনি, কি হিলা?

আর কি হিলা। সারাদিন হাঁটি হাঁটিকি পা দাদরা হি গেলা। কাঁথিনু হাঁটি গেলি পেটুয়া গাংঘাট। সেঠি কাজ সারিকি ফিরতে ফিরতে রাত বারটা।

পদ্ম আক্ষেপের সুরে বলে, ছাড়ি দও কাজ, ছাড়ি দও। অমন কাজের মুখে ঝেঁটা। গুলামের কাজ। দারগার জুতার সুকতালা হইকি আছ।

পদ্মর এতবড় মন্তব্য সহ্য করতে পারে না বুড়া দাস। বলে, তুই থাম, গোপী দারগাটা পাজি বলিকি কি সব্বু লোক পাজি? রাজার চাকরির সুখ তোর মনে বুঝবুনিচে পদ্ম, কুন কালে বুঝবুনি।

পদ্ম এক কথায় সারে, আমার বুঝিকি কাজ নেই।

রাতের বিছানায় দুজন পাশাপাশি বসে। আকাশে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। হাতল ভাঙা কাস্তের মত একফালি চাঁদ পৃথিবীর অন্ধকার দূর করার বৃথা চেষ্টা করছে।

পদ্ম সরষের তেল গরম করে এনে মালিশ করে দিচ্ছিল বুড়া দাসের পায়। এক সময় সে বলল, বুসি আছ কেনি, শুই পড়। আমি মালিশ করি দি, তুমি ঘুমাও।

তোকে আর মালিশ করতে হবেনি বউ, তুই বি ঘুমা। আমার তরে কত রাত জাগি রইলু।

মনে মনে হাসে পদ্মমণি। বুড়া দাস কি করে বুঝবে তার মনের কথা। রাতের পর রাত চোখে তার ঘুম থাকে না, সে কি নিশাচর স্বামীর কথা ভেবে ভেবে। সে যে কিভাবে, তার অশান্ত মন যে কি চায় তা কেউ জানেনা। নিজেও বুঝি স্পষ্ট করে জানেনা পদ্ম। মাঝে মাঝে সমুদ্রের গর্জন ওঠে তার মনে। সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সমুদ্রের মত দিগন্তে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কখনও তার মনে হয় হাট মাঠ ঘাট পেরিয়ে সে চলেছে তো চলেইছে। কোথায় চলছে তা সে জানেনা, শুধু চলা আর চলা। এক দুপুরে সে ভেড়ির ওপর দিয়ে একদল ছেলেকে সারি বেঁধে কোথায় যেন যেতে দেখেছিল। তারা হাত নেড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, এ গোলামখানায় পড়ব না পড়ব না। ইস্কুল কলেজ, বন্ধ কর, বন্ধ কর।

ওরা এমনি হাঁকতে হাঁকতে চলেছিল কাঁথি বাজারের দিকে। তারপর এক সময় তাদের সমবেত আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল।

তারা যখন চোখের বাইরে চলে গেল তখন পদ্মর মনে হল, সে যদি এমনি করে ওদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলে যেতে পারত।

BanglaBook.org

কত নিঃসঙ্গ মুহূর্তে পদ্মের চোখের ওপর ভেসে উঠেছে এই মিছিলের ছবি। খালগুলো যেমন তর্ তর্ করে এগিয়ে গিয়ে গাঙে পড়ে, আবার গাঙের স্রোত মিশে যায় অথৈ সমুদ্রে, ঠিক তেমনি যেন মিছিলগুলো ছুটে চলে যায় কোন বড় একটা সমুদ্রে মেলার জন্য।

কখনও কখনও রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে বসন্তদাকে।

বসন্তদার একি চেহারা হয়েছে। রোগা, একমুখ দাড়ি।

বসন্তদা ওর দিকে চেয়ে বলে, কি রে পদ্ম, বইটা রাখবি না ফিরিয়ে দিবি?

কাঁদ কাঁদ গলায় পদ্ম বলে, আমি বইটা পড়ি বসন্তদা। তুমার কেত্তে বই অছি, আমার এ বইটা গেলে কি রইবে কও!

বসন্তদা কত ভাল। হেসে বলে, আচ্ছা ওটা রাখ তুই। শুধু বই পড়লে হবেনা রে, বই-এর লোকগুলোর মত হতে হবে।

কোথায় মিলিয়ে যায় বসন্তদা। সারারাত বিছানায় শুয়ে চেখের জলে ভাসে পদ্ম।

পায়ে তেল মালিশ শেষ হল। পদ্ম বলে, অখনও বুসি রইল?

বুড়া বলে, দেখ পদ্ম, আইজ তোর মত একটা মায়াকে দেখিকি, তার দুঃখের কথা শুনিকি চোখে জল আইলা। কিন্তু আমি কি করবা ক? আমার কথা কে শুনবে।

পদ্ম উৎসুক হয়ে বলে, কি হিলা, কিসের দুঃখ?

কারু কোতরে কইবুনি, সে গুটে গোপন কথা।

ভণিতা রাখিকি কও ত। আমার কত বন্ধু, কত পড়শী, জনে জনে ধরিকি কইতে যাবা, শুনগো আমার ঘরের মানুষ কইছে।

বুড়া দাস এরপর যে ঘটনা বলে গেল তা সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায় পাঁউসী নদীর ওপারে লোনামালে এক বছর বন্যা আর তার পরের বছর খরা হয়ে লোকের দুঃখের আর শেষ নেই। যে মালিকদের চর তারা ধান কাটার সময় ছাড়া ও অঞ্চলে আর আসে না। খালি একটা কাছারী বাড়ি দু'একজন গোমস্তা নিয়ে প্রায় সারা বছর খাঁ খাঁ করে। গরীব প্রজাদের সুখ দুঃখের দিকে তাঁদের তাকাবার সময় নেই।

এ বছর অবস্থা যখন খুবই খারাপ, তখন দুটি আড়কাঠি এসে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিল। সুন্দরবনের দিকে নাকি সোনার থাল জমি। সেখানে একবার যেতে পারলে সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

তারা বলল, গুরুবারে তাদের পান বোঝাই একখানা নৌকো সাঁঝবেলা এসে লাগবে পাঁউসীর ঘাটে। দু'একজন যারা যেতে চাও লাটে, তারা আসতে পার ওই নৌকোয়। পরের ক্ষেপে যখন নৌকো আসবে তখন অনেক বেশি লোকের যাবার ব্যবস্থা থাকবে। তবে ওখানে কাজ পেলে, চাষের শেষে মাথা পিছু দশ টাকা করে দিতে হবে।

সব্বাই রাজি। এখন ভুখা মানুষগুলোর ভেতর কে আগে যাবে তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

আড়কাঠিরা এ ক্ষেপে নির্বাচন করল দুজনকে। তারা দুজন স্বামী স্ত্রী। এমন আকালেও যুবতী বউটার দেহে ধস নামেনি।

গুরুবারের রাতে পাঁউসীর ঘাটে সত্যি সত্যি একটা নৌকো এসে ভিড়ল। ওরা দুজন স্বামী স্ত্রী আড়কাঠিদের সঙ্গে উঠল সে নৌকোয়। উৎসাহী অনেকগুলি লোক গ্রামের থেকে খেয়া ঘাটে এসেছিল ব্যাপারটার সত্যাসত্য সরেজমিনে বুঝতে। তারা এ ক্ষেপে যেতে পারল না বলে যতটা দুঃখ পেল, তার চেয়ে অনেক বেশি আশা বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে ফিরল।

এর পরের ঘটনা অতি দ্রুত গড়িয়ে চলল স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে।

পেটুয়ার কাছ বরাবর এসে ধূর্ত লোকগুলো সন্ধ্যার মুখে দুঃখী লোকটাকে ছল করে নামাল নৌকো থেকে। সবলে ডাণ্ডা মেরে তার মাথাটা দু'ফাঁক করে দিল। তারপর চরের পাঁকে পুঁতে দিয়ে লাফিয়ে উঠল নৌকোয়।

BanglaBook.org

একটা আর্ত ডাক কানে এসে বেজেছিল বউটার। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপর সব চুপ হয়ে গিয়েছিল। সে প্রথমে ভাবতেই পারেনি এমন একটা অঘটনের কথা। তারপর যখন দেখল, সবাই নৌকোয় উঠল শুধু তার স্বামী ছাড়া তখন সে বুঝতে পারল, ঘোর একটা বিপদে সে পড়ে গেছে।

নৌকো তখন তীর বেগে ছুটেছে ভাঁটার টানে। কতকগুলো জোয়ান মরদ তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সে আর্তনাদ করে উঠল।

ভগবানের কি খেলা। জেলেরা বাহার গাঙ থেকে মাছ ধরে নদীতে উঠে আসছিল। ভাটা দেখে তারা জোয়ারের অপেক্ষায় নদীর মোহনায় একটা তীরে নোঙর ফেলেছিল। সন্ধ্যায় রান্নাবান্নার জোগাড়ে ব্যস্ত ছিল তারা। হঠাৎ কানে এসে বাজল, আর্ত একটি মেয়ের গলার স্বর।

নদীর বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে ওদের নৌকোগুলো ভাসছিল। লাগবি তো লাগ, বাটপাড়দের নৌকোটা অন্ধকারে বুঝতে না পেরে ধাক্কা লাগাল জেলে নৌকোর সঙ্গে।

সামাল সামাল, ধর ধর করে জেলে নৌকোগুলো ঘিরে ধরল ওই বাটপাড়দের নৌকোটাকে।

মেয়েটার মুখে জেলেরা শুনল তার করুণ কাহিনি। স্বামীকে যে এই লোকগুলো খুন করে মেয়েটাকে নিয়ে পালাচ্ছিল তা বুঝতে কারু বাকী রইল না। পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলা হল সবকটাকে। অনেক যুক্তির পর ঠিক হল, এতগুলো নৌকোর অযথা বসে থেকে কাজ নেই। একটা নৌকো পাহারায় থাকলেই চলবে। ওই নৌকোর একটা লোক থানায় গিয়ে খবর দিয়ে পুলিশ নিয়ে এসে ব্যাপারটা তাদের হাতে তুলে দেবে।

কথামত কাজ হল। থানার দারোগাবাবু ছুটে এলেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। চৌকিদার বুড়াদাসও রইল তাদের সঙ্গে।

দারোগাবাবু খুব তারিফ করলেন জেলে নৌকোর মাঝিমাল্লাদের। বুটের ঠোক্কর লাগালেন বাটপাড়দের দু-চারজনকে। পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে জেলে নৌকোর মাঝির হাতে দিয়ে বললেন, এ তোমাদের কাজের পুরস্কার। সরকারি বখশিশ।

মেয়েটিকে বললেন, তুমি এখন তোমার গাঁয়ে ফিরে যাও। থানা থেকে লোক গেলে তুমি সাক্ষী দিতে আসবে। ওই মাল্লারাই তোমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে, ওরাই তোমাকে যাবার পথে তোমার গাঁয়ে নামিয়ে দিয়ে যাবে। হাঁ, আর এক কথা, যদি থানা থেকে তোমার ডাক নাও আসে তাহলেও জানবে গোপীনাথ দারোগার হাতে এদের রেহাই নেই।

মেয়েটা বড় কাঁদছিল। অভুক্ত, দরিদ্র, তার কথা বলার ক্ষমতাও বিশেষ ছিল না। তাছাড়া এতবড় একটা অঘটনে সে কিরকম বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল।

দারোগাবাবু তার হাতে দশটা টাকা দিতেই মেয়েটা গোপীনাথ দারোগার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

গোপীনাথ তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে নিজেই জেলে নৌকোয় তুলে দিলেন। জোয়ারে নৌকোখানা রসুলপুর হয়ে পাঁউসীর দিকে এগিয়ে চলল।

এরপর শুরু হল গোপীনাথ দারোগার আসল খেলা। তাঁর আদেশে বুড়া দাসকে খুনে আসামীগুলোর বাঁধন খুলতে হল। ওরা ওঠে দাঁড়ালে গোপীনাথ দারোগা বললেন, পানাবাবুকে অনেককাল দেখিনি, লাট থেকে একবার এসে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যান।

ওদের দলের মাতব্বর হাত জোড় করে বললে, জো হুজুর। আমরা কাছারী পৌঁছেই তেনাকে পাঠিয়ে দেব।

তারপর চার পাঁচটা লোক একসঙ্গে গুজুর গুজুর করল। একজন এগিয়ে এল কখানা দশ টাকার নোট নিয়ে।

দারোগাবাবু বললেন, ও টাকা কটা ওদের দাও, আর যত তাড়াতাড়ি পার পানাবাবুকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে।

BanglaBook.org

আভূমি নত হয়ে নমস্কার করে লোকগুলো নৌকোয় গিয়ে উঠল। দারোগাবাবু ঘোড়ার ওপর উঠে থানায় ফিরলেন।

ঘটনাটি শেষ হলে পদ্ম বলল, তুমি কি পাপীগুলার হাতনু টাকা লিল?

সিপাই, দফাদার লিলা, আমি কুন জমিদার আছি যে ছাড়ি দিবা।

টাকাটা কুনঠি রোখছ?

পকটে। কাল সক্কালবেলা তুলি রোখবু বাক্সে।

আচ্ছা, আইজ ত ঘুমাও।

পরদিন বুড়া দাসের জামার পকেট থেকে পদ্মমণি দশ টাকার একখানা নোট বের করল। তাও বাঁ হাত ঢুকিয়ে। পুকুর ঘাটে নিয়ে গিয়ে ওটাকে জলে চুবিয়ে পাঁকে পুতে দিল। তারপর স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে ওঠে এল।

তিন

১৯২১ সালে ইংল্যান্ডের যুবরাজ আসবেন ভারত দর্শনে। তাই সারা দেশের রাজভক্ত কর্মচারীদের ভেতর পড়ে গেল সাজ সাজ রব। কিন্তু বাদ সাধলেন কংগ্রেসীরা। যুবরাজের সমস্ত অনুষ্ঠান বর্জন করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন তারিখে যে সকল স্থানে যুবরাজের অনুষ্ঠান থাকবে সেখানে পালন করতে হবে পূর্ণ হরতাল।

মফঃস্বলের বহু অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা ছুটল কলকাতা মহানগরীতে। কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। বর্জন-পরিকল্পনাকে করতে হবে সাফল্যমণ্ডিত।

শুরু হল পুলিশী অত্যাচার। প্রহারে জর্জরিত হতে লাগল স্বেচ্ছাসেবকের দল। বিভিন্ন স্থানে তছনছ করা হল কংগ্রেস অফিস। চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

কিন্তু কলকাতা শহরে পালিত হল অভূতপূর্ব হরতাল। শহরের পথে চলল না যানবাহন, রাত্রিতে রাজপথে জ্বলল না একটি বাতি। অন্ধকারে অবলুপ্ত হল মহানগরী।

রোজ বুড়া দাসকে বেরিয়ে যেতে হত দারোগাবাবুর সঙ্গে ডিউটিতে। কংগ্রেস অফিসের তালা ভেঙে কাগজপত্র, বুলেটিন টেনে বার করে আগুন ধরিয়ে দিতে হত। স্বেচ্ছাসেবকেরা জমায়েৎ হয়ে কাগজপত্র রক্ষা করার চেষ্টা করলেই শুরু হয়ে যেত বেধড়ক মার। ঘুষি, কীল, চড়, লাঠি।

ঘরে ফিরে এসে গল্প করত বুড়া দাস। পদ্মমণি হাঁ করে শুনত। শেষে বলত তুমারমনে কি মানুষ!

বুড়া দাস বলত, গোবরমেন্টর চাকুরি করি, তেনার খাই, কাজের বেলা পলি আইলে চলে।

ছাড়ি দও অমন চাকরি।

বুড়া দাস হেসে বলে, তাহিলে তোর অমন সুন্দর দুটা গোড়ের মল গড়িইবা কি করি?

ও মল পরার চাইতে আমার মরণ ভাল।

বুড়া দাস প্রবোধ দিয়ে বলে, থাম, থাম, অত চটলে কি চলে বউ। কি করবা, চাকরী করি চাকরের। মনিবের মতন ত হুকুম চালিতে পারবানি।

কদিন ধরে চারদিকে ভলানটিয়ারদের গলা শোনা যাচ্ছে। 'কাঁথি দারুয়া ময়দানে মেদিনীপুরের মুকুটহীন সম্রাট বীরেন্দ্রনাথের সংবর্ধনা সভায় দলে দলে যোগদান করুন।'

১৯২২ সালের আগস্ট মাসে ছাড়া পেয়েছেন বীরেন্দ্রনাথ। কাঁথি-বাসীরা তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য উৎসুক।

BanglaBook.org

ভেড়ীর ওপর দিয়ে ভলানটিয়াররা যখন মুখে চোঙ দিয়ে সভার খবর ঘোষণা করতে করতে চলে যায় তখন ঘরের কাজ ফেলে বাইরে ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় পদ্ম। তার কেবলি মনে হয়, সে যদি এমনি করে সকলের সঙ্গে দল বেঁধে শাসমল সাহেবের নাম ঘোষণা করতে করতে যেতে পারত।

হাতে ধরে থাকা ঘোমটাখানা কাঁপতে থাকে। মনে হয়, ঘোমটা টেনে খুলে ফেলে সে ছুটে যায়।

সংবর্ধনা-সভার আগের রাতে কথা হচ্ছিল পদ্মমণির সঙ্গে বুড়া দাসের।

বুড়া বলল, কাল সারা দিনটা গাধার খাট্‌নি আছে পদ্ম। সভায় লোক আসিব চারু বাড় দিকি। আমার মনকে সবু দেখতে হইব। যদি গুটে কাণ্ড লাগি যায় তাহিলে সারা রাত ঘরে ফিরি পারিবনি।

আমি সভার যাবা,—পদ্ম বায়নার সুরে বলে।

ক্ষেপে যায় বুড়া দাস, কি কইলু, তুই যিবু স্বদেশী সভার। আইজকাইল বোড়ো ধিঙ্গি হইছু দেখিঠি।

ধিঙ্গি কিসের শুনি, সব্‌বু লোক যাউছি। মায়া লোক বলি আমি কি যাই পারিবনি নাকি? মায়া মানুষ কি মানুষ না?

বুড়া দাস চৌকিদার, তার উপর পদ্মর স্বামী। ডবল দাপট তার। চোখ রাঙিয়ে বলে, দিনে দিনে দেখুছি বাইরে যাবার তরে মন উথলায় তোর। রাতে ভিতে ঘরে রউ কি নেই রউ তুই জানু। এবার বাইরে যাবার কথা কইবু কি মুখে ভুঁকড়া লাগিইবা।

রান্না ঘরের ভেতর ছুটে চলে যায় পদ্ম। মুখে ঘোমটা জড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। এতবড় অপমান করল তাকে তার সোয়ামী। সে রাতে ঘরের বাইরে যায় কিনা তাই নিয়ে সন্দেহ। তাকে আবার মারধোরের ধমক।

অনেক রাত অব্দি পদ্মমণি শুয়ে রইল রসি-ঘরের মাটিতে। চোখ দুটো খোলা। একবিন্দু জল নেই এখন। জ্বলছে, ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। সে একদিন সত্যিই তাহলে বেরিয়ে পড়বে। দুচোখ যেদিকে যায়, সে চলে যাবে সেদিকে। যেখানে স্বামী নেই, সংসার নেই, বাপ মা কেউ নেই। সুখ চাইনা তার, মুক্তি চাই। সংসারে শুধু ঘোমটার ভেতর বন্দী হয়ে থাকতে পারবে না সে। খাবার জুটবে না? ভিখিরি মেয়েগুলো তাহলে বেঁচে আছে কি করে। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

কে মাথায় হাত রাখল তার! পদ্ম এখন বুঝতে পেরেছে, বুড়া দাস তার শিয়রে বসে মাথায় হাত রেখেছে। সে সমস্ত শরীরটাকে কাঠের মত কঠিন করে পড়ে রইল।

বুড়া আস্তে আস্তে বলে, রাগ করলু রে পদ্ম।

কথা নেই পদ্মমণির মুখে।

আবার বুড়ো বলে, সতীলক্ষ্মী বউ মনে ঘর আলো করি কি রয়। তার মনে কি মরদের মত ঢ্যাং ঢ্যাং করি কি ঘুরে।

পদ্মমণির গা জ্বলতে থাকে। সে সহ্য করতে পারে না বুড়া দাসের এ ধরণের কথা। কিন্তু প্রতিবাদ করবে না সে। প্রতিবাদ করার অর্থই হল, বুড়া দাসের কথায় গুরুত্ব দেওয়া।

এবার বুড়া দাস অন্য পথ ধরে, তোর যেদি ভালা লাগে ত যা।

পদ্ম জানে, এটা বুড়া দাসের মনের কথা নয়। তার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে বুড়া জিততে চায়।

পদ্ম এবার উঠে বসে খোলা চুল বেঁধে নিল।

বুড়া দাস আশ্চর্য হয়ে দেখল পদ্মের রূপ। এযে একেবারে রক্তপদ্ম। আগুনের শিখার মত জ্বলছে। লম্ফটা বসান আছে পিলসুজের ওপর। বাইরের হাওয়া এসে মাঝে মাঝে কাঁপিয়ে দিচ্ছে শিখা। আলোছায়ার রহস্যময় নাচ শুরু হয়েছে। পদ্ম যেন দুলছে বুড়া দাসের চোখের সামনে।

BanglaBook.org

'কমলে কামিনী' যাত্রা দেখেছিল বুড়া দাস। তার পদ্ম যেন সেই 'কমলে কামিনী' হয়ে গেছে।

হঠাৎ বুড়া গলায় আবেগ ঢেলে বলল, কুনদিন তোকে বুঝতে পারলিনি পদ্ম। কতদিন মনে হিছে, তুই আমার বউ নয়, অন্য কো। আমার উচিত হয়নি তোকে বে করা। আমি তোর যুগ্যি নয়রে পদ্ম। তুই সগ্‌গের দেবী, আমার ঘরটা আলো কোরতে আসসু। আমি মন খুলিকি আইজ কইঠি পদ্ম, যেঠি খুশী, যেমা খুশী তুই যা, আমি কুন কথা কইবানি।

পদ্মের কঠিন মনটা মুহূর্তে গলে গেল। সে বুড়া দাসের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, আমি যাবানি গো, তুমার ঘর ছাড়িকি এক পাও লড়বানি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

বুড়া দাস বউ এর কথা শুনে গদগদ। পদ্ম যদি তার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে সেও বা উদার হবে না কেন।

বুড়া দাস বউকে জড়িয়ে ধরে তুলে নিয়ে এল শোবার ঘরে। বিছানায় পদ্মকে শুইয়ে দিয়ে বলল, আমি মনে বোড়ো কষ্ট পাবা পদ্ম, তুই যদি সভার নেই যাউ। খালি গটে অনুরোধ রোখবু, কো যন্ নেই জানি পারে। ঘম্ দিকি রইবু। সভা ভাঙি গেলে সুট্‌কি চালি আইসবু। সখ হিছে তোর স্বদেশী বাবুকে দেখতে, ত দেখ যা।

পদ্ম বুড়া দাসকে তার পাশে হাত ধরে টেনে শোয়াল। আজ স্বামী মুখে যত খারাপ কথাই বলুক, মনটা বুড়া দাসের সত্যি খারাপ না।

পদ্ম বলল, না গো না, ঘর ছাড়িকি আমি কুঁঠ্‌কে যাবা। সবু লোক গাঁ উজাড় করিকি চলি গেলে চোরের ত পুয়া বার।

বুড়া দাস হুঁকরে উঠল, হুঁ তুই থামত। ঘরে ত ঘড়া ঘড়া মোহর অছি, চোর লি পলিইবে। আমার মোহর ক, টাকা ক, সব্‌বু আমার পদ্মমণি। পদ্মমণি চালি গেলে বুড়া দাসের প্রাণ বি চালি গলা।

পদ্ম এবার বলে, যদি যাই তাহিলে বাইরে তালা দিবানি। ভিতর্‌কু বন্দ করিকি খিড়কি দরজায় তালা মারি পলিইবা।

একটু ভেবে আবার বুদ্ধি খাটাল, আচ্ছা, ছিঁড়া লাল গামছাটা বাইরে পল খড়ের গাদার উপ্‌রে মিলি দিলে কিধ্‌রা হয়?

কেনি ক'ত?

পদ্ম বলে, মাঠ দিকি যখন শয়ে শয়ে লোক চলব তখন ভাবব, এ ঘরে লোক অছি, নাহিলে কাপড় বাইরে শুকায় কি করিকি।

বুড়া দাস পদ্মকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুই যেদি ব্যাটাছেলে হিতু না পদ্ম তাহিলে কাছারীর কুন উকীল তোর বুদ্ধির সঙ্গে আঁটি উঠতে পারতানি।

সারাদিন মানুষের মিছিল চলেছে। পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, কোন দিকে বাদ নেই। রসলপুর নদীর ওপার থেকে খেয়া পেরিয়ে আসছে লোক। খেয়া মাঝির খেপ দেবার বিরাম নেই। ছেলে বুড়ো যুবক যেন সাগরে সংক্রান্তির মেলা দেখতে চলেছে।

এদিকে রামনগরের দিক থেকে দীঘা রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে মিছিল। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে শাসমল সাহেবের জয়ধ্বনি। মাঠ ঘাট ভেঙে লোক চলেছে কাতারে কাতারে।

একদল মেয়ে পুরুষ এগিয়ে আসছে পদ্মমণিদের বাড়ির দিকে। এই সুযোগ। পদ্মমণি খিড়কীর দিক দিয়ে আগের পরিকল্পনা মত এগিয়ে এসে যোগ দিল ওই মিছিলের সঙ্গে। মেয়েদের মুখে ঘোমটা। পদ্মমণিও ঘোমটার ফাঁকে পথ দেখে এগিয়ে চলেছে।

দারুয়ার ময়দানের সীমানায় ঢুকে পড়েছে ওরা। বিভিন্ন দিক থেকে বালুপথ ভেঙে ভেঙে লোক আসছে। এ অঞ্চলটা বালু দিয়ে তৈরি। সমুদ্র এখান থেকে সরে যাবার সময় সোনালী বালুর পাহাড়

BanglaBook.org

তুলে দিয়ে গেছে। বালুয়াড়ির ওপর বাঁশের জংগল, বুনো জামের ঘন সন্নিবেশ। সবচেয়ে যে গাছটি মুল্যবান, সেটি হল কাজুবাদামের। বিভিন্ন জায়গায় মালিকেরা কাজুবাদামের বাগান করে রেখেছে।

দারুয়ার ময়দান বা প্রান্তরেও বালু ছড়ান, তবে তা পায়ের গোছ ডুবে যাবার মত নয়। ওই ময়দান উত্তর দক্ষিণে সামান্য কম হলেও পুব পশ্চিমে বহু বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে। সারা প্রান্তরের স্থানে স্থানে প্রাচীন বট অশ্বত্থের গাছ ডালপালা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। এই বালু অঞ্চলে শীত যেমন প্রবল, গরমও ঠিক তেমনি। শীতের সকালে বালুরাশি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বালুর খাদে যে জল সঞ্চয় থাকে তাতে হাত পা ডোবালে মনে হয় যেন কোন জলের জীব কেটে নিয়ে পালাল। যারা বালুয়াড়ির ওপর ছোট ছোট ঘর বেঁধে থাকে তারা শীতকালে শীতের দাপট থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রায় সারারাত পাতাপত্র পুড়িয়ে ধুনি জ্বালায়।

আবার গরমের দিনে বেলা যত বাড়তে থাকে বালু তত তেঁতে ওঠে। শেষে এত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, পা রাখলেই ফোস্কা পড়ে যায়।

এই অবস্থায় পথচারীদের রক্ষা করে একমাত্র এই বনস্পতিগুলি। স্নিগ্ধ ছায়ায় গা জুড়িয়ে দেয়। পাতাগুলো যেন শত শত পাখা নেড়ে হাওয়া করতে থাকে।

আজ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়েছে এই দারুয়ার ময়দানে। ভলানটিয়াররা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা প্রাণপণ চেষ্টায় এই উত্তাল জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। বসে পড়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। সবাই এগিয়ে বসতে চায়। ময়দানের মাঝে একটি গাছের তলায় মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেইদিকে এগিয়ে যেতে চাইছে সবাই, ঠ্যালাঠেলি হচ্ছে খানিকটা। কংগ্রেস নেতারা হাত তুলে কখনও বা হাত জোড় করে জনতাকে বসে পড়তে বলছেন। বসছে লোক। তাদের ওপর আবার কতক লোক পেছনের ঠ্যালায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

পদ্মমণি বসে পড়েছে। সে চেয়ে আছে ওই মঞ্চের দিকে। মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন নেতা। তাঁরা অপেক্ষা করছেন শাসমল সাহেবের আগমনের।

চারদিকে শাঁখ বেজে উঠল। নেতা আসছেন। মেদিনীপুরের প্রিয়নেতা বীরেন্দ্রনাথ জনতার ভালবাসা, শ্রদ্ধা গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অভ্যর্থনাকারীরা। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তিনি যে পথ দিয়ে এগিয়ে আসছেন, সেখানকার জনতা তাঁর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আবার সেই উৎসাহী জনতাকে বসিয়ে দিচ্ছে ভলানটিয়াররা।

উঁচু মঞ্চের ওপর করজোড়ে দাঁড়ালেন বীরেন্দ্রনাথ। আকাশের বুকে একখণ্ড প্রথম শরতের মেঘ জুঁইফুলের বৃষ্টি ঝরাল। আশ্চর্য প্রশান্তি সেই কয়েকবিন্দু বারিধারায়। যেন বিধাতার আশীর্বাদ ঝরে পড়ল শুভ্র কুসুমের রূপ নিয়ে এই বিশাল সভাস্থলীতে।

কৃষ্ণকায় বীর্যবান দেহের অধিকারী বীরেন্দ্রনাথ। চোখে মুখে আশ্চর্য এক মমতার ছাপ। মানুষকে ভাল না বাসলে দেশকে ভালবাসা যায় না। তাঁর চোখে মুখে বর্ণে সেই দেশবাসীকে ভালবাসার মাধুর্যটি ছড়ান।

নেতা করজোড়ে দাঁড়িয়ে। জনতা মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ছে।

একসময় বীরেন্দ্রনাথ উপবেশন করলেন। বক্তারা বক্তৃতা শুরু করলেন। সভাপতির আসনে বসে বীরেন্দ্রনাথের সতীর্থ মণীন্দ্রনাথ। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা। বীরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বন্ধুর সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন জনতার দিকে। লক্ষ লক্ষ উৎসুক চোখের দৃষ্টি তাঁরই দিকে নিবদ্ধ।

বীরেন্দ্রনাথ একসময় উঠে দাঁড়ালেন। অমনি আবার আকাশ কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি।

বীরেন্দ্রনাথ শুরু করলেন তাঁর আবেগময়ী ভাষণ। কথা নয় যেন মেঘের মন্দ্রধ্বনি। আকাশের বুকে যে মেঘ কোমল লাবণ্যেভরা—তারই বুকে জ্বলে উঠে বিদ্যুৎ। শোনা যায় বজ্রের গর্জন। বীরেন্দ্রনাথ ঠিক যেন আকাশের সেই কোমলতা মাখানো বজ্র বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘ।

BanglaBook.org

তিনি বুঝিয়ে বললেন, অসহযোগ আন্দোলনের কথা। চরকা কেটে ঘরে ঘরে সুতো তৈরি করে স্বাবলম্বী হতে বললেন।

আদালতে না গিয়ে সমস্ত বিবাদ সালিশির মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, অস্পৃশ্যতা পাপ। যতদিন আমরা এই অস্পৃশ্যতার পাপ জাতির দেহ থেকে মুছে ফেলতে না পারব ততদিন আমাদের পর-দাসত্ব থেকে মুক্তি নেই।

এরপর বীরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বজ্র গম্ভীর নাদে বেজে উঠল। তিনি দীর্ঘ ভাষণে আগুন ছড়িয়ে দিলেন জনতার মধ্যে।

তাঁরই মঞ্চের খানিক দূরে সরকারি উচ্চ পদস্থ অফিসাররা নোট নিচ্ছিলেন। তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল সেপাই আর লাল পাগড়ী দফাদারের দল।

বীরেন্দ্রনাথ তাঁদের কাছেও দেশ মাতৃকার আহ্বান জানালেন। অমনি করতালি ধ্বনিতে সভাস্থল মুখর হয়ে উঠল।

সভা ভাঙল সন্ধ্যায়। উত্তাল জনতা। আকাশে চন্দ্রোদয় হচ্ছে। জয়ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে চলেছে জনস্রোত। একটি বিশাল জলাশয় থেকে এবার বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে জলধারা।

পদ্ম চলেছে। সে এখন মোহাচ্ছন্ন। সে যেন চলেছে ঢেউ-এর মাথায় ভাসতে ভাসতে। বক্তৃতা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে তার বড় কান্না পাচ্ছিল। সে কি দেশের কাজ করতে পারে না। রামায়ণে সে পড়েছে বানরদের সেতু-বন্ধনের কথা, কাঠবেড়ালির মত ক্ষুদ্র প্রাণীর সাধ্যমত সাহায্যের কথা। সে কি মানুষ হয়ে জন্মেও তাদের চেয়ে ছোট। নাকি, মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে দেশের কাজে তারা অস্পৃশ্য।

কিন্তু শাসমল সাহেব ত মা জননীদেরও দেশের কাজে ডাক দিলেন। বললেন, চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিনী বাসন্তীদেবীর কথা। আরও কত দেশসেবিকা মহিলাকর্মীর নাম করে শ্রদ্ধা জানালেন।

হায়, কোন কুলে জন্ম তার! শেষে কি কীট পতঙ্গের মত জীবন কাটিয়ে তাকে চলে যেতে হবে।

এখন ঘরে ফেরার পালা। দ্রুত পা চালিয়ে লোক ফিরে চলেছে। তারই ভেতর কথা বলছে তারা। আজকের সভার কথা। একটি যুবক ছেলে তার বন্ধুদের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতা দিতে দিতে চলেছে। সে অবিকল বীরেন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলছে। পদ্ম ভাবে, কি করে সবকটি কথা এমন মনে গেঁথে রেখেছে ছেলেটি।

ওরা এগিয়ে গেল। আগের দলের একটি মেয়ে পিছিয়ে পড়েছে। সে একটা ভারী ছেলেকে কোলে নিয়ে দলের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না।

পদ্ম তার কাছে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করে জানতে পারল তার পাশের গ্রামেই ওর বাড়ি। সে ছেলেটাকে কেড়ে নিল নিজের কোলে। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে বলে হয়ত প্রতিবাদ জানাল না।

ভারী ছেলেকে বয়ে নিয়ে যেতে মেয়েটির কষ্ট হচ্ছিল ঠিক কিন্তু আর একজন অপরিচিত মেয়ে তার ছেলেকে বইছে দেখে কেমন সংকোচ হল তার। সে পদ্মমণিকে বলল, আমি অকে লি যাইতে পারবা দিদি। তুমি মিছা কষ্ট করঠ।

পদ্ম বলল, শিশু ত ভাই নারায়ণ। নারায়ণকে বই লি গেলেও পুণ্যি।

মেয়েটি পাশে চলতে চলতে বলল, তুমার টকাছাকা ক'জন দিদি?

ডান হাতখানা নেড়ে পদ্মমণি বুঝিয়ে দিল, একটিও ছেলে নেই তার।

তারপর একটুখানি কি ভেবে নিয়ে বলল, অমন সব সোনার চাঁদ টকায় ত আমার দেশ ভরি আছে গো। আবার টকাছাকার কি দরকার।

একসময় ওরা পদ্মর গাঁয়ের কাছাকাছি এসে পৌছল। মেয়েটি তার ছেলেকে পদ্মের কোল থেকে টেনে নিল নিজের কোলে। অনেক কৃতজ্ঞতা জানাল পদ্মকে।

BanglaBook.org

পদ্মা এখন একা আলপথ ধরে বাড়ির দিকে চলেছে। কি হল তার, খাঁ খাঁ করছে বুকখানা। এতক্ষণ একটা শিশুকে সে জড়িয়ে রেখেছিল বুকে। তার অজ্ঞাতে হৃদয়ের গভীর থেকে বুভুক্ষু মাতৃত্ব জেগে উঠে স্নেহের সুধায় প্লাবিত করে দিচ্ছিল ছেলেটিকে। কিন্তু এখন শিশুটি কাছে নেই তবু সেই জাগ্রত মাতৃত্ব তার সুধা নিয়ে আর হৃদয়ের অন্তরালে ফিরে যেতে পারছে না। একটা শিশুর জন্যে আকুল হয়ে কেঁদে চলেছে।

চার

সন্ধ্যায় খিড়কী দিয়ে ঘরে ঢুকে বাইরের দরজা খুলতেই পদ্ম দেখল একটা লোক দাওয়ার অন্ধকার কোণে আত্মগোপনের চেষ্টা করছে।

পদ্ম সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে হাঁসুয়াখানা বের করে আনল।

একি ব্যাপার, লোকটি এখন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সম্পূর্ণ নির্জন জায়গায় ঘর। চারদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত। এখনও জলে পূর্ণ। ডাক দিলেও কেউ ছুটে আসবে না তাকে রক্ষা করার জন্যে।

পদ্ম ভয় পেল না। হাঁসুয়াখানা তুলে কঠিন গলায় বলল, খাড়া হি রও। গোড় তুলছ কি হাঁসুয়ার চটা লাগিই দিবা।

লোকটি একটুও ভয় না করে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, তোকে আনন্দমঠখানা দিয়ে আমি কোন ভুল করিনি। তুই আজও সেই আনন্দমঠের 'শান্তি' হয়েই রয়েছিস্।

হাঁসুয়ানাখা উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে গেল পদ্ম লোকটির দিকে।

বসন্তদা!

মুখ দিয়ে স্পষ্ট স্বরটা বেরিয়ে এল না। আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল গলা। লুটিয়ে পড়ে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই বসন্তদা পদ্মর মাথায় হাত রেখে বললেন, কেমন অবাক করে দিলাম বলত?

পদ্ম তখনও বসন্তদার মুখের দিকে চেয়ে আছে। একমুখদাড়ি। মুখটা পদ্মর চোখের সামনে হঠাৎ আবছা হয়ে গেল। পদ্মের দুচোখ উপছে ধারা নেমেছে।

বসন্তদা বুঝতে পেরেই পদ্মের মুখখানা দুহাতে তুলে ধরে বললেন, পাগ্‌লী, তুই কাঁদছিস্?

মাথা ঝাঁকি দিয়ে পদ্ম জানাতে চাইল, সে কাঁদেনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আঁচল তুলে চোখ দুটো মুছে নিল।

কই বসতে বললি না?

পদ্ম তার বসন্তদার হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল।

একটা মাদুর পেতে বলল, বুস দাদা।

বসন্তদা মাদুরে বসলে একটু দূরে মাটির মেঝেতে হাত ঠেকিয়ে বসল পদ্মমণি।

কবি আইল বসন্তদা?

তোকে কে বলল আমি এসেছি। তোর বসন্তদা কবে মরে গেছে।

অমন কথা কইলে আমি চগার করিকি কাঁদবা বসন্তদা। লোকজন জড় হি যাবে।

দুজনে ছোট্ট ঘরের অন্ধকার কাঁপিয়ে হেসে উঠল।

পদ্ম বলল, বুড়া মাটার সঙ্গে দেখা করি আসস?

সে কাজ সেরেসুরে তোর কাছে এসেছি।

মাউসী, বোড়ো কাঁদলা, না দাদা?

মা এখন চোখে একেবারে দেখতে পায়না রে।

BanglaBook.org

পদ্ম বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাবার মুখে শুনছি। তুমারু কথা ভাবি ভাবি কি অন্ধ হি গেলা। দেখিকি খুব কাঁদলা, না?

বসন্তদা একটু চুপ করে থেকে বলল, না দেখতে পেয়ে কাঁদল। অনেকক্ষণ আমার দাড়িটা ধরে ঝুঁকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করল। তারপর দেখতে না পেয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

তুমি কি পথর নাকি গা বসন্তদা। মাটার কথা ভুলি রইল।

বসন্তদা হঠাৎ বলল, তোর কাছে আনন্দমঠখানা কি এখনও আছে?

দেখব তুমি? দিনে বইটা আমি একবার হিলে একবার নাড়িচাড়ি কি দেখি।

ঝোরকা পথে ঘরের ভেতর প্রথম শরতের একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল। তারই ভেতর এতক্ষণ দুজনে বসেছিল মুখোমুখি। এখন আলো জ্বেলে শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যা দিল পদ্মমণি। তারপর কুলুঙ্গী থেকে আনন্দমঠখানা পেড়ে নিয়ে এল। সামনে রেখে দিয়ে বলল, বিশ্বাস হিলা ত? দেখ, কত যত্ন করিকি তুমার বইটা রোখছি।

বসন্তদা বলল, খোলত বইটা। প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদটা বের করত।

পদ্মমণি খুঁজে বের করে বলল, এই যে বসন্তদা, বার করছি।

'বন্দে মাতরম্' গানটা যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখান থেকে পড়।

আমি পড়বা?

কেন পড়বিনা। তুই পড়।

পদ্ম ধীরেধীরে পড়তে লাগল জায়গাটা। কতবার পড়া, তবু যেন কিসের একটা রোমাঞ্চ লাগে এই গানটা পড়তে গেলে।

'বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।'

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল, 'মাতা কে?'

'শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।'

মহেন্দ্র বলিল, এ ত দেশ, এ ত মা নয়—।

ভবানন্দ বলিলেন, আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা,—'

বসন্তদা বলল, থাক্ আর পড়তে হবে না। আমি আমার ঘর বাড়ি মা ভাইকে কেন ভুলেছি বুঝতে পারিলি তো?

চুপ করে পদ্ম স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বসন্তদার মুখের দিকে।

এবার হেসে বলল বসন্তদা, কই কিছু খেতে বললি না তো রে, কি আছে দে, খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

ওমা দেখ দিকি, নিজের কথা লিকি মজি আছি। টিকে বুস দাদা। অখন দুটা ভুজা দি। তারপর ঝট্‌কি রাঁধি পেকিইবা।

মুড়ি গুড় আর গাছপাকা কলা এনে ঝকঝকে কাঁসার বাটিতে পরিবেশন করল পদ্ম।

দুধ ঢালি দি বসন্তদা?

দে।

BanglaBook.org

সবকিছু মেখে খেতে খেতে বসন্তদা বলল, কতদিন এসব খাইনি রে। কি স্বাদ যে লাগছে না। আর ভুজা দিবানি বসন্তদা, ওক্‌খুন রান্না হি যিব। তখন আবার খাই পারিবনি।

তুই একটু পাশে বস পদ্ম। ঠিক আগের মত ছটফট করে বেড়াচ্ছিস।

পদ্ম বসল পাশে। খেতে খেতে বসন্তদা বলল, তোর ঘরের মানুষটি কইরে?

শাসমল সাহিবের মিটিং হিথ্‌লা, সউটি যাবার কথা থিলা। আমিও ত যাইথলি গো।

তাই তোর ঘরে এসে আর ঢুকতে পারিনি।

ছামুর তালা দেখিকি পাছে চোর ঢুকে তাউ খিড়কি দিকি বার হিথলি।

আর এসে দেখলি চোর হাজির।

কি যে কও বসন্তদা।

শোন, তোর বরের সঙ্গে আলাপ নেই। সে এসে আবার উট্‌কো লোক দেখে কিছু বলবে না তো?

তুমার পদ্ম সেধ্‌রা লোক লিকি ঘর করেনি। কিন্তু তুমি জানলা কি করি কওতো আমার ঘর?

তোর বাবার সঙ্গে আগে দেখা করেছি। সন্ধ্যার মুখে মেসোমশাইকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের পাট চুকিয়েছি। তারপর মনটা কেমন করল তোর জন্যে। পথে বেরিয়ে পড়ে মেসোমশাইকে জিজ্ঞেস করলাম। উনি বললেন, পথ থেকে দেখা যায় বাড়িটা। সুবদী গাঁয়ে ঢুকে মাঠের ভেতর তালগাছওয়ালা একটামাত্র ঘর।

উনি আদপেই জানেন না যে আমি তোর এখানে একবার ঢুঁ মারব।

পদ্ম বলে, জলকাদো পারিইকি আসতে হিলা ত?

এসেই চারদিকটা ঘুরে ফিরে দেখেছি। তারপর তোদের পুকুরে হাত পা ধুয়ে সামনের দাওয়ায় বসে হাওয়া খাচ্ছিলাম।

পদ্ম জানতে চাইল, তুমি আইজ আসিকি আইজু চালি যিব নাকি?

আমার যে থাকার উপায় নেই পদ্ম। আমাদের নামে থানায় থানায় হুলিয়া আছে। পুলিশের লোক আমাদের খোঁজে চারদিকে হন্যে হয়ে ঘুরে ফিরছে। আজ বীরেনবাবুর মিটিং আছে জেনেই ত এসেছি। এ সময় সবকটা টিকটিকি ওখানে ভীড় করবে। সেই ফাঁকে মায়ের সঙ্গে দেখাটা সেরে পালাব।

পদ্ম বলল, আমার মানুষটা কি কাজ করে তুমি জান বসন্তদা?

জোতজমি আছে। জনমজুর খাটায়।

তাহিলে তুমি খুব জান।

হেসে বলল বসন্তদা, তবে কি করে রে?

রাত ভোর ডাক দিকি ফিরে।

ডাক দিয়ে ফেরে? সে কি রে?

চৌকিদারগো চৌকিদার। গভরমেন্টর কাজ করে।

চুপ করে খানিক সময় কি ভেবে নিয়ে বসন্তদা বলল, আজই এখান থেকে চলে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোর স্বামী চৌকিদার শুনে থেকে যেতে ইচ্ছে করছে।

পদ্ম হেসে বলে, খুব সাহস ত তুমার। ধরা পড়িবার ভয় নেই?

বসন্তদা বলল, ভয় আছে বইকি! তবে পদ্মের হাতে যতক্ষণ নিজেকে সঁপে রেখেছি ততক্ষণ আমি একেবারে নিশ্চিন্ত। রাত ভোর নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারি।

অত বিশ্বাস তুমার পদ্মের উপরে বসন্তদা। তাহিলে শুনি রাখ, তুমার পদ্মর হাতে যতক্ষণ হাঁসুয়া অছি ততক্ষণ কো তুমার গায় হাত দিতে পারিবনি। আমার মানুষ বি সাহস পাবেনি আগুই আসতে।

BanglaBook.org

বসন্তদা বলল, আজ থেকে নতুন একটা নাম দিতে চাই তোর। তুই পদ্ম নয়, পদ্মা।

পদ্মা কি বসন্তদা?

একটা নদীর নাম। ভয়ঙ্কর সে নদী, আবার অসীম করুণা তার। আমরা পদ্মের ভেতর ছেলেবেলা থেকে সেই দুটো রূপই দেখেছি।

আমাকে এ নামে কে ডাকিব?

সব মানুষ একদিন ডাকবে পদ্মা। আগুন কখনো লুকিয়ে থাকে, না বন্যাকে হাত তুললেই রোধ করা যায়? তবে শোন, রান্নাবান্না আর আমার জন্যে করিস না, এমনিতে অনেক খেয়ে ফেলেছি। আমার আজ রাতেই দলের কাছে পৌঁছবার কথা। সারারাত জেগে হাঁটতে হবে। দিনে পুলিশের চোখ এড়াবার জন্যে গা ঢাকা দিতে হয়।

তুমি সত্যি চালি যিব দাদা! আমি যে তুমাকে রাঁধি খুইবা বলিকি দুটা বেশি করিকি ভুজা বি দিলিনি।

দেশ স্বাধীন হলে যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমার পদ্মার হাতের রান্না খাবার জন্যে আমাকে এখানে নিশ্চয়ই ফিরে আসতে হবে।

তুমার মনে লুকিইকি দেশ সেবা কর কেনি দাদা?

আমাদের পথ আলাদা বোন। ভদ্রলোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করা চলে, কিন্তু খুনী জোচ্চরকে বুঝিয়ে কোনদিন কিছু করা যায় না। ওদের শায়েস্তা করতে হয় ওদেরই পদ্ধতিতে। গুলির বিনিময়ে গুলি। ওদের ভেতর সন্ত্রাসের সৃষ্টি করাই আমাদের কাজ। ওদের অনেক অস্ত্র, অনেক সৈন্য। আমরা মুষ্টিমেয়। তাই আত্মগোপন করে আমাদের কার্যসিদ্ধি করতে হয়।

আমি এসব কথা বুঝি পারিনি দাদা। তবে তুমি যখন এ কাজে আছ তখন এ যে ভালা কাজ, এ আমি নিজের বুকে হাত দিকি কইতে পারি।

তুই আমাকে ভালবাসিস বলে পদ্মা একথা বলতে পারলি। শুধু মনে রাখবি যারা এ পথে এসেছে তাদের কাছে সংসারের সুখ বলে কিছু নেই, কেবল আছে দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন।

উঠে দাঁড়াল বসন্তদা। হেসে বলল, তোর কর্তার হাতে ধরা পড়ার আগে পালিয়ে বাঁচি।

পদ্মা তার বসন্তদার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, তুমারমনকের পথ ধরিকি চলার ক্ষমতা আইজ আর আমার নেই বসন্তদা। তবে তুমি তুমার পদ্মাকে আশীর্বাদ করি যাও, সে যন্ তার দেশকে ভালোবাসতে পারে। সে যন্ তুমারমনকের কথা ভাবিকি সবু দুঃখ সইতে পারে।

দাদার আশীর্বাদ নয়, অন্তরের গভীর ভালবাসা তোর জন্যে রেখে দিয়ে গেলাম বোন। তুই চিরদিন জয়ী হবি।

চলে গেল বসন্তদা। চাঁদের পাশে ধোঁয়ার মত একটা মেঘ থমকে আছে। সবুজ ধানের গাছ সমুদ্রের মত দিগন্তের বুক ছুঁয়ে। আলপথ ধরে চলে যাচ্ছে একটা মানুষ। কতক্ষণ পরে উঠল বাঁধের ওপর। পেছন ফিরে একবারও তাকাল না। সামনের পথ ধরে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেল।

পাঁচ

সত্যি!

জানিনি যাও।

পদ্ম, আমার গা ছুঁইকি ক।

তুমার কিরা।

বিছানায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসে বুড়া দাস পদ্মকে এক হেঁচকায় টেনে তুলল। মুখখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলল, কি সুখের খবর আইজ তুই দিলুরে বউ। বুড়া দাসের বংশ রখলু।

BanglaBook.org

আনন্দের ভার সইতে না পেরে বুড়া পদ্মাকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল।

তুমি কি পাগল হি গেল নাকি গো। আগু দেখ পো হয় না ঝি হয়।

আমার সব্বু ভালা। কতদিন ভাবছি, আমার অমন সুন্দোর বউটা বাঁজা হি গেলা। কিন্তু আইজ ভগবান আমারমনকের মুয়া মুখ তুলিকি চাইলা।

পদ্মা বলল, আমার পো হিলে তাকে তুমার মত চৌকিদার করবানি। গভরমেন্টের কাজ সে কোরবেনি কুনদিন।

বুড়া দাসের দিলে আজ তুফান। সে উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে বলল, কথা দিইঠি বউ, তুই তাকে লিকি তোর খুশি মতন গড়ি পিটিকি মানুষ করবু, আমি কুন কথা কইবানি।

দুজনে শুয়ে রইল পাশাপাশি। বুড়া দাস কিন্তু সরারাত নির্বিঘ্নে ঘুমুতে পারল না। মাঝে মাঝে তার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। যতবার তার ঘুম ভাঙে ততবার সে জানালা থেকে গলে পড়া আলোয় ঘুমন্ত পদ্মাকে দেখে। কি আশ্চর্য মুখ পদ্মার। এ মুখ যেন তার সম্পূর্ণ অচেনা। এ যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা অন্য কোন মেয়ে। তার ঘরে এসেছে কৃপা করে। যেন দয়া করে একটি সন্তান তাকে উপহার দিয়ে ফিরে চলে যাবে আবার স্বর্গধামে।

শেষ রাতটুকু সত্যিই ঘুমুতে পারল না বুড়া দাস। যদি ঘুম থেকে জেগে উঠে জানতে পারে ঘটনাটা সত্যি নয়, নিছক স্বপ্ন, তাহলে বুক ফেটে মরে যাবে সে। তাই শেষ রাতটুকু পদ্মার দিকে চেয়ে চরম সত্যটাকে পাহারা দিয়ে বসে রইল বুড়া দাস।

ভোরবেলা উঠে বুড়া নিঃসন্দেহ হবার জন্যে খবরটা আর একবার যাচাই করে নিতে গিয়ে ধমক খেল।

তুমার কি শুনি শুনিকি আশ মিটেঠেনি, নাকি গা?

ধমক খেয়েও বুড়া খুশি। দিনের আলোয় তার যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে।

বুড়া দাস আজ সকালে বাজার করতে চলল। আলপথ দিয়ে যেতে যেতে সে গুন গুন করে গান ধরল। তারপর গলা ছেড়ে গান। সুর নেই গলায়, তাতে কি এসে যায়। মনের খুশিতে এ দুনিয়ায় যে কেউ হাওয়ায় গান ছড়িয়ে দিতে পারে।

বুড়া দাস হাত ঘোরাতে ঘোরাতে দু'চার পা লাফ দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল, বুড়া বাপ হেইছি, বুড়া বাপ হেইছি।

নিজের খুশীতে নিজেই একবার হেসে নিল।

বড় রাস্তায় ওঠার আগে বুড়া একগোছা ধানের শিষ দুহাতের অঞ্জলিতে বুকের কাছে টেনে ধরে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। হাঁ, ধানের বুকে দুধ এসেছে। টিপলে ক্ষীর বেরুচ্ছে।

গোছাটা ছেড়ে দিয়ে বুড়া দাস একটা সুখের ছবি দেখতে লাগল। তার পদ্মর বুকখানা এমনি করে ভরে উঠবে দুধে। স্তনের বোঁটাটা টিপে ধরলে ঝর্‌ঝর্‌ করে ঝরে পড়বে ক্ষীর। সে অমৃত খাবে তাদের ছেলে।

বুড়া দাস বাজারে গিয়ে ভাল ভাল তেলতাপ্‌ড়ি আর রূপাপাটিয়া মাছ কিনল। কলাপাতার ঝোলান ঠোঙায় দোলাতে দোলাতে বাড়ির পথে এগোতে লাগল। একবার ভেবেছিল থানায় যায়। পেহ্লাদ দফাদারটাকে খবরটা দিয়ে আসে। ওই পেহ্লাদই তাকে জ্বালিয়ে মারছে বছর দুয়েক। তুই কিধ্‌রা মরদরে বুড়া, বাপ হিতে পারলুনি। বউটা বাঁজা নাকিরে?

আকারে ইংগিতে পেহ্লাদ দফাদার তার এক শালীর গুণগান করেছে। বুড়া একটুখানি মত করলেই পেহ্লাদ জুড়ে দেয় চারহাত। বুড়া কিন্তু জানে, শালীটা এখন পেহ্লাদের ঘাড়ে চেপে দাড়ি ওপড়াচ্ছে।

খবরটা পেহ্লাদকে তারিয়ে তারিয়ে শোনাবার ভারি ইচ্ছে করছিল বুড়া দাসের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিল সে। কি জানি বাবা, হয়ত তুক্‌ জানে পেহ্লাদ, খবরটা শুনে যদি বান মারে আর পদ্মর গভ্‌ভটা নেমে যায়।

BanglaBook.org

নিজেকে নিজে শাসন করতে করতে পা চালিয়ে দ্রুত ঘরের দিকে আসে বুড়া দাস।

চেনালোক পথ আটকায়, কিগো দাসের পো, অমন সাত সক্কাল বেলা বাজার করতে বারিইছ। কুটুম আসসে নাকি গো?

বুড়ার কেমন যেন মনে হতে লাগল, সব্বাই তার মনের কথাটা জেনে নিতে চায়। সে এত বোকা আরকি, বের করে নিলেই হল।

মুচ্‌কি হেসে বুড়া দাস মাথাটা একবার নেড়ে চলে এল। যা বোঝার বুঝে নাও।

মাতৃত্বের তৃপ্তিতে পূর্ণ প্রাণ পদ্মার। ভোরের রোদের মত একটা লাবণ্য তার দেহ-বর্ণকে আশ্রয় করেছে। সে সুন্দরী, সে দীর্ঘাঙ্গী। তবু তিলে তিলে কোথা থেকে বাড়তি সৌন্দর্য এসে তাকে তিলোত্তমা করে তুলেছে। এ রূপ কারু চোখে পড়লে অসম্ভব হত তার চোখ ফেরান। কেবল নির্জনে নির্বাসিতা কন্যার মত সে লোকালয়ের বাইরে আছে বলে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

পদ্মার চারদিকে এখন পাকা ফসলের মেলা। সোনালী ধানের গাছ আপন সৃষ্টির ভারে নুয়ে পড়েছে। পদ্মার চঞ্চলতা, উচ্ছ্বলতা এখন মন্থর। সেও এখন স্রষ্টার ভূমিকা নিয়েছে।

ধান কাটছে চাষীরা। সেও কৃষকের ঘরের মেয়ে। তাছাড়া পাশের গাঁয়ে বুড়া দাসেরও বিঘে পাঁচেক ধান-জমি আছে। বুড়া দাস কিন্তু চাষ আবাদ করে না। ভাগ-চাষীরা তাদের খামারে বুড়া দাসের ধান তোলে। সেখানেই ভাগ বাঁটোয়ারা, ঝাড়াই মাড়াই হয়ে বস্তা ভরে ধান আসে ঘরে। মরাইতে সে ধান জমা হয়। ঢেঁকিতে ধান ভানা হয়ে প্রয়োজনের চাল মজুত থাকে ঘরের মধ্যে। বাকী ধানটুকু কার্তিকা টানের সময় বেশি দামে বিক্রি করে বুড়া দাস।

পদ্মা সারাদিন ঘরে বসে ছবি দেখে। কাস্তে চলেছে মাঠ জুড়ে। এক একটা ধানের আঁটি শুয়ে আছে ফলভারে। সারি সারি শুয়ে আছে। কেমন যেন একটা আলস্যে মাটির বিছানায় শুয়ে রোদ্দুর পোহাচ্ছে তারা।

আলস্য এসেছে পদ্মারও শরীরে। সংসারের কাজ করতে করতে হঠাৎ ক্লান্তি আসে তার। সে অবেলায় বিছানা নেয়। গড়িয়ে গড়িয়ে আলস্য ভাঙে।

বাছুর হয়েছে গাইটার প্রায় দু-মাস হল। এখন দুধের স্রোত বইছে ঘরে। কিছু দুধ রেখে দিয়ে বাকি দুধটা বেচে আসে বুড়া দাস।

পদ্মা দেখেছে, বাছুরটা বিয়োনোর আগে কি কষ্ট পেয়েছে গাইটা। সমস্ত জীবেরই প্রসব-বেদনা আছে। কিন্তু শুয়ে চারটে পা ছুঁড়ে চোখ উল্টে প্রসব-বেদনার পর যখন লালায় মাখামাখি হয়ে বাচ্চাটা ভূমিষ্ট হল তখন সব যন্ত্রণা ভুলে গাইটা চাটতে লাগল তার বাচ্চার গা। সে কি মমতা! তুই আমার, তুই আমার,—এমনি একটা আবেগে কাঁপছে সমস্ত প্রাণ।

পদ্মা সেদিন আকুল আগ্রহ নিয়ে দেখেছিল এই মাতৃত্বের ছবি। মাতৃত্বের অনুভূতিতে পশু মানুষ একাকার।

চড়ুই আর শালিকের উৎসব পড়ে গেছে। পাকা ধান ছড়িয়ে পড়ে আছে মাঠে মাঠে। ফসল তোলার পরেও ঝরে পড়া শস্যে মাঠের ভাণ্ডারে কিছু উদ্বৃত্ত। এগুলি মানুষের জন্য নয়। এ সঞ্চয় শস্যভুক পাখিদের জন্য। কত মমতা এই মাটি মায়ের। সবার জন্যে তার কি অসীম করুণা।

এ ভাবনাগুলো আজকাল আপনিই আসে পদ্মর মনে। পথে প্রান্তরে, পশুতে পাখিতে, সর্বত্রই এখন পদ্মা দেখে স্নেহময়ী জননীর ছায়া।

শীত পড়েছে। বুড়া দাস ডিউটিতে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। ঘরের চারদিকের ফাঁকফুকরগুলো ঝাঁপ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। শীতে দারুণ কামড়। ফাঁকায় ঘর, তাই উত্তুরে হাওয়ার দাপট। তালগাছের পাতাগুলো থর্ থর্ করে কাঁপে।

BanglaBook.org

কাঁথার ভেতর শুয়ে থাকে পদ্ম। বুড়া দাস এলে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে তুলে দরজা খুলে দেয়। ঘুমচোখে আবার বিছানায় এলিয়ে পড়ে। বুড়া একই কাঁথার ভেতর সিঁধিয়ে আদর করে বউকে। পেটের ওপর হাত বুলিয়ে দেয়। কখনো বা আলতো করে পদ্মর পেটের ওপর কানটা চেপে পড়ে থাকে। যে আসছে সে কতদূরে। তার সাড়া পাবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

পদ্ম ঘুম জড়ান গলায় বলে, কি পাগল, কি পাগল। কারো আর টকা হয়নি গো, খালি তুমারু টকা হউচি। টিকে ঘুমিতে বি দিবনি?

কথা বলতে বলতেই পদ্ম আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

পদ্ম আজকাল স্বপ্ন দেখছে। নানা রকমের স্বপ্ন। ঘুম ভেঙে গেলে মনে থাকে না সেসব এলোমেলো স্বপ্নের কথা। কিন্তু মাঝে একটা স্বপ্ন দেখেছিল, সে-স্বপ্নের কথা ভোলেনি সে। স্বপ্নটা তার ভাবী ছেলেকে নিয়ে।

সদ্য ছেলেটা হাঁটতে শিখেছে। দুরন্ত ছেলে, ধরে রাখা যায় না। ঘরের চারদিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পড়ে গেলে অন্য ছেলেদের মত কেঁদে ভাসায় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একাই আবার উঠে দাঁড়ায়। টলতে টলতে ছোটে। ছুটতে ছুটতে খিল খিল করে হাসে। পদ্ম পেছনে পেছনে তাড়া করে। বলে, ধরত দুষ্টুটাকে, ধরত, ধরত।

হঠাৎ ছুটতে গিয়ে পায়ে ঢেলা লেগে উল্টে পড়ে গেল ছেলেটা; অনেকটা নীচে একেবারে মাঠের দিকে। অমনি পাগলের মত সেদিকে ছুটল পদ্ম। হঠাৎ রাস্তার কিনারায় পৌঁছে সে অবাক হয়ে দেখল নীচে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে চেয়ে হাসছে বসন্তদা। তার বুকে চুপ করে জড়িয়ে পড়ে আছে ছেলেটা।

কি যে খুশি হয়েছে পদ্ম। চেঁচিয়ে নীচে নামতে নামতে বলছে, ভাঙ্গাকে দেখতে আইস্‌স দাদা, অখন ভনকে ভুলি যাইছ।

বসন্তদার মুখে দাড়ি, মাথার চুল আরও বেড়েছে। হাসিটাতে তেমনি যাদু, তেমনি একটা আকর্ষণ।

পদ্ম মিষ্টি ধমকের সুরে বলল, আয় দুষ্টু, আমার কোলে আয়, মামুকে উঠতে দে।

কে শোনে কার কথা। একবার হাসি মুখখানা মাঝে দেখিয়ে আবার জাপ্টে ধরে মামার বুকে মুখ লুকাল।

এ আর তোর কাছে যাবে না পদ্ম।

পদ্ম অমনি বলল, তুমি তুমার কোতরে রোখি দও ত দাদা। ভারী দুষ্টু হিছে।

তুই ওকে ছেড়ে থাকতে পারবি পদ্ম?

তুমার কোতরে ও রইবে, এর চায়া আমার আর ভাগ্য কি কও।

অমনি হেসে বসন্তদা বলল, দেখি তুই কেমন ছেড়ে থাকতে পারিস। একটুও চোখের জল ফেলিস না কিন্তু।

ভেতর থেকে অদম্য একটা শক্তি জেগে উঠল পদ্মর মধ্যে। সে বলল বসন্তদা, তুমার পদ্ম যেকথা মুখে কয়, কাজেও সে তাউ করে।

বসন্তদা কিন্তু আর একটিও কথা বলল না। ছেলেটাকে বুক থেকে নিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে কাঁধে তুলল। তারপর পেছন ফিরে সমানে হাঁটতে লাগল। ছেলেটা বসন্তদার কাঁধে চেপে মায়ের দিকে মুখ বেঁকিয়ে দেখছে আর হাত নেড়ে নেড়ে হাসছে।

রাস্তার ওপর উঠল বসন্তদা। কোন দিকে মুখ না ফিরিয়ে শুধু সামনের রাস্তার দিকে লক্ষ্য রেখে হেঁটে গেল। এক সময় আর দেখা গেল না বসন্তদাকে।

চোখ ফেটে কি জল আসছে পদ্মর? না, সে কাঁদবে না। বুকটা কি ফেটে যাচ্ছে তার? না, বুক চৌচির হয়ে ফেটে গেলেও পদ্ম তার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকবে।

BanglaBook.org

ভেতরের একটা উত্তেজনায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পদ্মর। এমন প্রবল শীতেও মনে হল তার কপালে ঘাম চিক্ চিক্ করছে। স্বপ্নের কথাটা ভেবে সুখ-দুঃখের একটা মিশ্র অনুভূতিতে মনটা ভরে রইল পদ্মর।

দিন পনের পরের ঘটনা, বুড়া দাস গিয়েছিল থানায়। ফিরল সন্ধ্যার মুখে। এসেই বলল, জানুরে পদ্ম, তোর বাপের ঘরের কোতরে একটা লোককে মেদিনীপুরের পুলিশ গুলি করিকি মারি পেকিইছে।

অজানা আশঙ্কায় ধক্ ধক্ করে উঠল পদ্মর বুকখানা।

কে? কে মরছে?

তুই অমন করি উঠ্‌লু কেনি পদ্ম! তাকে তুই চিনি পারিবুনি। সে নাকি অনেককাল ঘর ছাড়িকি চালি যাইথ্‌লা। ম্যাজিস্টর সাহেবকে মারার তরে তলে তলে দল গড়থ্‌লা।

পদ্ম কি জীবিত না মৃত। সে দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রাণহীন মাটির প্রতিমার মত।

তার নাম বসন্ত। পদ্‌বীটা ভুলি যাউছি। তোর বাপের ঘরের গ্রামের নামটা শুন্‌লি। তুই কি নামে চিনি পারিবু?

পদ্ম শুধু মাথা নাড়ল। না, ও নামের কোন মানুষকে সে মৃত বলে স্বীকার করে না। তার বসন্তদা মরেনি, কখনও মরতে পারে না। কেউ তাকে মারতে পারে না।

রাতে বুড়া দাস ডিউটিতে বেরিয়ে গেলে আনন্দমঠখানা বুকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল পদ্ম। তার দুচোখ থেকে অনর্গল অশ্রু বিন্দু ঝরে পড়তে লাগল।

গভীর রাতে পদ্ম উঠে দাঁড়াল। বইখানা মাথায় ঠেকিয়ে কুলুঙ্গীতে রেখে দিল। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে। সে প্রার্থনার ভঙ্গীতে উচ্চারণ করতে লাগল, তুমি যেখানেরও বসন্তদা, তুমার পদ্ম কুনদিন তুমাকে ভুলতে পারিবনি। আজই তুমার নাম করিকি পদ্ম শপথ লিলা, যদ্দিন তার জীবন রইবে তদ্দিন সে দেশের শত্রুকে ক্ষমা করবেনি। তুমি আশীর্বাদ কর, তুমার পদ্মর গভ্‌ভের সন্তান যন্ তুমার মুখ রোখতে পারে।

BanglaBook.org

ছয়

জুনপুটে পৌষ সংক্রান্তিতে বিরাট মেলা বসে। সমুদ্র তীরের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে এই মেলার আয়োজন। স্নান করে পুণ্য লাভের জন্য এ মেলায় ভীড় করে আসে অগণিত নরনারী।

মেলায় দোকানপাট বসে সমুদ্র তীরের বিরাট উঁচু বাঁধের পশ্চিমপ্রান্তের মাঠ জুড়ে। সেখানে ম্যাজিক আর সার্কাসের তাঁবু পড়ে। তেলেভাজা, পান, বিড়ির দোকান বসে। হাজার হাজার গরুর গাড়িতে দূর দূরান্তের লোকেরা মেলা দেখতে আসে। সন্ধ্যারাতে গুরুর গাড়িতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে দূরের যাত্রীরা। সারারাত শত শত গরুর গাড়ি যখন সরকারি রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে তখন সে দৃশ্য দেখলে রোমাঞ্চিত হতে হয়। প্রতিটি গাড়ির নীচে ঝুলতে থাকে এক একটি লণ্ঠন। শত শত গো-শকট যখন রাতের অন্ধকারে সরকারি আঁকা-বাঁকা পথের ওপর দিয়ে সারি বেধে এগোয় তখন মনে হয় বিশাল এক অগ্নিনাগ যেন জনপদকে জনশূন্য করে সমুদ্রে আত্মগোপনের জন্য এগিয়ে আসছে। গরুর গলার সম্মিলিত ঘণ্টাধ্বনি, শত শত লণ্ঠনের সারিবদ্ধ আলো, অন্ধকার চরাচর সব মিলেমিশে আশ্চর্য এক অনুভূতির সঞ্চার করে।

শেষরাতে ওই মাঠের মধ্যে গরুর গাড়িগুলি এসে থামে। যাত্রীরা পৌষের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সমুদ্র-ভেড়ীর ওপর উঠে ওপারে নেমে যায়। আবার একটা সংকীর্ণ বাঁধ ধরে কিছুদূর তারা অগ্রসর হয়। এ বাঁধের দুদিকে লবণাক্ত জলাভূমি। তারপরেই সমুদ্র তীর। এখানেই আসল মেলার উচ্ছ্বাস। অজস্র চালাবাঁধা দোকান পাট মানুষজন।

মেলার বাঁদিকে বহুদূর বিস্তীর্ণ বালুকা স্তূপের নীচে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে লম্বা লম্বা খড়ের ছাউনি। এ অঞ্চলে মানুষের কাছে 'খটি' নামে পরিচিত।

বিশেষ করে শীতকালে অন্ধ্রবাসী নুলিয়ার দল এখানে মাছ ধরার জন্যে জড়ো হয়। সমুদ্র এ সময় শান্ত থাকে, তাই মাছ ধরার ব্যাপারে বিশেষ কোন বিঘ্নের সৃষ্টি হয় না। লোনা মাছ ধরে ওরা চালনা দেয় পার্শ্ববর্তী কাঁথি শহরে। উদ্বৃত্ত মাছ কেটেকুটে দড়িতে গেঁথে ঝুলিয়ে দেয় রোদ্দুরে। এমনি করে ওরা তৈরি করে শুট্‌কী।

মেলার সময় অনেকে খটির দিকে বেড়াতে যায়, কিন্তু শুট্‌কীর প্রবল গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে।

সেখানকার জীবনযাত্রা কিন্তু আশ্চর্য রকমের নিস্তরঙ্গ। পাশেই এতবড় মেলা, সেদিকে ছেলেবুড়ো যুবক যুবতী কোন নুলিয়ারই কোন ঔৎসুক্য নেই। কেবল একটা বিশেষ জায়গায় দু'চারজন নুলিয়া মেয়ে মাছের চুব্‌ড়ি নিয়ে বসে থাকে। দু'একটা প্রায় উলঙ্গ নুলিয়ার ছেলে তালপাতার ঠোঙায় নানা রঙের ঝিনুক নিয়ে যাত্রীদের কাছে বেচার জন্য ঘুরে বেড়ায়।

যাত্রীরা খটির আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে ওদের জীবনযাত্রা দেখার চেষ্টা করে। মেয়েরা ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে শুট্‌কী তৈরির জন্য মাছ কুটছে, কেউ বা উনুন ধরাচ্ছে ফুঁ দিয়ে, কেউ বা বালু ঝেঁটিয়ে চিংড়ির শুট্‌কীগুলো তুলে নিয়ে গোছগাছ করছে। বুড়োরা বসে বসে জাল সারাই করছে, কেউ বা কাক তাড়াচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্য, যাত্রীরা যে তাদের চারদিকে ঘুরে ফিরছে, মেলা থেকে শব্দ ভেসে আসছে, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপই নেই।

ভোরের সূর্য উঠবে সমুদ্রের ওপর, সহস্র সহস্র লোক দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের দিকে মুখ করে। ঢেউএর মাথায় একফালি টকটকে লাল সূর্য উঁকি দিল, অমনি জয়ধ্বনি। তারপর রক্ত গোলকের আকার নিয়ে সূর্য লাফিয়ে উঠল সমুদ্রের ওপরে। যাত্রীরা গঙ্গা মায়ের জয়ধ্বনি দিতে দিতে স্নানের জন্য লাফিয়ে পড়ল সাগরে। সংক্রান্তির স্নানের এই এক পবিত্র মুহূর্ত।

মেলাভূমির দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের তীর বরাবর কয়েকটি চিতা জ্বলছে। এই পুণ্য দিনে যারা দেহরক্ষা করেছে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে এই সমুদ্রতীরে দাহ করার জন্যে। এমন উদার উন্মুক্ত আকাশের তলে প্রসারিত সমুদ্রের তটভূমিতে দেহ বিলিন হয়ে যাবার মধ্যে অনন্তের সঙ্গে সান্নিধ্যের একটা তাৎপর্য আছে বই কি।

প্রতি বছরের মত এবারও মেলায় এসেছে পদ্ম। দেহ ঈষৎ স্থূল হয়েছে, তাছাড়া হাঁটাহাঁটিতে ক্লান্তি বোধ করে, তাই বারণ করেছিল বুড়া দাস। কিন্তু কোন কথাই শোনেনি পদ্ম। আগের দিন সন্ধ্যায় সে বাপের বাড়ি চলে এসেছিল। সেখান থেকে সে রাতে একাই হেঁটে এসেছে।

বুড়া দাসেরও আজ সারা দিনভর মেলায় ডিউটি। দুপুরে যখন যাত্রীর চাপ বাড়বে তখন তাদের মত চৌকিদারদের লম্বা লম্বা লাঠির প্রান্ত ধরে লাইন তৈরি করে মানুষজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পদ্মর সঙ্গে এ সমুদ্রের পরিচয় আবাল্য। সে মেলা থেকে বেশ খানিক দূরে যাত্রী সমাগমের বাইরে শেষ রাত থেকেই বসে আছে করজোড়ে। আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। সমুদ্রের ঢেউগুলি অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে।

পদ্ম অস্ফুটে প্রার্থনা জানাচ্ছে অন্তরালবর্তী অনন্তের কাছে। হে ভগবান, তুমি আমার বসন্তদাকে শান্তি দও। তার কত সাধ থিলা দেশের স্বরাজ আনবে বলিকি। সে সাধ তার মিটলানি। দয়াময় তুমি তার সউ সাধটুকু মিটাও।

হে ভগবান, হে মা গঙ্গা, তুমি আমাকে পথ বলি দও, আমি যন্ দেশের কাজে আমার বসন্তদার মতন প্রাণ দিতে পারি।

BanglaBook.org

আমার যে টকা জন্ম লিবে, সে যন্ আমার বসন্তদার মতন তার দেশকে ভালা বাসতে পারে।

চোখ দিয়ে দরদর ধারায় জল পড়ে বুক ভেসে যেতে লাগল পদ্মর। সে দুটি চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে লাগল।

কতক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখল, জ্যোতির্ময় সূর্যের আবির্ভাব হচ্ছে। পদ্মর চোখে জল, মুখে অপার এক পরিতৃপ্তির প্রসন্ন হাসি।

সে উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রের জল স্পর্শ করল। অঞ্জলি ভরে জল তুলে ছড়িয়ে দিল সর্বাঙ্গে। তারপর যুক্ত করে প্রণাম জানাল দেব দিবাকরকে।

দুপুরে দিকে জনস্রোত উত্তাল হয়ে উঠল। দেখলে মনে হয় সত্যিই জনসমুদ্র। পেছনের প্রবল চাপে টাল রাখতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে কত মানুষ। মেয়ে পুরুষ, বাচ্চা বুড়ো সবাই। মায়ের কোলে ভীড়ের চাপে কেঁদে কঁকিয়ে উঠছে দুধের বাচ্চা। কার ছেলে হারিয়ে গেছে, হাপুস নয়নে কাঁদছে মা। বাঁশি বাজছে, ঘুড়ি উড়ছে, তেলেভাজার কড়া গন্ধ, একদল কীর্তনীয়া প্রবল শব্দেখোল করতাল বাজিয়ে গান করতে করতে চলে গেল।

দুদিকে লম্বা করে লাঠি ধরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চৌকিদারেরা। ভীড়ের স্রোত সামনে সমুদ্রের দিকে বয়ে যাক্ কিন্তু দুধারে যেন উপচে না পড়ে। হোগলায় ছাওয়া সার সার দোকান ঘর তাহলে ভীড়ের চাপে ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে।

বড় দারোগাবাবু যেন স্রোতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছেন। হাতে একটা ব্যাটন, মাথায় শোলার টুপি, পরণে হাফ প্যান্ট। চৌকিদারদের কি যেন বলে বলে চলেছেন। মেলা যাত্রীরা দারোগা দেখলেই ছিট্‌কে পড়ছে এ ওর ঘাড়ে।

সী-ডাইকের ওপর কয়েক মিনিটের জন্যে থামিয়ে দেওয়া হল জনস্রোত। লালকালো পাগড়ীপরা কনেস্টবলে জায়গাটা ছয়লাপ। তারা কড়া শাসনে রুখে দিয়েছে জনতার গতি। তাকিয়ে আছে নীচের বাঁধের দিকে।

উঠে আসছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সপরিবারে। তিনি মেদিনীপুর থেকে এসেছেন সংক্রান্তির পুণ্যস্নান উপলক্ষে। তাঁর পরিবারের ইচ্ছাপূরণ করতে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা ব্যূহ রচনা করে তাঁদের উঁচু বাঁধের ওপর তুলছেন। জনৈক দারোগা একবার উঠে আসছেন বাঁধের ওপর আবার দৌড়ে নামছেন নীচে। ওপরে উঠে এসেই হাতের ছোট লাঠিটা বাতাসে পিটে যেন গরু তাড়াচ্ছেন। উদ্দেশ্য, যে যেখানে আছ হটো, প্রভুপাদ আসছেন।

ভদ্রলোকের একেই মোটা শরীর, তার ওপর তড়বড়ানিতে দারুণ খোলতাই হয়েছে চেহারা। নীচে খানিকটা লাফাতে লাফাতে নেমে গিয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন প্রভুকে একাই আগলে কাঁধে তুলে আনবেন।

দলটি এবার চলল সমুদ্রমুখী অপরিসর পথটি ধরে। দারোগা সাহেব ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে চলেছেন সামনে। এপারের যাত্রীরা মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরকে দেখার জন্যে পথের দুধারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চৌকিদারদের হাঁকডাক নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও যাত্রীরা কোথাও কোথাও ভেঙে ফেলছে বেড়া। তাদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে চৌকিদারেরা।

বুড়া দাস যেধারে ডিউটি দিচ্ছে তার প্রায় উল্টোদিকে যাত্রীদের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে পদ্ম। সে অনেক সময় ধরেই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তার বাপের বাড়ির গাঁয়ের ভাকু মুণ্ডোল দোকান দিয়েছে তেলেভাজার। গরীব মানুষ। পদ্মর বাপের বিঘে দুই জমি ভাগে চষে। মেলায় এসেছে দুটো পয়সা কামাতে। পদ্মকে দোকানের গায়ে একটা ভাঙা মোড়া দিয়েছে বসতে। পদ্ম সেখানে না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জনস্রোত দেখছে। বুড়া দাসের চোখ পদ্মর ওপর পড়লেই দুজনে দারুণ খুশি হয়ে উঠছে।

BanglaBook.org

একসময় বুড়া পদ্মকে ইশারা করে বসতে বলল। পদ্মর শরীর এখন ভাল নেই, তাই বুড়া দাসের উদ্বেগ, ওর বসা দরকার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, কষ্ট হচ্ছে।

পদ্ম কিন্তু পথের এপার থেকে ধরতে পারল না বুড়া দাসের ইশারা। সে ক্রমাগত মুখ নেড়ে, চোখে জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে জানতে চাইল, কি বলছে বুড়া দাস।

বুড়া, লাইন করে ধরে থাকা ডান হাতের লাঠিখানা হঠাৎ মাটিতে ফেলে দিয়ে বসার ভঙ্গি করে জানাল যে, সে পদ্মকে বসতে বলছে।

বুড়া দাস উঠতে যাচ্ছিল, আচমকা তার কাঁধে এসে পড়ল মোক্ষম এক লাঠির বাড়ি। তাকে আর উঠে দাঁড়াতে হল ন। হাতে কাঁধ চেপে সে মাটিতে বসে পড়ল। দারুণ একটা যন্ত্রণায় মুখখানা তার বিকৃত হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় দেখা গেল সেদিকে এগিয়ে আসছে ম্যাজিস্ট্রেটের পুরো দলটা। তখনও বুড়া দাসের উদ্দেশ্যে সেই দারোগা নামক কুমড়োটি লাঠি উঁচিয়ে করে চলেছেন অকথ্য গালিবর্ষণ। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে কাছাকাছি আসতে দেখে হম্বিতম্বি বেড়ে গেল তাঁর, উঠে দাঁড়া শালা, দেখছিস না তোর বাপ আসছে।

হঠাৎ দারোগা দেখলেন, তাঁর হাতে লাঠি নেই। একটি দশাসই মেয়ে তাঁর হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

জীবনে এমন তাজ্জব ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হয়নি দারোগা বাহাদুরকে। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাবার পরেই তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তবেরে মাগী।

মেয়েটা কী দুঃসাহসী। দারোগার লাঠিটাকে দু'হাতে বাগিয়ে ধরে সে শূন্যে তুলে ধরেছে, খবরদার গুলামের বাচ্চা, আর এক পা আগিইবু ত তোর মাথা ফাটিই দিবা।

বুড়া দাস ততক্ষণে কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়িয়েছে, পদ্ম তুই কি পাগল হি গেলু নাকি রে!

তুমি চুম্মার,—হাঁকার দিয়ে উঠল পদ্ম।

দুপাশের জনতা তাদেরই মত সাধারণ বাড়ির একটি মেয়ের এরকম অভাবনীয় আচরণে একেবারে স্তম্ভিত।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পুরো দলটা ঠিক সেই মুহূর্তেই এসে পড়ল তাদের সামনে।

ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর ইংরাজিতেই জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি। তখন দারোগা তাঁকে ইংরাজি করেই বোঝাতে লাগলেন, চৌকিদারটার কর্তব্যকর্মে অবহেলার কথা। হুজুর আসছেন জেনেও তার লাঠি ছেড়ে বসে পড়ার কথা। সামান্য শাসন করেছে কি না করেছে, অমনি রণরঙ্গিনীর আবির্ভাব।

তখনও পদ্মর হাতে ধরা লাঠি, আর দুচোখে আগুন। কে এসে দাঁড়াল কি না দাঁড়াল তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সারা মাথাটা তার যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে আর তার তাপ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বাংগে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেখানে কালক্ষেপ না করে সঙ্গের বড় দারোগাবাবুকে কিছু একটা নির্দেশ দিয়ে এগোলেন। দারোগার নির্দেশে একটি জাঁদরেল চেহারার সেপাই হঠাৎ পেছন থেকে লাঠি সমেত পদ্মর হাতখানা ধরে মুচড়ে দিলে। লাঠিটা পড়ে গেল মাটিতে। পদ্ম প্রাণফাটা একটা চীৎকার করে ঘুরে দাঁড়িয়েই মোক্ষম কামড় বসালে সেপাইটার হাতে। অমনি মেয়েটাকে সায়েস্তা করার জন্যে কয়েক জোড়া লাঠি আকাশে উঠল।

চীৎকার শুনে পেছনে ফিরে তাকিয়েছিলেন মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে বারণ করলেন। স্বামীকে বললেন, আস্ক দেম নট টু হিট হার, সি ইজ ক্যারিয়িং।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নির্দেশে তখনকার মত ব্যাপারটা থেমে গেল। আবার জনস্রোত আবার মেলা। বুড়া দাস কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে। সে কাঁধের ব্যথা ভুলে টান টান করে লাঠি ধরে জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ করছে।

BanglaBook.org

মেলা কখন ভেঙে গেছে। পদ্ম হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চলেছে নিজের ঘরে। ভাকু মুণ্ডোলের মুখে বাপের বাড়িতে তার ঘরে ফেরার খবরটা পাঠিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার নেমেছে। কত লোক ধরেছে মাঠের পথ। সরকারি বাঁধের ওপর দিয়েও মেলা ফিরতি মানুষের মিছিল। শীত জাকিয়ে পড়েছে। গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে পা চালিয়ে চলেছে মানুষজন। পদ্মকে পেছনের দলগুলো অতিক্রম করে যাচ্ছে। এক একটা ছায়া যেন। কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারছে না কারো মুখ। ওরা জোরে জোরে কথা বলতে বলতে চলেছে।

পদ্ম ধীরে ধীরে চলেছে। পরিচিত পথ, তবু অন্ধকারে পা পিছলে গেলে আঘাত পেতে পারে। তখন গর্ভের সন্তানকে নিয়ে বিপদের সম্ভাবনা।

পদ্ম এই অন্ধকার পথে যাত্রীদের মুকে কতবার শুনেছে তার কাহিনি। সকলে তাজ্জব বনে গেছে তার সাহস দেখে। পদ্ম মনে মনে ভাবে, এতে সাহসের কি আছে। একটা মানুষকে অসহায় পেয়ে তার ওপরওয়ালা ঠ্যাঙাবে, এ কেমন কথা। সে তার স্বামী বুড়া দাস না হয়ে আর যে কেউ হতে পারত। সে ওই অপরিচিত মানুষটার জন্যেও ঠিকই প্রতিবাদ জানাত।

পদ্ম সারাদিনের পরিশ্রম আর উত্তেজনায় কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বুড়া দাস তাকে বারণ করেছিল যেতে কিন্তু সে শোনেনি কারু কথা। সংক্রান্তির পুণ্য দিনে সাগরের জল ছুঁয়ে সে তার বসন্তদার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করবে, এই ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করার জন্যেই সে কোন বারণ না শুনেই গিয়েছিল।

ক্লান্ত পদ্ম ঘর খোলা রেখেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। শেষ রাতে ঘুম ভাঙতেই দেখে পাশে তার শুয়ে আছে বুড়া দাস।

ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল পদ্ম। কখন কি করে ঘরে ঢুকল মানুষটা! সে জানতেই পারেনি। দরজা নিশ্চয়ই খোলা ছিল। সারা রাত প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় কেটেছে তার। খিদে তেষ্টা পায়নি। একটা মানুষ যে সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে খেতে চাইবে, সেকথা বেমালুম ভুলে গেছে সে।

বুড়া দাস জেগে কি ঘুমিয়ে বোঝা যাচ্ছে না। তারা দুজনে একখানা বড় কাঁথা গায়ে দিয়েই শোয়। কিন্তু সারারাত পদ্মর গায়েই কাঁথাটা ছিল, বুড়া দাস একবারও টেনে নেয়নি। পদ্ম দেখল, বুড়া তার চাদরখানা গায়ে দিয়ে কুন্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে।

ভীষণ একটা দুঃখ আর ক্ষোভে মনটা পুড়ে গেল তার। সে ক্লান্ত স্বামীকে সারারাত উপোসে ফেলে রেখেছে। ঠাণ্ডায় তার গায়ে কাঁথাটাও চাপিয়ে দিতে পারেনি।

হাঁগা, শুনছ?—পদ্মা হাত দিয়ে ঠেলা দিল।

বুড়া দাস নড়ল না। মটকা মেরে পড়ে রইল। পদ্ম এবার কাঁথাটা বুড়া দাসের গায়ে চাপিয়ে দিতেই গায়ের থেকে সবেগে সেটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বুড়া দাস।

পদ্ম বুড়ার কাছে মুখখানা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, ঘাট হিছে আমার। ক্ষমা করি দও। দুব্‌লা হিকি ঘুমিই পড়্‌থিলি, তাউ কুন সাড়া পাইনি।

উঠে বসল বুড়া দাস, তুই দুব্‌লা। তুই ত মরদের মরদ রে। হাজার লোকের ছামুর লাঠি ধরতে পারু। কে কইবে তুই মায়া রে, মরদ মনে তোর কোতরে হার মানি যিব।

পদ্ম বুঝল, যে কারণেই হোক বুড়া দাস তার ওপর ক্ষেপে আছে। সে শুধু বলল, ভগবানের ভুল হি যায়, আমি ত কুন ছার। দরজাটা খুলি রোখিকি ঘুমিই পড়্‌থিলি তাউ অত রাগ হিছে তুমার। আমি কি তুমার তরে কিচ্ছো করিনি? অতকাল তুমি কি আমার কুন সেবা পাওনি?

বুড়া দাস বলল, অনেক সেবাযত্ন করছু। তোর সেবার ঠেলায় থানায় যাই কিরি তিনশ বার কান ধরিকি উঠ্‌বুস্ করতে হিলা। নাক ঘস্‌টিতে হিলা।

পদ্মর মনে আবার সেই আগুনটা জ্বলে উঠল, ছাড়ি দও চাক্‌রী, অমন চাকরীর মুয়ে ধাড়ু।

BanglaBook.org

বুড়া দাস গর্জে ওঠে, তুই খুইবু?

পদ্ম অমনি বলে, দরকার হিলে ঝিগিরি করিকি খুইবা। তুমি মরদ, মাটি চষব; দরকার হিলে আমি রুইবা। গভরমেন্টের চাকরী ছাড়ি দও।

গজ গজ করে বুড়ো দাস, মায়া (মেয়ে) বুদ্ধি নাহিলে অমন কথা কয়।

পদ্ম বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। গরুটা হামলাচ্ছে। সারারাত বাছুরটা কাছে নেই। পানা কটকট করছে দুধের ভারে। এখুনি দুধটা দুইয়ে নিয়ে বাছুরটাকে তার মার কাছে দিয়ে দিতে হবে।

পদ্ম বাইরে যাবার সময় বলে গেল, যা হবার হিছে, তুমার গোড়তল (পায়ে) পড়ি সব ভুলি যাও। মুখ হাত ধুইকি আইস, আমি দুধ আর মুড়ি আনি রোখিটি।

বুড়া হাঁকে, পখাল (পান্তাভাত) নেই?

নাগো, আমি কাল রাতে রাঁধি পারিনি। কি যে কাল ঘুমে পাইলা, কবাট বন্ধ করতে বি ভুলি গেলি।

পরিস্থিতি এখন শান্ত হয়েছে। বুড়া গাছের মর্তমান রম্ভা, মুড়ি আর দুধ মেখে ভোরের ফলার সারছে। পদ্মা পাশে বসে ধামা থেকে দরকার মত মুড়ি তুলে তুলে দিচ্ছে।

বুড়া দাস খাবার ফাঁকে ফাঁকে তার নির্যাতনের কাহিনি শুনিয়ে যাচ্ছিল। পদ্মা যে রক্ষা পেয়েছে সে নাকি ম্যাজিস্টর সাহিবের বউ-এর দৌলতে। পদ্ম গভ্ভবতী বলে তেনার মনে দয়া এসেছিল, তাই বারণ করেছিলেন তিনি সেপাইদের।

মেলা থেকে ডিউটি দিয়ে থানায় ফিরে বড়বাবুর কোপে পড়তে হল বুড়া দাসকে। কোন কথা নেই, বার্তা নেই, কেবল তিনশবার কান ধরে ওঠাবসার অর্ডার হয়ে গেল।

সেটা শেষ করতে গাঁটে গাঁটে ব্যথা ধরে গেল। অমনি অর্ডার হল, নাকে খৎ দেবার সারা হল ঘরটায় নাক ঘষতে হল তিন তিনবার। এখনও জ্বলছে জায়গাটা। ছাল উঠে লাল হয়ে গেছে।

ছাড়া পেয়ে চলে আসছিল। থানার কম্পাউন্ড পেরিয়ে রাস্তায় পড়েছে, এমন সময় ঝাঁকড়া বটগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন গোপী দারোগা।

ছোটবাবু, সত্যি দেবতা। কত মিষ্টি কথা বলে প্রবোধ দিলেন বুড়া দাসকে। শেষে জানতে চাইলেন মেয়েটা কে? বুড়া যখন বলল, পদ্মমণি তার বউ, তখন নাকি গোপী দারোগা তার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে উঠলেন। মুখে বললেন, আন্দাজ করেছিলাম বুড়া। আহা যেমন তেজী তেমনি সুন্দরী। তুই একটা জাম্বুবান হয়েও কত ভাগ্যবান। রোজ বউ-এর পা-ধোয়া জল খাবি, বুঝলি?

পদ্মা কথার মাঝে বলে উঠল, এ আবার কি কথার ছিরি গো। যত কও, তুমার গোপী দার্‌গা লোক ভালা না।

কেনি ক? লোকটা খারাপ হিলা কি সে?

পদ্ম বলে, তুমার ঘটে কি টিকে বুদ্ধি নেই গ। সারাদিন মেলায় ঘুরিকি লোকটা ঘর গেলানি। তুমার সাঙে (সঙ্গে) কথা কইবে বলিকি বটগাছের আড়ে খাড়া হি রইলা। তুমার বউটা সুন্দরী, তুমি একটা জাম্বুবান, একথা কইলা। এরপরও যেদি লোকটাকে সাধু কও তাহিলে দেশে ঠক্ ডাকাত বলিকি আর কো রইবেনি।

বুড়া দাস বলে, কি জানি বউ, সবুতে তোর সন্দেহ। তোর চোখটাই বাঁকা।

পদ্মা তার স্বামীর কাছে সরে গিয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, সত্যি বল না গো, আমার চোখটাকি বাঁকা?

পদ্মর ভঙ্গী দেখে হাতের মুঠো বাগিয়ে মারার অভিনয় করল বুড়া দাস।

মার না মার। সত্যি করিকি কও, তুমি আমার গায়ে হাত তুলতে পারব?

বুড়া বলল, আমার কি আর শক্তি আছে রে পদ্ম। তুই আমাকে ভালবাসা দিকি মারি রোখছু।

BanglaBook.org

একদিন পদ্মার অনুমানকে সত্যে পরিণত করে গোপী দারোগা এল বুড়া দাসের বাড়ি। থানার কাজে তড়িঘড়ি বুড়াকে সেপাইদের সঙ্গে পাঠান হয়েছিল মেদিনীপুর। হয়ত এর ভেতর কাজ করছিল গোপী দারোগার প্ল্যান। এত দূরের যাত্রা, দু'দুটো রাত ফেরার কোন প্রশ্নই নেই। তাই গুটি গুটি রাতের অন্ধকারে গোপী দারোগা এসে উঠল বুড়া দাসের উঠোনে। হাঁক ছেড়ে বলল, এটা কি বুড়া দাসের বাড়ি?

ভারিক্কী গলার হাঁক শুনে ঘোমটা মাথায় টেমি হাতে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল পদ্ম।

চুপচাপ পদ্মকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গোপী দারোগা আবার বলল, এটা কি বুড়া দাসের বাড়ি।

পদ্ম ঘোমটা সমেত মাথা নেড়ে জানাল তাঁর অনুমান সত্য।

গোপী বলল, থানা থেকে আসছি।

কথাটা শুনে আর লোকটির ভদ্র ভদ্র চেহারা দেখে পদ্ম টেমিটা দাওয়ায় বসিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকল মাদুর আনতে।

লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে পদ্ম। অনেক আগে শাসমল সাহেবের দারুয়া ময়দানের সভায় কি? ঠিক সেই মুখ চোখ, খালি সাজ বদল হয়ে গেছে। দারোগাবাবুদের পোশাক ছেড়ে পরে এসেছে জমিদারবাবুদের পোশাক।

একটা মাদুর এনে দাওয়ায় পেতে দিল পদ্ম।

গোপী দারোগা উঠে এসে মাদুরের ওপর জমিয়ে বসল।

আমি থানা থেকে আসছি। তোমার স্বামীর নাম কি বুড়া দাস?

পদ্ম বলল, আজ্ঞা হঁ।

হঠাৎ তার মনে কেমন যেন একটা ভয় এল। থানা থেকে লোক এসেছে, তার স্বামীর খোঁজ করছে, ব্যাপারটা কি?

দারোগা ঘুঘু লোক। পদ্মার দুর্ভাবনার কথাটা আঁচ করে সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বরে অভয় এনে বলল, না না, ভাবনার কিছু নেই, একটা খবর দিতে এলাম।

সামান্য সময় থামল গোপী দারোগা। বলল, বুড়া জরুরী কাজে একটা দলের সঙ্গে গেছে মেদিনীপুর। ফিরতে দু'একদিন দেরী হবে, তাই খবরটা দিতে এলাম। একজন চৌকিদারের মুখে খবরটা পাঠালেই হত, কিন্তু তুমি পাছে চিন্তায় পড়, তাই নিজেই এলাম।

পদ্ম এবার ভদ্রতা রক্ষার জন্য বলল, আপনি কি তামুক খান?

দাঁত বের করে বলল গোপী দারোগা, তোমার ভদ্রতায় খুব খুশি হলাম। কিন্তু আমি তামাক খাই না, আমার সিগারেট আছে। একটু আগুন দিতে পার। একটা পাটকাঠি হলে চলবে। ল্যাম্প থেকে ধরিয়ে নেব।

ঘরের ভেতর থেকে একটা দেশলাই বের করে এনে এগিয়ে ধরল পদ্ম। গোপী দারোগা তড়িঘড়ি করে সেটা নিতে গিয়ে পদ্মর আঙুলগুলো ছুঁয়ে দিল। অস্বস্তি লাগল পদ্মর, কিন্তু এর ভেতর কোন উদ্দেশ্য আছে, তা সে ভাবতে পারল না।

গোপী দারোগা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে বলল, এমন ফাঁকা জায়গায় তুমি একা একা বুড়া না থাকলে থাক কি করে? ভয় করে না?

পদ্ম মাথা নেড়ে জানাল, তার ভয় করে না।

তুমি ত খুব সাহসী! এই ফাঁকায় একজন সাহসী পুরুষেরও একা থাকতে বুক গুর্‌গুর্ করবে।

এবার পদ্মর কিছু বলা দরকার। সে ধীর গলায় বলল, উনি রাতের বেলা ডাক দিকি ফিরে, তাউ একলা রইতে হয়, অভ্যাস হি যাউছি।

BanglaBook.org

গোপীনাথ দারোগা রসিকতা করে বলে, চৌকিদারের ঘর, তাই চোর ডাকাত আসতে ভয় পায়। তবে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বলে একটা কথা আছে। তাই সাবধান করে দিতে এলাম।

আপন রসিকতায় আপনি হেসে উঠল গোপী দারোগা। তারপর যেন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে চুপি চুপি বলল, কিন্তু সাহসী মেয়ে সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে। দারুয়া, মহিষামুড়া গ্রামে মুসলমান ডাকাতরা দল বেঁধে লুঠতরাজ শুরু করেছে।

পদ্ম বলল, ডাকাত মনকে ধরিকি সাজা দিতে পারননি?

গোপী দারোগা বলল, দুটোকে কালাপানি পাঠান হয়েছে। একটা মরেছে নিজেদের ভেতর বিবাদ করে কুড়ুলের ঘা খেয়ে।

পদ্ম বলল, আরও ত কত আছি।

হেসে উঠল গোপীনাথ, একদিনে সব চোর ছ্যাচোড়কে ধরে ফেললে আমাদের ত কাজ ফুরিয়ে যাবে, তখন বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেবে কে? চাকরি বজায় রাখতে হলে চোরদেরও বজায় রাখতে হবে।

পদ্ম হেসে ফেলল, ভারী মজার কথা কন ত আপনি।

গোপীনাথ বললে, তোমাকে একটু সাবধানে কাটাতে হবে দু'তিনটে দিন। চোরেরা সব খোঁজ খবর রাখে, কে কখন কোথায় গেল।

আপনি যখন খবরটা দিলন তখন আমি সাবধানে রইবা।

গোপী দারোগা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ভয় নেই গো, ভয় নেই। গোপী দারোগার কুঁয়োতে বাঘে আর গরুতে চুক্ চুক্ চোঁ চোঁ করে জল টানে। আমি যখন ভার নিয়েছি তোমার তখন তুমি থাকবে পুরোপুরি নিশ্চিন্তে।

পদ্ম গোপী দারোগার নামটা শুনে একটু চমকে উঠল। তাহলে এই লোকটাই গোপী দারোগা! একটু কেমন যেন গায়ে পড়া মনে হল।

পদ্ম বলল, আপনি অত ভাবননি, চোরকে পদ্ম শায়েস্তা করতে জানে।

গোপীনাথ বলল, আমি জানি সে ক্ষমতা তোমার আছে। মেলায় যে খেলা দেখালে সে খেলার কথা শুনে সকলে তাজ্জব বনে গেছে। বড়বাবুর এইখানটা (নিজের মাথার তালুটা দেখিয়ে দিলে গোপীনাথ) মোটা, তাই বেমক্কা শাস্তি দিয়ে বসল বুড়াকে। আমার যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে তোমার সাহসের কথা ভেবে বুড়াকে আমি পুরস্কার দিতাম।

লোকটা ঠিক ঠিক কি ধাতুতে গড়া তা বুঝতে পারছিল না পদ্ম। স্বামীর কথা মনে পড়ল, সে ত লোকটাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। পদ্ম ভাবল, তাহলে কি তারই ভুল। লোকটা হয়ত সত্যিই সৎ। পদ্ম এবার বলল, গরীবের ঘরে ত আপনাকে দিবার মত কিচ্ছো নেই, আপনি যদি দয়া করিকি কিছু খান।

গোপী দারোগা হৈ হৈ করে উঠল, তোমার বলাতেই আমার খাওয়া হয়ে গেল পদ্ম। আচ্ছা, আচ্ছা আজ থাক। কাল রাতে কাজ সেরে এ পথে ফেরার সময় তোমার হাতের রান্না খেয়ে যাব।

পদ্ম বলল, সে ত আমার সৌভাগ্য।

পরের দিন পদ্ম নিজের পুকুরে বঁড়শী ফেলে মাছ ধরল। তরিতরকারীর ভাবনা নেই তার। নিজের বাড়ির জমিতে নিজেই ফলায়। গরু বাছুর ঘরে মজুত। দুধ অঢেল। সারাদিন বসে বসে খাবার তৈরি করল সে।

সন্ধ্যা থেকে গোপীনাথ দারোগার পথ চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল পদ্ম। রান্না তার কখন শেষ।

গোপীনাথ এল অনেক রাতে। তখন সদয় দরজা বন্ধ করে তার ওপর পিঠ চেপে বসে ঝিমোচ্ছে পদ্ম।

BanglaBook.org

গোপীনাথ দরজায় টোকা দিতেই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুম চোখে দরজা খুলে দিল পদ্ম।

বড্ড দেরী হয়ে গেল। ভাবছিলাম, এত রাতে আসব কি আসব না। তারপর মনে হল এত কষ্ট করে পদ্ম আমার জন্যে রেঁধে রাখাবে আর আমি যাব না। খুব কষ্ট হল ত?

না না কষ্ট কি আপনি বসুন, আমি পাত পাতিকি ডাকবা।

গোপীনাথ দারোগা বলল, আজ রাতে নাইবা খেলাম, খাওয়া ত রোজ হয়। তার চেয়ে ফালতু সময় নষ্ট না করে তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করলে কাজ দেবে।

পদ্ম কোন কথা না বলে ঘরের ভেতর খাবার আয়োজন করতে চলে গেল।

আসন পেতে ভাতের থালা বসিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল, গোপী দারোগা তার সামনে দাঁড়িয়ে। টেমির আলোতে পদ্মার চোখে পড়ল, গোপী দারোগা একটা বুভুক্ষু মানুষের চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে আছে। কোন কথা বলছে না।

পদ্ম মনে মনে সাহস এনে বলল, বসুন খাইতে।

গোপী দারোগা বলল, তুমি আমার কথার জবাব দিলে না ত পদ্ম?

কি কথা?

যেটা আমি তোমার চলে আসার সময় বললাম।

মনে নেই, রাত হিলা, আপনি খাইতে বসুন।

বললাম যে, খাবার চেয়ে আমার গল্পে সুখ।

আপনি কৃপা করিকি খান আগুর। আমি আপনার কোতরে বুসিকি কথা কইবা।

গোপী দারোগা পদ্মর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, আমরা দুজনে এক পাতে গল্প করতে করতে খেতে পারি না পদ্ম?

পদ্ম ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েই বলল, অপনি বসুন আজ্ঞা, আমি আসন লি আসিঠি।

গদগদ গোপীনাথ আসনে বসে পড়ল। উত্তেজনায় কাঁপছে তার সারা শরীর। সে তাকিয়ে আছে পদ্মর আসা-পথের দিকে।

পদ্ম এল। হাতে তার সেই হাঁসুয়া। ফলাটা ঝক্‌ঝক্ করছে।

বিপদ বুঝে উঠতে যাচ্ছিল গোপীনাথ, কিন্তু রাজ পড়ার মত চড়াৎ করে একটা গলা বেজে উঠল, উঠকি পার পাইব ভাবছ? এ হাঁসুয়ার কোপে গলাটা রোখি যাইতে হব। বাঁচিবার সাধ থাকে ত ভালয় ভালয় খাইকি পলাও।

গোপী দারোগা কাতর, আমার ঘাট হয়েছে পদ্ম, আমাকে ছেড়ে দাও। বিশ্বাস কর, আমি তোমার সাহস কতখানি তাই পরীক্ষা করতে এসেছিলাম।

পদ্ম হাতের হাঁসুয়া তুলে বলে, আবার মিছা কথা। পদ্মকে অখনো চিনতে তুমার অনেক বাকী। আগু খাও, তারপরে সুট্‌সুট্ কি চালি যাও।

এরকম ফাঁপরে গোপী দারোগা কোনদিন পড়েনি। তেতো খাবার মত গ্রাস গ্রাস গিলতে লাগল ভাতকটা। একবারও চোখ তুলে তাকাতে পারল না পদ্মর দিকে।

খাওয়া কোন রকমে শেষ করে উঠে দাঁড়াল গোপীনাথ। পদ্ম মুখ ধোবার জায়গা দেখিয়ে দিল। আঁচিয়ে, যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল গোপী দারোগা।

একলাফে উঠোন পেরিয়ে মাঠে নেমে বলল, আবার খেতে আসব শয়তানি, তোর মুড়োটা খেতে আসব।

দাওয়ায় বেরিয়ে এসে পদ্ম হেঁকে বলল, এবার আইলে আগুর তুমার শরাদের (শ্রাদ্ধের) খাবার খুই দিবা।

BanglaBook.org

গোপী দারোগাকে অপমান করার জের চলেছিল অনেকদিন। বুড়া দাস সব কথা শুনে পদ্মকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। সে বলেছিল, প্রথমেই কথাটা শোনার পর প্রণাম করে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দেওয়া উচিত ছিল পদ্মর। না হলে কপাটের আড়ালে থেকে দু'একটা কথা বলে চুপ করে গেলেই চলে যেত গোপী দারোগা। ল্যাঠা চুকে যেত। এখন পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে গোপী দারোগার হাতে।

দাগী আসামীকে লেলিয়ে দিয়ে বুড়া দাসের পাশের গাঁয়ে সিঁধ দিয়ে চুরি করাল গোপীনাথ, এদিকে ঠিকমত রাতের ডিউটি না দেবার কথা তুলে বুড়া দাসকে জরিমানা করল। কাজে অকাজে গোপী দারোগা এখন ছোটাচ্ছে বুড়া দাসকে দূর দূর জায়গায়। পায়ের গাঁট খুলে যাবার জোগাড় হয়েছে তার। বুড়া যত তাতছে তত ঝাল ঝাড়ছে পদ্মর ওপর।

পদ্ম বলে, বড় দারোগাবাবুকে কোই (বলে) দিতে পারনি গোপী দারগার কীর্তি। দরকার হিলে আমি বি যাবা।

বুড়া খিঁচিয়ে ওঠে, যা না বড়বাবুর কোতরে, তোকে দেখলে আস্ত গিলি পকিইবে।

পদ্মা ফোঁস করে ওঠে, পদ্মকে গিলবে অমন মরদ জন্মিছে নাকি গো?

তোর মুখ সার। পষ্ট ক'ত তুই কি আমার চাকরিটা খাবু লাগছু?

আমি ত আগুর তুমাকে কইচি, এ গুলামী চাকিরি ছাড়ি দও।

বুড়া দাস আবার খিঁচিয়ে ওঠে, তুই মায়া লোক, তোর অত ফড়ফড়ানি কেনি র‍্যা?

সাত

সাত বছর হল বুড়া মারা গেছে। মরার সময় সে পুত্র-মুখ দেখে যেতে পারেনি। গোপী দারোগা তাকে গভীর রাতে কয়েকজন কনেস্টবলের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল দারুয়া গাঁয়ে কয়েকটি দাগী মুসলমান ডাকাতকে ধরবার জন্যে। বাইরে কনেস্টবলদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গোপী দারোগা। বুড়া দাসকে একা অন্ধকারে পাঠিয়েছিল বাদাম জঙ্গলের ভেতর ডাকাত দলের খোঁজ করতে। বুড়া একা সেই ডাকাতের ডেরায় ঢুকতে আপত্তি করায় গোপী দারোগা নাকি তার পেছনে সবুট লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল। উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল বুড়া দাস। ভাগ্যিস জমিটা ছিল বালুতে ভরা, তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল সে। এসব কথা প্রহ্লাদ দফাদারই প্রচার করে দেয় পরে, ১৯৩০ সালের আন্দোলনে যখন স্বদেশী কর্মীদের কাছ থেকে ডাক এসেছিল চৌকিদার, দফাদার, তহশীলদারদের কাছে চাকরি ছেড়ে দিতে। অবশ্য পদ্মর ওপর একটি অত্যাচারের দৃশ্য দেখে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল চাকরি ছাড়ার। তারপরই বুড়া দাসের সাত বছর আগেকার মৃত্যুর রহস্যটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে রাতের অন্যতম সাক্ষী ছিল প্রহ্লাদ দফাদার। তার নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে বুড়া দাসের মৃত্যুটা পূর্ব পরিকল্পিত। কারণ বাদাম জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা প্রাণফাটা আর্তনাদ শুনে যখন সারা দলটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ছুটে যাবার জন্যে, তখন গোপী দারোগা তাদের চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার আদেশ দিয়েছিল। পনের বিশ মিনিট পার হয়ে গেলে গোপী দারোগার নির্দেশে ওরা বাদাম জঙ্গলে ঢুকে একটি পরিত্যক্ত চালাঘরের উঠোনে বুড়া দাসকে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রায় অচৈতন্য দেখতে পায়। ততক্ষণে দাগীরা সহজেই গা ঢাকা দেবার সুযোগ পেয়েছিল।

বুড়াকে আরও দুজনের সঙ্গে হাত ফের করতে করতে কাঁথি হাসপাতালে বয়ে এনেছিল প্রহ্লাদ দফাদার। টাঙির কোপ বসেছিল তার বাঁ দিকের গলায়। মরার আগে জ্ঞান ফিরে এসেছিল তার ঘণ্টা খানেকের জন্যে। সে ডাকছিল পদ্মার নাম ধরে। বড় দারোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে পদ্মকে আনিয়েছিলেন হাসপাতালে। পদ্ম তখন আসন্ন প্রসবা। সে কিন্তু স্বামীর এ অবস্থা দেখে হাহাকার করে কেঁদে ওঠেনি কিংবা মূর্চ্ছিত হয়েও পড়েনি। তার চোখ দুটো জ্বলছিল।

BanglaBook.org

পদ্মকে দেখে বুড়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। সে মৃত্যুর আগে একবার শুধু চিৎকার করে উঠেছিল, পদ্ম পদ্ম, আমার পো হিলে তাকে চৌকিদার করবুনি, কুনদিন না রে পদ্ম, কুনদিন না।

তারপর আর কথা বলেনি বুড়া দাস। হাসপাতালের বাইরে ক্লান্ত পদ্ম বসেছিল ভোরের প্রতীক্ষায়। সমুদ্র থেকে বাতাস বয়ে এসেছিল। পাখি করবর করতে করতে উড়ে চলেছিল। রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়ছিল পুবের আকাশে।

পদ্ম অনুচ্চারিত গলায় প্রার্থনা করছিল। ঠাকুর, শান্তি দও ওকে। দয়া কর ঠাকুর। ও যন্ আমার বসন্তদার কাছে যাইতে পারে।

১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রিতে কংগ্রেস ঘোষণা করল, পূর্ণ স্বরাজই ভারতবাসীর লক্ষ্য।

এই ঘোষণায় ভারতবাসীর অন্তরে বয়ে গেল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। এবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে ভারতবাসী শুরু করবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। চারদিকে অভূতপূর্ব উন্মাদনার ভেতর ১৯৩০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ঘোষিত হল স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্য।

গান্ধীজির নেতৃত্বে প্রস্তুত হল আইন অমান্য আন্দোলনের কার্যসূচি। ভারতের দীনতম মানুষটিরও প্রয়োজন, লবণ। কিন্তু বিনা শুল্কে লবণ প্রস্তুত করে খাবার অধিকার ছিল না তার। তাই ভারতবাসীর অধিকারের আন্দোলনকে একই সূত্রে বেঁধে দিয়ে প্রথমেই শুরু হল লবণ আইন অমান্য।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ সত্যাগ্রহী গান্ধীজি সঙ্গীদের নিয়ে সবরমতী আশ্রম ছেড়ে যাত্রা করলেন ডাণ্ডী অভিমুখে। অমান্য করবেন তিনি লবণ-আইন। উদ্বেলিত হয়ে উঠল সারা ভারত। লবণ-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ তখন ভারতবাসীর অন্তরে। ৬ই এপ্রিল সমুদ্র তীরবর্তী ডাণ্ডীতে গান্ধীজি ভঙ্গ করলেন লবণ-আইন।

—সারা বাংলার শ্রেষ্ঠ লবণ-সত্যাগ্রহ কেন্দ্র তখন পিছাবনি। অভয় আশ্রমের কর্মীদের সঙ্গে মিলে গেছে কাঁথির কর্মীরা। তারা শুরু করেছে আইন অমান্য। নেতৃত্ব দিচ্ছেন অভয় আশ্রয়ের অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রস্তুত হচ্ছে বে-আইনী লবণ। পুরিয়া করে কর্মীরা সে লবণ বিক্রি করছে হাটে বাজারে। বুলেটিন পাঠ করে জনতাকে শোনাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনের অগ্রগতির কথা।

শুরু হয়ে গেল পুলিশের অকথ্য অত্যাচার। শোভাযাত্রী শত শত স্ত্রী পুরুষের হাত থেকে তারা কেড়ে নিল জাতীয় পতাকা। ছিঁড়ে, পায়ে দলে, পুড়িয়ে, ছাই উড়িয়ে দিল বাতাসে। অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত হল সত্যাগ্রহীর দল।

পিছাবনি, মির্জাপুর, খোলাখালি, সমুদ্রপুর—সর্বত্র আইন অমান্যের তীব্র উন্মাদনা।

শিশু পুত্রটির হাত ধরে শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে পদ্মা। কাঁধে করে কখনো বইছে পতাকা, কখনো মেয়েদের জমায়েতে করছে বক্তৃতা। মা মনে, ভগ্নী মনে, কি সুখে ঘরে বুসি আছ। সুমুদ্রের বাঁধ ভাঙিকি বন্যা আসুছি। তুমার মনে তার গর্জন শুনি পাওঠনি। আইস আইস, চালি আইস ঘর ছাড়ি। সমুদ্রের জল মাথায় লও। বল, যতদিন বাঁচবা সমুদ্রের লুন তৈরি করিকি খাবা। কুন গুলামের ব্যাটাকে এক পইসা ট্যাক্স দিবানি।

পদ্মর মনে যা আসে তাই সে বলে যায় আবেগের মাথায়। শ্রোতারা ঘন ঘন করতালি দেয়, উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠে।

দারুয়ার ময়দানে রোজ চলেছে সত্যাগ্রহীর শোভাযাত্রা। কিন্তু মিটিং করতে পারলেও লবণ-আইন অমান্য করতে পারছে না তারা। চতুর্দিকে পুলিশ কর্ডন করে রেখেছে। এক ফোঁটা

BanglaBook.org

সমুদ্রের জল নিয়ে গিয়ে আগুন জ্বেলে লবণ তৈরির উপায় নেই। লবণ তৈরি না করতে পারলে লবণ-আইন ভঙ্গ কি করে হয়।

থানা, হাজত পেরিয়ে গেলে হাসপাতাল। হাসপাতালের কাছাকাছি খঙ্গচণ্ডীর শ্মশানক্ষেত্র। তারপর বালুর স্তূপ চলে গেছে দারুয়া ময়দান অব্দি। দারুয়ার ময়দান পেরিয়ে বালুর পাহাড়ের নীচে কাঁটা বাঁশের জঙ্গল আর গ্রাম। কাঁথি বাজার থেকে লোকেরা কেনাকাটা সেরে দারুয়া ময়দানের ভেতর দিয়ে ওইসব গ্রামে যাতায়াত করে।

পুলিশ কর্ডন করে রাখলেও গ্রামবাসীদের যাতায়াতে কোন বাধা নেই। শুধু লবণ জল তারা নিয়ে যেতে পারবে না ও পথে।

একটি ঘোমটা দেওয়া গাঁয়ের বধূ ছন্দে ছন্দে পা ফেলে এগিয়ে আসতে থাকে। মাথায় তার জলের কলসী। সে চলেছে দারুয়া ময়দানের দিকে।

হৈ হৈ করে উঠল সেপাইরা। কলসী নিয়ে কে যায়?

মেয়েটি সেপাইদের মুখোমুখি পড়ে থমকে দাঁড়ায়।

কলসী নামাও।

বাঁ হাতে ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে রেখেছে বউটি। কলসী নামায় না।

কলসী নামাও, নাহলে লাঠি পিটে ভেঙে দেব কলসী।

মেয়েটি ঘোমটাখানি একটু শিথিল করতেই দুটো উজ্জ্বল চোখ বেরিয়ে পড়ে। সেপাইদের বুকে লাগে চাঞ্চল্য। কিন্তু ওপরওয়ালার নির্দেশ, লবণ নিয়ে কেউ যেতে পারবে না ময়দানে।

একজন সেপাই একটু মোলায়েম গলায় বলল, নিয়ম নেই কলসী নিয়ে যাবার, তুমি কি শোননি? নুন জল নিয়ে ঢোকা বারণ।

মেয়েটি সেপাইদের দিকে পেছন ফিরে মাথার কলসী মাটিতে নামিয়ে ঘোমটাটা ঠিক করে নিয়ে দাঁড়াল। এবার হাত ইসারার বলল, সে নন্দকুমার দীঘি থেকে জল তুলে নিয়ে দারুয়ার ভেতর দিয়ে গাঁয়ে চলেছে। তাঁরা ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

সেপাইদের ভেতর কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। নুন জল নিয়ে যাওয়া বারণ কিন্তু পানীয় জল নিয়ে যেতে বাধা কি।

একে বউটির মুখের যেটুকু অংশ ঘোমটার আড়ালে ঝিলিক দিয়েছে তাতে সেপাইদের প্রাণ গলে জল হয়ে গেছে, তার ওপর বউটির কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তাকে বারণ করে কার সাধ্যি।

একটি সেপাই উঠে গেল বউটির কাছে। বলল, বড় তেষ্টা, হাতের আঁজলায় একটু জল ঢেলে দাও তো দেখি।

মেয়েটি এবার দাঁতে ঘোমটার কাপড় আটকে সেপাই-এর হাতে জল ঢেলে দিলে।

সেপাই জল খেয়ে সঙ্গীদের দিকে চেয়ে হাসি ছড়াল। না, এই মেয়েটির জলে নুন নেই।

সেদিন মেয়েটি চলে গেল। একদিন পরে আবার তার আবির্ভাব।

এবার আর একটি সেপাই জল পরীক্ষা করে মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, তোমার গুণের কিছু ঘাটতি আছে মেয়ে। নুন না থাকলে গুণ গাই কি করে।

সবকটি সেপাই এ কৌতুকে যোগ দিয়ে হাসতে লাগল।

পরের দিন শূন্য কলসী দোলাতে দোলাতে ওদের সামনে দিয়ে জল আনতে চলে গেল মেয়েটি। সেপাইদের দিকে চেয়ে চোখের হাসি ঝরাল।

কিছুক্ষণের ভেতরেই ফিরে এল ভরা কলসী মাথায় নিয়ে। কলসীর গা তখনও ভেজা ভেজা।

সেপাইরা বসে গজলা করছে, মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। জল পরীক্ষা করে আমাকে যেতে দাও।

BanglaBook.org

আজ আর পরীক্ষার কি আছে। যাবার সময় মেয়েটি তো সামনে দিয়ে খালি কলসী নিয়ে গেছে। সমুদ্র এখান থেকে মাঠ পেরিয়ে গেলেও মাইল তিনেকের কম নয়। সেখান থেকে দশ পনেরো মিনিটে জল নিয়ে আসা দত্যিদানার পক্ষেও কি সম্ভব?

একজন সেপাই বলে উঠল, না গো মেয়ে, আজ আর কলসীর জল খেয়ে কাজ নেই। তুমি ঘরে যাও।

আর একজন রসিকতা করে বলল, শুধু জল খেয়ে কি হবে, তার চেয়ে একদিন এক কলসী সরবৎ আমাদের খাইয়ে যেও।

মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, শেষের কথাটা শুনে কোমর বেঁকিয়ে ফিরে সেই আশ্চর্য চোখের হাসি ছড়াল।

ময়দানের বাকী পথটুকু হাওয়ায় উড়ে চলে গেল মেয়েটি। সে আজ সার্থক হয়েছে পুলিশের চোখে ধুলি দেবার ব্যাপারে। আজ কদিন ধরে চলেছিল লবণ-সত্যগ্রহী আর সরকারি পুলিশের ভেতর মর্যাদার লড়াই। পিছাবনি, সমুদ্রপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরে পুলিশ বেষ্টনী দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সত্যাগ্রহীরা কলসী ভরে সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করে আনত লবণ জল। আগুন জ্বেলে সেই জল থেকে নুন তৈরি করত। দূর থেকে আগুন দেখলেই ছুটে, আসত পুলিশের লোক। লাঠির ঘায়ে ধরাশায়ী করত সত্যাগ্রহীদের। কিন্তু দারুয়ার ময়দানের প্রধান প্রবেশ মুখগুলোতে পুলিশ অবরোধের পাঁচিল তুলে রেখেছে। আজ চারদিন সেখানে সত্যাগ্রহীরা ভীড় করে আছে, কিন্তু লবণ জলের অভাবে পূর্ণ হচ্ছে না তাদের সংকল্প। পুলিশ অফিসারেরা তৃপ্তির হাসি হাসছেন। কারণ এই একটি জায়গায় অন্তত তারা সত্যাগ্রহীদের হার মানতে বাধ্য করেছেন।

মেয়েটির বুকে আজ আনন্দের তুফান। ভোরবেলাতেই কলসী ভরে সমুদ্রের জল তুলে রেখে এসেছিল সে নন্দকুমার দীঘির জংগলে-ভরা পশ্চিম পাড়ে। তারপর দুপুরে দারুয়া ময়দান দিয়েই চলে এসেছে সে শূন্য কলসীখানা দোলাতে দোলাতে। সব পরিকল্পনাই তার। এতদিন ধরে সে তার প্রাণের ঠাকুরকে ডেকেছে, শেষ রক্ষা কর ঠাকুর।

শেষ রক্ষা হয়েছে। দারুয়া ময়দানে ঢুকে সে তার ঘোমটা খুলে সত্যাগ্রহীদের হাতে তুলে দিয়েছে লবণ জলে পূর্ণ কলসী।

অমনি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। তার ওপর কলসী বসিয়ে সত্যাগ্রহীরা গগন বিদীর্ণ করেছে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে। আর ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিয়েছে সেদিনের বীরাঙ্গনার—জয়, পদ্মা দেবী কি জয়। পদ্মা মায়ী কি জয়।

আগুন দেখে চতুর্দিক থেকে উন্মাদের মত ছুটে এসেছে পুলিশবাহিনী। এ লজ্জা, এ পরাজয় তারা মুছবে কি করে।

পাগলের মত দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে লাঠি চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। হাত পা ভেঙে লুটিয়ে পড়ছে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীর দল। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূরে। পাগলের মত চিৎকার করে চলেছে শত শত সত্যাগ্রহীও—জয় পদ্মা দেবী কি জয়। জয় ভারত মাতা কি জয়। বন্দেমাতরম্।

পদ্মর তখন আলুথালু বেশ। সে একটি বটগাছের উঁচু শেকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সত্যাগ্রহীদের উদ্দেশ্যে বলে চলেছে, ভাই মনে, ভগ্নী মনে, মার খাইকি মরি গেলেও হাতের পতাকা পকিইবনি (ফেলবে না)। মার খাইকি মরি গেলেও মায়ের নাম ছাড়বনি।

পুলিশবাহিনী এবার ছুটেছে পদ্মর দিকে। ওই ত সেই সবুজ পাড়ের কাপড় পরা মেয়েটা। ওই ত হাত নেড়ে চিৎকার করে বক্তৃতা দিচ্ছে। ওই মেয়েটাই ত তাদের ধোঁকা দিয়ে কলসীতে লবণ জল এনেছে ময়দানে।

BanglaBook.org

গোপীনাথ দারোগা কাঁথি থেকে বদলী হয়ে গিয়েছিল জনকা। আন্দোলনের সময় তাকে আনা হয়েছে কাঁথি সদরে।

দারুয়া ময়দানের খবর কানে যেতেই রাইফেলধারী পুলিশ নিয়ে ছুটে এসেছে গোপীনাথ। সেপাইদের কাছে থেকে পদ্মর ধোঁকাবাজির কথা শুনে পাগলা কুকুরের মত ক্ষিপ্ত হয়েছে গোপী দারোগা।

টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আন ওই শয়তানীটাকে। চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে আন মাগীটাকে।

সেপাইরা ছুটে গেল পদ্মকে বটগাছের শেকড়ের ওপর থেকে টেনে নামাবার জন্যে। অমনি চারদিক থেকে তাকে ঘিরে দাঁড়াল সত্যাগ্রহীরা। পৈশাচিক উল্লাসে তাদের প্রহার করতে লাগল সেপাইবাহিনী। কেউ কেউ ভূতলশায়ী হল, কেউ বা সরে গেল দূরে।

গোপী দারোগার নির্দেশে চুলের মুঠি ধরে মাটিতে পেড়ে ফেলা হল পদ্মাকে। তারপর বালুর ওপর দিয়ে টানতে টানতে এনে ফেলা হল একটা নির্জন স্থানে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। প্রহারে জর্জরিত সত্যাগ্রহীর দল দ্রুত ফিরে যাচ্ছে আপন আপন আস্তানায়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন, ক্লান্ত, আহত মানুষগুলোর মনে আজ আর কোন ক্ষোভ নেই। সহস্র নির্যাতনের মাঝেও তাদের মন ভরে আছে জয়ের উত্তেজনায়।

গোপী দারোগার আদেশে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা হয়েছে পদ্মাকে। থানা থেকে কাছি এনে তাকে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে একটা অশ্বত্থ গাছের কাণ্ডের সঙ্গে। হাতের ব্যাটন দিয়ে পদ্মার অনাবৃত নিম্নাঙ্গে বারবার আঘাত করে গোপী দারোগা বলল, কিরে শয়তানী, তোর হাঁসুয়াটা কই?

এবার নিজের মুখখানা পদ্মর মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, কাট আমার গলাটা কাট।

পদ্মর দুটো চোখ যেন পাথর দিয়ে তৈরি। পলক পড়ছে না, স্থির হয়ে আছে। রক্ত জমে জমে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত লাল হয়ে ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে।

চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল গোপী দারোগা, কি রে হারামজাদী, মুখে জবাব নেই কেন?

সঙ্গে সঙ্গে গোপীদারোগার মুখ চোখ ভরে গেল পদ্মর ছুড়ে দেওয়া থুথুতে।

সেপাই আর দফাদাররা দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। তারা লাঠি উচিয়ে ছুটে এল। তাদের বাঁ হাত তুলে বাধা দিল গোপী দারোগা।

বলল, খোল এর বাঁধন। গাছের কাণ্ডের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আবার একে বাঁধো। শক্ত করে বাঁধবে, খোলা রেখে দেবে শুধু পিঠখানা।

তাই করা হল। পদ্ম যেন একটি মাটির প্রতিমা, তাল তাল মাটি দিয়ে শ্রেষ্ঠ কোন কারিগর যেন তৈরি করেছে তাকে। বিবস্ত্রা, নির্বাক কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগরের হাতে তৈরি অপূর্ব এক মহামায়া মূর্তি।

হাতে শঙ্কর মাছের চাবুকখানা তুলে নিল গোপী দারোগা। পিঠের ওপর পড়ল প্রথম চাবুক। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল চামড়া। তার ঠিক পাশেই আর এক ঘা। শুধু পিঠখানা থর থর করে কেঁপে উঠল পদ্মর। মুখ দিয়ে একটু আওয়াজ বেরুল না।

গোপী দারোগা কি আশ্চর্য শিল্পী। বাতাসে আর্তনাদের শব্দ তুলে চাবুক কষে চলেছে। প্রতিটি আঘাত পিঠের ওপর পড়ে যাচ্ছে সমান দূরত্ব বজায় রেখে। পশ্চিমের আকাশে রক্তাক্ত সূর্যাস্ত। গোপী দারোগা যেন সেই রক্তে চাবুক চুবিয়ে রক্তের রঙে চিত্রিত করছে পদ্মর অনাবৃত পিঠখানা।

না, কোন গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এখন আর থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছেনা পদ্মর শরীর। চাবুক চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল গোপী দারোগার মাংসপেশী। একসময় শ্রান্ত

BanglaBook.org

কুকুরের মত ফ্যা ফ্যা করতে করতে চাবুকখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পদ্মর ঘাড়খানা কাৎ হয়ে পড়ল বাঁদিকে।

একটা ঘূর্ণি ঝড় উঠল। শেষ চৈত্রের গরণ ঘূর্ণি হাওয়া ঘুরতে ঘুরতে ছুটে এল দারুয়ার প্রান্তরে। এক ঝাঁক চড়ুই পাখির মত প্রথমে ফর্ ফর্ করে উড়ে গেল কয়েকটা শুকনো পাতা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ধুলোবালির চোখ অন্ধ করা দম বন্ধ করা ঝড়।

পালাচ্ছে সেপাই-এর দল। বালুর ওপর দিয়ে পড়তে পড়তে ছুটে পালাচ্ছে গোপী দারোগা। কেউ কারু দিকে তাকাচ্ছে না। লক্ষ্য একটা আশ্রয়।

মিনিট কয়েক পরেই এক পশলা বৃষ্টি নামল। ধীরে ধীরে সরে গেল ধুলোর আবরণ। বড় বড় ফোঁটায় বালুর জমিনে জেগে রইল কার যেন কান্নার দাগ।

আট

পুরো চার চারটি মাস হাসপাতালে শুয়ে থাকার পর ছাড়া পেল পদ্ম। প্রথম দিকে সে লোক চিনতে পারত না। হাসপাতালে অনেক লোক তার সঙ্গে দেখা করতে যেত, সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত তাদের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল তার লুপ্ত বোধ। প্রথম সে চিনল তার সাত বছরের ছেলেটিকে। চোখ দিয়ে জল গড়াল। হাত দিয়ে আদর করল। কিন্তু তার বাবা কিংবা ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে সে চিনতে পারল না।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে এসে সে সব কথা জেনেছিল তার বাবার মুখ থেকে।

সবাই যখন ঘূর্ণি ঝড়ে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে গেল দারুয়া ময়দান ছেড়ে তখন একজনই শুধু রয়ে গিয়েছিল সেখানে। সে সেই ধুলোর ঝড় উপেক্ষা করে বাঁধন খুলে দিয়েছিল পদ্মর। তারপর চেতনাহীন পদ্মকে বালুর ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল পাশের মুসলমান পল্লীতে। সেখানে মুসলমান মেয়েরা তার সেবাযত্ন করেছিল, কিন্তু জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারেনি। শেষে ঝড় থামলে পদ্মকে সবাই মিলে কাপড়ের দোলায় করে বয়ে নিয়ে এসেছিল হাসপাতালে।

পদ্ম আরও একটি খবর আশ্চর্য হয়ে শুনল। যে প্রহ্লাদ দফাদার তার জীবন রক্ষা করেছিল, সে নাকি তার ওপর এই নৃশংস অত্যাচার দেখে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে।

এখন প্রহ্লাদ কাজ করছে নিজের জমিনে। বাজারের ওপর খুলেছে একটা পানের দোকান।

পদ্ম তার বাবার কাছে আরও শুনল, প্রহ্লাদের বউ নাকি এ ক'মাস পদ্মর ছেলেটাকে নিজের কাছে রেখে তার কচি মেয়েটার সঙ্গে প্রতিপালন করেছে।

মার খেয়ে অপমানে নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে যার চোখে শুধু আগুন ছাড়া জল বেরোয়নি, সে প্রহ্লাদ আর তার বউ-এর কথা শুনে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ভাসিয়ে দিল।

হাসপাতালে সে প্রহ্লাদকে দেখলেও সকল কথা না জানার জন্য তেমন করে কথা বলেনি। কিন্তু প্রথমদিন তার বাড়িতে এসে যখন প্রহ্লাদ দাঁড়াল তখন পদ্ম গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বলল, দাদা, এ অধম ভন (বোন) কুনদিন তুমার ঋণ শোধ করি পারিবেনি।

প্রহ্লাদ বলল, ভাই ভনের সম্পর্কে ত কুন ঋণ নেই দিদি। খালি ভক্তি আর ভালোবাসা।

একটু থেমে আবার বলল, যেদি ঋণের কথা ধর তহিলে আমি তুমার কোতরে (কাছে) ঋণী দিদি। আমার জীবন পাঁকের ভিতরে ডুবি থিলা, তুমি সে জীবনে পদ্মের খবর আনি দিছ। তুমার সাহস দেখিকি দিদি আমি অবাক মানছি। তুমার মুয়া চাইকি আমার মনে হিছে ইংরেজমনকে এ দেশ ছাড়িকি চালি যাইতে হবে। আগুনের উপরে কাঠের ভার চাপিই দিলে আগুন নিভবেনি, সে কাঠকে জ্বালিই দিবে। আমারমনকের উপরে ইংরেজ যত অত্যাচার করবে তত জ্বলি পুড়ি মরতে হবে তারুমনকে।

BanglaBook.org

পদ্ম প্রহ্লাদের কথাগুলো মন দিয়ে শুনল। তার মনে হল, স্বরাজের হাওয়ায় মানুষটার বুক ভরে উঠেছে।

পদ্ম প্রহ্লাদকে যত্ন করে খাওয়াল। বাড়ি ফেরার সময় পদ্মর ছেলে নিতাই বায়না ধরল প্রহ্লাদের সঙ্গে তার বাড়িতে যাবার জন্যে।

প্রহ্লাদ হেসে বলল, মাকে ছাড়িকি কাই যিবুরে বকা?

পদ্মা বলল, যে আপন মা নাই হইকি পরের টকাকে বুকে ঘিরি রাখে সে মার চাইতে ছোট নয় দাদা। তুমি বৌদির কোতরে লি যাও অকে, আমি কাল যাইকি অনবা।

প্রসন্ন মনে প্রহ্লাদ নিতাই-এর হাত ধরে বাড়ির পথে রওনা দিল।

ঘরে ফিরে এল পদ্ম। এখন একটি মাত্র ভাবনা, কি করে সে পুরোপুরি নিজেকে দেশের কাজে সঁপে দেবে।

স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকেরা পদ্মর বিস্ময়কর সাহসের পরিচয় পেয়েছিল। তারা সভা, শোভাযাত্রায় পদ্মকে ডাক দিতে লাগল।

পদ্ম শোভাযাত্রায় নারীবাহিনীকে নিয়ে এগিয়ে চলে। হাতে জাতীয় পতাকা, মুখে 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনি। কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হয় স্বদেশী-সংগীত

'না জাগিলে ভারত ললনা
এ ভারত কভু জাগেনা, জাগেনা'।

চারণ কবির মত গান গাইতে গাইতে পদ্ম ধনী দরিদ্র সকল মানুষের দরজায় দরজায় ধাক্কা দেয় উঠ, জাগ, আর কতকাল নিদ্রা যিব বঙ্গনারী।

অমনি গান শুরু হয়ে যায় :—

'ভেঙে দাও কাচের চুড়ি, বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর পরনা।'

বক্তৃতা শুরু করে দেয় পদ্মা,—বিলাতি জিনিস ঘরের পাপ, ঘরের অমঙ্গল। মা ভাগ্নীরা ভাঙি দও হাতের চুড়ি, পুড়িয়ে দও বিলাতি কাপড়। শাঁখা সিঁদুর নারীর শোভা।

আবার গান :—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'।

চরকায় কাটা খদ্দরের কাপড় পর মা ভগ্নীরা। মোটা কাপড় পরিকি শরীরে সুখ নেই? সুখের বাসা ত শরীরে নাই মামনে (মায়েরা), সুখের বাসা মনে।

শুরু হয়ে যায় বস্ত্র দহন যজ্ঞ। এগিয়ে আসে ঘরের বউ ঝিয়েরা। তারা রাস্তায় বেরিয়ে যেতে পারে না ঠিক, তাবলে কি তারা দেশকে বালবাসে না।

পথের ওপর পড়তে থাকে বিলিতি কাপড়। এ বাড়ি ও বাড়ি, আশেপাশের সব বাড়ি থেকে। পদ্ম দুহাত বাড়িয়ে কাপড়গুলো লুফে নিতে থাকে। যাঁরা কাপড় দেন তাঁরা একটা উন্মাদনার ভেতর পড়ে ট্রাঙ্ক, বাক্স হাতড়াতে থাকেন। যা আছে সঞ্চয়ে তাই খুঁজে পেতে বের করে দেন। রাশি রাশি সখের রেশমী চুড়ি নিয়ে হাজির হন পদ্মর কাছে। পদ্ম বসে বসে নানা রঙের রেশমী চুড়ি পথের ধারে ভেঙে ফেলে দেয়।

এবার আগুন ধরান হয় স্তূপীকৃত কাপড়ে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। পদ্ম চিৎকার করে বলে, অমন করিকি পুড়ি ছাই হি যাবে ইংরাজ রাজ্য।

সেখানে বিভিন্ন বক্তারা বলে যেতে থাকে বিলাতি দ্রব্য বর্জনের সার্থকতার কথা।

বহ্ন্যুৎসব শেষ হলে পদ্ম সমবেত নারী পুরুষের কপালে পরিয়ে দেয় ভস্মতিলক। তারপর গান গাইতে গাইতে চলে যায় সমগ্র দলটি।

BanglaBook.org

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।'

পুলিশ আসছে গ্রাম ঘেরাও করতে। কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের ধরে নিয়ে যাবে। ওরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে গিয়ে সরকারি ট্যাক্স দিতে বারণ করেছে। আবগারী দোকানের সামনে গিয়ে পিকেটিং করেছে। মেরে চামড়া তুলে নিতে হবে ওদের, না হলে শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

পদ্মর কাছে ছুটতে ছুটতে আসে নিতাই। সে এখন ন'বছরেরটি হয়েছে। অন্যতম বানরসেনা সে। ছোটদের দিয়ে গড়া হয়েছে বানরসেনার দল। তারা এ ক্যাম্প থেকে ও ক্যাম্পে খবর সরবরাহ করে। ডাংগুলি খেলে পুলিশ ফাঁড়ির কাছে। সেপাইরা মার্চ করে বেরিয়ে গেলে ওরা পিছু নেয়। কোন্‌দিকে চলেছে, সে খবরটা পৌঁছে দেয় কাছে পিঠের কংগ্রেস ক্যাম্পে।

নিতাই মাঠ ভেঙে ছুটে এসেছে। পুলিশ আসছে গাঁয়ের দিকে সরকারি রাস্তা ধরে।

গাঁয়ের মাঠ। তার মাঝখানে দ্বীপের মত উঁচু ঢিবির ওপর পদ্মর বাড়ি। গাঁয়ের পশ্চিমে কংগ্রেসের একটা ক্যাম্প আছে। সেখানে আজ সন্ধ্যায় মিটিং বসার কথা। বিভিন্ন ইউনিয়নে ট্যাক্স বন্ধের কর্মসূচি আবার গ্রহণ করা হবে। জোরদার প্রচার চালাতে হবে সবখানে। বুলেটিন ছাপা হয়েছে। সেগুলো অবশ্য জমা আছে পদ্মর কাছে। নিতাই আর তার বন্ধু কটা বানরসেনাকে দিয়ে সেগুলো বিলি করাতে হবে সামনের হাটে।

খোঁজখবর রেখেছে ঠিক পুলিশের চর। মিটিংএর খবরটা ঠিকই পৌঁছে দিয়েছে থানায়। সেপাইরা বেরিয়েছে সন্ধ্যার মুখে। মিটিং চলবে আর তারা ঘেরাও করবে কংগ্রেসের অফিস ঘর। ছাকনি জাল ফেলে ছেঁকে তুলবে সব কটাকে।

সরকারি পুলিশ সুপার সামসুদ্দোহা বেরিয়েছে সদলবলে। ওকে দেখলে পথচারী, গৃহবাসী সকলেই অতংকে মরে। থানা থেকে বেরুলেই দুহাতে থাকে উদ্যত দুটো পিস্তল। চারদিক ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে চলতে থাকে দোহা। সাক্ষাৎ যমদূত যেন।

নিতাই, বাচ্চা হলে কি হবে, দোহাকে সে ঠিকই চেনে। দুহাতে দুটো মারণাস্ত্র নিয়ে দোহা ছাড়া আর কেউ ঘুরে বেড়ায় না।

পদ্ম নিতাই এর মাথায় একটা ঝুড়িতে বুলেটিন বোঝাই করে বসিয়ে দিলে। ওই ঝুড়ির মাথায় চেপে চেপে ভরল বেশ খানিকটা কুঁড়ো। তারপর বলল, যা, পেহ্লাদ মামুর ঘরে দিয়ে আয়। মাঠ দিকি ছুটি ছুটি কি যাবুনি, পুলিশ ধরি পকিইবে। বোড়ো বাঁধ ধরিকি গুটি গুটি পুলিশের ছামু (সামনে) দিকি যা। পুলিশের মুয়া চাইবু তবে ভয় করিকি চলবুনি। যদি জিগ্‌সায়, কি আছি ঝুড়ির (ঝুড়িতে), কইবু, কুঁড়া লি যাউছি।

আবার যদি কয়, ঘর কাই তোর? কাহারে (কার বাড়ির) টকা (ছেলে)?

কইবু, গোলেহারে গ বাবু। ('গোল' পদবীধারী কোন বাড়ির ছেলে।)

মায়ের শেখান মন্ত্র মনে মনে জপ করতে করতে নির্ভীক নিতাই ঝাঁকা মাথায় সরকারি রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলে। পুলিশের মুখোমুখি হয়েও সে ঘাবড়ায়না। পুলিশের দিকে তাকাতে তাকাতে পথ চলে। যেন এতগুলি সেপাইকে পথ চলতে দেখে নিতাইচন্দ্র কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

দোহার চোখ চারদিকে। ধমক দিয়ে বলল, কি নিয়ে যাচ্ছিস ঝট্‌পট্ বলে ফেল?

যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে ছেলেটা। কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, কুঁড়া বাবু।

মাথার ঝাঁকাটা সেপাইদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই দোহা বললে, যা ব্যাটা ভাগ।

পেছন দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল নিতাই।

BanglaBook.org

দোহা বলছিল, এই বাচ্চাগুলো মহা বিচ্ছু। এদেরকে দিয়ে কংগ্রেসীগুলো নাকি নানা ধরনের কাজ করায়।

দীর্ঘ সময় ধরে একটা শাঁখ বাজতে লাগল। গ্রামবাসীরা এ শাঁখের আওয়াজ চেনে। এটি সংকেত শঙ্খ। পদ্ম কোন অশুভ খবর পেলেই শাঁখে ফুঁ দেয়। অমনি গ্রাম জুড়ে বাজতে থাকে শাঁখ। যে যেখানে থাক, সাবধান হও। পালাও পালাও, পুলিশ আসছে।

সন্ধ্যার আবছায়ায়, রাত্রির ঘন অন্ধকারে সাধারণত চলে পুলিশের অভিযান। সারাদিন কাজকর্মের পর যখন গাঁয়ের মানুষ ঘরে ঘরে ফিরে আসে অথবা রাত্রির আহারের পর শয্যায় যায় তখনই চরের সাহায্যে পুলিশ ঘিরে ফেলে বাঞ্ছিত লোকটির আস্তানা।

আজ সন্ধ্যায় পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে, সঙ্গে স্বয়ং দোহা সাহেব। কংগ্রেস অফিসের জমায়েৎ থেকে চাঁইগুলোকে ধরতে পারলে একটা বড় রকমের কার্যসিদ্ধি হবে। সরকারের তহবিলে যদি ট্যাক্স জমা না পড়ে তাহলে এতবড় রাজকার্য চলবে কি করে!

দোহা যেন বাতাসে গন্ধ পায়। থমকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, পাখি শিকার হবে না।

কেন স্যার?—চরটি বলে উঠল।

শুনতে পাচ্ছ না কতগুলো শাঁখ একসঙ্গে বাজছে। আজকাল কংগ্রেসীগুলো শাঁখ বাজিয়ে আগেভাগেই আমাদের যাবার খবরটা পৌঁছে দেয়। শাঁখের আওয়াজ শুনলেই পাখিরা উড়ে পালায়।

চরটি বলল, কাক পক্ষীতেও জানে না স্যার আমাদের এই অভিযানের কথা। আমাদের সামনে দিয়ে একটি কুকুরও যায়নি, যে আগেভাগে গ্রামে গিয়ে আমাদের খবরটা জানিয়ে দেবে।

তবে একসঙ্গে এত শাঁখের আওয়াজ কেন?

স্যার, আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন, সন্ধ্যা নামছে। এখন গাঁয়ে তো সাঁঝের শাঁখ বাজবেই।

বেশ চল, এগোনো যাক।

ওরা গাঁয়ের কাছাকাছি এসে তিনটি দলে ভাগ হয়ে গেল। কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই আক্রমণ করা হবে। ইনফরমারের সঙ্গে চলল দোহা সাহেব।

কংগ্রেস অফিসের কাছে গিয়ে দেখা গেল কেউ কোথাও নেই। একটা গোয়াল পালান গরু অফিস ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে।

গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্যাম জানা মশায়ের বাড়িতে গিয়ে সদলবলে উঠল দোহা।

জানা মশায় বাড়িতেই ছিলেন। আলো আনালেন ভেতর থেকে। চেয়ার এগিয়ে দিলেন দোহা সাহেবকে। বেঞ্চ টানাটানি করে দাওয়ায় এনে ফেললেন। সেপাইদের বসতে বললেন বেঞ্চের ওপর। ভেতর বাইর করলেন কয়েকবার।

গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্ত থেকে শোনা গেল সেপাইদের ঘন ঘন হুইসেল। কয়েকজন সেপাই ছুটল সেদিকে। বাঁশ জংগল ঘেরাও করে ধরা পড়ল দুটো লোক। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হল তাদের। তারা সবেমাত্র বাঁশবাগানের ভেতর ঢুকে সান্ধ্যকৃত্যের আয়োজন করছিল।

ইনফরমার কিছুটা অপদস্ত হয়েছে। তাকে দোহা সাহেব রেহাই দিচ্ছে না।

কি আজে বাজে সব খবর জোগাড় কর, আমাদের হয়রানির একশেষ। এরপর সঠিক খবর না দিলে বুঝব, তুমি ওদেরই দলের চর, বুঝলে? তখন তোমাকেই পুরবো হাজতে।

ইনফরমার কোন প্রতিবাদ না করে মাথা নীচু করে বসে রইল। সে এ গ্রামের লোক নয়, পাশের গ্রামে তার বাড়ী। তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখ আর অসাধারণ খবর সংগ্রহের ক্ষমতার জন্যে সে সরকারের সুনজরে পড়েছিল। দু'চারটে সঠিক খবর যে সে দিতে পারেনি তা নয়, তবে ইদানিং কয়েক জায়গায় তাকে বেশ খানিকটা অপদস্ত হতে হয়েছে। তার সব সন্ধান, সব হিসেব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

শ্যাম জানা মশায়ের বাড়ির ভেতর থেকে চা আর মোহনভোগ এল। এ অঞ্চলের মানুষের তখনকার দিনে বড় একটা চা পানের অভ্যেস না থাকলেও শ্যামবাবুর সংগ্রমে বহু জিনিসই থাকত। অনেক সময় খাসমহল অফিসার, পুলিশ অফিসারেরা তাঁর বাড়িতে পদধুলি দিতেন। অতিথি আপ্যায়নের বিশেষ সুনাম ছিল তাঁর। যেসব অফিসারের মাছ ধরার নেশা, তাঁরা প্রায়ই চলে আসেন জানা মশায়ের পুকুরে। ভুরি ভোজ করে বাড়ির জন্যে দু'একটা মাছ বেঁধে নিয়ে যান।

শ্যাম জানার সুনাম আছে সরকারি মহলে। সংগতি সম্পন্ন মানুষ। কাঁথি বাজারে আছে বড় কাপড়ের দোকান। সবচেয়ে বড় কথা আন্দোলনের ধার ধারেন না তিনি। নিয়মিত ট্যাক্স দিয়ে যান। সরকারি লোকের সঙ্গে তাঁর সদ্ব্যবহার থাকলেও নিজের জন্যে কোন সুযোগ আদায়ের চেষ্টা করেন না তিনি। সরকারি লোক তাঁর বাড়িতে আসে কিন্তু সরকারের ঘরে তদ্বিরের জন্যে তাঁকে যেতে দেখা যায় না।

শ্যাম জানা মশায়ের বাড়িতে সন্ধ্যায় জলযোগ সাঙ্গ করল সদলবলে দোহা সাহেব।

চাঁদ উঠল আকাশে। কৃষ্ণপক্ষের প্রথমার চাঁদ। জানা মশায়ের সামনের পুকুরের ওপারে বাঁশবনের মাথায় থালার মত দেখা দিল চাঁদটা।

দোহা বলল, ঢের হয়েছে, চল ফেরা যাক। যদি মিটিংএর কথা থেকেও থাকে তাহলেও আজ রাতে কেউ কংগ্রেস অফিসে আর ভিড়ছে না।

শ্যাম জানা মশায় দোহা সাহেবের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বললেন, আপনার খুবই কষ্ট হল সাহেব, অকারণে এলেন, কিন্তু আমি আপনাদের মত লোকের সেবা করে বড় তৃপ্তি পেলাম।

দোহা বলল, সরকারও আপনাদের মত প্রজা পেলে দেশের উন্নতির কাজে আরও বেশি করে মন দিতে পারতেন। রাতদিন সরকারকে বিরক্ত করে তুললে সরকারের পক্ষে উন্নতিমূলক কোন কাজে হাত দেওয়া কি সম্ভব?

শ্যাম জানা মশায় হাত জোড় করে মাথা নেড়ে দোহা সাহেবের কথায় সায় দিলেন।

সদলবলে দোহা নামল উঠোন পেরিয়ে রাস্তায়। পুকুর পাড় ধরেই সরু রাস্তাটা গিয়ে পড়েছে লোকাল বোর্ডের চওড়া রাস্তাতে। হঠাৎ ইনফরমার নীচু গলায় দোহা সাহেবকে কি যেন বলল। অমনি থামল দোহা, থামল তার দলবল। তীক্ষ্ণ-চক্ষু দোহা তাকাল সান বাঁধানো পুকুর ঘাটের দিকে।

ঘাটের পাট যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পাটের দুদিকে জলের ওপর ভেসে আছে দুটো হাঁড়ি। হাঁড়ি দুটো জলে ভেসে থাকলে কি হয়, প্রায় স্থির, নড়ন চড়ন নেই।

দোহা আর একটা সেপাই সিঁড়ি বেয়ে নীচের পাটে নেমে গেল। দোহার নির্দেশে সপাটে ব্যাটনের ঘা লাগাল হাঁড়িতে। ভেঙে ছত্রখান হয়ে খোলাম কুচিগুলো তলিয়ে গেল জলে। ঝক্‌ঝকে চাঁদের আলোয় দেখা গেল জলের ওপর একটা বাঁশের লাঠি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওই লাঠির মাথাতেই বসান ছিল কাকতাড়ুয়ার মাথার মত চিত্রিত হাঁড়িটা।

সন্দেহ পুরোপুরি ভঞ্জনের জন্যে দ্বিতীয় হাঁড়িটা ভাঙতে এগোচ্ছিল সেপাইটি, ওপরের সিঁড়ি থেকে সহসা শ্যাম জানা মশায়ের গলার স্বর শোনা গেল, বড্ড পিছল জায়গাটা, সাবধানে এগোতে হবে। ওই বুটজুতো পরে এগোলেই বিপদ। দাঁড়ান, আমিই কাজটা করছি।

সেপাই দাঁড়িয়ে গেল। শ্যাম জানা নেমে এলেন তর্‌তর্ করে। শেষ পাটের প্রান্তে গিয়ে লাঠির মাথা থেকে দ্বিতীয় হাঁড়িটা আস্তই তুলে ধরলেন। আবার নেড়েচেড়ে বসিয়ে দিলেন লাঠির মাথায়।

হেসে বললেন, কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হাঁড়িগুলো ঠিক মানুষের মাথার মত। যেন কেউ জলে গা ডুবিয়ে মাথাটা ভাসিয়ে রেখেছে।

দোহা বলল, আমি একবার দুটো চোরকে রাতে পাকড়াও করতে গিয়ে পুকুরঘাটে ওটা হাঁড়ি ভেসে থাকতে দেখেছিলাম। ওই দুটো হাঁড়ি নড়ে চড়ে না দেখে লাঠির ঘা মেরেছিলাম। আর যায়

BanglaBook.org

কোথা, হাঁড়ি থেকে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল দু'দুটো চোর। কিন্তু জানা মশায়, আপনার হাঁড়িতে চোরের হদিস নেই কেন?

শ্যাম জানা হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, একটু লক্ষ্য করে দেখুন স্যার, এমন হাঁড়ি আমার পুকুরের ধারে ধারে প্রায় গোটা বিশেক আছে।

দোহা চোখ চালিয়ে দেখল কথাটা সত্যি।

কিন্তু জানা মশায়, হাঁড়িগুলো এমন সারে সারে লাঠির মাথায় রেখে দেবার মানেটা কি বলুন তো?

শ্যাম জানা বললেন, আর বলবেন না স্যার, উদ্‌বেড়ালের যা উৎপাত। প্রচুর মাছ আছে তাই দৌরাত্ম্য। ওদের ঠেকাবার জন্যেই হাঁড়ির গায়ে মানুষের চোখ মুখ এঁকে এমন করে রেখে দিয়েছি। তাছাড়া আর একটা কাজও হয় ওতে। মাঝে মাঝে গাঁয়ের লোক আসে কালো মাছ আর কাঁকড়া ধরতে। ওরা জলে হাঁড়ি ভাসিয়ে ডুবে ডুবে মাছ ধরে আর মাছগুলোকে রেখে দেয় ওই হাঁড়ির ভেতর।

দোহা ওপরে উঠে আসতে আসতে বলল, স্যরি মিঃ জানা, আপনার একটা হাঁড়ি অকারণে ভেঙে দিলাম।

শ্যাম জানা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বাঃ, সন্দেহ হলে ভাঙবেন না, একটা কেন, সব কটাই ভাঙতে হবে বৈকি।

দোহা পথে উঠে একবার থমকে দাঁড়াল। শ্যাম জানার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি একজন খাঁটি রাজভক্ত, জানা মশায়।

সদলবলে গাঁ ছেড়ে চলে গেল দোহা। পথের ওপর বুটের জোরালো শব্দগুলো যেন অক্ষমতার আক্ষেপ।

বেশ কিছু সময় ওদের লক্ষ্য করার পর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন শ্যামবাবু।

বললেন, তোমার বুদ্ধিই কাজ দিল মা পদ্ম। সামনের দুটো হাঁড়ি সব সময়েই তুমি খালি রাখতে বলতে। আজ ওটার ওপর দিয়েই পরীক্ষা হয়ে গেল।

পদ্ম বলল, ওরমনকে (ওদের) আর জলের ভিতরে রোখি শাস্তি দিকি কি লাভ বাবা। পুলিশ ত চালি যাউছি।

তোমার খাবার তৈরি মা?

তৈরি বাবা। ডাকি লি আইস।

শ্যামবাবু পুকুর ঘাটে গিয়ে একটা হাঁক পাড়লেন, বাস্ তাতেই কাজ হল। হাঁড়িগুলোর ভেতর থেকে দশটা মাথা জেগে উঠল। তারপর লাঠির ওপর হাঁড়িগুলো চাপিয়ে রেখে ওরা জল কেটে চলে এল ঘাটে। শ্যামবাবু একটি গামছা আর দশখানি লুঙ্গি এনেছিলেন। গা-হাত মুছে সেগুলি পরল সবাই। তারপর ঘরের ভেতর গিয়ে বাদামভাজা আর মুড়ি খেতে খেতে মিটিং চলল ট্যাক্স বন্ধের।

পাশের গাঁয়ে তহশীলদারের বাড়ি। বড় চতুর লোক জীবন তহশীলদার। সে যে কখন বাড়ি থেকে সুট করে কোথায় বেরিয়ে পড়ে তার ঠিক নেই। তার এলাকায় ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীদের বোঝায়, ভয় দেখায়। তার বাক্‌বিভূতিতে পড়ে অনেকেই চুপি চুপি বকেয়া ট্যাক্স দিয়ে দেয়।

এখন কথা হল, জীবন তহশীলদারের ওপর নজর রাখে কে। তার গতি বিধির সন্ধান পেলে তার পেছন পেছন গাঁয়ে ঢুকবে ভলানটিয়াররা। তখন ভীত মানুষজনকে ট্যাক্স বন্ধের কথা বোঝাতে কিংবা তাদের মনে সাহস দিতে কোন অসুবিধাই হবে না।

পদ্ম বলল, সে ভার আমার উপোর ছাড়ি দও।

BanglaBook.org

একজন কর্মী বলল, কি ভরসায় ছাড়ি দিবা কও। তুমি মায়ালোক, তুমি কি জীবনের পাছু পাছু ঘুরব?

পদ্ম বিরক্ত হয়। বলে, অত কথায় কাজ কি কও। কাজটা আমি করি দিলে ত হিলা। তুমার মনকের কানে খবর পৌঁছি দিবা। তার পরের কাজটা করবার দায়িত্ব তুমারমনকের (তোমাদের)।

পদ্মর ওপর বেশি কথা বলতে কারু সাহস হল না। তারা শুধু এটুকু ভেবে নিশ্চিন্ত হল যে পদ্ম যে কাজের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সেকাজ সে করবেই।

রাতে বিছানায় শুয়ে পদ্ম নিতাইকে বলল, তুই জীবন তোশীলদারকে চিনু? যে থলির কাগজপত্র লিকি লোকের দরে দরে ঘুরে?

নিতাই বলে, চিনবানি কেনি গো। আমার ইস্কুলের ছামুর তার ঘর।

তুই এক কাজ করবু বাবা, যক্ষুণ (যখন) লোকটা থলি লিকি বার হবে, তুই তক্ষুণ ইস্কুলনু পিসাব (প্রস্রাব) করার নাম করিকি বার হি আসবু। লোকটা কুমা (কোনদিকে) যায় তকে তকে রইবু। কুন (কোন) গেরামে ঢুকলা দেখিকি আমার কোতরে (কাছে) খবরটা দি যাবু। নাহিলে শ্যাম আজার (মায়ের বাবা বা পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি) ঘরে যাইকি খবরটা দিবু।

এ পরিকল্পনায় ভারী খুশী নিতাইচন্দ্র। পড়াশোনায় আদপেই তারমন বসে না। কিন্তু এসব কাজে ছেলেবেলা থেকেই সে পারদর্শী। তাই বয়েসের তুলনায় তাকে অনেক বেশি করিতকর্মা দেখায়।

নিতাই-এর লেখাপড়ায় মন না থাকলে কি হয়, পদ্ম তাকে নিজের মনের মত করে মানুষ করবার চেষ্টা করছে। মরার আগে নিতাই-এর বাবার সত্যদর্শন হয়েছিল। সে বলেছিল, তার ছেলে যেন তার মত চৌকিদার না হয়। কিন্তু পদ্ম আর একটু বেশি ভেবেছে, তার ছেলে যেন লেখাপড়া শিখে কোনদিনও সরকারি চাকুরে না হয়।

পদ্ম ছেলেকে রামায়ণ, মহাভারত পড়ে পড়ে শুনিয়েছে ছেলেবেলা থেকেই। ইদানিং সে তাকে মুখে মুখে শোনাচ্ছে আনন্দমঠের গল্প। কোন্ ছেলের না ভাল লাগে গল্প শুনতে। আবার পদ্ম যখন গল্প বলে, তখন সেটা আর নিছক গল্প থাকে না, সেটা হয়ে যায় সত্য। চরিত্রগুলো চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারা কথা বলে, গান করে, দরকার হলে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে।

মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোয় নিতাই। পদ্মর কেবল মনে হয় বসন্তদার কথা। নিতাই কি তার বসন্তদার মত হতে পারবে? সে কি তার মত প্রাণটা দিতে পারবে দেশের কাজে? অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে?

চাষার ঘরের ছেলে চাষবাস ভাল করে শিখুক, এটা চায় পদ্ম। সৎ হোক, মানুষ হোক, কিছু লেখাপড়া শিখুক, ব্যস। বেশি লেখাপাড়া শিখলে নতুন নতুন পোশাক, নতুন নতুন জুতো পরতে চাইবে। না লাগাবে গায়ে হাওয়া, না লাগাবে গায়ে ধুলো। মাটির সঙ্গে মনের যোগ না থাকলে কি মানুষ হয়। ভারতমাতাকে ভালবাসতে চাইলে আগে বুক ভরে মাটির গন্ধ টেনে নিতে হবে।

এসব পদ্মর মনের গোপন অনুভূতির কথা।

মাঝে মাঝে গভীর রাতে মনে পড়ে মানুষটাকে। অতি সাদামাঠা একটা মানুষ। ছোট ছোট সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা নিয়ে ছিল তার জগৎ। সে দেশকে স্বাধীন করার কথা ভাবতে পারত না। প্রতিদিন তার কাজটুকু কিন্তু সে নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেত। সেখানে তার কোন ফাঁকি ছিল না।

পদ্মকে মানুষটা ভালবাসত পাগলের মত। এই ছোট মাপের মানুষটার বুকখানা তখন এতখানি চওড়া হয়ে যেত। পদ্মর শরীরে এখনও সে উত্তাপ লেগে আছে।

পদ্ম ভাবে, কতবার সে মানুষটাকে চাকরি ছাড়তে বলেছে, কিন্তু সে তা ছাড়েনি। যেদিন নিজের থেকে ছাড়ল সেদিন সবকিছু ছেড়ে সে চলে গেল।

কাজের ছেলে নিতাই। ঠিক লেগে আছে জীবন তহশীলদারের পিছু পিছু। পুকুরে, মাঠে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে চলেছে জীবনের পিছু পিছু। গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে, কখনো

BanglaBook.org

বা পথের বাঁকে বাঁকে। তাকে সন্দেহ করে কার সাধ্যি। একটা ইস্কুল পালান ছেলে, টইটই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে প্রান্তরে।

কিন্তু জীবন তহশীলদারের সঠিক খবরটা পৌঁছে যাচ্ছে ঠিক জায়গায়। স্বেচ্ছাসেবকরা হদিস পেয়ে ছুটছে সেখানে। জীবন তো চোখ কপালে তুলে হাঁ হয়ে বসে আছে। কে দেয় খবর। বাড়ি থেকে বেরোয় সে চুপিচুপি। পড়শী তো দূরের কথা ঘরের মানুষকেও সে বলে আসে না তার মনের কথা। কিন্তু সে যে গাঁয়ে ঢুকল সে গাঁয়ে দু'একটা বাড়ি সারতে না সারতেই পৌঁছে গেল ভলেনটিয়ারের দল। তার সামনেই শুরু করে দিল বক্তৃতা। অমনি বেঁকে বসল সব লোক। কে কবে ট্যাকের টাকা আপসে বের করে দিতে চায়।

হার মানতে হল জীবনের মত ঝানু তহশীলদারকেও। ভালবেসে নিতাইকে প্যান্ট জামা বানিয়ে দিলেন শ্যামবাবু। পদ্ম আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, বাবা, তুমি ত জ্ঞানী লোক, দেশের কাজের পুরস্কার কি টাকা পইসা? ওকে প্যান্ট জামা দিল আইজ। কাল যখন আবার কুন কাজ কোরবে তখন আবার কিছু পাবার তরে চাঁই রইবে। ও লোভী হি যাবে বাবা, দেশের কাজ করি পারিবেনি।

শ্যামবাবু হেসে বলেছিলেন, তোমার পেটে যে জন্মেছে মা, সে আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনার নিতাই হয়ে এসেছে। লোভের খাদ ওকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারবে না।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সালের ভেতর পুলিশ যে অত্যাচার চালাল, অচিরেই সন্ত্রাসবাদীদের হাতে তার ফল পেতে হল তাদের। তিন তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রাণ হারাল মেদিনীপুরে। বিপ্লবী যুবকদের কেউ প্রাণ দিল পুলিশের গুলিতে, কেউবা ফাঁসি কাষ্ঠে। বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ নিয়ে গান বাঁধল গ্রাম্য কবিরা। সে গান আকাশে বাতাসে ঢেউ তুলল। তাদের নির্ভীকতার কথা মানুষের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

পদ্মার চোখে ঘুম নেই। মাঝরাতে সে বিছানার ওপর উঠে বসে। তার বুকখানা যেন খোলা প্রান্তর, তার ওপর দিয়ে হু হু করে বইতে থাকে সমুদ্রের হাওয়া। একটা চাপা কান্না বিনিয়ে বিনিয়ে চলতে থাকে বুকের মাঝে। সে অন্ধকারে হাত জোড় করে থাকে। কার কাছে সে প্রার্থনা জানাবে এইসব বিপ্লবীদের জন্য? কি প্রার্থনাই বা জানাবে? ওদের আত্মার শান্তি কামনা করবে ঈশ্বরের কাছে? না, তা সে করবে না। যতদিন ভারত স্বাধীন না হয় ততদিন ওদের অশান্ত আত্মা প্রতিটি ভারতবাসীর আত্মার মধ্যে আশ্রয় লাভ করুক। শুরু হোক দহন। বিপ্লবীদের জ্বালান আগুনে প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরের দহন।

পদ্মা স্বপ্নের ঘোরে যেন ছুটতে থাকে তার নিতাই-এর হাতখানা ধরে। যেখানে আগুন সেখানেই পদ্মা বাড়িয়ে দেয় হাত। সে হাতের তাপ দিয়ে স্পর্শ করে সন্তানের ললাট। মুখে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে, তোকে সঁপি দিলি এই দহনের মাঝুর, তুই দুহাতে আগুন লিকি খেলা কর।

সম্বিত ফিরে এলে দেখে তার একখানা হাত ছুঁয়ে আছে নিতাই-এর ঘুমন্ত ললাট।

হঠাৎ ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে পদ্ম। বসন্তদা, বসন্তদা, তুমি দেখি যাও, যে আগুন তুমি জ্বালিই দিল সে আগুন চারুবাড়ে কিধ্‌রা (কি রকম) ছড়িই পোড়ছে। বসন্তদাগো, তুমি অকালে চালি গেল, এ দৃশ্য দেখি যাইতে পারলনি।

ঘুম থেকে জেগে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে নিতাই। সে অন্ধকারে অবাক হয়ে তাকায় মায়ের মুখের দিকে। চিরদিন সে তার মাকে দেখে এসেছে নির্ভীক সাহসীর মূর্তিতে। সেই মা আকুল হয়ে কাঁদছে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। কোন কথা না বলে সে মাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে।

পি. জি. গ্রিফিথ্‌স্ এসেছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। শুরু করে দিয়েছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। ব্রিটিশ প্রভুদের শক্তির গুরুত্ব বোঝাতে আদেশ দিয়েছে সৈন্য দলের রুটমার্চের।

BanglaBook.org

গ্রামের ভেতর ফাঁকা প্রান্তরে শুরু হয়েছে কুচ কাওয়াজ। মিলিটারীরা কিভাবে মার্চ করে যায়, কিভাবে তারা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে সবকিছু দেখান হচ্ছে মক্-ফাইটের মাধ্যমে।

গ্রাম গ্রামান্তের লোক ভেঙে পড়ে এ দৃশ্য দেখতে। নিতাই আর তার বন্ধুর দল ভীড়ের চাপে ভাল করে দেখতে পায়না সৈন্যদের কুচকাওয়াজ। তাদের চেয়ে দর্শকদের ভেতর প্রায় সবাই লম্বা। অমনি মতলব ভাঁজে নিতাই। তিন বন্ধুতে তারা চড়ে বসে একটা বটগাছের উঁচু ডালে। এবার তাদের বাধা দেয় কে? প্রতিটি দৃশ্য তারা যেন উন্মুখ আগ্রহে গিলতে থাকে।

লক্ষ্যভেদের খেলা চলেছে। দূরে বাঁধের ওপর সারি সারি খুঁটি পোতা। ওই খুঁটির মাথা থেকে ঝুলছে জলে বোঝাই হাঁড়ি। গ্রুপ কমাণ্ডার আদেশ দিতেই শুয়ে পড়ল সৈন্যদল। তারপর রাইফেল উঁচিয়ে সেই শায়িত অবস্থায় চালাতে লাগল গুলি। জলভরা হাঁড়িতে গুলি লেগে ওপর দিকে ছল্‌কে উঠছে জল। একের পর এক ভেঙে পড়ে যাচ্ছে হাঁড়িগুলো।

নিতাই আর তার বন্ধুরা বাহবা দিচ্ছে তাদের।

এরপর সঙ্গীন উঁচিয়ে ছুটেছে সৈন্যদল শত্রুপক্ষকে নিধন করতে। তাদের উদ্যত সঙ্গীন ঝক্‌ঝক্ করছে সূর্যালোকে। মাঠের পশ্চিম প্রান্তে শত্রুরা দাঁড়িয়ে। লাঠির তৈরি মানুষ, বুক আর পিঠ খড় বোঝাই বস্তা। সৈন্যরা ছুটে গিয়ে ওই বস্তায় চালিয়ে দিচ্ছে বেয়োনেট। একবার নয়, প্রবল বিক্রমে. দু'তিন বার।

তারপর কোমরে আটকানো ভোজালি নিয়ে ছুটল পুব দিকে। সারি সারি কলাগাছ আগে ভাগেই পুঁতে রাখা হয়েছে সেখানে। এবার ভোজালির কোপে কাটা পড়তে লাগল কলাগাছের সারি।

বটগাছের ওপর বসে খুশিতে ফেটে পড়ল নিতাইরা তিন বন্ধু।

পরের দিন গুল্‌তি আর ছুরি নিয়ে বেরিয়ে গেল নিতাই। গুল্‌তি চালিয়ে লক্ষ্যভেদ অভ্যেস চলল। একটা নিরীহ পাখিকে গুল্‌তির ঘায়ে আত্মবলি দিতে হল।

এরপর ছুরি চলতে লাগল কলাবাগানে। ফলন্ত গাছগুলিও রক্ষা পেলনা সৈনিক নিতাই-এর হাত থেকে।

সকাল থেকেই নিতাই ছোটে মিলিটারী ক্যাম্পের দিকে। কারণ, আগে ভাগে যেতে না পারলে অনেক জিনিসই হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সকালে সৈন্যগুলো এনতার সিগারেট ফোঁকে। তারা খালি কৌটোগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেগুলো কাড়াকাড়ি করে কুড়িয়ে নেওয়া এক উত্তেজনার ব্যাপার। এ' কয়েকদিন তিন তিনটি বাক্স সংগ্রহ করেছে নিতাই। সেগুলো লুকিয়ে রেখে দিয়েছে পলখড়ের গাদার ভেতর। মাকে দেখাবার সাহস নেই তার। এই অমূল্য সম্পদ সংগ্রহের জন্য ইস্কুল ফাঁকি দিতে হয়েছে তাকে।

কিন্তু পদ্মর চোখকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নয়। সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, যে নিতাই স্কুলে যাবার নামে বিছানা ছাড়ে না, সে-ই ভোর হতে না হতে তাকে তাগাদা দিয়ে ওঠায়। জামা কাপড় পরে বই পত্তর হাতে পড়ি কি মরি করে ছোটে।

আজ সকালে কলাবাগানে তৈরি কলার কাঁদিটা কাটতে গিয়ে চোখ পড়ল কলাগাছগুলোর তীক্ষ্ণ ছুরি-বিদ্ধ চেহারা। গভীর সন্দেহ হল নিতাই-এর ওপর। কারণ, কাল রাতে সামান্য কি একটা দরকারে হাতর কাছে ছুরিটা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পল খড়ের গাদা থেকে ছাতু তুলতে গিয়ে সব রহস্যের সমাধান হল। খড় চিরে কে যেন কি ঢুকিয়ে রেখেছে। পদ্ম হাত চালিয়ে দিতেই কৌটোগুলোর সন্ধান পেল।

ঠিক ইস্কুল ছুটির সময় ফিরে এলো নিতাই।

শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। মায়ের মুখের সামনে চোর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিতাই।

যেন কোন জ্ঞান নেই পদ্মর। ছেলেকে মারছে তো মারছেই। আর ছেলেটাও এমন টুঁ শব্দ নেই মুখে। ছেলে যত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মার হজম করছে, পদ্মর ক্রোধও তত চড়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

শেষে মার খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে যখন ধরাশায়ী হল নিতাই তখন রাগ পড়ে শোক ওথলালো পদ্মর। সারাদিন ছেলেকে আগলে বসে রইল। নাওয়াল, খাওয়াল, বিছানায় শুইয়ে গল্প শোনাল। শেষে বলল, ও লোকগুলো ভালা না বাবা। বন্ধুক লি কিরি আমার মনকে মারবার তরে আসুছি। ওরমনকের ছুঁড়ি দওয়া কৌটা লিকি কি হবে বাবা। রাস্তার ডগা (ঢেলা) লিকি খেলা কর, সে অনেক ভালা। কুত্তাকে যমন থাবার ছুঁড়ি ছুঁড়িকি দেয়, তুমারমনকেও কুত্তা ভাবিকি কৌটা ছুঁড়ি ছুঁড়িকি দিচ্ছে। কুত্তাগুলা যন্ কাড়াকাড়ি করিকি খায়, তুমারমনেও কাড়াকাড়ি করিকি কৌটা গুড়িইছ (কুড়িয়েছ)। ওর মনে হাততালি দিছে, কখন বা লাঠি লিকি খেদিইছে (তাড়া করেছে)।

নিতাই খুব বুঝদার ছেলে। সে বলে, মা, আমি রতন আর বিশুকে আমার কৌটাগুলা দি দিবা।

পদ্ম সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে, রতন, বিশু তোর বন্ধু না?

হঁ মা।

তাহিলে খারাপ বলিকি তুই যেটা পেকিই দিবু (ফেলে দিবি) সেটা বন্ধুর হাতে তুলি দিবু কি করিকি?

দিবানি মা।

পরের দিন ইস্কুল যাবার জন্যে নিতাই বেরুল। কৌটোগুলো কোচড়ে বাঁধা। মিলিটারী ক্যাম্পের পাশ দিয়ে ইস্কুলে যাবার পথ। নিতাই ক্যাম্পের পাশে এসে থমকে দাঁড়াল। মুখে বিড়বিড় করে বলল, আমারমনে (আমরা) কুত্তা নয় যে তুমারমনে যাউ (যা) ছুঁড়ি দিব তাউ লিবা।

বলতে বলতে কোচড় থেকে কৌটো বের করে তারের বেড়ার ওপারে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

দুটো মিলিটারী ম্যান বসে বসে মৌজ করে সিগারেট ফুঁকছিল। একজন পাহারাদার সঙ্গীন খাড়া করে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল। নিতাই-এর কাণ্ড দেখে পাহারাদারের পা থেমে গেল। সিগারেট খাচ্ছিল যারা তাদের হাতে ধরা রইল সিগারেট। তাদের কৌতূহলের শেষ নেই। যারা প্রতিদিন কৌটোর লোভে ভীড় জমায়, একটু আগেও জমিয়েছিল, তাদেরই মত একটা ছেলে কৌটো ক্যাম্পের ভেতর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে কেন!

উঠে এল দুটো মিলিটারী। নিতাইকে তার এরকম আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করল। প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর হিন্দিতে। কিছুই বুঝল না নিতাই। তবে আকার ইংগিতে একসময় বুঝল তাদের কথা। সেও অমনি তার ভাষায় হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল, এমন কুকুরের খাবার সে আর কাড়াকাড়ি করে তুলে নেবে না।

ওরা ভাবল, খালি কৌটো বলে ছেলেটা নিতে চাইছে না। একজন ভেতরে গিয়ে সিমারেট ভর্তি একটা কৌটো এনে ওর হাতের দিকে এগিয়ে ধরল।

জোরে জোরে মাথা নাড়ল নিতাই।

অন্য আর একজন মিলিটারী বন্ধুকে বলল, আরে ও তো বাচ্চা, সিগারেট খেতে শেখেনি এখনও। দাঁড়াও দাঁড়াও আমি বিস্কুটের টিন আনছি।

বিস্কুটের টিন আনা হল। টিন খুলে বিস্কুট বের করে এগিয়ে দেওয়া হল। নিতাই আরও জোরে মাথা নাড়তে লাগল। খাবার দিয়ে তাকে কেনা যাবে না।

মজা পেয়ে গেছে মিলিটারী দুটো। তারা নিতাইকে দিয়ে বিস্কুট নেওয়াবেই। শেষে পুরো বিস্কুটের টিনটাই তারা চাপিয়ে দিলে নিতাই-এর মাথায়।

নিতাই কিন্তু হাত দিয়ে টিন ধরল না। অমনি জেদ চেপে গেল মিলিটারী দুটোর। তারা জোর করে নিতাই-এর দুটো হাত চেপে ধরল বিস্কুটের টিনের ওপর। মিলিটারীরা হাত ছেড়ে দিতেই নিতাইও হাত ছেড়ে দিল। অমনি টিনটা পড়ে গেল মাটিতে। ছড়িয়ে পড়ল টিনের বিস্কুট।

BanglaBook.org

মিলিটারী দুটো রাগে তখন কাঁপছে। একজন ধরে রইল নিতাই-এর হাত, অন্যজন ক্যাম্প থেকে নিয়ে এল চাবুক।

এক ঘা পড়তেই পিঠ বেঁকে গেল নিতাইএর। অন্য মিলিটারীটা ওর ঘাড়ে ধরে মাথাটা নুইয়ে দিয়ে বলছে, কুড়ো, কুড়িয়ে নে, নইলে নিস্তার নেই।

মাটিতে পড়ে গেল নিতাই তবু একটাও বিস্কুট তুলল না।

রাগে ফুঁসছে মিলিটারী দুটো। বেহেড ছেলেটার মুখে পিঠে সপাসপ চালাতে লাগল চাবুক। কিছুক্ষণের ভেতরেই আধমরা হয়ে গেল নিতাই। অমনি দুটো মিলিটারী ওর একখানা হাত আর একখানা পা ধরে শূন্যে তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে এল রাস্তার ওপারে নয়নজলির ধারে। ফিরে আসার সময় নিজেদের ভেতর বলাবলি করতে লাগল, এইসব বেয়াদব বাচ্চাগুলোই তো পরে বড় হয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে শ্লোগান ঝাড়বে।

স্কুলের ছেলেরাই ফেরার পথে নয়নজলির ধারে আবিষ্কার করল নিতাইকে। অবশ্য পথ চলতি কিছু লোক আগেই একটি ছেলেকে পড়ে থাকতে দেখেছিল, কিন্তু কৌতূহলী হলেও তারা মিলিটারী ক্যাম্পের সামনে থেকে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যেতে সাহস পায় নি। কি জানি, কোন অন্যায় কাজ করতে গিয়ে হয়ত মিলিটারীর কোপে পড়ে শাস্তি পেয়েছে।

ছেলের দল অতশত বোঝে না। তারা হেঁইও হেঁইও করতে করতে নিতাইকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেল তার বাড়ি।

জ্ঞান ফিরল ছেলের অনেক বেলায়। খবর পেয়ে ছুটে এলেন শ্যাম জানা। ছুটে এল কংগ্রেসী ভলানটিয়াররা। নিতাই ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছে। গাঁদাপাতার থেতো দিয়ে সারা পিঠ বাঁধা।

পদ্ম বলল, শুই পড় বাবা।

কে শোনে কার কথা। জ্ঞান ফিরে একবাটি দুধ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে নিতাই। সে হাত নেড়ে সবাইকে বলছে তার মার খাওয়ার আনুপূর্বিক ঘটনা।

শ্যাম জানা নিতাই এর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, এতটুকু কচি একটা বাচ্চাকে কি রকম জানোয়ারের মত ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে দেখেছ।

পদ্ম বলে উঠল, দীক্ষা হি গেলা, বাবা দীক্ষা হি গেলা। মার নেই খাইলে দেশের কাজে দীক্ষা হবে কি করিকি।

নয়

প্রহ্লাদ দফাদারের বউ পদ্মর হাতখানা চেপে ধরে বলল, ঠাকুরঝি আমার গটে (একটি) কথা রাখতে হবে তুমাকে।

কও কি কথা? নাই শুনিকি বি কথা দিলি, রোখবা। তুমি আমার পেহ্লাদদার বউ, তুমার কথা রাখবা নি ত কার কথা রাখবা গো?

প্রহ্লাদ দফাদার তার ঘরের দাওয়ায় বসে থেলো হুঁকোয় তামাক টানছিল। সে তার বউ আর পদ্মর কথা কান পেতে শুনছিল। এই মুহূর্তে তার মনেও একটা উত্তেজনা। পদ্মর উত্তরের ওপরে অনেকখানি নির্ভর করছে বৈকি।

প্রহ্লাদ দফাদারের বউ বলল, আমার সরমাকে তুমার পায়ে রোখি দিবা। তাকে তুমার বউ করিকি লিতে হবে।

প্রহ্লাদের হুঁকোর ভুড়ভুড়ি বন্ধ হয়ে গেল। সে কান খাড়া করে রইল পদ্মর উত্তরটুকু শোনার জন্য।

পদ্ম ক্রমাগত মাথা নেড়ে তার অসম্মতি জানাতে লাগল। মুখে কিছু বলল না।

একটা হতাশা নেমে এসেছে সেই মুহূর্তে প্রহ্লাদ আর তার বউএর মুখে।

BanglaBook.org

এবার মুখ খুলল পদ্ম, আমার সরমা কি পথের ধুলা যে তাকে পায় রোখবা। যে, ঘরে বউ হি কি আইসবে, সে ত লক্ষ্মী। তাকে মথায় করিকি রোখতে হয়। সরমা আমার মথার ঠাকুর না, নিতাইএর মতন সে আমার বুকের ধন।

পদ্মর কথা শুনে আনন্দে আবেগে কেঁদে ফেলল প্রহ্লাদের বউ। প্রহ্লাদ বলে উঠল, দ্যাখ রে, আমার ভন (বোন) উত্তরটা কি দিলা দ্যাখ।

পদ্ম ডাক দিল সরমাকে। বড় মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে সরমা। সারাদিন ঘরের কাজে সাহায্য করছে মা বাবাকে। বছর দুয়েক ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেছে তার। লেখাপড়াও শিখেছে কিছু কিছু। পদ্ম মাউসী (মাসী), বাবা, এরা যে দেশের কাজ করছে, বারো বছরের মেয়ে হলে কি হয়, এসব সরমার অজানা নয়। সেও মাঝে মাঝে পদ্ম মাসীর সঙ্গে গেছে সভা, শোভাযাত্রায়।

পদ্মর ডাক শুনে ঘর থেকে সরমা বেরিয়ে এলো। পদ্ম তাকে কাছে ডেকে একেবারে পাশটিতে বসালে।

বলল, মা মণি তুমার নিতাই দাদাটা তুমাকে খুম্ (খুব) মারে না গ?

সরমা কথাটা সলজ্জভাবে মাথা নেড়ে অস্বীকার করল। অমনি পদ্ম তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ভুলি গেল। পিঠের দাগটা কি মিলিই গেলা?

এ কথার পিছনে ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে। নিতাই প্রায়ই প্রহ্লাদ মামুর বাড়িতে আসত, খেত, থাকত। সে খেলাধুলো করত সরমার সঙ্গে। সরমা তার বশংবদ চেলা। যেখানে নিতাই সেখানে সরমা। নিতাইদা, নিতাইদা করে পেছন পেছন ঘুরত আর ফাইফরমাস খাটত।

নিতাই তাকে নিয়ে অভিনয় করত, স্বদেশী আন্দোলনের অভিনয়। যা সে দেখত চোখের সামনে, শুনত মায়ের কাছে।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিত নিতাই। ভাষা সাজিয়ে, কথা গুছিয়ে বলতে না পারলেও উত্তেজনায় ভরপুর। শ্রোতা একমাত্র সরমা। বক্তৃতার শেষে হাততালি না দিলে বক্তা নেমে এসে শ্রোতার কান ধরে শিখিয়ে দিত তার করণীয়গুলো। কাঁদ কাঁদ হয়ে শ্রোতা হাততালি দিয়ে তার ভ্রম সংশোধন করত।

একরাতে মায়ের কাছে শুয়ে নিতাই শুনল পদ্মর ওপর পুলিশের অত্যাচারের কাহিনি। তাকে কেমন করে পুলিশের লোক গাছের সঙ্গে বেঁধেছিল, কেমন করেই বা তার পিঠের ওপর চাবুক চালিয়েছিল।

শুনতে শুনতে উত্তেজনায় কাঁপছিল নিতাই।

পদ্ম ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, মনের জোরে সবু সহ্য করা যায় বাবা। কাপুরুষ এক ঘা খাইকি কাৎ হি পড়ে।

পরের দিন ছুটল নিতাই প্রহ্লাদ মামুর বাড়ি। সরমাকে নিয়ে চলল মাঠের মাঝখানে একটা নিমগাছের কাছে। কাল রাতে মায়ের মুখে শোনা ঘটনার অভিনয় হবে। প্রথমে মায়ের ওপর অত্যাচারের ঘটনাটা বুঝিয়ে দেওয়া হল সরমাকে। তারপর গরু বাঁধার একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা হল সরমাকে নিমগাছের সঙ্গে। এরপর গোপী দারোগার ভূমিকায় দাঁড়াল নিতাই।

সরমা উৎসাহে ভরপুর। নিতাইদা বলেছে, দেশের কাজ করতে হলে কোন কিছুতে ভয় পেলে চলবে না।

প্রথম বেত পড়ল ভাবী দেশ-সেবিকার পিঠে। তাতেই শুরু হয়ে গেল পরিত্রাহি আর্তনাদ। পিঠ ফেটে দাগ বসে গেল।

নিতাই দারোগা এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলে দিল বন্দীর। পিঠে হাত বুলোতে যেতেই সরমা কামড়ের দাগ বসিয়ে দিল হাতে। আশ্চর্য, একটুও আঃ উঃ করল

BanglaBook.org

না নিতাইদা। তখন নিজেই লজ্জা পেল সরমা। সে নিতাইদার হাতখানা টেনে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করতে লেগে গেল।

এ ঘটনা চাপা থাকে না, তাই দু' বাড়িতেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কেউ প্রথমে মুখ ফুটে না বললেও দুজনের হাতে পিঠের দাগই দুজনকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

ষোল বছরের ছেলে নিতাই আর বারো বছরের মেয়ে সরমা। পদ্ম সরমাকে অনেক আদর করে শেষে কাজে যেতে বলল। সরমা চলে গেলে পদ্ম বলল, দাদা, আমার একটি অনুরোধ অছি।

প্রহ্লাদ বলল, তুমার অনুরোধও আমি রক্ষা করবা।

সরমাকে আমি নিতাইর বউ করি ঘরে তুলবা, এ পাক্কা কথা, তবে বছর দু'এক এরমনকে (এদের) বোড়ো হি উঠার সময় দও।

পহ্লাদ বলল, ঠিক অছি দিদি।

পদ্ম আশ্বাস দিয়ে বলল, আইজনু (আজ থেকে) ও কিন্তু আমার ঘরের বউ। তুমারনকের কুন অধিকার রইবেনি অর উপরে। খালি তুমার দরে আমার মা মণিকে রখি গেলি, সময় বুঝিকি লি যিবা।

কথা রেখেছে পদ্ম। তিন বছর পরে নতুন বউটি সেজে সরমা এসেছে তার নিতাইদার বাড়ি। পদ্ম সত্যিই সরমাকে তার বুকে তুলে নিয়েছে।

উনিশ বছরের ছেলে হলে কি হয়, পদ্মর মত সুন্দর আর লম্বা চওড়া হয়েছে নিতাই। রঙটা শুধু বাপের মত মাজা শ্যামল। বড় সড় পুরুষালি চেহারা হয়েছে ইতিমধ্যে।

নিতাই যখন চাষের কাজ করে তখন ঘরের জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে পদ্ম। নিতাই যখন লাঙল চষে তখন তার বলিষ্ঠ দেহের প্রতিটি পেশী ফুলে ফুলে ওঠে। আবার সে যখন বৃষ্টির জলে ভিজে গান গাইতে গাইতে ধান রুইতে থাকে তখন আষাঢ়ের ধেয়ে আসা নবীন মেঘের মত তাকে মনে হয়। তেমনি রঙ তেমনি বাতাসের বুকে বেজে ওঠা মেঘের গান।

পাখিয়া মাথায় দিয়ে নিতাই এর জন্যে খাবার নিয়ে যায় সরমা। দুজনে কিছু কথা বলে। অস্পষ্ট সেকথা। বাতাস অন্য কারো কানের কাছে তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। সে কথা শুধু দুজনের, বিশ্ব সংসারে আর কারো নয়। বাঁশের সবুজ পাতার মত থর থর করে দুটি হৃদয় কাঁপে সে কথার ছোঁয়ায়। পদ্মর চোখে জল আসে ওদের দিকে চেয়ে। সে জীবনে এমনি একটা ছবি হতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সে পারেনি। আজ ছেলে বউএর ভেতরে সে ছবি ফুটে উঠতে দেখে গভীর আনন্দে চোখ বেয়ে জল নামে।

শ্যামা আজা (দাদু) যেদিন নিতাইএর বাড়িতে আসেন সেদিন সারা বাড়িটা যেন উৎসবে মেতে ওঠে। নাতি আর নাত বউএর সঙ্গে সারাক্ষণ চলে রঙ্গরসিকতা। যেদিন আসেন সেদিন কিছু না কিছু জিনিস বয়ে আনেন হাতে। উঠোন থেকেই হাঁক পাড়তে থাকেন, কই গো নাত্‌বউ ধর, তোমার জন্যে আজ বাটা মাছ আনলাম। পছন্দ হয় কিনা দেখ।

নিতাই অমনি বেরিয়ে পড়ে বলে, এ ত বেশ হিলা। আগুর (আগে) যা লি আসত লাতির হাতে তুলি দিত। অখন লাত্‌বউ হিছে নয়নের মণি।

শ্যাম জানা বলেন, টাকার চাইতে সুদের স্বাদ বেশি রে ভাই। আমার মত বয়েস হলে তখন জানতে পারবি।

সরমা এসে মাছ নিয়ে যায়। শ্যাম জানার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসে। মুখে বলে, আজা মশায়, বোড়ো হিংসুক আপনার ওউ লাতিটা।

শাসনে রাখতে হয় ভাই। লাগাম ছাড়লেই বিপদ।

BanglaBook.org

সরমা বলে, আইমা (দিদিমা) তাহিলে আপনাকে লাগাম দি রোখছে?

লাগাম বলে লাগাম, একটি পা বাইরে ফেলেছ কি কৈফিয়ৎ দিয়ে আসতে হবে।

এবার চঞ্চল হয়ে ওঠেন শ্যাম জানা। পদ্ম মা কই, তাকে দেখছি না যে?

নিতাই বলে, সরমাকে ঘরে রাখিকি আইজকাল মা যে কুন্‌ট্‌কে (কোথায়) চালি যায় কে জানে। কাজ সারিকি ফিরতে ফিরতে বেলা গড়ায়।

শ্যাম জানা গালে হাত ঠেকিয়ে বলেন, দেশের অবস্থা খুব ভাল নয় নিতাই। যুদ্ধ চলছে চারদিকে। সব জিনিসের দাম বাড়া। মানুষগুলোকে যেন যাঁতা কলে পিষে মারা হচ্ছে।

কিন্তু আজ মা কইথ্‌লা (বলেছিল) একটা নাকি মস্ত সুযোগ আসুছি, ইংরাজকে ঘা দিবার।

আমিও শুনছি নাতি, তবে সঠিক এখনও জানতে পারিনি।

শ্যাম জানা মশায় আদর্শবাদী খাঁটি লোক। তিনি বাজারে বড় ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সরকার তাঁকে নিরুপদ্রব, নিরীহ ব্যক্তি হিসেবেই চিহ্নিত করে রেখেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি ঘোরতর দেশপ্রেমিক। নানাভাবে তিনি সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করে রেখেছেন সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানগুলিকে। অনেকগুলি স্কুলে তাঁর বেশ বড় রকমের দান আছে, কিন্তু অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও তিনি কোন কমিটির ভেতর যাননি। মানুষটি কর্মযোগী কিন্তু নামের ব্যাপারে নির্লোভ. আর এইখানেই তাঁর মিল পদ্মর সঙ্গে। পদ্মর রক্তে দেশপ্রেম, কিন্তু পদ্ম কোনদিন নাম চায় না। কোন কংগ্রেস কমিটির ভেতর তার নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। কর্মী হিসেবেই সে চিরদিন পরিচিত থাকতে চায়। খাঁটি মানুষ দেখলেই পদ্মর মাথা আপনি নত হয়ে আসে। তিনি একজন আদর্শবাদী শিক্ষকই হোন্ অথবা স্বধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থ।

দশ

সত্যিই সুযোগ এল। উত্তাল হয়ে উঠল সারা ভারতভূমি। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট গৃহীত হল সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাব—ইংরাজ, ভারত ছাড়।

সারা ভারত যেন উদ্বেলিত মহাসমুদ্র। দিকে দিকে চলছে মিছিল। যেন মহাসমুদ্রের কোটি কোটি তরঙ্গ প্রবাহ।

ইংরাজ সরকার আরও নির্মম আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। তাদের অত্যাচার হয়ে উঠল সীমাহীন। তারা দেশের আন্দোলনের কর্ণধারদের নিক্ষেপ করল কারাগারে।

কতক্ষণ চলতে পারে কর্ণধারহীন তরণী? অত্যাচারের আবর্তে অচিরেই ঘটবে তার সলিল সমাধি।

কিন্তু ইংরাজের সব হিসাব ভুল হয়ে গেল। এগিয়ে এল ভারতের যুব সমাজ। এগিয়ে এল হাটে মাঠে ঘাটে খেটে খাওয়া মানুষের দল।

'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধ্বনিতে বিদীর্ণ হল আকাশ। সে ধ্বনি বাজতে লাগল বুকের মধ্যে।

স্কুল কলেজ থেকে স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে ছেলের দল। তারা হাতে নিয়েছে আন্দোলনের ভার।

পদ্ম উঠে দাঁড়ায় সভার মাঝখানে। উর্ধ্ব অঙ্গের বাস খুলে ফেলে নতুন দিনের ছেলেদের দেখায় তার পিঠের ওপর অত্যাচারের নির্মম চিহ্ন। আগুন জ্বলতে থাকে চোখে। বলে, বাপসকল, গুলামের বাচ্চামনে আমার শরীরের উপরে যে অত্যাচার করছে সেটা শুধু আমার বলিকি মনে করবনি, সে অত্যাচার তুমারমনকের মা ভগ্নীর উপর হইছে। এ অত্যাচারের, এ অপমানের শোধ তুমারমনে তুলব ঔ আশা লিকি আমি বাঁচি আছি। যদি ছেলে মার অপমান মুখ বুজিকি সহ্য করে তাহিলে দেশে 'মা' বলিকি ডাক আর রইবেনি।

BanglaBook.org

বাপসকল, বুকে আমার আগুন জ্বলছে। তুমারমনে মার বুকের আগুনে মশাল ধরিকি ছুটি চল। ইংরাজের থানা, অফিস, জেলখানা, যা অছি সব জ্বালিই পুড়িই ছাই করি দও। নিজের মা ভগ্নীর অপমানের শোধ তুলি লও। উত্তাল জনতা, জ্বলে ওঠে মশাল, ছাই হয়ে যায় সরকারী সবকিছু।

কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেছে, প্রতিটি থানার মানুষ পরিস্থিতি অনুযায়ী গ্রহণ করবে ব্যবস্থা। সেখানে নির্দেশ আসবে অন্তরের কাছ থেকে, অন্য কোন নির্দেশ নেই।

পুলিশ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। তারা ক্ষিপ্ত কুকুরের মত হয়ে উঠেছে। গুলি চলেছে আন্দোলনকারীদের ওপর। নির্বিচারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে শত শত যুবক।

সংগ্রামী মানুষ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে সরকারি যোগাযোগ। পুড়িয়ে দিচ্ছে নদী পথে সরকারি রসদবাহি নৌকো। বন্দী করছে সরকারি অফিসারদের।

এগিয়ে এল একদল কৃষক যুবক রাতের অন্ধকারে। কাটিয়ে দিতে হবে কাঁথি-দীঘার প্রশস্ত সড়ক। বন্ধ করে দিতে হবে সরকারি যানবাহনের পথ। দলের নায়ক নিতাই দাস। চওড়া কাঁধের ওপর কোদালখানা ফেলে অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। পেছনে তাকে অনুসরণ করছে কালো কালো কতকগুলো ছায়ামূর্তি।

ঘর থেকে বেরিয়ে আগে নিতাই মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পড়েছিল কতক্ষণ। পদ্ম চোখ বন্ধ করে হাত রেখেছিল ছেলের মাথায়। ঠিক সেই মুহূর্তে পদ্মা অনুভব করেছিল আর একখানা হাত তার নিতাই এর মাথায় এসে পড়েছে। পদ্ম চিনেছিল সে হাতের অধিকারীকে। সে হাত কোন সাধারণ মানুষের নয়, বিরাট শক্তিমান এক পুরুষের। যিনি সারাজীবন অফুরন্ত প্রেরণা দিয়ে পরিচালিত করেছেন পদ্মকে। সেই পদ্মর বসন্তদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর হাত পদ্মর ছেলের মাথায়। পদ্ম স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল তার বসন্তদার গলা, জয়ী হও। আমি যেখানে থেমেছি সেখানে থেকে শুরু হোক তোমার জয়যাত্রা।

নিতাই এগিয়ে চলেছে। দুটো সরল উদ্বিগ্ন চোখ সারাক্ষণ তাকে অনুসরণ করে চলেছে। সে চোখ সরমার। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে নিতাই মাকে প্রণাম করেছিল। কিন্তু তারও আগে দেখা হয়েছিল তার সরমার সঙ্গে। বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে সে কোদালের জন্যে একটা বাঁট তৈরি করছিল, ঠিক সেই সময় সেখানে গরু বাঁধতে গিয়েছিল সরমা।

নিতাই বলেছিল, সাঁঝের মুখে মুখে বার হি যির সরমা।

সরমা জানতে চেয়েছিল, ফিরিব কেতেবেলা (কখন)?

মুখে একটুখানি হাসির রেখা টেনে বলেছিল নিতাই, যাবাটা (যাওয়াটা) আমার হাতে সরমা কিন্তু ফিরা ত আমার হাতে নেই।

সরমার গলা ঠেলে কান্না বেরিয়ে এসেছিল। সে কান্নাঝরা গলায় বলেছিল, আমাকে ভয় দেখিইকি কি সুখ তুমি পাও কওত?

নিতাই অমনি গলায় জোর আওয়াজ তুলে বলেছিল, ভয় কিরে? মার কোতরে (কাছে) রইকি তোর ত দেখিঠি খুব উন্নতি হিছে।

সরমা অমনি বলেছিল, মাকে টানঠ (টানছ) কেনি। মার সাঙে (সঙ্গে) কার তুলনা। তার পায়ের নখের যুগ্যি আমি হবা।

এবার কথা না বাড়িয়ে নিতাই বলেছিল, কাজ শেষ করিকি ঝটপট চালি আইসবা।

একটু থেমে আবার বলেছিল, তোর চোখের জল গড়ালে ঘর ছাড়িকি যাইতে আমার পা উঠবেনি বউ।

সরমা মুখে হাসি ফুটিয়েছিল। ঠিক যেন বৃষ্টি থেমে যাওয়া আকাশে বেলা শেষের এক চিলতে আলোর খেলা।

BanglaBook.org

মুখে হাসি ফুটিয়েই বলেছিল, না গো না, তুমাকে যাইতে আমি বারণ করবা কেনি। মার কাছে তাহিলে শিখলি কি। মা কয়, দেশের ডাক বোড়ো ডাক, সব ছাড়িকি যখন বাইরে যাই, তখন কুন দুঃখ রয়নি আমার মনে। কেনি জানু? তুই আমার চোখে নেই—মনে।

নিতাই চলেছে। ঘরের ছবিগুলো একবার চোখের ওপর ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। মা, সরমা, তাদের টুকরো টুকরো কথা। চলে আসার সময় তাদের অনিমেষ চোখে চেয়ে থাকা।

নিতাই—

পেছনের সঙ্গীটির ডাকে নিতাই ফিরে তাকাল। তখন সবাই ফিরে দাঁড়িয়েছে।

দূরে আলেয়ার আলোর মত কি যেন এগিয়ে আসছে। না, একটা নয়, কয়েকটা। ভোমরার মত একটা গুঞ্জন-ধ্বনিও কানে এসে বাজছে।

নিতাই চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, মনে হয় পুলিশের গাড়ি। সামনে সরিষাবেড়িয়ার বটগাছটা অর আড়ে (ওর আড়ালে) ধান গাছের ভিতরে ঝটপট চিৎ হি কি শুই পড়।

দলপতির আদেশে সবাই কোদাল কাঁধে কিছু পথ দৌড়ে গিয়ে ছায়ার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছটাকে আবিষ্কার করল। সঙ্গে সঙ্গে গাছটার আড়ালে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ধান ক্ষেতে।

দুটো জিপ ছুটে আসছে। আর্মড্ পুলিশে বোঝাই। নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে তারা কিছু একটা হতে চলেছে। অথবা কোনকিছু হয়ে যাবার আশঙ্কায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকদিন আগে পুলিশ আর মিলিটারীদের জন্য দুধ, চা, কেরোসিন তেল বোঝাই দুখানা নৌকো রসুলপুর নদীতে ধরে বিপ্লবীরা পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই দারুণ রকম সজাগ আর সাবধান হয়ে গেছে সরকার। জলপথে যে বিপর্যয় ঘটেছে স্থলপথে যেন তা না ঘটে তাই হয়ত এই সাবধানী টহল। সরকারি লোকেদের সরবরাহ অটুট থাকা চাই; না হলে তারা বিপ্লবীদের দমন করবে কি করে।

রাতের অন্ধকার চিরে ঝাঁক ঝাঁক আলোর তীর ছুটে আসছে। গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠছে বাতাস। পথের ধারের বটগাছটা আলোর জলে স্নান করে নিল।

দম বন্ধ করে কটি মৃতদেহের মত ছড়িয়ে পড়ে আছে ওরা। চেয়ে আছে কিন্তু পলক নেই চোখে। একবার তাদের ওপর আলো এসে পড়লে থেমে যাবে জিপ। তারা ধরা পড়ে যাবে ওদের হাতে। ধরা পড়ে যাবার পরিণতি ওদের অজানা নয়।

ওরা শুধু আকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়ে চলেছে, যেন জিপগুলো হঠাৎ থেমে না যায়।

সেই একই গতিতে গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেল দুটো জিপ।

ওরা ধান ক্ষেতের ভেতর এখন ব্যাঙের মত উঠে বসেছে। তাকিয়ে আছে জিপের পেছনে কয়েকটা লাল আলোর দিকে। যেন রক্তচক্ষু দেখিয়ে চলে যাচ্ছে পুলিশগুলো।

জিপগুলো শব্দ আর আলো নিয়ে দ্রুত গ্রামের ওপারে মিলিয়ে গেল।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে তার পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেছে। আর এগিয়ে যাওয়া নয়, এখানেই ওদের আটকে দিতে হবে। চালাও কোদাল। রাস্তাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে পুলিশের ফেরার পথ রুখে দাও।

দশখানা কোদাল চলেছে দশদিক বিদীর্ণ করে। বিশখানা বলিষ্ঠ হাতের উত্তেজিত মাংসপেশী ঘন ঘন আকুঞ্চিত প্রসারিত হচ্ছে। লাল লাল মাংসের টুকরোর মত ইটের খোয়া উঠে এল প্রথমে। তারপর পিণ্ড পিণ্ড মাটি। শেষে পিচ্ছিল ক্লেদ।

পুরো দুটি ঘণ্টার অক্লান্ত পরিশ্রমে এপারের মাঠের সঙ্গে ওপারের মাঠের যোগ হয়ে গেল জলপথে।

মাঝরাতে শ্রান্ত ক্লান্ত দশটি যুবক চলে গেল গাঁয়ের মধ্যে। উঠল বিপ্লবীদের আস্তানায়। একটা পোড়ো ভাঙা ইস্কুল বাড়ি। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাস্টার, ছাত্র উভয়েই ছিটকে পড়েছে

BanglaBook.org

আন্দোলনের ধাক্কায়। খড়, বাঁশ উপড়ে টেনে নিয়ে গেছে লোকে, এখন ক'টি দেয়ালে চিহ্নিত হয়ে আছে বিদ্যালয়ের সীমানা।

ওই পড়ো দেয়ালের ভেতর বিপ্লবীদের রাতের আলোচনা চক্র বসে। পরবর্তী দিনের কর্মপন্থা স্থির হয়।

স্কুল বাড়ির ভেতর কেউ ছিল না সে রাতে। বৃষ্টির একটা মেঘ দেখে কর্মীরা সরে চলে গিয়েছিল গাঁয়ের গৃহস্থ বাড়িতে।

ওরা দশটি যুবক পোড়ো বাড়িটার ভেতরে ঢুকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল। কিন্তু অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে কখন যে বুজে এল তাদের চোখ তা কেউ বুঝতে পারল না।

যখন বুঝল তখন আর রাত নেই। দেখল, একদল সশস্ত্র পুলিশ গ্রাম পরিক্রমা শেষ করে পোড়ো ইস্কুল বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

কেউ কেউ ধরা পড়ার ভয়ে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, বাধা দিল নিতাই।

হেঁকে বলল, কাপুরুষ, মরদ কুনদিন পিঠে গুলি খাইকি মরে?

ওরা দশজন দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে, হাতে ধরা রইল কোদাল।

রাইফেলধারী পুলিশ এগিয়ে আসছে। তারা দেখতে পেয়েছে ওদের। সবকটা রাইফেলের মুখ এখন ওদের দিকে।

পুলিশ অফিসার সামনে এসে দাঁড়াল। সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ল, তোমরা তাহলে রাস্তা কাটিয়েছ?

কোন উত্তর নেই কারো মুখে।

পুলিশ অফিসারটি এবার আর্মড ফোর্সকে ইংগিত করল।

তিনজন দাঁড়াল ওদের পেছনে সঙ্গীন তাক করে, বাকি তিনজন আর স্বয়ং অফিসার রইল সামনে।

ওদেরকে নিয়ে আসা হল সরকারি রাস্তার ধারে।

হায়ার অফিসার বসেছিল গাড়িতে। তার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করল অফিসারটি।

গ্রামের চৌকিদার ইতিমধ্যে খবর পেয়ে এসে পড়েছিল। তাকে গ্রাম থেকে কয়েকখানা তক্তা জাতীয় জিনিস সংগ্রহ করে আনতে বলা হল। এক সময় কপাট, তক্তা সবই এসে পড়ল। সেগুলো ফেলা হল কাটানের ওপর। দুটো জিপই ওপারে পেরিয়ে গেল। একটা জিপ ছ'জন রাইফেলধারী নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্য জিপটা উড়ে চলে গেল শহরের দিকে। বিশ মিনিটের ভেতর দুটো ট্রাক এসে দাঁড়াল। ভেতরে রাইফেলধারী পুলিশ বাহিনী।

অফিসারের নির্দেশে ওরা ট্রাক থেকে নেমে রাইফেল হাতে সারিদিয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে গ্রাম আর সরকারি রাস্তার সংযোগ রক্ষাকারী সংকীর্ণ মেঠো পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে কৌতূহলী গ্রামবাসীরা।

পুলিশ অফিসারটি এবার নিতাইদের দিকে ফিরে কঠিন আদেশের গলায় চেঁচিয়ে উঠল, বাঁধো রাস্তা, হারামজাদা শুয়ার কা বাচ্চা।

কোদাল হাতে দশটি যুবক তেমনি স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে। চোখের পলক পড়ছে না।

এবার গলাখানা, পর্দার শেষ সীমায় তুলে চেঁচিয়ে উঠল অফিসার, চালাও কোদাল।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাবুকখানা বাতাসে বৃত্ত এঁকে সপাং করে পড়ল এসে অগ্রবর্তী নিতাই-এর মুখে।

মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বিদ্যুৎ গতিতে নিতাই সেই চাবুকের অগ্রভাগ ধরে টেনে নিল নিজের হাতে।

চেঁচিয়ে উঠল তীব্র তীক্ষ্ণ গলায়, ভাইসব, ছুটি আইস, আমার মনে চার পাঁচশ লোক খাড়া হি আছি। এ ক'টা কুত্তাকে পিষি মারি পেকিইবা।

BanglaBook.org

হাতের চাবুকখানা ঘুরিয়ে নিতাই সজোরে মারল অফিসারটার মুখে।

ফায়ার, ফায়ার।

সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটল রাইফেলের মুখ থেকে।

প্রথম বুলেট খেয়ে লুটিয়ে পড়ল নিতাই। তিন তিনটে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তার বুক।

সঙ্গে সঙ্গে কোদাল উঁচিয়ে ছুটে এল ন'টি যুবক। একে একে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লালফুল ছড়াতে ছড়াতে।

ততক্ষণে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বিদীর্ণ হচ্ছে আকাশ। গ্রামবাসীরা ছুটে আসছে উন্মাদের মত। মার্ মার্ মার্ মার্।

আবার গুলি বর্ষণ। হাতে, পায়ে, বুকে, পিঠে গুলি লেগে লুটিয়ে পড়ছে মানুষ।

কিছু সময়ের ভেতর গুলির সামনে থেকে ফিরে গেল নিরস্ত্র মানুষের দল।

সরিষাবেড়িয়ার পথ, ধানক্ষেত আর্ত আহত মানুষের আর্তনাদে পূর্ণ।

আহত আর মৃতদের রক্ত তখন মিশছিল কাটানো রাস্তার নালিপথে প্রবাহিত স্রোতধারায়। ধরিত্রীর সবুজ শ্যামল ফসলের গায়ে লাগছিল সে রক্তের স্পর্শ।

পথের ওপর পড়ে থাকা মৃত পশুগুলোকে যেমন পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে এনে ফেলা হয় গাড়িতে ঠিক তেমনি করে মৃতদেহগুলিকে প্রথমে টেনে তোলা হল ট্রাকে। তারপর আহতদের হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে এনে বোঝাই করা হল শবদেহগুলির ওপরে।

ট্রাক, জিপ গর্জন করতে করতে ছুটে চলল কাঁথি শহরের দিকে।

থম থম করছে কাঁথি শহর। বন্ধ হয়ে গেছে বাজার, হাট, যানবাহন। অস্ত্রধারী পুলিশ কর্ডন করে রেখেছে একটি অংশ। সেখানে মানুষের জটলা, যাতায়াত নিষেধ।

সেই নিষিদ্ধ এলাকার মাঝে খঙ্গচণ্ডীর মহাশ্মশানে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। একই চিতায় পুড়ছে কতকগুলি কৃষক আর ছাত্র।

অফুরন্ত পেট্রল ঢালা হচ্ছে তাদের ওপর। আগুন লেলিহান শিখা মেলে আকাশ স্পর্শ করতে চাইছে। আকাশে সহসা ধরে উঠল আগুন। সূর্যাস্তের মেঘে মেঘে আকাশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল বহ্নি-মহোৎসব।

গভীর রাত্রি। আকাশে চাঁদ নেই। ভাসমান মেঘের আড়ালে কয়েকটা নক্ষত্র বহু বহু দূরের ধরিত্রীর একটি ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করছে।

কর্ডন ভেঙে দিয়ে চলে গেল সশস্ত্র পুলিশের দল মার্চ করতে করতে।

কয়েকটি ছায়ামূর্তি গুড়ি মেরে বালুর ঢিবির আড়াল থেকে উঠে এল। তারা চিতার কাছে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসল।

কে যেন ফুঁপিয়ে উঠল। আরও কয়েকজন।

সহসা চাপা গলায় বলল একজন, আমার বীরসন্তান মনে প্রাণ দিলা, কাঁদি ভাসাউঠু কি রে।

পাগলের মত ছাই নিয়ে সারা গায়ে মাখতে লাগল পদ্ম। শেষে ওই শ্মশানের ছাই তুলে সবার কপালে একটি একটি করে এঁকে দিল তিলক।

BanglaBook.org

ঝঞ্ঝাবর্ত

নাথুর মা তলিয়ে যাচ্ছে ঘুমের ভেতর। একটা ফুটো পাত্র যেন ডুবে যাচ্ছে জলের গভীরে। কোনো আক্ষেপ নেই। ভেসে ওঠার কোনো চেষ্টা বা শক্তিও নেই আর। শুধু অনন্ত অতলে তলিয়ে যাওয়া। ভাঙা তোবড়ানো একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ডান হাতের নাগালের ভেতর। খানিকটা ফেনের তলানি চকচক করছে। কিন্তু সময়কালে অবশ হাতখানা ওই ভাঙা বাটির পদার্থটুকু পৌঁছে দিতে পারেনি নাথুর মা'র ঠোঁটের কাছে। পার্কের কোনায় ফুটপাথে যেখানে নাথুর মা'র হাড্ডিসার দেহটা লেপটে ছিল সেখানে একটা নিমগাছের ডালে কাক বসে ছিল। অনেকক্ষণ কাকটা চেয়ে বসে ছিল নাথুর মা'র দিকে। তার ছোটোখাটো নড়াচড়া আর দেহের আক্ষেপ মোচড়গুলো সে লক্ষ করছিল নিবিষ্ট চোখে। এখন নাথুর মাকে স্থির হয়ে থাকতে দেখে সে গলাটা আরও নিচু করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। এটা সাময়িক ঘুম না একেবারে শীতল হয়ে যাওয়া? বহুদর্শী কাক, তবু নিজের ধারণাকে স্পষ্ট করে নেবার জন্যে দুবার জোরে কা কা করে ডেকে উঠল।

আশ্চর্য! ঘুমের অতল থেকে একবার ভেসে উঠল নাথুর মা। নাথুর মা-মা ডাকটা স্পষ্ট যেন তার কানে এসে বাজল। ঘোলাটে চোখের সামনে কুয়াশার একটা পরদা নড়তে নড়তে হঠাৎ সরে গেল।

কাকটা তখনও নিবিষ্ট হয়ে দেখছে।—নাথু নাথু রে তুই এলি বাপধন। কথা বলছে নাথুর মা কিন্তু সে শব্দ শুধু শুনছে সে নিজেই। হাতখানা তোলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু সেটাকে যেন কেউ ফুটপাথের সঙ্গে সেঁটে দিয়েছে।

অনন্ত অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে নাথুর মা'র আশ্চর্য এক শক্তি এল। প্রবল ইচ্ছাশক্তি তার হাতখানাকে সরিয়ে নিয়ে গেল ভাঙা বাটিখানার কাছে। বাটিটা সামান্য তুলে ধরে সে আকুল হয়ে বলতে লাগল, খা খা, বাপধন খা।

১

গাছপালা ঘেরা সুবদী গাঁয়ে সবে ভোরের আলো ফুটেছে। সিংহবাড়ির সামনের শিরিষ গাছটা থেকে কয়েক শো পাখি আলোর স্রোতে হইহই করে ভেসে গেল। নাথুর মা সিংহবাড়ির অন্দরমহলের পিছনে খিড়কি পুকুরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে থালা মাজছিল আর নাথুর বাপের কথা ভাবছিল। কী হল মানুষটার, একেবারে চুপ। সেই যে গেছে শীতকালে সোঁদরবনে সিংহবাবুদের লাটে মাটি কাটতে তার আর পাত্তাই নেই। শীত গিয়ে গরম এল, মাঠ ফাটল, ঘাট শুকল তবু ঘরে ফেরার নাম গন্ধ নেই। মাথায় ঘোমটা টেনে কাছারি বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে সে দু-চারবার সাধুচরণ বকশির কাছে মিনমিনে গলায় মানুষটার খবর নেবার চেষ্টা করেছে কিন্তু বিশেষ কিছুই জানতে পারেনি। দু-পাঁচটা টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাধুচরণ বলেছে, গদাই পাঠিয়েছে। এখন টাকা কটা নিয়ে যা, পরে পশ্চাতে বাড়িতে যাব অখন। সন্ধেয় বাড়িতে থাকবি তো, হুট করে কোনদিন হাজির হয়ে যাব দেখিস।

সাধুচরণ এসেছিল গাঁয়ের প্রান্তে তেঁতুলতলায় তার ঝোপড়িতে। পান চেয়ে খেয়েছিল। যত কথা বজর বজর করে বলেছিল তার দু-একটা ছিটে ফোঁটা গদাইচন্দ্র সম্পর্কে। বাকি সব নিজেকে

BanglaBook.org

নিয়ে। আগডুম বাগডুম কী যে সব বকে যায়। ছাই, মাথামুন্ডু বোঝা দায়। উঠে যাবার সময় নাথুর মা মরিয়া হয়ে মানুষটার কথা জানতে চায়, বকশি সাধুচরণ বলে, খোয়া যায়নি গো খোয়া যায়নি। ভয় কী বল, আমি তো আছি।

হাতটা চেপে ধরে দু-একটা টাকা গুঁজে দিয়েছে কোনো দিন। বেরিয়ে যাবার সময় হেসে বলেছে, আবার আসব, গদাই কাছে নেই বলে কি তোর সংসারটা ভেসে যাবে নাকি রে!

মানুষটার রকম-সকম, গা গন্ধ ভালো লাগেনি নাথুর মা'র। কিন্তু কী করতেই বা পারে সে। মালিক বাড়ির এঁটো ধোয়ার চাকরানি বই তো নয়। এই সাধুচরণ তার মরদকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে লাটে নিয়ে গিয়েছে। নিজে ফিরে এসেছে দিন পনেরো যেতে না যেতেই, কিন্তু গদাইচন্দ্র সেই থেকেই বেপাত্তা।

নাথুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখের জলে রাতের বিছানা ভেজায় গদাইয়ের বউ। অভিমান হয় মানুষটার ওপর। বড়লোক সাজবার সাধ গিয়েছে। আরে বাবা কথায় আছে, 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে কাল হল তার হেলে গোরু কিনে'। এখানে মাটি কুপিয়ে চাষের দিনে মজুর খেটে দুমুঠো কুড়িয়ে বাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। নিজেও তো সে কম খাটে না। শিউলির মা'র বাড়ি কটার ধান ভানতে যায়। তাকে সবাই চায়। গা গতরে খেটে কাজ তুলে দেয়। তার সঙ্গে এক ঢেঁকিতে পাল্লা দিয়ে পাড় দিতে পারে একমাত্র লখাইর মা, আর এ তল্লাটে কেউ না। শুধু ধপড়-ধাঁই ঢেঁকিতে পা কুড়লেই হয় না, ঠিক তাল ঠুকে লাথিটি মারা চাই। কখনো জোর তাল, কখনো ধীর লয়। গড়ের কাছে যে ধান সেঁকাচ্ছে তার হাতটির দিকে চেয়ে বোঝা চাই সে কী চাইছে। এক শিউলির মা-ই পারে এমন খর হাত চালিয়ে ধান উসরে দিতে। নাথুর মা আর শিউলির মা'র বোঝাপড়াটা খুব ভালো। তাই অন্যের বাড়ির কাজের চেয়ে শিউলির মা'র ঢেঁকিতে কাজ করতেই ভালোবাসে গদাইয়ের বউ।

কত করে সে নাথুর বাপকে বলেছিল একটা ঢেঁকি বসাতে। তা হলে নিজেই কটায় ধান ভানবে। কিন্তু নাথুর বাপ গা করেনি! নিজের সামান্য ঝোপড়িখানার খড় কালবৈশাখীর ঝড়ে পাখির ছানার রোঁয়ার মতো খাড়া হয়ে উঠলেও নতুন খড় চাপিয়ে ছাইবার যার মুরোদ নেই সে কিনা বানাবে ঢেঁকিশাল! রাখাল হবে রাজা! বউয়ের কথায় কান না দিয়ে সরে পড়ে গদাইচন্দ্র। নাথুর মা'র মনের আশা মনেতেই শুকোয়। কিন্তু গদাই লোকটা বড় ভালো। রা কাড়ে না মুখে। পাড়ার অন্য সব বাড়ির মতো তার বাড়িতে তুলকালাম নেই। বউয়ের চুলের মুঠি ধরে ঘরের বাইরে টেনে এনে কিল চড় মেরে বিক্রম দেখায় না অন্য সব মরদদের মতো। দেহে গতর আছে নাথুর বাপের, আলসেও নয়, তবে একটু মাথামোটা। নিজের বুদ্ধি বড়ো একটা খোলে না, অন্যের বুদ্ধিতে চলে। না হলে এমন সোমত্ত বউ ছেড়ে কেউ ফালতু কটা পয়সার ধান্দায় সোঁদরবনে যায়! বুদ্ধিদাতা সাধুচরণ। সিংহবাবুদের হেড বকশি। লোকটা শেয়ালের মতো ধূর্ত। কোন ফাঁকে কার ঘাড়ে এসে পড়ে কখন যে সুট করে সরিয়ে নিয়ে যাবে তা কে জানে। কথায় আছে যৌবনকালে কুক্কুরীও সুন্দরী হয়। নাথুর মা সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়েও সৌন্দর্যটা হয়তো বয়সের গুণেই বজায় রেখেছে। সারাদিন খাটাখাটনির কামাই নেই। তার ওপর খাদ্য জোটে না পেটে, তেল জোটে না মাথায়। তবু পাশ দিয়ে চলে গেলে পথ চলতি মরদগুলো তার দিকে আড়চোখে একবার তাকাবেই তাকাবে। অকারণে গায়ে পড়ে কেউ কেউ জানতে চাইবে গদাইয়ের খবর। কেউ আবার আরো একটু এগিয়ে দরদি সেজে বলবে, কোনো সংকোচ রেখোনি গদাইয়ের বউ, যখন দরকার ডাক দেবে। গদাই আমার কত আপনজন, অ্যাক্কেবারে বন্ধুর মতন!

মৃদু হাসিতে বিনয় প্রকাশ করে সরে এসেছে সে। কখনো বা আধ হাত ঘোমটা টেনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে শুধু মাথা নেড়ে উৎসাহীদের বিনয়ের সঙ্গে বিদায় করেছে। পারেনি শুধু ওই ধূর্ত

BanglaBook.org

শেয়ালটাকে। কারণ সাধুচরণের কাছেই গদাইচন্দ্রের যা কিছু খবর। তা ছাড়া গদাইয়ের রোজগারের টাকাটা সিকিটা আসে ওরই হাত দিয়ে।

সেদিন ভোরবেলা পুরনো এক পাঁজা বাসন মাজতে হল তেঁতুল দিয়ে। বড়ো বাড়িতে কারা যেন খাওয়াদাওয়া করবে। মালিক অর্ণব সিংহ অকালে পরলোক গমন করেছেন। এখন বাড়ির কর্ত্রী নতুন বউরানি। তিনি থাকেন অন্দরমহলে। তবু তাঁরই ইচ্ছায় আজ একটা ভোজের আয়োজন হচ্ছে। এসব কথা ঝি চাকরদের মুখে কানাকানিতে শোনা। পরচর্চায় বড়ো একটা আগ্রহ নেই নাথুর মায়ের। ঠিকে ঝি, কালেভদ্রে বাসি জিনিস বাঁচলে কিছু পায়, এর বেশি প্রত্যাশাও নেই তার। কাজের সময়টুকু ছাড়া নাথুকে নিয়ে ঘরের ভেতর থাকতেই সে ভালোবাসে। রোগা ছেলেটাকে ঘরে রেখে যেতে মন সরে না, আঁচলে বেঁধে কাজের বাড়িতে ঘোরা যায় না। তাই কাজটুকু শেষ হলেই সে পড়ি-কি মরি করে পা চালিয়ে ঘরে ফিরে আসে। কাছেপিঠে ঘর বাড়ি নেই বললেই হয়। নাথু তাই আট বছর বয়স অবদি একা একা থাকতেই শিখেছে। উঠোনে দু-চারটে গাছ আছে। সজনে, পেঁপে, ওদিকে ছোটোখাটো একটা বাঁশঝাড়। সারাদিন ফুড়ুত ফুড়ুত পাখি উড়ে আসে, গাছের ডালে বসে নিজেদের ভেতর কলর বলর করে কী সব পরামর্শ করে, আবার উড়ে যায়। নাথু তাই চেয়ে চেয়ে দেখে। বাতাসে বাঁশের পাতা কাঁপে। ছোট্ট ডোবাটায় দুটো হাঁস ঢেউ তোলে। কখনো বা পিছন উঁচু করে জলের ভেতর মুখ ডুবিয়ে গুগলি খোঁজে। কোনো কোনো সময় কাঁক কাঁক, কটাস কটাস আওয়াজে দিগবিদিক কাঁপিয়ে তোলে। ঘরের ভেতর থেকে ছুটে আসে নাথু। হাঁসগুলো মাঝ ডোবায় ভাসে আর গলা তুলে তাকায় বাঁশবনের দিকে। হ্যাঁ, ঠিকই তো, কার যেন একটা মুখ দেখা যাচ্ছে। শেয়াল না কটাস? দুপুরবেলা চরাচর ঝাঁ ঝাঁ, কেউ কোথাও নেই, সেই সুযোগে হাঁসটা মুরগিটা ধরতে বেরিয়েছে। এতটুকু বয়েস হলে কী হয়, নাথুর চোখ কান খোলা। সে অনেক কিছু দেখতে আর শুনতে শিখেছে। হাতের ছোট্ট লাঠিখানা নিয়ে তেড়ে যায় ডোবার ওপারে বাঁশবনের দিকে। তাড়া খেয়ে পগার ডিঙিয়ে চোর পালায়। গতর ফুলিয়ে জল কেটে কেটে হাঁসগুলো এবার নির্ভয়ে গুগলি খোঁজে।

সকালে বাবুর বাড়ির বাসন মাজা আর কিছু কিছু ঝাঁটাকুচির কাজ সেরে নাথুর মা ঘরে ফিরে এসে রান্না চাপায়। ডোবায় গা ধুয়ে মায়ে-পোয়ে ভাতেভাত খেতে বসে। আট বছরের ছেলের মুখে বড়ো বড়ো ডেলা পাকিয়ে ভাত পুরে না দিলে নাথুর আবার পেট ভরে না। এ অভ্যেস সেই ছেলেবেলা থেকে। দু-তিন বছর বয়েস অবদি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে নাথু। তারপর থেকে একা থাকতে শিখেছে আপনার ঘরে। নাথুর মা ধান ভানার সময়ে ছেলের একটা পায়ে দড়ি বেঁধে দিয়ে সেই দড়ির অপর প্রান্ত বেঁধে দিত গাছে। নাথু দড়ির গণ্ডির ভেতর হামা দিয়ে খেলা করত। এরপর একা কিছুকাল ঘরের ভেতর রইল বন্দিদশায়। খিড়কি সদর বন্ধ। ছোট্ট একটা ঝোরকা খোলা। তারই ফাঁকে সে চোখ মেলে দেখত, আকাশে মেঘ জমেছে, পুকুরে হাঁস চরছে, মাঠে ধান রুইছে চাষারা। যখন হাওয়ার দাপটে বাঁশে বাঁশে ঘষা লেগে ক্যাঁচোর কোঁচোর শব্দ হত তখন কেমন যেন তার গা ছমছম করত। এখন বড় হয়ে নাথুর সে ভয় গেছে। তা ছাড়া এখন সে মুক্ত। সকালে পাঠশালায় যায়। ফিরে এসে আপনমনে খেলা করে আর মা'র জন্যে অপেক্ষা করে। মা এলে রান্না বসে। একবেলাই যা রান্না। খাবার শেষে উদ্বৃত্ত ভাতে জল ঢেলে রাতের জন্য রাখা হয়। ভাত যখন টগবগ করে ফুটে ওঠে তখন নাথুর মা হাঁড়ির মুখের সরাটা খুলে দেয়। অমনি হু হু করে ভেতরের হাওয়া বেরিয়ে আসতে থাকে। সেই ভাতের গন্ধ মাথা হাওয়াটুকু নিশ্বাসের সঙ্গে টানতে টানতে নাথু বলে, আঃ, ভাতের কী গন্ধ মা!

অল্প ছাঁটা লাল চালের ভাত একটু নুন তেঁতুল দিয়েই চলে যায়। ভাতে-ভাত যেদিন জোটে সেদিন তো মহোৎসব।

BanglaBook.org

পাঠশালার মাইনে মাসে আট গণ্ডা পয়সা। সে পয়সাটুকু জোটানো দায় হল নাথুর মায়ের। গদাইচন্দ্র লাটে যাবার পর থেকে সংসারে টানাটানি। মাস তিনেক মাইনে বাকি পড়ার পর লজ্জায় ছেলেকে পাঠশালায় পাঠানো বন্ধ করল নাথুর মা। চতুর্থ দিনে স্বয়ং পণ্ডিতমশাই এসে হাজির। দুপুরবেলা সবে খেয়ে উঠেছে মায়ে-পোয়ে, ছাতা বগলে বুড়ো পণ্ডিতমশাই দাওয়ায় এসে হাজির।

নাথু কই রে? নাথু?

আধহাত ঘোমটা টেনে ছেলেকে ঘরের ভেতর থেকে টেনে নিয়ে এল নাথুর মা। পণ্ডিতমশায়ের পায়ে ঢিব ঢিব করে পেন্নাম করলে মায়ে-পোয়ে। বসার জন্যে চাটাই বিছিয়ে দিলে। পণ্ডিতমশাই বললেন, বসতে আসিনি নাথুর মা, বলি হতচ্ছাড়াটা পাঠশালা বন্ধ করল কেন?

মিনমিনে গলায় নাথুর মা বললে, বড় গরিব বাবা আমরা। নাথুর বাপ সেই কবে লাটে গেছে তারও ফেরার নাম নেই। আপনার তিন মাসের মাইনা শোধ দিতে পারিনি বাবা, বড়ো কষ্টে বড়ো লজ্জায় আছি।

ভারী ভালো কাজ করলে! টাকাও দিতে পারলে না আবার ছেলেটাকেও পাঠাতে পারলে না! কাল ভোরে বাঁদরটাকে পাঠিয়ে দিয়ো আর টাকা হাতে এলে দিয়ে এসো। টাকা নেই বলে ওর যাওয়াটা যেন আর বন্ধ কোরো না।

নাথুর মা অনুচ্চে বলল, বাবা, একটা কথা বলব?

বলোই না কী বলবে? এই এঁড়ে বাছুরটাকে চাষের কাজে লাগিয়ে দেবার মতলব তো?

না বাবা, আমি তা বলতে চাইছি না।

তবে কী বলতে চাও বলে ফেলো।

নাথু এসে বলেছিল, আপনার পাঠশালায় যে ঝাঁটপাট দিত সে নাকি আর আসে না?

তেল হয়েছে, তেল হয়েছে। একবেলা ঝাঁট, মাসে একটাকা। এখন বলে কী তেল চাল নুনের দাম বেড়েছে পাঁচসিকের কমে পারবে না। অমনি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছি। এখন নিজেই ঝাঁটাই।

আমি বলছিলাম কী নাথুটার মাইনা যদি ফিরি করে দেন তবে আমিই রোজ ঝাঁটটা দিয়ে দেব বাবা। ওই পথেই তো সক্কালে বাবুর বাড়ি যেতে হয়। আমাকে আর কিছু দিতে হবে না। গা গতরে ওটুকু খেটে দেব।

পণ্ডিতমশাই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, তুমি আমাকে অঙ্ক শেখাতে এসো না নাথুর মা। যোগ বিয়োগ, গুণ ভাগ শেখাতে শেখাতে হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গেল। আমার স্পষ্ট কথাটা শুনে নাও, বিনি পয়সায় তোমার ছেলেকে যেমন আমি পড়াব না, তেমনি বিনি মাইনেতেও তোমাকে আমি খাটাব না। মাসের শেষে তোমার হাতে আমি একটি করে টাকা তুলে দেব, তুমি ছেলের বেতন আটগণ্ডা পয়সা আমাকে ফেলে দিয়ে বাকিটা নিয়ে চলে আসবে, ব্যস।

পণ্ডিতমশাই চলে যাবার আগে নাথুর মাথায় একটা চাঁটি কষিয়ে বললেন, কাল সকালে যদি পাঠশালায় না দেখি তা হলে আর আস্ত রাখব না হতভাগা।

পণ্ডিতমশাই চলে গেলেন। নাথুর মা যেন অকূলে কূল পেল। বড় শখ ছিল তার নাথু একটু লেখাপড়া শেখে, হিসেব নিকেশটা করতে পারে।

BanglaBook.org

২

সিংহবাড়ির বারমহলে বৈঠকখানায় আজ বিশিষ্ট অতিথি সমাগম। বাইরের গেটে একটা পাঁচলাইট আলো ছড়াচ্ছে। ভেতরে বৈঠকখানায় তিন তিনটে ডে-লাইট।

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট পি. কে. ঘোষ আজ নিমন্ত্রিত অতিথি। তাঁর সঙ্গে এসেছে জনাচারেক গোরা সৈন্য। রসুলপুর নদীতে তাঁর লঞ্চ থেকে তিনি উঠে এসেছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। একাই আসতেন এই ক্রোশখানেক পথ বন্ধুর বউয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে, কিন্তু সময়টা অনুকূল নয় তাই সঙ্গে এনেছেন লালমুখো চারটে আর্মড গার্ড। যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো দিক থেকে স্বদেশি লোকগুলো ঘিরে ফেলতে পারে। এই তো ক'দিন আগে খেজুরি-ভগবানপুর থানার সার্কেল অফিসার বিজয় বোস ওদের পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হয়েছে। যেমন বোকা তেমনি শাস্তিভোগ। দশ দশজন সশস্ত্র সেপাই সঙ্গে আর তুমি কিনা গুলি চালাবার অর্ডার না দিয়ে ওই স্বদেশি জনতার কাছে সারেন্ডার করলে! তারা তোমার জানটা যে নিয়ে নেয়নি এই যথেষ্ট। রসদের নৌকো পুড়িয়ে দিয়ে সাধারণ দুটো নৌকোয় তুলে ভাসিয়ে দিলে সুন্দরবনের পথে। মান তো খোয়ালেই জানটাও যেতে বসেছিল।

সিংহবাড়ির পথে আসতে আসতে বিজয় বোসের আহাম্মকির কথাটা ভাবছিলেন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মি. ঘোষ। পড়ত আমার পাল্লায়, শায়েস্তা কাকে বলে দেখিয়ে দিতুম। ঝাঁঝরা করে ছাড়তুম ওই বুকের খাঁচাগুলো। ইংরেজকে হটাবে ইন্ডিয়ানরা? তা হলেই হয়েছে আর কী। আঙুলে গোনা সাদা চামড়ার কটা মানুষ এসে যে সারা দেশটা শাসন করছে তার ক্ষমতার সোর্সটা কোথায়? সাহস আর কৌশল। বুক ফুলিয়ে বিপদের ঝুঁকি না নিলে এতদিন টিকতে পারত কেউ।

সিংহবাড়ির বউরানি ললিতা সিংহ স্বামীর বন্ধুটিকে আনবার জন্যে পালকি পাঠাতে চেয়েছিল কিন্তু ঘোষসাহেব সম্মত হননি। পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন, সামান্য এটুকু পথ হেঁটেই পার হব। আকাশে চাঁদের রোশনাই, প্রকৃতিতে মৃদু শীতের শিহরণ, বেশ লাগবে পদব্রজে অভিযান। সঙ্গে থাকবে চারজন বিদেশি দেহরক্ষী। তাদের জন্যে যে উপযুক্ত পানীয়ের ব্যবস্থা থাকরে সেটা আশা করি অর্ণব সিংহের সহধর্মিণীকে বেশি করে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

চিঠি পেয়ে কন্টাই টাউনে লোক পাঠিয়ে উৎকৃষ্ট পানীয় আনিয়ে রেখেছিল ললিতা সিংহ। কলকাতার কলেজে স্বামীর সহপাঠী বন্ধু ছিলেন মি. ঘোষ। স্বামীর সঙ্গে পরবর্তী সময়ে কয়েকবারই তার বাপের বাড়ি বালিগঞ্জে এসেছেন। দারুণ স্মার্ট আর হ্যান্ডসাম। তারপর কয়েক বছর অদর্শন। হঠাৎ একেবারে অজ গ্রামাঞ্চলে আবির্ভাব। খেজুরি থানার নাকি 'মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের' প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তৈরি হয়েছে সিলমোহর, গঠিত হয়েছে মন্ত্রীসভা। স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, কৃষি, রাজস্ব, বিচার আর পররাষ্ট্র বিভাগ নিয়ে শুরু হয়েছে কাজ। নির্বাচিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। জনপদ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে প্রাথমিক বিচার পর্ব, তার ওপর থাকবে 'মহাল ধর্মাধিকরণ,' সবশেষে বিচার হবে 'কেন্দ্রীয় ধর্মাধিকরণে'। দলিলপত্র সম্পাদনের জন্য তৈরি হয়েছে 'কারবারনামা কার্যালয়'।

ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষ একশো গোরা সৈন্য এনেছেন এদের শায়েস্তা করতে। পিছনে আসছেন স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম. এন. খান। রাজনীতির কত ধানে কত চাল এবার টের পাবে বাছাধনেরা। সারা কাঁথি মহকুমা জুড়ে থানা পোড়ানোর উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে এবার। গভর্নর স্যার জন হাবার্ট অবধি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের কাছে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, Can you imagine that the British administration was completely paralysed in Khejuri.

BanglaBook.org

গোরা চারটে বসে বসে মদ গিলছিল বাইরের বৈঠকখানায়। সঙ্গে চাট পরিবেশিত হচ্ছিল। অন্দরমহলে বেডরুমের সোফায় বসে কথা হচ্ছিল বন্ধুপত্নীর সঙ্গে মি. ঘোষের।

বন্ধুর জন্যে প্রাথমিক দুঃখ প্রকাশ শেষ করে মি. ঘোষ বললেন, তোমাদের বালিগঞ্জের বাড়ির আড্ডার কথা কোনোদিনও ভুলতে পারব না ললিতা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ললিতা সিংহ বলল, সেই দিনগুলো উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে মি. ঘোষ।

ঘোষ সাহেব ঋজু দেহটাকে কয়েক ইঞ্চি সামনে এগিয়ে এনে প্রশ্ন করলেন, তুমি আমাকে কী বলে ডাকলে ললিতা? আগে কি মি. ঘোষ বলে ডাকতে?

ললিতা মুখে হাত রেখে চাপা হাসি হেসে বলল, এখন তো তুমি আর সেই ইউনিভার্সিটির ছাত্রটি নেই যে পলাশদা বলে ডাকব। কত বড়ো অফিসার এখন তুমি। আমাকে যে মনে রেখে এক ডাকে এসেছ, এই কত ভাগ্যি।

ললিতা, তুমি আমাকে পলাশদা বলেই ডাকবে।

আচ্ছা পলাশদা, তোমাকে যে কবিতাটা বলে খেপাতুম, মনে আছে?

নিশ্চয়ই। ওই একটা জিনিসই আমাকে তাড়া করে ফেরে, মেমারি। বলেই মি. ঘোষ মাথা দুলিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

দেখিতে পলাশ ফুল অতি মনোহর
গন্ধ নাই বলে কেহ করে না আদর।

তুমি গম্ভীর হয়ে বসে থেকে মাঝে মাঝে শুধু বন্ধুর সঙ্গে কথা চালাতে।

সেটা করতাম ললিতার গলায় মানভঞ্জনের সাধাসাধিটা শুনব বলে।

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল ললিতা। বলল, এখন তো তোমার মানভঞ্জনের লোক এসে গেছে। বলি, বউকে আনলে না কেন সঙ্গে?

তা হলেই হয়েছে। গোরাগুলো টগবগ করে ফুটছে। লেঞ্চে মেয়েমানুষ দেখলে ওদের আর বাগে রাখা যেত না। অফিসার-টফিসারের তোয়াক্কা না রেখে গিলে ফেলত টপ করে।

শুনেছি ওরা খুব ডিসিপ্লিন মেনে চলে।

কথাটা মিথ্যে নয়, তবে কী জানো, একেবারে হাংগ্রি যারা তারা যে কোনো মুহূর্তে নিয়ম ভেঙে ফেলতে পারে।

প্রসঙ্গান্তরে গেল ললিতা, কটি ছেলেমেয়ে তোমার?

কেন, তোমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করবে নাকি?

হলে তো লাভবান হতুম, কিন্তু সে বালাই নেই পলাশদা।

আশ্চর্য! অর্ণব তার একটি বংশধরও রেখে যায়নি! এত বড় স্টেট তুমি চালাচ্ছ কী করে?

সুন্দরবনেই জমি-জায়গা বেশি। ওখানে শ্বশুরের আমলের পুরনো নায়েবমশায় আছেন। অতি সৎলোক কিন্তু অতি বুদ্ধ। ফসল তোলার সময় তাঁকে সাহায্য করার জন্য এখান থেকে একজন দক্ষ আমলাকে পাঠিয়ে দিই।

যে লোকটা সিংহবাড়ির ভেট নিয়ে আমাদের লঞ্চে গিয়েছিল সে কিন্তু খুব চালাক।

ওই তো আমাদের হেড বকশি সাধুচরণ। লাটে গিয়ে আদায় উসুল করে আনে। এদিকে দেশের জমিজমা দেখাশোনার দায়িত্বও ওর ওপর।

মি. ঘোষ বললেন, আমি তো ওর কাছ থেকেই তোমাদের খরবটা জানতে পারলাম। অর্ণবের সঙ্গে বহুদিনই তো ছাড়াছাড়ি। ওর গাঁয়ের নামটা ভুলে যাওয়াই সম্ভব।

BanglaBook.org

একবার যখন অজ পাড়াগাঁ অঞ্চলে এসে পড়েছ তখন মাঝে মাঝে এ বাড়িতে তোমাকে আশা করব।

মি. ঘোষ হেসে বললেন, ঘন ঘন এলে স্বদেশিওলাদের কাছে বাড়িটা মার্কড হয়ে যাবে। আমরা চলে যাবার পর তুমিই বিপদে পড়বে। তার চেয়ে পালকি করে মাঝে মাঝে চলে এসো আমার লঞ্চে। হয়তো ভালোই কাটবে।

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল কবিতা সিংহ।

হাসলে যে?

দেখছি তুমি তোমার বউকে কতখানি ভালোবাসো।

একথা কেন?

একটু আগে লঞ্চে বউকে আনার কথায় ভয় পাচ্ছিলে, এখন আমাকেই সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছ লঞ্চে। গোরাদের খাদ্য হবার জন্যে বুঝি?

হেসে উঠলেন মি. ঘোষ, এখনো তেমনি শার্প রয়ে গেছ তুমি। কী করে যে শহর ছেড়ে এইসব উজবুকদের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছ ভেবে পাই না।

ললাট লিখন পলাশদা।

মানুষই নিজের ভাগ্যকে গড়ে নিতে পারে। কীসের মোহে তুমি এখানে পড়ে আছ? টাকা? এত টাকা নিয়েই বা কী করবে তুমি?

পলাশদা, সিংহবাড়ির গেটে ঢোকার সময় একটা মস্ত বড়ো শিরিষ গাছ তোমার চোখে পড়ে থাকবে। ও গাছটা বহুদিনের পুরনো। কাণ্ডের নানা জায়গায় ফোঁপরা হয়ে গেছে। ওর তো বিদেয় নেবারই কথা কিন্তু টিকে আছে কেন জানো? হাজার পাখি বাসা বেঁধেছে ওর ডালে, তাই ইচ্ছে থাকলেও ও সরে যেতে পারছে না। বড়ো জড়িয়ে পড়েছি পলাশদা।

মি. ঘোষ বললেন, স্বদেশিওলারা তোমাকে জ্বালাতন করে না?

খুব, তবে আমারও লোকবল আছে। সবাই শক্তের ভক্ত না হলেও, শক্তিমানকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

দাঁতে দাঁত চেপে বললেন মি. ঘোষ, সবুর করো কটা দিন, একেবারে বিষদাঁত উপড়ে ঠান্ডা করে দেব।

হেসে বলল ললিতা সিংহ, এসব বুঝি তোমাদের শিখতে হয়?

কী শিখতে হয় ললিতা?

মানুষ ঠ্যাঙানো?

সরকার আমাদের এমনি এমনি এত পয়সা আর সুযোগ সুবিধা দেয় না।

ললিতা এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল, তোমার সঙ্গে সেই থেকে গল্প করছি, খেতে দেবার কথা ভুলেই গেছি। এখানেই খাবে না নীচের বৈঠকখানায়?

আমি এখানেই খাব তবে আরও কিছু পরে। আর সঙ্গে খেতে বসবে আমার হোস্টেস।

আমি উইডো পলাশদা। আমার স্থানকাল খাদ্যাখাদ্যের বিচার আছে। আমি তোমাকে পাশে বসে খাওয়াব।

অল রাইট। তোমাকে তা হলে আর জোর করব না। কিন্তু তোমার মতো মেয়ের কোনো রকম সংস্কার আছে একথা ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

মনের দিক থেকে কোনো সংস্কার নেই, কেবল লোকভয়।

হেসে উঠলেন মি. ঘোষ।—আবার ছেলেবেলার সেই কবিতা মনে করিয়ে দিলে ললিতা—

BanglaBook.org

করিতে পারি না কাজ, সদা ভয় সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে।

তোমার স্মৃতিশক্তি দেখছি অসাধারণ। ছেলেবেলার কবিতাগুলো বেশ মনে রেখেছ।

পণ্ডিতের বেতের দাপটে।

ললিতা বলল, পণ্ডিতমশায়ের দান তোমার জীবনে কম নয় দেখছি। লাগসই জায়গায় কবিতাগুলো মনে রেখে লাগাতে পারছ। তার ওপর তাঁর বেত চালাবার কৌশলটাও ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়েছ।

হা-হা করে হেসে উঠলেন মি. ঘোষ।

ললিতার মনে হল বাইরে কেউ যেন তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, ভেতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। ললিতা 'আসছি' বলে দরজার বাইরে যেতেই দেখা হল খাস দাসী গোলাপির সঙ্গে। গোলাপি বলল, বকশিবাবু জানতে চাইছেন, নীচের মেনিমুখোগুলোকে কি এখনই খাবার দেওয়া হবে?

ললিতার বড়ো প্রিয় দাসী এই গোলাপি। ললিতা কথা শুনে মুখে আঙুল রেখে বলল, চুপ চুপ, খবরদার, মেনিমুখো টুখো বলিস না।

গোলাপি চাপা গলায় উত্তেজনা প্রকাশ করে বলল, বলবে না আবার। দরজার ওপার থেকে ডিমের বড়া এগিয়ে দিচ্ছিলাম। চোখে একটুখানি পড়েছি কি পড়িনি, অমনি এক ব্যাটা তেড়ে এসেছে। কাছে আসতে না আসতেই আমি দৌড়েছি রান্নাঘরের দিকে। বাঁদরটা সমানে ছুটে আসছিল আমার পেছন পেছন। ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি সেই যাত্রার দলের রাজা নলের মতো। দুটো হাত বাড়িয়ে এড়ংব্যাড়ং কী সব বলছে। আমিও মুখপোড়া বাঁদর বলে একদৌড়ে পালিয়ে এসেছি।

বেশ করেছিস। ভাগ্যিস লোকটা তোর গালাগালটার মানে বোঝেনি, নইলে বেয়নেট চালিয়ে বুকখানা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে যেত।

গোলাপি বেয়নেটের মানে না বুঝেও সাংঘাতিক একটা কিছু আঁচ করে নিয়ে শুকনো মুখে বলল, গালাগাল দিয়েছি বলে মাপ চেয়ে আসব?

থাম হতচ্ছাড়ি বাঁদরি। তোর গালাগাল শুনে ও হয়তো ভেবেছে, তুই ওকে সোহাগের কথা বলছিস। শোন, বকশিবাবুকে গিয়ে বল ওদের খাবার এখুনি দিয়ে দিতে। চাকররা যেন খাবার দেয়। তুই বা মেনকা একদম ধারেকাছেও ভিড়বি না।

ঘরের ভেতর আবার এল ললিতা। মি. ঘোষ কী যেন মনে করে বললেন, যাকে দিয়ে লঞ্চে ভেট পাঠিয়েছিলে, তার নামটা যেন কী ছিল?

সাধুচরণ সামন্ত।

কাল একবার সময় করে ওকে আমার লঞ্চে পাঠিয়ো তো। বেশ চালাক চতুর। ওকে দিয়ে কিছু কাজ হাসিল হতে পারে।

পাঠিয়ে দেব, তবে সারাদিন মানুষটা জমিদারি সেরেস্তার কাজেই চোখ ডুবিয়ে রেখেছে। ওকে দিয়ে কি কোনো সুবিধে হবে তোমার?

সে আমি বাজিয়ে দেখব এখন। আগে তো সিংহীর অনুমতি পাই।

ললিতা হেসে বলল, সিংহীর অনুমতি বাহুল্যমাত্র, যেখানে খোদ ব্রিটিশ সিংহ সামনে বসে রয়েছে।

হাসলেন মি. ঘোষ। ললিতাকে মনে মনে নিজের স্ত্রীর বিপরীত পাল্লায় চাপিয়ে ওজন করলেন। সৌন্দর্যে, বুদ্ধিতে ঝকঝক করছে ললিতা। স্ত্রী রুমার চেয়ে পাল্লায় ভারী বই কী।

BanglaBook.org

ঢং ঢং করে নটার ঘড়ি পেটা হল সিংহদুয়ারে। ললিতা চঞ্চল হয়ে বলল, রাত হল, তোমাকে যেতে হবে। এবার খাবারটা আনছি।

তা দাও। তবে মনে হচ্ছে সকাল সকাল বিদেয় করতে পারলে বাঁচো।

এমন করে বলছ কেন পলাশদা। এতদিন পরে যখন দেখা হয়ে গেল তখন হঠাৎ ছেড়ে দিতে কি প্রাণ চায়। তবে দিনকালের কথা ভেবেই তোমাকে বলছি। এরপর যেদিন আসবে, একটু সকাল সকাল এসো।

কার্পেটের আসন পেতে সোনার মতো ঝকঝকে পেল্লাই থালায় খেতে দেওয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে। টেবিলে সার্ভ করার কথা তুলেছিল ললিতা কিন্তু নিজেই মেঝেতে পিঁড়ি পেতে খেতে চাইলেন মি. ঘোষ। থালার চারদিকে সাজানো তেমনি ঝকঝকে বিভিন্ন আকারের বাটি।

পাত সাজানো শেষ হলে ললিতা সামনের মেঝেতে বসে পড়ে বলল, নাও, খেতে শুরু করো।

আমি কি নতুন জামাই যে এমন করে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে বসিয়ে দিলে?

যা পারো খাও, সিংহবাড়ির এটাই রেওয়াজ। পাতে পড়ে থাকে ক্ষতি নেই। তোমাকে অতিরিক্ত কিছু খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করব না। জানি তুমি সাহেবসুবো মানুষ।

মি. ঘোষ খেতে শুরু করে বললেন, কোথা থেকে যে আরম্ভ করব ভেবে পাচ্ছি না। এলোপাথাড়ি শুরু করলে হেসো না কিন্তু।

তোমার খুশিমতো তুলে খাও, আমি কিচ্ছু বলব না।

ঘোষসাহেব খেতে খেতে বললেন, এর কোনটাতে তোমার হাতের ছোঁয়া লেগেছে বলো, সেটাই বেশি করে খাই।

ললিতা বলল, তা হলে সব পদগুলোই তোমাকে খেতে হবে।

সারাদিন বসে বসে এইসব বানিয়েছে! এত টেস্টফুল, যে কোনো একটা আইটেম ধরলে তো শেষ না করে ছাড়া যাবে না।

তুমি সবটুকু চেঁছেপুছে খেলেও কেউ কিছু মনে করবে না।

লোভ বাড়িয়ে দিয়ো না ললিতা। শেষে সবটুকু রান্না সাবাড় করে খোদ রাঁধুনিকে না খেয়ে ফেলি।

ললিতা মি. ঘোষের কথার ইঙ্গিতটাকে লঘু করে দেবার জন্যে খিলখিল করে হেসে উঠল। সরস খাবারের সঙ্গে নিজের সরস মন্তব্যটুকু ঘোষসাহেব পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে গিলতে লাগলেন।

ললিতা প্রসঙ্গ পালটে নিল। বলল, লঞ্চে তোমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কী রকম পলাশদা?

সব রকম ব্যবস্থাই আছে, মাছ, মাংস ডিম। আয়োজনের অভাব নেই, অভাবটা কেবল স্বাদের। মাইনে করা রাঁধুনি চার্ট ধরে সারা সপ্তাহটা রান্না করে যাচ্ছে। একই স্বাদ, একই বর্ণ, একই গন্ধ।

সত্যি পলাশদা, যখন মন চাইবে চলে এসো।

একবার যখন সন্ধান পেয়েছি তখন বদলি না হওয়া অবদি ঠিকই আসব তোমার আস্তানায়। অবশ্য সিংহসদনের দ্বার যদি খোলা পাই।

হেসে বলল ললিতা সিংহ, তোমার জন্যে সদা উন্মুক্ত থাকবে।

সামান্য সময় বিরতি। মি. ঘোষ মাংসের হাড় থেকে থকথকে মজ্জাটুকু চুষে বার করছিলেন। ললিতা বলল, এতসব সাঙ্গোপাঙ্গর খাবার আসছে কোত্থেকে? নিশ্চয়ই দু-চারজন জমিদারের ভেট থেকে নয়?

ভেট তো আছেই, তা ছাড়া প্রতিদিন আমাদের বাহিনী গ্রামবাসীদের শায়েস্তা অভিযানে বেরোয়। বীর স্বদেশিওলারা আগেভাগেই ভেগে পড়ে। দু-একটা সামনে পড়লে চাবুকের ঘায়ে

BanglaBook.org

স্বদেশি ভোলানো হয়। তারপর ঘরের আসবাবপত্র পথে মাঠে ঘাটে টেনে ছড়িয়ে ফেলে দেয় আর্মড ফোর্স। মেয়ে আর কাচ্চাবাচ্চাগুলো মাঠে বসে চেঁচাতে থাকে। পেট্রল ছড়িয়ে ঘরের চালে আগুন দেওয়া হয়। মুহূর্তে পুড়ে ছাই। ছাগল, গোরু যা থাকে থানার চৌকিদার, দফাদাররা তাড়িয়ে নিয়ে আসে। খাদ্যবস্তু হিসেবে ওগুলোর উপাদেয়তা নিশ্চয়ই তুমি অস্বীকার করবে না।

ললিতা বলল, ঘরদোর জ্বালিয়ে নিরীহ মেয়ে আর কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে শাস্তি দিতে কষ্ট হয় না তোমার?

খেতে খেতে থেমে গেলেন মি. ঘোষ। উত্তেজিত হয়ে বললেন, এক একটা কালকেউটের বাচ্চা। ওদের শুধু আশ্রয়টা কেড়ে নিয়েছি, অঙ্কুরে যে বিনাশ করিনি এই যথেষ্ট। আর তোমার এলাকার মেয়েদের কথা বোলো না, শাঁখ বাজাতে ওস্তাদ। দূর থেকে আমাদের লোকজনকে আসতে দেখলেই শাঁখ বাজাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভেগে পড়বে স্বদেশিওয়ালা।

আগুন নিয়ে খেলতে খুব ভালো লাগে তোমার, তাই না পলাশদা? কিন্তু কোথায় যেন পড়েছিলাম, from little spark may burst a mighty flame.

হা হা করে হাসতে গিয়েও হাসি থামাতে হল মি. ঘোষকে বিষম লাগার ভয়ে। ধীরে ধীরে বললেন, ললিতা, তোমাকে আজও ভুলতে পারিনি কেন জানো, খুব সুন্দর কথা বলতে পারো তুমি। আগেও বলতে, এখনো কোনো পরিবর্তন নেই। একটু থেমে আবার বললেন, আমি কলেজ লাইফে কবিতা লিখতাম, মনে আছে? এখন কবিতার কলি শুকিয়ে গেছে ললিতা।

বিশ্বাস করি না পলাশদা। ফুলের নামে তোমার নাম। যে সে ঋতুর নয়, বসন্তের ফুল তুমি। পলাশের রঙেই তো আগুনের খেলা। সারা মন জুড়ে তোমার রঙের আগুন জ্বলছে, পার পাবে কী করে।

তুমি আমার অতীতকে এই মুহূর্তের জন্যে হলেও ফিরিয়ে আনলে ললিতা। আজ তোমাকে তা হলে একটি সত্যি কথাই বলি। কবিতার বোধ করি মৃত্যু হয় না। কয়েকদিন আগে আমার লোকেরা গিয়েছিল গাঁয়ে আগুন দিতে। আমি বসেছিলাম লঞ্চে। সন্ধ্যার মুখে গাঁয়ের মাথায় আগুন দেখতে পেলাম। কী বিউটি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। দূর থেকে মনে হল কয়েকটা ক্ষুধার্ত সিংহ লালচে কেশর ফুলিয়ে শিকার লক্ষ করে লাফিয়ে চলেছে। আমার মনে হল, আমি বাংলাদেশে নেই, আফ্রিকার কোনো গভীর বনের বুক চিরে ছুটে চলা নদীর ওপর থেকে এ দৃশ্য দেখছি।

ললিতা বলল, আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না, তুমি এবার যখন আসবে, অন্তত একটা করে কবিতা সঙ্গে আনবে।

কথা দিতে পারছি না, তবে চেষ্টা করব ললিতা।

খাওয়া শেষ হল। হাত মুখ ধুয়ে মসলা চিবুতে চিবুতে কথা হচ্ছিল দুজনের।

ললিতা বলল, হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল, তোমার এই সর্বভুক শদেড়েক ব্যাটেলিয়ানের খাবারদাবার কি গ্রাম থেকেই সংগ্রহ হয়ে যায়?

পাগল হয়েছ। নৌকো বোঝাই সব খাবার আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে।

আমিও তাই ভাবছিলাম, কী করে এতগুলো মানুষের খাবারদাবার, প্রতিদিনের দরকারি জিনিসপত্র এখানে সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু নদীতে নৌকো-টৌকো সব নাকি স্বদেশিওলারা পুড়িয়ে দিয়েছে?

আমি সরকারি নৌকোর কোনো রিস্কে যেতে চাই না। কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে দুটি মহাজনকে। ওরাই নৌকো বোঝাই রসদ সাপ্লাই করে যায়।

ললিতা বলল, শুনেছিলাম নদীতে এখন কোনোরকম নৌকোই চলছে না?

BanglaBook.org

ঠিকই শুনেছ। আমাদের সাপ্লায়াররাও খুব সজাগ হয়ে গেছে। পাছে কোনো হাঙ্গামায় পড়তে হয় তাই গভীর রাতেই ওরা নৌকো ভাসিয়ে আনে। সোম আর বুধ, এই দুটো দিন ওরা সাপ্লাই দিয়ে যায়।

ললিতা বলল, আমার এত সব খবর নেবার কারণ কী বলো দেখি পলাশদা?

এমনি কৌতূহল।

না। কন্টাই থেকে আমাদেরও মাসকাবারি অনেক জিনিস নৌকোতে আসে। আমার ছোটো একখানা নৌকো আছে। ওদের ভয়ে বের করতে পারি না। গড়খাইতে ডুবিয়ে রেখে দিয়েছি। এদিকে গোরুর গাড়িরও চলাচল বন্ধ। বড়ো রাস্তার পঞ্চাশ-ষাট জায়গায় কেটে উড়িয়ে দিয়েছে কংগ্রেসিরা। কাঁহাতক মুটে দিয়ে মালপত্র আনা যায় বলো। এদিকে আমার শিরে সংক্রান্তি।

কেন, কী হল তোমার?

আসার সময় দেখোনি, ঠাকুরমণ্ডপে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে? মহানবমীতে গ্রাম ভোজন। কত আর লোক দিয়ে রসদ সংগ্রহ করব।

একটু ভেবে নিয়ে মি. ঘোষ বললেন, পরশুর আগে সাপ্লায়ারদের সঙ্গে তো আর দেখা হবে না। ওরা এলে ওদের দিয়ে তোমার মালপত্র আনাতে পারি। বুধবার আমার আটশো ইউনিট কেরোসিন আসছে। দরকার থাকলে বোলো।

তোমাকে আর ভাবতে হবে না পলাশদা, যা হোক করে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমাকে নেমন্তন্ন করবে না পুজোয়?

বাড়িতে অতিথি এলে মুখোমুখি তাকে কি আর নেমন্তন্ন দেওয়া যায়। বকশি সাধুচরণ তোমার লঞ্চে গিয়ে সিংহবাড়ির তরফ থেকে নেমন্তন্ন করে আসবে।

মি. ঘোষ তাঁর আস্তানার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবার পর তাড়াতাড়ি কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসল ললিতা।

সুচরিতেষু—

অন্ধকারের স্রোতে দুটো কাগজের নৌকো ভেসে আসছে দরিয়ার দিকে। বুধবার নক্ষত্রখচিত আকাশ। চাঁদের কণামাত্র থাকবে না আকাশে। নৌকোর খেলা দেখতে চাও তো দীপ জ্বালাও—তোমাদের সিংহবাহিনী।

চিঠিটা ভাঁজ করে গোলাপিকে ডাকল ললিতা। গোলাপি এসে দাঁড়াতেই তার হাতে চিঠিখানা গুঁজে দিয়ে বলল, এখুনি দৌড়ে যা মাস্টারবাবুর কাছে। আজ রোববার। বোর্ডিংয়ে উনি ছাড়া আর কেউ নেই। চটপট দিয়ে আসবি।

গোলাপি এই আন্দোলনের সময় বহুবারই পত্রবাহিকার কাজ করেছে। সে জানতে চাইল, বউরানি, কী কথা লিখেছ এই লেখনের মধ্যি?

এটা তার যে অকারণ একটা কৌতূহল তা জানত ললিতা। কখনো সে গোলাপির মনে সামান্যতম সন্দেহেরও উদ্রেক হোক, এটা চাইত না। তাই সে বলল, ইস্কুল নিয়ে অনেক দরকারি কথা আছে, তুই সে সব বুঝবি না।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গোলাপি মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। নির্ভীক গোলাপি। তার খুড়তুতো একটা বোনকে নিয়ে স্বামীটি সুন্দরবনে পালিয়ে যাবার পর সারা পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে তার। চাকরবাকর, বকশিপাঠক কারু মান রেখে খাতির করে সে কথা বলে না। এক কথা বলতে গেলে গোলাপির মুখ থেকে পাঁচটি কথা শুনে আসতে হয়। এ হেন গোলাপির পথ রোধ

BanglaBook.org

র দাঁড়াল একটি লোক। অন্ধকারে তে-মাথার মোড়ে ঝাঁকড়া তেঁতুলতলাটায় অন্ধকার আরও ন হয়ে উঠেছে। তেঁতুলগাছের কাণ্ডের আড়ালে তার অর্ধেকটা দেহ ঢাকা পড়েছে। লোকটিকে হসা চেনা গেল না। সে একটা হাত একটা পা বের করে দাঁড়িয়ে আছে।

গোলাপির সাহসী বুকখানাও একবার কেমন যেন কেঁপে উঠল। তার মনে হল, পুকুরে ঝাঁপিয়ে ড়ে একডুবে ওপারে গিয়ে উঠলে কেমন হয়। অন্ধকারে লোকটার চোখে ধুলো দেওয়া যাবে। ন্তু ততক্ষণে আসল মানুষটা তার পরিচয় দিয়েছে।—বলি কোন লাগরের কাছে যাওয়া হচ্ছে, ন্দরী?

মরণ আর কী! তুমি তো এই কতক্ষণ আগে দেউড়িতে ছিলে, এরই ভেতর আমার পেছু নিয়ে খানটায় এসে দাঁড়িয়েছ!

মাইরি বলছি গোলাপি, একটু হাওয়া খেয়ে ফিরছিলাম। দেখি, হনহন করে একটা মেয়ে পাশ াটিয়ে চলে যাচ্ছে। মনে হল তোরই মতো। তাই একটু ভয় দেখাব বলে মাঠের পথে নেমে তঁতুলতলায় এসে উঠেছি।

খুব হয়েছে, এখন পথ ছাড়ো।

আচ্ছা তুই আমাকে দেখলে অমন এড়িয়ে চলিস কেন গোলাপি? সাধুচরণ কি তোর কোনো পকার করেনি? তোর মরদটা যখন পালিয়ে গেল তখন তার খাটুনির পাওনা টাকাগুলো কড়ায় গুায় তোর হাতে তুলে দেয়নি?

উবকার করেছ তুমি, না বলছি না। গোলাপির মন একটু নরম হয়। সে আবার বলে, দিগদারি ফারো না, রাস্তা ছাড়ো, আমার অনেক কাজ।

খালি বলে যা কোথায় যাচ্ছিস।

যমের বাড়ি।

এ কি একটা কথা হল?

তুমি এ রাতে কোন গস্তে বেরিয়েছ শুনি?

ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে সাধুচরণ বলে, তিনকুলে বাতি দিতে তো কেউ নেই তাই ঘুম াসে না, মনটা ফক্ ফক্ করে, একা একা ঘুরে বেড়াই।

গোলাপি বলল, তা বেশ করো, ঘুরতে ঘুরতে আবার যেন এ তেঁতুলতলা ছেড়ে ভুবনেশ্বরীর তঁতুলতলায় যেয়ো না।

ভুবনেশ্বরী!

হাঁ গো হাঁ, ভুবনেশ্বরী, নাথুর মা। আর ন্যাকা সেজে থেকো না। গোলাপির পেছনেও দুটো চখ আছে জানবে।

বিশ্বাস কর গোলাপি, আমি ওর ঘরে যাই গদাইয়ের টাকাপয়সা দিতে।

সে তো তুমি কাছারিতে দিতে পারো।

শুধু কি টাকা রে, তার মরদের খবরটাও তো দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে নাথুর মা'র শরীরের খবরটাও নিতে হবে।

নাঃ, তোর সঙ্গে কথায় আর এঁটে উঠব না।

একটা কথা বলে রাখি বকশিবাবু, আমাদের পেছু লাগো না লাগো কিছু বলব না কাউকে, কিন্তু

BanglaBook.org

ও বলবে কেন, আমি সব বুঝি। গদাইকে যেদিন সোঁদরবনে পাঠিয়েছ সেদিনই বুঝেছি ওর কপাল ভেঙেছে। তার ওপর হতচ্ছাড়িটা যদি আমাদের মতো কুচ্ছিৎ হত তা হলে হত—ভরা কোটালে থইথই রূপ নিয়ে বসে আছে।

তোষামোদে ফেটে পড়ল সাধুচরণ, তুই কুচ্ছিৎ, তা হলে ভূ-ভারতে সোন্দর কে রে!

বাস বাস, হয়েছে। রাতে আর অত সুখ্যাত কোরো না, ফেটে পড়ব।

সখেদে বলল সাধুচরণ, কোনোদিন কি একটু চোখ তুলে চাইবি না গোলাপি?

এখন সরে পড়ো। দিনের আলোয় মুখখানা দেখব অখন ভালো করে।

আচ্ছা যা, কিন্তু একটা অনুরোধ রাখবি?

বলে ফেলো চটপট।

কোথায় যাচ্ছিস তুই জানতে বড়ো ইচ্ছে করে।

বোর্ডিংয়ে মাস্টারবাবুর কাছে।

সেখেনে এত রাতে?

গোলাপি তেড়ে উঠল, মাস্টারবাবুকে নিয়ে কোনো কথা বোলো না বলছি, মুখে পোকা পড়বে।

আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা, আমি কি তাই বলছি। কত গুণের লোক তিনি! তাঁর নামে যে ব্যাটা বদনাম দেবে তার জিভ খসে পড়বে।

নরম হল গোলাপি। বলল, বউরানি তেনার কাছে জরুরি লেখন পাঠিয়েছেন।

খাবার ডাক দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন বুঝি?

তোমার তো খাবার চিন্তে ছাড়া আর কিছু নেই।

আমি বাজি রেখে বলতে পারি আজ রাতে ভোজের জন্যে ডাক পড়েছে।

তুমি ছাই জানো। যাও যাও, আর কথা বাড়িয়ো না। আলো থাকলে দেখিয়ে দিতাম এটাতে খাবার ডাকের কথা লেখা নেই।

তবে কী লেখা আছে?

ইস্কুলের কী সব কথা।

যদি হেরে যাই দু-দুটো টাকা দেব। সাধুচরণের কৌতূহল তখন তুঙ্গে।

বড়ো জিগিড়ে লোক তো তুমি বাপু। আঁধারে দেখতে পাও নাকি গো?

চিঠি বার কর, টর্চ আছে আমার কাছে।

অগত্যা চিঠিখানা বের করতে হল গোলপিকে। সে তখন কথার স্রোতে পড়ে গেছে, ফেরার উপায় নেই। মনে মনে ভাবলে, দেখুক না, ইস্কুলের কথা বই তো নয়। মাঝের থেকে মোফত হাতে এসে যাবে দুটো টাকা।

টর্চ জ্বেলে বউরানির চিঠিখানা পড়ল সাধুচরণ। দু-দুবার। তবু মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারল না। গোলাপি চিঠিখানা খপ করে হাত থেকে টেনে নিয়ে বলল, টাকা ফাঁকি দেবার মতলব আঁটছ বুঝি?

সাধুচরণের মাথায় তখন চিঠির হেঁয়ালিটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে কথা না বাড়িয়ে বলল, তোর কথাই ঠিক রে গোলাপি, তোর কথাই ঠিক।—বলতে বলতে ট্যাক থেকে বটুয়া খুলে দুটো কাঁচা টাকা বের করে দিলে।

গোলাপি টাকা দুটো হাতে নিয়ে বলল, আমি কি লেখন পড়তে পারি? বউরানিকে লেখনের ভেতর কী আছে জিজ্ঞেস করতে ইস্কুলের কথাটা বললেন।

ধূর্ত সাধুচরণ বুঝল, বউরানি গোলাপিকে ধাপ্পা দিয়েছে। কিন্তু তার উর্বর মাথা কিছুতেই দুটো নৌকোর রহস্য আবিষ্কার করে উঠতে পারল না।

BanglaBook.org

৩

আজ দুপুরে ধান ভানার কাজ ছিল না নাথুর মা'র। অনেক দিন পরে সে একটুখানি অবসর পেয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছিল। মা ঘরে আছে তাই নাথু ডোবায় পাড়ে বসে বালকুড় আর পুঁটি ধরছিল বঁড়শিতে। ভাতের টোপেই উঠে আসছিল মাছগুলো। এক একটা মাছ ধরে আর মহা আনন্দে লাফাতে থাকে নাথু। পাশে একটা মাটির ভাঁড়ে জমা হয় মাছ। একটুখানি ভাঁড়ের জলে খলবল করতে থাকে মাছগুলো। বোধ করি ঘাটের পাটের কাছে ঝাঁক বেঁধে এসেছে। ঘন ঘন টোপে ঠোকরাচ্ছিল।

নাথু ভেবে রেখেছে, মা ঘুমোয় ঘুমোক। ঘুম ভাঙলে নাথুর কৃতিত্ব দেখে অবাক হয়ে যাবে।

স্বপ্ন দেখছে নাথুর মা। ধান ভানতে উঠেছে শিউলির মা'র ঢেঁকিতে। একী, মাথার ওপর খড়ের চালটা গেল কোথায়! খাঁ খাঁ করছে নীল শূন্যতা। একটা চিল মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে। কাছে এলেই শোনা যাচ্ছে তার গলায় আর্ত চেঁচানি। নাথুর মা'র বুকের ভেতর ওই শব্দটা সরাসরি এসে বাজছে।

গড়ের ভেতর ধার পড়েছে। সে পাড় দিচ্ছে আজ একা। শিউলির মা উসরে দিচ্ছে রোজকার মতো। আজ ওই ফাঁকা শূন্যটা নাথুর মায়ের চোখ দুটোকে বড়ো টানছে। শেষ আশ্বিনের তরল সোনার মতো রোদটুকু ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে তার সর্বাঙ্গে। ওই তো একটা সাদা মেঘ আকাশের মাঝ থেকে নদী-রেখার মতো দিকপ্রান্তে গিয়ে মিশেছে। নাথুর মা'র মনে হল ওটা সত্যিই একটা নদী আর ওই নদীটা চলে গেছে সুন্দরবনের মনসাপোতায়। তার মনে হল সে ওই নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে চলে যাবে নাথুর বাপের কাছে। কতদিন তাকে দেখেনি। সেই যে কবে গেছে দেশ ছেড়ে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলবে, একটুও কি আমার কথা মনে পড়ে না তোমার! আমার কথা না হয় ভুলেই গেলে, তোমার নাথু কী অপরাধ করেছে বলো? সে যখন, 'আমার বাবা কবে আসবে মা' বলে, তখন আমি তাকে কোনো উত্তর দিতে পারি না। সাধুচরণ স্পষ্ট করে তোমার আসার খবর দেয় না। সে কটা টাকা ধরিয়ে দেয়। অমন টাকা চাই না আমার। দেশে থাকব, খেটে খেটে শুধু নুনভাত খাব। তিনটে পেট চলে যাবে। আর কখনো সাধুচরণ আমার কাছে থেকে তোমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

শিউলির মা হাঁ করে চেয়ে বলল, কী রে নাথুর মা, আজ তোর শরীরটা ভালো নেই বুঝি?

নাথুর মা সচকিত হয়ে সমান তালে পা ফেলে পাড় দিতে লাগল। এতক্ষণ নাথুর বাপের কথা ভাবতে গিয়ে এলোমেলো পড়ছিল তার পা-টা।

আবার একসময় মন উধাও হল নাথুর মা'র। নতুন বউ, চোদ্দো বছরের মেয়ে। বিয়ের পর গদাইচন্দ্রের পিছন পিছন আসছিল সে ঘোমটা দিয়ে। বাপ-মা ছিল না, জ্ঞাতি কাকার বাড়িতে মানুষ। তারা সম্বলহীন মেয়েটাকে পাত্রস্থ করেই খালাস। পাত্রের পৈতৃক দেহখানা আর একটুকরো মাথা গোঁজার ভূমি ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু তাতেই খুশি হয়েছিল চোদ্দো বছরের চাঁপারানি। গদাইচন্দ্র নতুন বউকে কোল পাঁজা করে তুলে ধরে খাল পার করেছিল। পাছে বউয়ের বিয়ের টুকটুকে শাড়িখানা ভিজে যায়।

সিংহবাবুর বাড়ি জনমজুরের কাজ করত গদাইচন্দ্র। সারাদিনে বারোগণ্ডা পয়সা মজুরি। তারই ওপর সংসার চলত। মাঝে মাঝে হায়-হাবালত করতে হত। অনেক বলে কয়ে সাধুচরণ বকশির কাছ থেকে গদাইচন্দ্র বিঘে খানেক জমি চাষের অনুমতি পেয়েছিল। তাতে একটু সুরাহা হয়েছিল

BanglaBook.org

তার। বসত বাড়ির লাগোয়া জমিটা, তাই গদাইচন্দ্রের সঙ্গে দরকার পড়লে চাষের কাজে হাত লাগাত চাঁপা। কিন্তু নাথু জন্মাবার পর থেকে গদাইচন্দ্র আর নাথুর মাকে খেতের কাজ করতে দিত না। কেন দিত না সে-ই জানে।

একদিন কী কুক্ষণে সে বর্ষার জলে সারাদেহ ভিজিয়ে গদাইচন্দ্রের জন্য পান্তাভাত নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেল সাধুচরণের সঙ্গে। বাবুর বাড়ি যাত্রার আসরে গদাইচন্দ্র হেডবকশি সাধুচরণকে চিনিয়ে দিয়েছিল।

সাধুচরণকে হঠাৎ ছাতা মাথায় আসতে দেখে পথের ধারে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। তাড়াতাড়ি করে ঘোমটা মাথায় টানতে গিয়ে গা থেকে সরে গিয়েছিল ভেজা কাপড়খানা। আড়চোখে সে দেখেছিল, লোকটা যেন তাকে গিলে খাচ্ছে।

গলার সুর মিহি করে সাধুচরণ জিজ্ঞেস করেছিল, কার ঘরের বউ গো তুমি?

স্বামীর নাম মুখে আনা পাপ। তাই সে আঙুল তুলে তাদের ঘরটা দেখিয়ে দিয়েছিল। সাধুচরণ অমনি বলে উঠেছিল, আরে আমাদের গদাইয়ের বউ! বাঃ বাঃ, খাসা বউটি তো পেয়েছে গদাই!

তারপর একদিন স্বামী গদাইচন্দ্র এসে তাকে বলল, ও বউ, আমাদের ভাগ্য ফিরেছে রে। বকশিবাবু আজ আমাকে নিজে ডেকে বলেছে, তোর বউকে এখানে বাসন মাজার কাজে লাগিয়ে দে। মাসে চারটাকা করে পাবে।

সেই থেকে বড়ো বাড়িতে তার কাজ জুটল। কিন্তু কিছুকাল পরেই তার সব সুখ হরণ করে নিল ওই সাধুচরণ বকশি। কী মন্তর যে কানে দিল মানুষটার কে জানে। সে সোঁদরবনে যাবার জন্যে খেপে উঠল। বছর দুয়েক সেখানে থাকতে পারলেই নাকি ট্যাকে টাকা গুঁজে আনবার জায়গা থাকবে না।

মানুষটার যাবার দিন সারারাত ঘুমুতে পারেনি সে। খালি কেঁদে কেঁদে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে। গদাইচন্দ্র কত প্রবোধ দিয়েছে তাকে, তবু মন মানেনি। কত রাতে পাশে শুয়ে ঘুম ভেঙে গেছে তার। ঝোরকা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে গদাইচন্দ্রের ঘুমন্ত মুখে। সে চেয়ে চেয়ে দেখেছে তার মানুষটাকে। তেমন করে খেতে পায় না তবু কী সুন্দর শরীরটার গড়ন।

ভোররাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় গদাই বলেছে, নাথুকে আমার দেখিস বউ। একটু থেমে আবার বলেছে, আর তোকে ভগবান দেখবে।

মানুষটা পুবদিকে দুটো হাত তুলে অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে গেছিল, আর একবারও স্ত্রীপুত্রের দিকে ফিরে তাকায়নি।

স্বপ্নের ভেতর যাত্রার মতো জীবনের ঘটনাগুলো ঘটে যেতে লাগল। নাথুর মা স্বপ্নে ধান ভানছে, আবার ধান ভানতে ভানতে স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন দেখছে।

শিউলির মা গড়ের মুখে হঠাৎ চিৎকার করে উঠতেই নাথুর মা ঢেঁকি থেকে পা-টা সরিয়ে নিল।—কে ওখানে কে?

একটা মানুষ মাথায় হাত চেপে ধরে বলছে মাথাটা আমার ফেটে গেছে রে নাথুর মা।

এ যে অবিকল নাথুর বাপের মুখখানা। সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য হারিয়ে গোঙাতে লাগল নাথুর মা।

এই যে মা—মা, ওঠ ওঠ। অমন করে গোঁ গোঁ করছিস কেন?

নাথুর ডাকে ধড়ফড়িয়ে মেঝেতে উঠে বসল নাথুর মা। হঠাৎ নাথুকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল। কী বিচ্ছিরি অলুক্ষুণে স্বপ্নটা সে দেখল!

কী হয়েছে তোর, মা, অমন করছিস কেন?

কিছু না বাবা, তুই খেলা কর। বলতে বলতে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল নাথুর মা।

BanglaBook.org

স্বপ্ন যে এমন করে সত্যি হয় তা কে জানত। কদিন পরে সারা সুব্দি গাঁয়ে রটে গেল, সুন্দরবনের জঙ্গলে লুকিয়ে মৌচাক ভাঙতে গিয়ে গদাইচন্দ্র আর ফেরেনি। নির্ঘাত সে বাঘের পেটে গেছে।

গদাইয়ের বেঘোরে প্রাণটা যাবার জন্যে হা-হুতাশ প্রকাশ করতে লাগল গ্রামবাসীরা। নাথুর মা'র সেই যে মুখের বাক্যি বন্ধ হল, কালেভদ্রে ছাড়া বড়ো একটা কেউ তাকে কথা বলতে শোনেনি। লোকে অবাক হয়ে দেখত আর বলত, এক ফোঁটা জল বেরোয়নি চোখে, মেয়েটা পাথর হয়ে গেল নাকি রে!

একদিন থপ থপ হেঁটে ছাতা বগলে নাথুর মা'র দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন পণ্ডিতমশাই।—কই গো মা, সে হতভাগাটা যে আর পাঠশালা যায় না।

নাথুকে নিয়ে বেরিয়ে এল নাথুর মা। প্রণাম করতে গিয়ে এই প্রথম সে কেঁদে বুক ভাসাল। তার মতো হতভাগ্য গরিবকে কেউ 'মা' বলে ডাকে না। পণ্ডিতমশায়ের মুখে সেই ডাক শুনে নাথুর মা'র বুকের পাষাণ গলে গিয়ে কান্নার স্রোত বইতে লাগল।

শক্ত হতে হবে মা, শক্ত হতে হবে। এই শিশুটার মুখের দিকে চেয়ে শক্ত হতে হবে। হতভাগাটা জন্মেছে চাষাভূষোর ঘরে কিন্তু গতজন্মের কর্মটা ওর ভালো ছিল মনে হয়। বামুন কায়েতের ঘরের ছেলেগুলো ওর সঙ্গে লেখাপড়ায় এঁটে উঠতে পারছে না।

নাথুর মা বলল, আপনার ছিচরণে ওকে সঁপে দিয়েছি বাবা। বাপ-মরা ছেলেটাকে আপনি দেখবেন।

হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন পণ্ডিতমশায়, আমি দেখব? আমি দেখবার কে? আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই যে আড়ালে বসে আছেন বিধাতা পুরুষটি, যিনি এমন জোয়ান সমর্থ ছেলেটাকে অকালে মারলেন, তিনি দেখবেন নাথুকে। সকলের মুরুব্বি হয়ে বসে আছেন, তাঁকেই ভাবতে হবে তোমার ছেলের ভাবনা। একেবারে ছেড়ো না ওই মুরুব্বিকে। সব আর্জি জানারে ওঁর কাছে। আদায় করে নেবে নিজের পাওনা কড়ায় গণ্ডায়, একদম ছাড়বে না। দরকার হলে আচ্ছা করে দুকথা শুনিয়ে দেবে।

কিছু বুঝল নাথুর মা, কিছু বা বুঝল না। তবে এটুকু সে সার বুঝল, এ গাঁয়ে একজন মাত্র লোক তার সত্যিকারের শুভানুধ্যায়ী আছেন, যিনি অর্থ দিয়ে না পারুন, সৎ উপদেশ দিয়ে সবসময় তাকে সাহায্য করতে চান।

পণ্ডিতমশায় বললেন, এই নাও মা তোমার পাওনা আট আনা পয়সা।

নাথুর মা বলল, কিন্তু বাবা, এ মাসে আমার অনেক কটা দিন কামাই হয়েছে। আপনি গতবারের মতো কামাইয়ের হিসেব করে তো পয়সা কাটেননি?

হিসেব ভুল হবে গয়ারাম পণ্ডিতের, তা হলে পণ্ডিতিই ছেড়ে দেব। কাটতাম, কাটতাম, কেবল এই হতচ্ছাড়া নাথুটা শোধবোধ করে দিলে। পিতৃদায়ে বেশ কটা দিন ওর কামাই গেছে। সে কটা দিন আমি ওর মাইনে নেব কোন যুক্তিতে? অত সব তোমাকে ভাবতে হবে না, অঙ্কের হিসের আমার ওপর ছেড়ে দাও।

গয়ারাম পণ্ডিত চলে গেলেন। যাবার সময় নাথুকে শাসিয়ে বলে গেলেন, কাল পাঠশালায় যদি না দেখি তোকে তা হলে হাড়মাস আর আস্ত রাখব না।

কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যায় নাথুর মা'র ঝোপড়ি ঘরে এসে ঢুকল সাধুচরণ। প্রথমে ফোঁস ফোঁস করে কটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে। তারপর গলাটাকে যদ্দুর সম্ভব করুণ করে বলল, মুখ নেই নাথুর

BanglaBook.org

মা তোর সঙ্গে কথা বলার। গদাইয়ের উপকার করতে গিয়ে আজ হতভাগাটাকে হারাতে হল। পই পই করে কানে মন্ত্র দিয়ে বলে এসেছিলাম, মাছের ভেড়ির তদারকি করবি, দুটো কাঁচা পয়সা চোখে দেখতে পাবি। রাতে পাহারা দিবি, উপরি পাবি। হায় হায়, সে সব কথা কানে তুলল না। কার বুদ্ধিতে পড়ে বনের ভেতর মৌচাক ভাঙতে গেল। আরে বাপ ওসব খালখাঁড়ি, জঙ্গলবুদার অন্ধিসন্ধি বোঝা কি তোর কম্ম। বাঘের পেটে গেলি হতভাগা!

একটু থেমে ভাঙা গলায় আবার বলল, ছেলে বউটাকে মাঝগাঙে ভাসিয়ে দিয়ে গেলি র‍্যা! আহা ভরকোটালের টানে সোমত্ত যৈবন বউটা ভেসে যায়।

আফশোসটা চাপার জন্যে কতক্ষণ ঠায় বসে রইল সাধুচরণ। আড়চোখে দেখল দাওয়ার খুঁটি ধরে বাইরের আবছা অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে নাথুর মা।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ট্যাকের বটুয়া খুলে একখানা একশো টাকার নোট মেলে ধরল।—নে ধর, নম্বরি নোটখানা রেখে দে। গদাই নেই বলে তো তোদের আর চোখের সামনে কুটোর মতো ভেসে যেতে দিতে পারি না।

তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে নাথুর মা। মুখে কোনো কথা নেই, শরীরে কোনো চাঞ্চল্য নেই।

বাঁ হাতে খপ করে নাথুর মা'র একখানা হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল সাধুচরণ, টাকার মতো বন্ধু নেই রে। সব শোক ভুলিয়ে দিতে পারে শুধু টাকা।

এতক্ষণে নাথুর মা'র গলা থেকে স্বর বেরিয়ে এল, হাত ছাড়ো।

সাধুচরণ নাথুর মার গলায় এতখানি কঠিন স্বর কোনোদিনই শোনেনি। সে প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেল। কিন্তু পোড়খাওয়া বহু অভিজ্ঞ সাধুচরণ সহসা দমে গিয়ে হাল ছেড়ে দিল না। সে হাতটা ধরে রেখেই বলল, আজ রাগ করছিস আমার ওপর কিন্তু এই টাকার জন্যে একদিন তোকে আমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। লক্ষ্মীকে ঠেলে ফেলতে ভয় করল না তোর!

এবার গলায় সবটুকু জোর জড়ো করে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল নাথুর মা, ছাড়ো হাত।

সাধুচরণ মনের মধ্যে এমন শক্তি আর ফিরে পেল না যাতে সে নাথুর মা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার হাতখানাকে ধরে রাখতে পারে। ঝড়ের ঝাপটায় পোকা লাগা ভাঙা ডালের মতো নিঃশব্দে খসে পড়ল সাধুচরণের হাতখানা।

কিছুকাল পরে সুন্দরবনের লাট থেকে পাশের গাঁয়ের একটা লোক এসে রটনা করে দিল গদাইচন্দ্রের মৃত্যু-রহস্য। পাশাপাশি দু-চারখানা লাটের লোকেরা নাকি এ খবরের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। বকশি সাধুচরণের নিযুক্ত লোকরাই নাকি মধু সংগ্রহের লোভ দেখিয়ে গদাইচন্দ্রকে বনে নিয়ে যায়। তারপর পিছন থেকে ডান্ডা মেরে গদাইয়ের মাথাটা ফাটিয়ে বনের আরও গভীরে ফেলে দিয়ে এসে রটিয়ে দেয়, গদাইচন্দ্রকে বাঘে খেয়েছে।

রটনা, রটনা। যে রটনার সত্যতা যাচাই করতে ঘরের খেয়ে কেউ যাবে না সুন্দরবন, সে রটনা সত্য হোক মিথ্যা হোক, তাতে কার কী এসে যায়। গ্রামের দরিদ্র আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত প্রায় সকলেই কোনো না কোনো ভাবে সিংহবাড়ির অনুগ্রহপ্রার্থী। তারা কথাটা নিয়ে কানাঘুষো করল কিন্তু হেড বকশি সাধুচরণের বিরুদ্ধে যেতে সাহসী হল না। সমাজের আঁস্তাকুড়ের এক গুবরে পোকা গদাইচন্দ্র, তার প্রতি কে অবিচার করেছে তাই নিয়ে বেশিদিন কেউ আর মাথা ঘামাতে চাইল না।

BanglaBook.org

৪

সুবদি গাঁয়ের পশ্চিমে সিংহবাড়ি, পুবে বামুনপাড়া। কানা ভুবন মিশ্রর আদি বাড়ি ওই বামুনপাড়াতেই। কানা অর্থে ছেলেবেলায় বসন্ত রোগে একটি চোখ খুইয়ে কানা আখ্যা পায়। তারপর থেকে বহু চেষ্টা করেও ওই বিশেষণটিকে নাম থেকে বিযুক্ত করতে পারেনি।

কানা ভুবনের পৈতৃক ভিটে বামুনপাড়ায় হলেও আর একটি বাড়ি সে করেছিল গ্রামের শেষে খালপাড়ে। অল্প বয়সে স্ত্রী বিয়োগের পর সুন্দরবনে গিয়ে সে একসময় বেজাতের একটি মেয়েকে সঙ্গে করে আনে। শোনা যায় যে মেয়েটি নাকি ছিল সদ্য বিধবা। একে বেজাতের মেয়ে তাতে বিধবা তাই জ্ঞাতিগোত্র মারমুখো হয়ে উঠল। শেষে ওই খালপাড়ে মেয়েটার জন্য আলাদা একটা ঘর তুলে সে তাকে নিয়ে বসবাস করতে লাগল। মেয়েটির নাম ছিল তরু। সবাই তার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে গেলে তাকে নিজেদের ভেতর তরু রাঁড়ি বলেই বলত। তবে তরু ছিল খুবই ফলবতী। সাত-আট বছরের ভেতর পাঁচ-পাঁচটি মেয়ের জন্ম দিয়েছিল সে। আশ্চর্য, তাতেই ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলে কানা ভুবন। মেয়েগুলোর গড়ন-গাড়ন বেশ ভালোই ছিল। কানা ভুবন এক-একটিকে বছর আট-দশেক হলেই কোথায় যেন নিয়ে চলে যেত, তারপর ফিরে আসত একা একা। এমনি করে সে সব কটাকেই পার করলে। লোকে বলে, অনেক দামে ও মেয়ে বেচে দিয়ে আসে। শেষেরটাকে পার করে দিয়ে আসার পর ঝটাপটি লাগল কানা ভুবনের সঙ্গে তরু রাঁড়ির। খালে নৌকো করে যাবার সময় অনেকে শুনতে পেত তরু রাঁড়ি ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। তারপর তাকেও বেশিদিন কাঁদতে হল না। কানা ভুবন তাকেও একদিন কোন বিকিকিনির হাটে যেন বেচে দিয়ে এল।

কেউ বলে এই মেয়ে বেচেই আসল পুঁজিটা জমিয়েছিল কানা ভুবন। আবার কেউ বলে, একসময় ঝড়ে ডুবে যায় একখানা লঞ্চ। ওই লঞ্চের মৃত কিছু যাত্রী ঠেকেছিল সুন্দরবনের একটা চড়ায়। সে সময় সুন্দরবনে ছিল কানা ভুবন। কাক-পক্ষীর মুখে খবরটা পেয়ে সে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যায় সেখানে। দু-দশজন আগেভাগেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিল খরস্রোতা একটা খালের ধারে! তার ওপারে চরটা দেখা যাচ্ছিল। মৃতদেহগুলো পড়ে ছিল। এলোমেলো। জোয়ারের জল সরে গিয়ে চড়াটা বেরিয়ে পড়েছিল কচ্ছপের পিঠের মতো। সবাই দাঁড়িয়েছিল খালের ধারে, লোভও ছিল মনে মনে, যদি ওই চরের বুকে ধনরত্ন কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু ওই খরস্রোতা খালটা পেরিয়ে কেউ সাহস করে যেতে চাইছিল না। নামলেই কুমির-কামোটের মুখে পড়ার সম্ভাবনা। একে একে সবাই চড়া রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিমুখ হয়ে ফিরে গেল। সবাই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে কানা ভুবন নেমে গেল খালের জলে। সবে জোয়ার শুরু হয়েছে। বেশি দেরি করলে সামনের চর ডুবে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যাবে মৃতদেহগুলো। এই সুযোগ। জীবনে বিপদের ঝুঁকি না নিলে লক্ষ্মী লাভ সম্ভব নয়। সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে উঠল সে। পাগলের মতো ছুটে গেল ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহগুলোব দিকে। উলটেপালটে দেখতে লাগল এক একটা করে। ধনী এক মহিলার গলা আর হাত থেকে গয়না খুলে নিল। একটি মানিব্যাগ থেকে বেশ কিছু টাকাও পাওয়া গেল। ঘড়ি আর আংটি জোগাড় হল। সবকিছু কোমরে জড়িয়ে আবার খাল পেরিয়ে এপারে এসে উঠল কানা ভুবন। একটা রাখাল ছেলে গাছের মাথায় চড়ে দেখেছিল কানা ভুবনের এই কীর্তি। তার পরের দিন ভোর হতে না হতেই সে নাকি মালপত্র নিয়ে দেশে চলে এসেছিল।

যে করেই হোক মধ্য বয়সে অনেক টাকাপয়সার মালিক হয়ে কানা ভুবন তেজারতি কারবার খুলে দিলে। অতি বিনীত আর নিরীহ একটা মানুষের মতো তার আচরণ। দীনভাবে দিন যাপন। ছেঁড়া ময়লা কাপড় আর একমুখ দাড়িগোঁফ তার শ্রী অঙ্গের ভূষণ।

BanglaBook.org

রাতের বেলা কানা ভুবনের অন্য চেহারা। খালপাড়ের বাড়িতে তখন একটি একটি করে লোক ঢুকতে থাকে। আর সোনা-দানা, ঘটি-বাটি বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে যায়। চড়া সুদে টাকা খাটায় সে।

লোকে বলে, ভুবন তেজারতি কারবারের থালা ঘটি বাটি বস্তাবন্দি করে মোটা দড়ি বেঁধে খালের কোন একটা জায়গায় ডুবিয়ে রাখে। আর টাকাপয়সা মানে নোটের গোছা সে পুরে রাখে ডাবের শুকনো খোলা কিংবা শুকনো বাঁশের পাবের ভেতর। এমনভাবে ঘরের আনাচে-কানাচে সেগুলো পড়ে থাকে যে লোকে সেই সব অকিঞ্চিৎকর বস্তুর দিকে ফিরেও তাকায় না।

মাস দুয়েক আগে চলছিল স্বদেশিওয়ালাদের খুব হাঁকডাক। সে সময় থানা পুড়িয়ে, সরকারি অফিস জ্বালিয়ে একটা তাণ্ডব চালিয়েছিল তারা। ধেনো মহাজনদের গোলা থেকে ধান কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছিল গরিব গুরবোদের ভেতর। ওই সময় একদিন কানা ভুবনের ভাষায়, স্বদেশি ডাকাতগুলো আসছিল তার বাড়ির দিকে। গাঁয়ের হাটে তারা সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে যখন বক্তৃতা করছিল তখনই তার মনে সন্দেহ জেগে ওঠে। সে হাট থেকে সরাসরি বাড়ি চলে আসে। গয়নাগাঁটি ট্যাকে গুঁজে টাকাপয়সা বাঁশের চোঙায় ভরে ঘরের দরজা হাট করে খুলে বসে থাকে। দূর থেকে সে চিনতে পেরেছিল কটা লোককে, যারা থালা আর গয়না বাঁধা রেখে টাকা নিয়ে গিয়েছিল তার কাছ থেকে। ব্যস, বেরিয়ে গেল কানা ভুবন পিছনের দরজা খুলে। হাতে তার গামছায় বাঁধা কিছু শুকনো চিড়ে। গামাগাছের জটলার ফাঁকে সে আকণ্ঠ নেমে গেল খালের জলে। একটা ফুটো হাঁড়ির ভেতর মাথা ঢুকিয়ে সেই হাঁড়িখানা গামাগাছের শেকড়ের ফাঁকে ভাসিয়ে রাখল। শ্বাস নেবার কষ্ট নেই, এদিকে আত্মগোপনও হল।

ঘরে ঢুকে স্বদেশিবাবুরা তাজ্জব। কেউ কোথাও নেই। ঘরের ভেতর শুকনো খড়, পাতা উড়ছে। আর খুঁজবে কোথায় তারা। খালপাড়ের অস্থানে এই একখানাই তো বাড়ি। সব্বাই লোকটাকে গালাগাল করতে করতে ফিরে গেল। পরের দিন রাত শেষের আগে জল থেকে উঠল না কানা ভুবন। পাশের গাঁয়ের একটা জেলে নৌকো সে সময় ওই খাল দিয়ে যাচ্ছিল বাহার গাঙের দিকে। তারা কানা ভুবনকে মাথা থেকে হাঁড়ি সরিয়ে কোমর ভরা সম্পদ নিয়ে ডাঙায় উঠতে দেখল।

সুব্‌দি হাই স্কুলের হেডমাস্টার মণিশঙ্করবাবু একরাতে এলেন কানা ভুবনের ডেরায়। তখন ভুবন সকালের জল ঢালা ভাতে তেঁতুল, লঙ্কা অর নুন সহযোগে খাচ্ছিল। ঝোরকা দিয়ে আবছা চাঁদের আলোয় সে দেখল লোকটিকে। মানুষটি তার অচেনা নয়। গ্রাম বেগ্রামের লোকেরা শ্রদ্ধা করে হেডমাস্টার মণিশঙ্করবাবুকে। কেউ বলে স্বদেশিওলাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখেন মণিশঙ্করবাবু। আবার কেউ বলে ও সব বাজে রটনা। পড়াশোনা আর ছাত্র নিয়েই তাঁর দিন কাটে। বিপত্নীক মানুষটি থাকেন স্কুল বোর্ডিংয়ে। সঙ্গে থাকে তাঁর বছর পনেরো বয়েসের মা-মরা একটি ছেলে।

মণিশঙ্কর বাইরে থেকে হাঁক পেড়ে বললেন, ভুবনবাবু বাড়ি আছেন?

এই প্রথম কানা ভুবন শুনল, তাকে এ তল্লাটের শ্রদ্ধেয় একজন লোক বাবু বলে ডাকছেন। সে বিগলিত হল মনে মনে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের মনের আবেগটুকু সামলে নিয়ে ভাবলে, আবেগ, দয়া এসব কারবারির মনের মধ্যে রাখতে নেই। সে অমনি নিরাসক্ত গলায় বলল, আছি আজ্ঞে, আসুন।

মণিশঙ্করবাবু ঘরে ঢুকলেন। ভুবন আসন পেতে বসালে।

BanglaBook.org

মনে হল মণিশঙ্করবাবু একটু চিন্তিত হয়ে আছেন। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটি লাল রঙের কাস্কেট বের করলেন। কাস্কেটটি খোলামাত্র সামান্য হেরিকেনের আলোতে হারখানা ঝকমক করে উঠল। কানা ভুবনের অভিজ্ঞ চোখ এ হারের মুল্য মুহূর্তে অনুমান করে নিল।

মণিশঙ্করবাবু বললেন, বুঝতেই পারছেন, খুব অসুবিধেয় পড়ে এসেছি। আপনি এ হারটা যদি কেনেন তা হলে আমার বড়ো উপকার হয়। আসলে বেশ কিছু টাকা আমার দরকার, তাই জিনিসটা বেচতে হচ্ছে। দেখুন কী রকম ভারী। ওজন করে দাম দিন যা হয়।

কানা ভুবন কাতর গলায় বলল, কিন্তু মাস্টারবাবু আমার এখানে তো সোনাদানা বেচা-কেনা হয় না।

মণিশঙ্করবাবুর মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। বললেন, কাঁথি যাবার পথটা বড়ো দুর্গম হয়ে পড়েছে, নইলে ওখানেই হারখানা বেচে আসতাম।

কানা ভুবন হারখানা হাতের তেলেতে নিয়ে ওজন বোঝার জন্যে বারকয়েক নাচিয়ে নিলে। তারপর বলল, বন্ধক রেখে কিছু টাকা দিতে পারি। কত টাকা আপনার দরকার?

দরকার তো অনেক—ম্লান হাসলেন মণিশঙ্করবাবু।

তবু কমেসমে কতটা হলে চলবে বলুন?

শ' আটেক টাকা।

বড়ো বেশি হয়ে গেল মাস্টারবাবু। তারপর একটু ভেবে আবার বলল কানা ভুবন, আচ্ছা, অসুবিধেয় যখন পড়েছেন, দেব আমি টাকা। তবে মাস দু-তিনের বেশি একে আগলে রাখতে পারব না। আপনি সুদে আসলে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

খুব উপকার করলেন ভুবনবাবু।

এ আমার ব্যবসা মাস্টারমশায়। আপনার উপকার করতে পারলে আমারও কিছু হবে।

মণিশঙ্করবাবু হার রেখে টাকা নিয়ে চলে গেলেন। পথে যেতে যেতে ভাবলেন, হারের লকেটে এল. এস. খোদাই করা রয়েছে। ললিতা হারটা পাঠাবার সময় চিঠিতে সে কথার উল্লেখ করেনি। ভুবন মিশ্রকে হারটা দিতে গিয়েই লকেটের ওপর নাম খোদাইটা চোখে পড়েছিল। কারো চোখে ওই নাম লেখা হারখানা পড়লে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেতে কতক্ষণ। আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে যে ললিতা সিংহের গোপন সংযোগ আছে তা অনুমান করে নিতে বেশি বেগ পেতে হবে না।

কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। টাকাটা কালই সুবোধ আর আনন্দর বাড়িতে দিয়ে আসতে হবে। আহা, হাজতে পচছে ওরা, আর প্রায় না খেয়ে উপবাস করছে পরিবার দুটো।

ললিতার কাছে কিছু টাকাই চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ললিতা বলল, গয়না দিতে পারি, টাকা নয়। গয়না আমার নিজের আর টাকা সিংহ এস্টেটের। ও টাকা আমি ন্যায়ত খরচ করতে পারি না। অনেক গয়না আছে আমার। এক এক করে নিয়ে বেচে দাও, আমি খুশি হব, তৃপ্তি পাব। আর গয়নার ভার তো কোনোদিন আমার বইতে হবে না।

পথ চলতে চলতে ললিতা সিংহের দানের কথা ভাবতে লাগলেন হেডমাস্টার মণিশঙ্কর।

আদর্শবাদী মণিশঙ্কর এই সিংহ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন একসময়। অতি মেধাবী, বিনয়ী ও বুদ্ধিমান। পাশের গাঁয়ের এক দরিদ্র বাড়ির সন্তান ছিলেন তিনি। গ্রামবাসীরা এখনো মণিশঙ্করের জন্মের সঙ্গে একটি কলঙ্কজনক ইতিহাস রটনা করে থাকে। মণিশঙ্কর পিতা বলে এখনো যাঁর নাম লিখে থাকেন, আসলে সেই মানুষটি নাকি জন্ম-পুরুষত্বহীন। সুন্দরী স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার বা বশে রাখার কোনো ক্ষমতাই ছিল না তাঁর। বাবা মারা যাবার মাসতিনেক পরে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারার আদলে সিংহবাড়ির ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

ললিতা সিংহের শ্বশুর ছেলেটিকে সন্তান স্নেহে পালন করতেন। তিনি সিংহবাড়ির ইস্কুলে তাকে ভরতি করে দেন। মণিশঙ্করের মাতৃ বিয়োগের পর অর্ণব সিংহের বাবা নৃপতি সিংহ বিনি পয়সায় অধ্যায়ন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন মাতৃহীন ছেলেটির। অর্ণব সিংহের থেকে দুক্লাস নীচে পড়ত মণিশঙ্কর। কিন্তু বুদ্ধিতে ঔজ্জ্বল্যে সে ছাড়িয়ে গিয়েছিল অর্ণব সিংহকে।

মণিশঙ্কর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার দ্বিতীয় হয়ে চারদিকে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। তার সেই অসামান্য কীর্তি দেখার জন্য তখন নৃপতি সিংহ জীবিত ছিলেন না। তিনি মৃত্যুর সময় অর্ণব সিংহকে কাছে ডেকে নাকি মণিশঙ্কর-ঘটিত সব কথা অকপটে বলে যান। আর অনুরোধ জানিয়ে যান, সিংহ এস্টেট থেকে মণিশঙ্করের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যাবার জন্য।

অর্ণব সিংহ অত্যন্ত উদারচেতা ছিলেন। তিনি একসময় মণিশঙ্করকে সিংহবাড়ির সম্পত্তির কিছু অংশ লিখে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু মণিশঙ্কর তাতে স্বীকৃত হননি। সম্পত্তি গ্রহণ করলে তাঁর জন্মের সঙ্গে যে অপ্রীতিকর ইতিহাসটুকু জড়িত, তাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। তিনি মফস্‌সল কলেজেই পড়াশোনা করেন। ছাত্রাবস্থায় আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সহায়-সম্বলহীন মেয়েকে বিয়েও করে ফেলেন। একটি শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে মণিশঙ্করের অষ্টাদশী স্ত্রীটি মারা যায়। সেই থেকে মণিশঙ্করেব পুত্রটি তাঁর সঙ্গেই রয়েছে।

ললিতা সিংহকে মণিশঙ্কর বউঠান বলেই সম্বোধন করেন। বড়ো প্রীতির সম্পর্ক দুজনের। ললিতা, স্বামী অর্ণব সিংহের কাছ থেকে মণিশঙ্কর-ঘটিত সব কথা শুনলেও কোনো দিন কোনো প্রসঙ্গে আভাসে-ইঙ্গিতে তার উল্লেখ করে মণিশঙ্করের অন্তরে আঘাত দিতে চায়নি। ললিতা সিংহের ব্যবহার এত অন্তরঙ্গ ছিল যে বাইরের সবাই ভাবত মণিশঙ্কর বউরানির আপন দেবর।

ললিতার কথাতেই একসময় কলকাতা কলেজের চাকরি ছেড়ে সিংহ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে হেডমাস্টারের কাজ নেন মণিশঙ্কর। কিছু আদর্শবাদী শিক্ষকও এইসময় তাঁর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভালো ভালো ছাত্রতে স্কুল ভরে যায়।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সারা দেশ যখন উত্তাল হয়ে ওঠে তখন তার ঢেউ এসে লাগে সুবদি স্কুলেও। ছাত্ররা দেশাত্মবোধের প্রেরণায় স্কুল ছেড়ে পথে নেমে পড়ে। কয়েকজন শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে যোগ দেন। এই কর্মযজ্ঞের মূল উৎস মণিশঙ্কর, আর তাঁর একমাত্র প্রেরণাদাত্রী বউঠান ললিতা সিংহ। যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দেশের কাজে তাঁদের পরিবারগুলিকে দেখার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন মণিশঙ্কর। সিংহ এস্টেটে খয়রাতির একটা খাত আছে। সেই খাতে গোলা থেকে ধান নিয়ে ললিতা সিংহ তুলে দিয়েছে মণিশঙ্করের হাতে। মণিশঙ্কর সেই দান যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। এই বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সুবাদেই মণিশঙ্কর তাঁর বউঠানের নতুন নামকরণ করেছেন সিংহবাহিনী। বাইরে ললিতা সিংহের রাজভক্তির অন্ত নেই। দারোগা, সার্কেল অফিসার, ইন্সপেক্টার কিংবা সদর থেকে কোনো বড়ো সরকারি অফিসার যখনই অঞ্চল পরিদর্শনে আসেন তখনই সিংহবাড়িতে চলে তাঁদের সাদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা। ললিতা সিংহ স্বয়ং উপস্থিত থেকে অতিথি সৎকারের সবকিছু ব্যবস্থা করে। এমনি ত্রুটিহীন ছিল তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা যে সারা মহকুমার তাবৎ অফিসারেরা ললিতা সিংহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। কিন্তু বাইরের এই ইংরেজ-ভক্তির আড়ালে ললিতা সিংহের ছিল আর এক রূপ। সে রূপটি যথার্থই সিংহবাহিনীর। ধ্বংসাত্মক কাজের ভেতর দিয়ে ইংরেজ বিতাড়নে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সমূলে উৎপাটিত করতে হবে ইংরেজ শাসন। নিভৃত ঘরোয়া বৈঠকে যারা তার আলোচনা শুনেছে তারাই জানে ললিতা সিংহের প্রতিটি কথার কতখানি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়।

BanglaBook.org

৫

অমাবস্যার অন্ধকারে একটি ছোট্ট নৌকো সংকীর্ণ খাল পথে তীব্রগতিতে রসুলপুর নদী লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে। এখন নদীর বুকের সমস্ত জল ছুটেছে দরিয়ার দিকে। ছোটো খালের জলও সেই টানে ছুটে চলেছে উন্মত্তের মতো। নৌকোর বুকে চারজন আরোহী। তাদের দুজন নৌকো সামলাতে ব্যস্ত। একজনের হাতে হাল, অন্যজন লগি হাতে বাঁকের মুখগুলো সামলাচ্ছে যাতে ডাঙায় নৌকো ধাক্কা না খায়। নৌকোর গলুইতে দুজনে বসে। একজনের বয়স তিরিশ, অন্যজন সবে কৈশোর কাটিয়ে উঠেছে। দুজনের মাঝখানে দুটি মুখবন্ধ পেট্রলের টিন, এক বান্ডিল দেশলাই আর গোটা চারেক মশাল।

পূর্ণ যুবা পুরুষটির গলা শোনা গেল, অন্তু, তোমার কিন্তু এই অ্যাকশানে আসাটা ঠিক হয়নি। মণিদার কথা শোনা উচিত ছিল।

কেন, আমি তো বাবার মত নিয়েই এসেছি।

ওকে মত নেওয়া বলে না, জোর করে কথা আদায় করে নেওয়া।

আমি তো বড়ো মামণিকেও বলেছি, তিনি তো বাধা দেননি।

ললিতাদি ভালো কাজে কাউকেই বাধা দেন না, তা সে যত কঠিনই হোক।

অন্তু বলল, কাকু, যদি কাজটা কঠিন বলে পিছিয়ে আসি তা হলে সারাজীবন সহজ কঠিন বেছে বেছেই সময় যাবে, কাজ আর হবে না। তাই সুযোগ এলেই বাছবিচার না করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।

হাল ধরে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে অমনি বলে উঠল, সাবাস, মণিদার ব্যাটার মতোই কথা বলেছিস।

যে লগি ঠেলছিল সে অন্ধকারে ফোড়ন কাটল, দেখতে হবে তো কার চেলা। একেবারে ললিতা সিংহের মন্ত্র শিষ্য।

অন্তু বলল, আসার সময় বড়ো মামণি আমায় চুপি চুপি একটা কথা বলে দিয়েছেন।

হালের মানুষটি বলল, সে কথা কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছেন তো?

না, বারণ করবেন কেন?

তা বল কী বলেছেন?

অন্তু বলল, রবি ঠাকুরের দুলাইন কবিতা।

কী কবিতা রে?

অন্তু বলল,

'বাঁচি আর মরি
বহিয়া চলিতে হবে তরী'

আর কোনো কথা নেই কারো মুখে। ওই দুছত্র কবিতা আশ্চর্য এক মন্ত্রের মতো অভিযাত্রীদের অন্তরে ফিরে ফিরে বাজতে লাগল।

খাল যেখানে নদীতে এসে পড়েছে সেখানে স্রোতের টান প্রবল। একজন নৌকো থেকে লাফিয়ে নেমে গামাগাছের কাণ্ডের সঙ্গে নৌকোটাকে বাঁধল। এখন শুধু একটা আওয়াজ কানে বাজছে, পলাতক জলস্রোতের খলখল শব্দে নৌকোর পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে যাওয়া।

ওরা চার মূর্তি নৌকোয় বসে অন্ধকার নদীর দিকে চেয়ে আছে। নদীতে কোনো চাঞ্চল্য নেই। এই অমাবস্যার রাতগুলিতে জেলেদের নৌকোর আলোয় নদী রহস্যময় হয়ে উঠত। কিন্তু নদী

BanglaBook.org

থেকে সমুদ্রের দিকে সরে গেছে জেলেরা। এখন এ নদীর বুকে নৌ চলাচল বন্ধ। এপার থেকে ওপারে যাবার উপায় নেই। সারাদিন নদীর বুকে মৃত্যুর স্তব্ধতা। আন্দোলনকারীরা পুড়িয়ে দিয়েছে নদীপথে চলাচলকারী বহু নৌকো। অত্যাচারী পুলিশবাহিনীকে তারা কোনোমতে জলপথে পারাপার হতে দেবে না।

হালে বসে আছে রঘুনাথ। সে ভাবছিল আটাশে সেপ্টেম্বর থানা আক্রমণের কথা। সমর পরিষদের নির্দেশ মতো তারা প্রায় ছ-সাত হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল অজানবাড়ি বাজারে। একটা মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ তখন এক হয়ে গেছে। পিছনে ফেলে আসা সংসারের ভাবনা নেই। শুধু সামনে কঠিন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রতীক্ষা। প্রতিটি মানুষের ভাবনা এমনকী তাদের বুকের স্পন্দনও তখন একই তালে চলেছে।

ঢং ঢং ঢং ঢং বেজে চলেছে থানার ঘণ্টা। প্রহরী রাত এগারোটার ঘণ্টা বাজিয়ে পাগড়ির ওপর মাথা রেখে টান হয়ে শুয়ে পড়ল বেঞ্চের ওপর। রামায়ণ পড়ছিল আর একজন সেপাই। তার পাশে পড়ে ছিল বন্দুক। মুহূর্তে সমর পরিষদের অগ্রগামী দল ঝাঁপিয়ে পড়ল সেপাইদের ওপর। কেড়ে নিল বন্দুক। বীরেন মিশ্র, ভোলানাথ, রাখলচন্দ্র, হর বর, হৃদয় মণ্ডল আরও শত শত লোক তখন বন্যার মতো ঢুকে পড়েছে থানা কম্পাউন্ডের ভেতর। সেও ছুটছে তাদের সঙ্গে। বাকি কটা বন্দুক তখন তাদের আয়ত্বে। ঘুমন্ত সেপাইরা কিছু বোঝার আগেই বন্দি হয়ে গেল। এদিকে হুইস্‌ল্ বেজে উঠল সরোজবাবুর মুখে। উত্তর দিক থেকে প্রায় হাজার মানুষের এক দল পুষ্টিন সেনের নেতৃত্বে দৌড়ে এল।

থানার ঘরগুলোতে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। দারোগা সেপাই সকলেই তখন বন্দি। সাত-আট হাজার মানুষ তখন সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে আগুন ধরিয়ে চলেছে। সে কী উল্লাস, সে কী প্রাণমাতানো বন্দেমাতরম্ ধ্বনি! রাতের আকাশে ফণা বিস্তার করে তখন সবকিছু গ্রাস করেছে অগ্নিনাগ।

অন্তর চোখেই আলো এসে পড়ল প্রথম। দুটো তারা যেন নদীর স্রোতে ভেসে আসছে। বহু দূর থেকে এঁকেবেঁকে আসছে তারা। কখনো একটি কখনো দুটি দেখা যাচ্ছে। কখনো বা পাশাপাশি, কখনো বা দূরে। আবার কখনো নদীর বাঁকের মুখে দুটিই অদৃশ্য।

ওরা মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। ছোট্ট নৌকোখানা ছেড়ে দিল স্রোতের মুখে। বেশ খানিক পথ গিয়ে ওপারে ঠেকল। ওদের অনুমানই ঠিক। নৌকো দুটো নদীর দক্ষিণ তীর ঘেঁষেই আসছে। উত্তর তীরে ঘন জনবসতি। আন্দোলনে আন্দোলনে জায়গাটা উত্তপ্ত উত্তাল। ওই তীর ধরে এগোলে বিপদ যে কোনো বাঁকে ওত পেতে থাকতে পারে। তাই দক্ষিণ তীরই অনেকটা নিরাপদ। এদিকটা শহরের দিক। একটু দূরেই গুহ রাইস মিল। তার পাশে একটা পরিত্যক্ত বজরার ভেতর থানার নতুন দারোগা সাময়িক আস্তানা গেড়েছে। ওপারে আন্দোলনকারীরা পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে পুরাতন থানা।

দুটো ভড় নৌকো পাশাপাশি তীর বরাবর এগিয়ে আসছে রসুলপুর খেয়াঘাটের দিকে।

অন্তু আর রঘুনাথ নৌকো থেকে নেমে তীর ধরে ভড় দুটোর দিকে ছুটে গেল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, নৌকো তীরে নোঙর করে নেমে এসো শিগ্‌গির, সামনে বিপদ। স্বদেশিওলারা বজরার ওপর থানাটাকে ঘিরে ফেলেছে। আমাদের থানা থেকে ডাঙা পথে পাঠিয়ে দিয়েছে তোমাদের খোঁজে। এই পাশের বাঁকে নৌকো বেঁধে রেখে ঝটপট উঠে এসো। ওপারের বহু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে নদীর ধারে। তারা তোমাদের নৌকোর খবর পেয়ে গেছে। ওপারে নিয়ে গেলেই ডুবিয়ে দেবে।

BanglaBook.org

নৌকোর মাঝিমাল্লারা মহা ত্রস্ত হয়ে ভড় দুটো কূলে ভেড়াল। তারা নোঙর করে ঘন কাদা ঘেঁটে তীরে উঠে এল। নৌকোর আলো দুটো ইতিমধ্যেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ কাউকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না।

অন্তু চাপা গলায় বলল, চলে আসুন আমাদের সঙ্গে। সামনে একটা প্রাইমারি স্কুলবাড়ি। ওখানে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেবেন। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশিওলারা ভেগে পড়বে। লঞ্চ থেকে গোরা সৈন্যরা তাড়া করে নিয়ে যাবে ওদের।

লোকগুলো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওদের পিছন পিছন চলতে লাগল। এদিকে রঘুনাথদের নৌকোর বাকি দুজন নৌকোটার গুণ ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল ভড়ের দিকে। অমাবস্যার অন্ধকারে পাড়ের নীচে ছোট্ট নৌকোখানার গতিবিধি কেউ লক্ষ করল না।

কিছু পরেই ভড় দুখানার ভেতর থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে এল। ততক্ষণে অন্তু আর রঘুনাথ লোকগুলোকে পিছনে ফেলে ভড়ের দিকে ছুটে চলেছে। দেখতে দেখতে আগুন অমাবস্যার অন্ধকার চিরে আকাশের দিকে উঠতে লাগল। এতক্ষণে লোকগুলো বুঝতে পেরেছে তারা প্রতারিত হয়েছে। তারাও মার মার শব্দে ছুটে আসতে লাগল ওদের পিছন পিছন। ওরা লাফিয়ে পাড় ছেড়ে নীচে জলের কিনারায় নেমে গেল। সেখানে তখনো চাপ চাপ অন্ধকার। কাদায় পায়ের গোছ ডুবে যাচ্ছে। অতি কষ্টে পা তুলে তুলে আছাড় খেতে খেতে তারা নিজেদের নৌকোর নাগাল ধরে ফেলল।

রঘুনাথ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল নৌকোয়। এতক্ষণে জ্বলন্ত দুটো ভড়ের আলো এসে পড়েছে নদীর ওপর। রঘুনাথদের ছোট্ট নৌকোটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তীর থেকে। অন্তু উঠে এলেই খরস্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হবে নৌকো। রঘুনাথ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, অন্তু হাতটা ধরে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছে নৌকোয়। ওঠা আর হল না। রাতের আকাশ কাঁপিয়ে ছুটে এল একটা বুলেট। রঘুনাথের হাত অন্তুকে আর ধরে রাখতে পারল না। প্রবল স্রোতের মুখে দু-চার বার লাট খেতে খেতে আহত কিশোর বীর অন্তু নদীর নিম্ন স্রোতে তলিয়ে গেল। রঘুনাথদের নৌকো তখন আলোর বৃত্ত থেকে অন্ধকারে উন্মত্তের মতো ছুটে চলেছে। সে নৌকো ফেরাবার শক্তি তখন আর কারু হাতে ছিল না। কয়েকটা বুক ফাটা কণ্ঠের চিৎকার অন্ধকার আকাশটাকে যেন তোলপাড় করে তুলল, অন্তু, অন্তুরে...!

ভড়ের মালিকের বন্দুকটা আবার অন্ধকার ভেদ করে চতুর্দিক কাঁপিয়ে গর্জে উঠল, গুড়ুম, গুড়ুম।

৬

লঞ্চের ডেকে চেয়ার পেতে বসেছেন পি. কে. ঘোষ। শেষ রাতে শয্যায় শুয়ে একটুখানি মেঘ গর্জন শুনেছিলেন। এখন ভোরের আকাশ উজ্জ্বল নীল। সূর্যের সোনালি উত্তরীয় খসে পড়েছে সামনের বটগাছটার মাথায়। তার একটা অংশ লুটোচ্ছে নদীর জলে।

ঘোষসাহেব শেষ শরতের রোদটুকু গায়ে মেখে চরাচরের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। ললিতার জন্যে কবিতা চাই। এই তো কবিতার মুহূর্ত। তিনি উঠে গেলেন কেবিনের ভেতর। পেন আর প্যাড টেনে নিয়ে বসলেন। কবিতার এলোমেলো কয়েকটা ছত্র মনে এল। কিন্তু কবিতা লেখা আর হল না। কবিতার বদলে কাব্য করে ললিতাকে চিঠি লেখার প্রেরণা এল।

ললিতা,

তোমার জন্যে কবিতা লিখতে গিয়ে এই মুহূর্তে বড়ো বিপন্ন বোধ করছি। প্রকৃতির যেদিকে তাকাই সেদিকেই কবিতার উপাদান ছড়ানো। কিন্তু আমার কলমে কাব্য-প্রতিমা গড়ার জন্যে যখন

BanglaBook.org

প্রকৃতির কাছে উপাদান সংগ্রহ করতে যাই তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে একজনের আশ্চর্য উপস্থিতি লক্ষ করি। একদিন তোমাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সে কত দিনের কথা। তবু ছবিটা স্পষ্ট চোখের ওপর ভাসছে। তুমি জানো, চিরদিনই স্মৃতি আমার প্রখর। তুমি সেদিন সদ্য স্নান সেরে আকাশ-নীল একটা শাড়ি পরে বেরিয়ে এসেছিলে। এখনো দেখতে পাচ্ছি শাড়ির আঁচলে সোনালি জরির কাজ। সবে সুরভিত সাবানে ধোয়া ধারাযন্ত্রে সিক্ত মুখ। আজকের উজ্জ্বল শরতকালের ঊষার সঙ্গে তার কী আশ্চর্য মিল। নীল আকাশ, সোনালি রোদ, বৃষ্টি ঝরে যাওয়া অমলিন সাদা মেঘ, সবটাই আজ সেদিনের ললিতার উপমা হয়ে আছে।

আমার অনুভূতির কথাগুলো আজ এই ছোট্ট চিঠির ভেতর দিয়ে তোমাকে জানালাম। কবিতা এলে তাকে যত্ন করে সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাব।

পলাশদা।

চিঠিখানা ভাঁজ করে খামে বন্দি করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! কেবিনের ছোট্ট উইন্ডোর ভেতর দিয়ে যাকে লঞ্চের দিকে আসতে দেখা গেল সে যে ললিতারই দূত।

কেবিন থেকে ডেকে নেমে এলেন ঘোষসাহেব। সাধুচরণ হাত নেড়ে কী বোঝাচ্ছিল শাস্ত্রীকে। ঘোষসাহেব ডেক থেকে লোকটিকে ওপরে নিয়ে আসবার আদেশ দিলেন।

সাধুচরণ ডেকে এসে ছাতাখানাকে বগলে চেপে কোঁচার কাপড় দুহাতে ধরে হাঁটু অবদি মাথা ঝুঁকিয়ে সাহেবকে প্রণাম করল।

ডেকের ওপর একটা বেঞ্চ দেখিয়ে ঘোষসাহেব তাকে বসতে বললেন। কিন্তু জমিদার কাছারির লোক আদব-কায়দা জানে। প্রভু দণ্ডায়মান থাকলে উপবেশন করতে নেই। তাই মি. ঘোষ চেয়ারে বসলে সাধুচরণ যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে সংকুচিত হয়ে বেঞ্চের একটি ধারে বসল।

মি. ঘোষ বললেন, আপনার নাম সাধুচরণ না?

সাধুচরণ অত্যন্ত বিনীত গলায় বলল, হুজুরের অনুমান যথার্থ।

আপনার মনিব কেমন আছেন?

কিছুকাল আগে পর্যন্ত খুবই মনকষ্টে ছিলেন, এখন হুজুরের আগমনের ফলে বড়োই শান্তি পাচ্ছেন।

পলাশ ঘোষ মনে মনে সামান্য চমকে উঠলেন, লোকটা বলে কী! থট রিডিং-টিডিং জানে নাকি! ললিতা আর তাঁর ভেতরে যে ঘনিষ্ঠতা তা তো এই লোকটার জানবার কথা নয়। মি. ঘোষ পরিষ্কার করে নেবার জন্য বললেন, কথাটা ঠিক বুঝলাম না, পরিষ্কার করে বলুন।

সাধুচরণ বলল, আজ্ঞে কথাটা খুবই সরল। যে ডাকাতগুলো স্বদেশি করে, তারা আমার মনিবকে খুবই জ্বালাত, এখন হুজুর আসায় তারা গা ঢাকা দিয়েছে। তাই বলছিলাম, তিনি এখন শান্তিতে আছেন।

হো হো করে একচোট হাসলেন ঘোষসাহেব। বললেন, ও তাই বুঝি।

হাসির কারণ না বুঝে মুখটা হাসি হাসি করে বলল সাধুচরণ, আজ্ঞে।

এবার অন্য কথার অবতারণা করলেন মি. ঘোষ, আচ্ছা, আপনি কতদিন সিংহ এস্টেটে কাজ করছেন?

তা হুজুর, আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে পঁয়ত্রিশ বছর।

বাড়িও আপনার এ অঞ্চলে?

হুজুর, আমি এখানকারই মানুষ।

ও। তা আপনি একটি বড়ো জমিদারি এস্টেটে কাজ করছেন সুতরাং পাশাপাশি জমিদারদের অনেককেই চেনেন নিশ্চয়ই?

BanglaBook.org

হুজুর আজ্ঞে।

এই স্বদেশি আন্দোলন সম্বন্ধে ওদের মনোভাব কিছু জানেন?

এবার একটু চিন্তিত হল সাধুচরণ। পক্ষে বিপক্ষে কোনটা বলা যুক্তিযুক্ত তা বুঝতে পারল না। একবার ভাবল, বলে দেয়, সবাই আন্দোলনের বিরুদ্ধে। আবার মনে হল, এই তো সুযোগ। যাদের সঙ্গে জমিজায়গা নিয়ে বিবাদ, দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে আছে তাদের বিরুদ্ধে খোদ রাজপ্রতিনিধির কাছে কিছু বলার এই তো মওকা। সে বলল, হুজুর যদি অভয় দেন তো বলি।

নির্ভয়ে বলুন, আপনার নাম প্রকাশ করা হবে না। তা ছাড়া খবর দেবার জন্য আপনি সরকারের বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় থাকবেন।

বিগলিত সাধুচরণ বলল, সে আপনার কৃপা হুজুর। তবে লিখে রাখুন, সবচেয়ে ধড়িবাজ লোক হচ্ছেন খগপতি বেরা।

ধড়িবাজ বলতে আপনি কী বোঝাতে চান?

হুজুর, বাইরে থেকে দেখলে এমন রাজভক্ত পাবেন না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে স্বদেশিওলাদেরও চাঁদা দেন।

খাস বেয়ারা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। মি. ঘোষ তাকে কেবিন থেকে ডায়েরি আর পেন আনতে বললেন।

ডায়েরি এলে নামটা নোট করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, কোন গ্রামে বাড়ি?

সেরখাঁ চক, হুজুর।

বন্দুক আছে ওদের?

আছে হুজুর।

আর সব নাম বলুন যারা সরকার-বিরোধী।

সাধুচরণকে কোনো না কোনো সময়ে অপমানিত হতে হয়েছিল যাঁদের কাছে একে একে তাঁদের সকলের নাম বলে গেল সে। মি. ঘোষ নামধামগুলো লিখতে লিখতেই বললেন, এরা সকলেই ইংরেজ-বিরোধী?

হুজুর, কেউ কেউ আড়াল থেকে বিরোধিতা করেন। কেউ নিজে না করলেও বাড়ির ছেলেপুলেরা স্বদেশি করে।

অলরাইট। আপনি অনেক ইনফরমেশান দিলেন। আমাদের কাজে লাগবে।

মনে রাখবেন হুজুর, এ অধমকে।

আমাদের সরকার তার উপকারী মানুষদের ভোলে না। আপনি মাঝে মাঝে আসবেন। কোনো খবর থাকলে দিয়ে যাবেন। আর এজন্য সরকারই আপনাকে পুরস্কৃত করবেন। তবে জেনে রাখুন খবর যত গুরুত্বপূর্ণ হবে আপনার পুরস্কারের মূল্য ততই বাড়বে।

এবার ছাতাসহ জলে ভাসমান ব্যাঙের মতো ডেকের ওপর থেবড়ে পড়ে ঘোষসাহেবকে প্রণাম করল সাধুচরণ।

উঠে দাঁড়াতেই মি. ঘোষ বললেন, আপনি একটুখানি অপেক্ষা করুন। ললিতাদেবীকে একখানা চিঠি আপনার হাতেই দেব ভাবছি। বলে ভেতর থেকে চিঠিখানা এনে সাধুচরণের হাতে দিয়ে মি. ঘোষ বললেন, যথাস্থানে আশা করি পৌঁছে দেবেন।

সে কথা বলতে হুজুর।

সাধুচরণ লঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামল। সাহেবকে সে যে খুশি করতে পেরেছে এই আনন্দে পাখির মতো হালকা হয়ে গেল তার শরীরটা। সে এবড়ো খেবড়ো লোকাল বোর্ডের রাস্তার ওপর দিয়ে যেন উড়ে চলল।

BanglaBook.org

মি. ঘোষ তাঁর বেয়ারাকে দিয়ে স্লিপ পাঠালেন পুলিশ ইন্সপেক্টারের কাছে। ইন্সপেক্টার এলে তিনি সাধুচরণের কাছ থেকে পাওয়া নামের লিস্ট তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, এদের এখানে ডেকে পাঠান। এরা এইসব অঞ্চলের এক একজন ধেনো জমিদার। সরকার-বিরোধী এক একটি ঘুঘু।

ডেটটা কবে ফেলব স্যার?

সামনের সানডে।

ইন্সপেক্টার ডেক ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন হাঠাৎ পিছন থেকে ডাকলেন ঘোষসাহেব, মি. ধর একটু শুনে যাবেন।

শ্রীমন্ত ধর এসে দাঁড়ালেন সামনে।—স্যার?

আচ্ছা মি. ধর, সাপ্লায়ারদের দুটো নৌকো রাতের ভেতরেই আসার কথা ছিল না?

হ্যাঁ ছিল, কিন্তু আসেনি স্যার।

কী ব্যাপার বলুন তো?

জোয়ার ভাঁটার ব্যাপারে হয়তো কোথাও আটকে আছে।

মি. ঘোষ চিন্তিত মুখে বললেন, তা হতে পারে, কিন্তু কখনো ওদের হিসেবে বড়ো একটা ভুল হতে দেখি না তো।

শ্রীমন্ত ধর বললেন, নদী বরাবর খবরটা আনবার জন্যে কাউকে পাঠাব স্যার?

থাক দরকার নেই। আরও খানিক সময় অপেক্ষা করা যাক।

শ্রীমন্ত ধর চলে গেলেন।

দুপুরে লাঞ্চের পর কেবিনে বিশ্রাম করছিলেন মি. ঘোষ। জেগে ছিলেন তিনি। কথা বলছিলেন নিজের সঙ্গে। চিঠিখানা পড়ে ললিতার কী রি-অ্যাকশন হতে পারে? কয়েক ছত্রে ভোরের একটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ললিতা নিশ্চয় ওটুকু উপভোগ করেছে। তারপর যেখানটাতে ললিতার অতীতের একখানা ছবি এঁকে তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে আকাশের নীল, শরতের মেঘ আর সোনালি আলোর, সেখানটাও নিশ্চই দুবার করে পড়েছে। অন্যের মুখে নিজের স্তুতি শুনতে কোন নারীরই না ভালো লাগে।

চোখ দুটো বন্ধ করে ঘোষসাহেব দেখলেন, কখন যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সাদা ম্যাগনোলিয়া ফুলের মতো একটি পূর্ণ বিকশিত নারী।

কেবিনের দরজায় কে যেন করাঘাত করছে। মি. ঘোষের চোখের সামনে থেকে সরে গেল সেই মানস-প্রতিমা। তিনি চোখ মেলে চাইলেন। ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে কেবিনের ভেজানো দরজাটা খুলে দিলেন।

বেয়ারার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একটি অপরিচিত লোক আর ইন্সপেক্টার শ্রীমন্ত ধর।

কী ব্যাপার মি. ধর?

আন্দোলনকারীরা মাল বোঝাই দুটো নৌকোই পুড়িয়ে দিয়েছে স্যার।

পুড়িয়ে দিয়েছে! কী করে?

যে লোকটি বেয়ারার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে ভড় নৌকো দুটোর অগ্নিদগ্ধ হবার বিবরণ পেশ করল।

নৌকোর মালিক কোথায়?

হুজুর, আমারই নৌকো।

আমি তো আপনাকে কোনোদিন দেখিনি। টাকমাথা আর এক ভদ্রলোক আসতেন।

সে আমার ছোট ভাই। কী দুর্ভাগ্য হুজুর, সে-ই মাল সাপ্লাই করত। হঠাৎ জ্বরে পড়ে যাওয়ায় আমাকে এ খেপে আসতে হল। আর আমার প্রথম যাত্রাতেই সর্বনাশ।

BanglaBook.org

মহাজনি নৌকোর মালিক। অবস্থাপন্ন সন্দেহ নেই। তবু কয়েক হাজার টাকার ক্ষতিতে পড়ে গিয়ে খুবই কাতর আর বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

মি. ঘোষ বললেন, আপনাদের তো বন্দুকের লাইসেন্স আছে। আপনার ভাইকে প্রতিবারেই বন্দুক সঙ্গে আনতে দেখেছি।

হুজুর আমিও এনেছি।

যথাসময়ে চালাতে পারেননি?

চালিয়েছিলাম। নৌকোর ওপর থেকে একজনকে জলে পড়ে যেতেও দেখেছি।

আপনি নৌকোর ওই আগুনের আলোয় কাউকে চিনতে পেরেছেন?

ওদের চিনব কী করে হুজুর। আমরা পশ্চিম অঞ্চলের লোক। তবে অন্ধকারে ডিঙিটা থেকে একটা নাম ধরে ওরা চিৎকার করে ডাকছিল। সম্ভবত যে সঙ্গীটা গুলি খেয়ে জলে পড়ে গিয়েছিল তারই নাম—

কী নাম মনে আছে?

অন্তু...অন্তু রে....বলে চেঁচাচ্ছিল।

নামটা শুনে মনে হচ্ছে ডাকনাম। আর বয়সেও মনে হয় খুব বেশি নয়।

আপনার অনুমান ঠিক হুজুর। মনে হয় বছর চৌদ্দ-পনেরো বয়েস হবে। ওই ছেলেটাই আমাদের ধোঁকা দিয়ে নদীর ধারের কোন একটা ইস্কুলের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আবার আমার গুলিতে নৌকো থেকে নদীতে পড়ে যাবার সময় ওকেই যেন দেখলাম।

ঘোষসাহেব ডায়েরিখানা আনিয়ে 'অন্তু' নামটা লিখে রাখলেন। তারপর নৌকোর মালিককে বললেন, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন সাপ্লাই অব্যাহত রাখুন। আমার কাছে ক্ষতির ফিরিস্তিসহ পিটিশন দেবেন।

হুজুর, একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। সরকার মা বাপ। আপনি দয়া করে একটু দেখবেন।

বললাম তো। যতটুকু সম্ভব দেখব।

মি. ধরের দিকে তাকিয়ে ঘোষসাহেব বললেন, আজ পাঁচখানার বদলে পঁচিশখানা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিন। কুড়িজন আর্মড ফোর্স নিয়ে যান। নদীর ধারের গ্রামগুলোতে গিয়ে আগুন ধরাবেন। একেবারে ওই নৌকো পোড়ানোর স্পট অবদি চলে যাবেন। প্রতিটি গ্রামবাসীর মনে যেন একটা প্যানিক সৃষ্টি হয়।

মি. ধর মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ স্যার।

আরও শুনুন, জোয়ান, সমর্থ লোক, যারা ছুটে পালাবার চেষ্টা করবে তাদের গুলি করার ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করবেন। তারপর তাদের গাছে বেঁধে প্রচণ্ড রকম চাবকাবেন। আসল কালপ্রিটগুলোর খবর নেবার চেষ্টা করবেন।

ইয়েস স্যার।

যান। এখুনি বেরিয়ে পড়ুন। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে আগুন লাগাতে হবে। রাতের অন্ধকারে গ্রামের পর গ্রাম জ্বলতে থাকলে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হবে। আমাদের এখন এটাই দরকার।

দুদিন পরে এতদঞ্চলের জমিদারেরা তলব পেয়ে লঞ্চের ডেকে এসে হাজির হলেন। ঘোষসাহেব তাঁদের বসার জন্য বড়ো একটা শতরঞ্চি পেতে রেখেছিলেন। তাঁরা এলে তাঁদের ইঙ্গিতে বসতে বললেন।

প্রথমে পরিচয়ের পালা শেষ হতেই তিনি বললেন, এই যে দেশব্যাপী আন্দোলন চলেছে এ সম্বন্ধে আপনাদের কার কী ধারণা তাই বলুন।

BanglaBook.org

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

প্রচণ্ড ধমকের সুরে মি. ঘোষ বললেন, ব্যাপারটা ভালো কি মন্দ সেটুকু বলার ক্ষমতাও নেই? ছ্যাকড়াগাড়ির ঘোড়ার মালিক হয়ে বসে আছেন!

কয়েকজন বলে উঠলেন, এ ধরনের আন্দোলন ভালো বলে আমরা মনে করি না।

কেন করেন না?

একজন বলল, হুজুর, দা-কাটারি দিয়ে যদি যুদ্ধ করা যেত তা হলে কামান বন্দুক তৈরি করার দরকার হত না। ওরা গেছে ইংরাজ বাহাদুরের সঙ্গে লড়তে!

মি. ঘোষ বললেন, ওরা সমানে সমানে বন্দুক কামান না চালিয়ে দা-কাটারি চালাচ্ছে বলেই আপনার আপত্তি, তাই তো?

জমিদার বাহাদুর মি. ঘোষের কথার মানেটা সহজে ধরতে না পেরে বললেন, ঠিক ধরেছেন হুজুর।

ঘোষসাহেব মুহূর্তে অনুমান করে নিলেন লোকটা নিতান্তই গর্দভ। আস্ত আহাম্মক। এসব লোক আর যাই হোক সরকারের পক্ষে ডেঞ্জারাস নয়।

মি. ঘোষ একজনের দিকে আঙুল তুলে বললেন, আপনার নাম খগপতি বেরা?

আপনার অনুমান ঠিক।

মি. ঘোষ মনে মনে একটু ইন্‌সালটেড ফিল করলেন। কারণ তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় প্রায় সকলেই 'হুজুর' বা 'স্যার' ব্যবহার করে থাকে। এ লোকটা ঠিক সহবত জানে না। মি. ঘোষ নিজের মনোভাবটা গোপন করে বললেন, আন্দোলন সম্পর্কে আপনার নিজস্ব একটা ধারণা আছে নিশ্চয়?

দেশের মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পাবার জন্য পরাধীনতার শেকল ছেঁড়ার আন্দোলন করছে।

এ আন্দোলন আপনার মতে ভালো কি মন্দ?

খগপতি বেরা বললেন, মি. ঘোষ, কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে এ আন্দোলন জীবনের একটা পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু আমাদের মতো মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে এ আন্দোলন এখনো শুভ হয়ে উঠতে পারেনি।

এর অর্থ?

অর্থ খুব সহজ। এখনো নিজের নিজের জমিজমার ওপর আমাদের বড়ো বেশি মায়া রয়ে গেছে। সব ছেড়ে আমরা তো কই আন্দোলনকারীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি না। তাই বলছিলাম, যা দেশের পক্ষে কল্যাণকর তাকে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক বলে ভাবতে পারছি কই।

আপনার কথা বলার কৌশলটি দেখছি বিশেষ প্রশংসনীয়। তা বেশ।

একটা কিছু চিন্তা করলেন ঘোষসাহেব। এবার অন্য একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো যোগ আছে?

না হুজুর। এ আন্দোলনের ফলে আমি অত্যন্ত বিচলিত।

আপনার ছেলে আছে?

আজ্ঞে হাঁ।

কী করছে?

আজ্ঞে বড়োটি জমিজমা দেখাশোনা করছে আর ছোটোটি কলেজে পড়ছে।

কলেজে পড়ছে! তার মানে আন্দোলনে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েছে?

হুজুর, আমার ছেলেটি কিন্তু...।

ভীষণভাবে ধমকে উঠলেন মি. ঘোষ, থামুন। সবাই নিজের নিজের ছেলেকে নাবালক, গোবেচারা বলে মনে করে।

BanglaBook.org

আপনার কটি ছেলে?...আপনার ক'টি ছেলে?...আপনার?...আপনার?—উপবিষ্ট প্রত্যেককে ঘোষসাহেব আঙুল নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। প্রশ্নের দ্রুততার সঙ্গে উত্তরগুলো সমান তালে এগোতে পারল না।

মি. ঘোষ ডেক থেকে লঞ্চের ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন সঙ্গে একজন বেয়ারা আর দুজন রাইফেলধারী সেপাই নিয়ে। বেয়ারার হাতে একটা ফিতে। সে ডেকের এক প্রান্তে গিয়ে ছফুট মতো একটা জায়গা মাপ করে লাল চকে দাগ দিয়ে দিলে।

মি. ঘোষ বললেন, আপনারা সমস্বরে বলুন, আপনাদের দেশের নাম কী?

সবাই বললেন, ভারতবর্ষ।

এই তো ঠিক বলেছেন। এবার বলুন, ভারতের এই যে কোটি কোটি যুবক এরা আপনাদের সন্তানতুল্য কিনা?

অনেকে বললেন, অবশ্যই, অবশ্যই।

মি. ঘোষ এবার বললেন, সন্তান দুষ্কর্ম করলে বাবাকেও তার শাস্তি ভোগ করতে হয়, তাই নয় কি?

সবাই নীরবে বসে রইলেন।

আঃ, একটা উত্তর তো আছে এর। বলুন—বলুন—?

অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য বললেন, তা ঠিক।

তা ঠিক মানে?

একজন বললেন, আপনি যে শাস্তি ভোগের কথাটা বললেন, সে কথাটা ঠিক।

এই তো আপনি ঠিক ধরেছেন। আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়াতেই মি. ঘোষ ডেকের প্রান্তের দাগ দেওয়া জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক তাঁকে অনুসরণ করলেন।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে ফিরে দাঁড়ালেন ঘোষসাহেব। তারপর হুংকার দিয়ে উঠলেন, পুত্রদের পাপের জন্যে পিতা হয়ে সামান্য এই শাস্তিটুকু ভোগ করুন। নিন, বসে পড়ুন চটপট। এই অল্প কফুট দাগ দেওয়া জায়গা আপনার নাসিকাঘর্ষণে ধন্য হোক।

ভদ্রলোক হতবুদ্ধির মতো পিছনে একবার তাকালেন।

মি. ঘোষ অমনি বললেন, কারো ঘাড়ে দুখানা মুণ্ডু নেই যে আমি বারণ করলে এদিকে তাকাবে। তাড়াতাড়ি কাজ সারুন।

এমনি করে জমির মালিকেরা একে একে এসে নাকে খত দিয়ে গেলেন। সামান্য ইতস্তত করলেই মি. ঘোষের ইঙ্গিতে দুটো সেপাই দুদিক থেকে সঙ্গীন এগিয়ে আনছিল। ওতেই কাজ হয়ে যাচ্ছিল মি. ঘোষের।

আর একজন বাকি। তিনি খগপতি বেরা। মি. ঘোষ তাঁর শাস্তির ব্যবস্থাটা একটু ভিন্ন ভাবে করতে চান। তাই সবাইকে সরকারের প্রতি অনুগত থাকতে বলে বাড়ি চলে যাবার আদেশ দিলেন।

সবাই মাথা নিচু করে চলে গেলে তিনি বেরামশায়ের মুখোমুখি হলেন।

এই শুয়োরের খোঁয়াড়ে দেখছি আপনিই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী।

হা হা করে হেসে উঠে খগপতি বেরা চমকে দিলেন মি. ঘোষকে।

এমন করে হাসছেন যে?

আপনি এমন একখানা হাসির কথা বললেন আর তা শুনে কেউ না হেসে থাকতে পারে? তবে কী জানেন মি. ঘোষ, চতুষ্পদদের চেনা যায়, কিন্তু দ্বিপদেরা চতুষ্পদ হলে তারা অতি ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

ঘোষসাহেব নিরুত্তাপে বললেন, প্রথম থেকেই দেখছি আপনি বেশ নির্ভীক আর গুছিয়ে কথা বলতে জানেন। তা যাক গে—ঘোষসাহেব সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, কিছু ইন্‌ফরমেশন দিতে পারেন?

খগপতি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, একটা ইন্‌ফরমেশন এইমাত্র দিতে পারি। আপনি এই যাঁদের ধরে নিয়ে এসে অপমান করলেন, এঁদের সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনের কানাকড়ি যোগ নেই।

আপনি অনুমান করলেন কী করে?

অনুমান নয়, সত্য। একই বৃত্তির লোক, পরস্পরকে জানব না?

অনেকে বলে, এ অঞ্চলের মানুষদের ওপর আপনার নাকি বেশ দরদ আছে।

সেটাই কি স্বাভাবিক নয় মি. ঘোষ?

ঠিক তাই। তবে আপনি যে ইংরেজ সরকারের প্রজা, তাঁর প্রতি আপনার আচরণ কি ঠিক হচ্ছে?

মি. ঘোষ, আমি গভর্নমেন্টকে নিয়মিত কর দিয়ে থাকি। আর সরকার বাহাদুর কোথাও ঘোষণা করেননি যে নিজের অঞ্চলের মানুষদের ভালোবাসা আইন-বিরুদ্ধ।

মি. ঘোষ খগপতি বেরার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, লোকটার বুকের পাটা তো কম নয়! তবে কথাগুলো অকাট্য বলেছে।

মি. ঘোষ একটুখানি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন। কিন্তু ইংরেজের নিমক খেয়ে তিনি নিমকহারামি করতে পারবেন না। শাসন করতে এসে সেন্টিমেন্টাল হওয়া সাজে না।

হ্যাঁ মি. বেরা, কথাগুলো আপনার শুনতে ভারী ভালো। কিন্তু একটা প্রশ্ন, ইংরেজ সরকারকে কর দিলেই কি আপনার কর্তব্য শেষ? আপনার বাড়ির রাঁধুনির কাজ হল রান্না করা। কিন্তু রাতের বেলা চোর-বদমায়েশকে আসতে দেখে সে যদি ভাবে, প্রভুর রান্না করাই আমার কাজ, চোরের আসার খবর দেওয়া নয়, তা হলে কি সে তার প্রভুর প্রতি কর্তব্য ঠিক ঠিক করল?

মি. ঘোষ তা হলে খাঁটি কথাই বলি, প্রাণের যোগ যেখানে নেই সেখানে শুকনো কতকগুলো নিয়ম পালন ছাড়া আর কিছুই থাকে না। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা এখন সেই জায়গায় এসে ঠেকেছে।

মি. ঘোষ বিদ্রূপের গলায় বললেন, অসুখ করলে সমস্ত সংসারটাকেই খারাপ লাগে। ভালো জিনিসে রুচি থাকে না। কুপথ্য খেতে মন চায়। কিন্তু উপযুক্ত দাওয়াই পড়ে গেলে অসুখ সেরে গিয়ে শরীর মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আপনার একটু সরকারি দাওয়াইয়ের দরকার হয়ে পড়েছে।

হাততালি দিলেন ঘোষসাহেব। খাস বেয়ারা পাশে এসে সেলাম জানাল। মি. ঘোষ বললেন, ধর সাহেবকে ডাকো।

ইন্সপেক্টার শ্রীমন্ত ধর দু-এক মিনিটের ভেতর হাজির হলেন।

মি. ঘোষ খগপতি বেরাকে দেখিয়ে বললেন, ইনি রাজনৈতিক অসুখে ভুগছেন। এঁকে দাওয়াইখানায় নিয়ে গিয়ে যথোপযুক্ত দাওয়াই দিয়ে দিন।

মিনিট কুড়ি পরে ডেকের ওপর দুটো লোক ধরে নিয়ে এল খগপিত বেরাকে। তাঁর দেহের ঊর্ধ্ব অঙ্গে কোনো আচ্ছাদন ছিল না। একটা লোক বয়ে আনছিল তাঁর ফতুয়া আর সাদা ধবধবে জামাটা।

মি. ঘোষের নির্দেশে শতরঞ্জির ওপর বেরামশায়ের জামা ফতুয়া রেখে লোকগুলো নীচে নেমে গেল। ঘোষসাহেব খগপতি বেরাকে একচক্কর প্রদক্ষিণ করে বললেন, শ্রীমন্ত এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ না হলেও ভালো দাওয়াই দিয়েছে দেখছি। কিন্তু মি. বেরা, দু-চারদিন অন্তর এখানে এসে দাওয়াই নিয়ে যাবেন। কোর্সটা কমপ্লিট করা দরকার। রোগ একেবারে সেরে যাবে।

BanglaBook.org

পিঠটা প্রচণ্ড জ্বালা করছিল। পিঠের চামড়া বোধহয় ফেটে গেছে। তার ওপর পড়ছিল মি. ঘোষের কথার আহুতি। খগপতি বেরা কোনোরকমে ফতুয়া আর জামা পরে অসীম মানসিক জোরে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। হাত দুটো জোড় করে বললেন, আমি কৃতজ্ঞ।

মি. ঘোষ বেশ একটু অবাক হলেন। তিনি এতক্ষণ কাটা ঘায়ে কথার চাবুক কষছিলেন। কিন্তু লোকটা বলে কী! হঠাৎ কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল কেন?

মি. ঘোষ বললেন, আপনার কৃতজ্ঞ হবার কারণটা জানতে পারি কি?

খগপতি বেরা বললেন, আগস্টের আন্দোলনে আমার দেশের কত ছেলে গুলি খেয়ে মারা গেল। চাবুক খেয়ে জ্ঞান হারাল। আমি তাদের কষ্টটা মনে মনে অনুভব করতাম, কিন্তু আজ আপনি সেই শাস্তির সামান্য নমুনা দেখালেন। তাই আপনার ওপর আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

হেরে গিয়ে নির্লজ্জের মতো হো হো করে হেসে উঠলেন ঘোষসাহেব। বললেন, যেদিন শেষ দাওয়াইটা পড়বে সেদিন আর কৃতজ্ঞতা জানাবার মতো অবস্থাও থাকবে না। এরপর কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, যান আমার সামনে থেকে, বেরিয়ে যান।

৭

মুখোমুখি বসে আছেন মণিশঙ্কর আর ললিতা। জানালা দিয়ে মণিশঙ্করের চোখে এসে পড়ছে দিগন্তজোড়া সূর্যাস্ত। কিছুক্ষণ আগে নদীর মোহনা থেকে অন্তুকে দাহ করে তিনি ফিরে এসেছেন। অন্তুর গুলিবিদ্ধ দেহখানা স্রোতে কোথায় ভেসে গেল তাই নিয়ে নদীর দুটো তীর তোলপাড় করে খুঁজেছে আন্দোলনকারীরা। এ দুরাত এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ বন্ধ করতে পারেনি ললিতা সিংহ। সে দলের কর্মীদের ডেকে প্রত্যেকের হাত ধরে বলেছে, জীবিত, মৃত যা-ই হোক আমার অন্তুকে তোমরা এনে দাও।

ললিতার আকুলতা দেখে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও তারা দুদিন দুরাত্রি ঘুরে ফিরেছে অন্তুর দেহের সন্ধানে। শেষে নদীর মোহনার কাছে এসে জেলেদের কাছ থেকে খোঁজ পেয়েছে অন্তুর বিকৃত দেহটার। ললিতা খবর পেয়েই ছুটে যেতে চেয়েছিল কিন্তু বাধা দিয়েছিলেন তাকে মণিশঙ্কর। এখুনি লোক জানাজানি হয়ে যাবে। তখন সব গোপনীয়তাই প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর তা প্রকাশের অর্থই হল মণিশঙ্কর আর ললিতার কারাবরণ।

মুখোমুখি বসে অন্য মনে ভাবছিল দুজনে। দুজনের ভাবনার স্রোতে বইছিল দুদিকে। অবশ্য ভাবনার বিষয়বস্তু ছিল একই, সেই দুর্দান্ত কিশোর অন্তু।

মণিশঙ্কর ভাবছিলেন শৈশবে মা-হারা শিশুটিকে তিনি কীভাবে এত বড়োটি করে তুলেছিলেন। একই সঙ্গে নাওয়া-খাওয়া, একই শয্যায় শয়ন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল পিতা-পুত্রের। অন্তু বাবার কাছেই পড়াশোনা করত। সে সেরা ছাত্র ছিল তার ক্লাসের। দুষ্টুমি করে একরাতে অন্তুরা কবন্ধু মিলে বোর্ডিংয়ের পাশের বাগানের নারকেল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। বিচারে মণিশঙ্কর সারা দিন রাতের মতো তাদের মিল বন্ধ করে দেন। অন্তুর বন্ধুরা বাইরে গিয়ে খেয়ে আসে কিন্তু অন্তু শাস্তি মাথায় পেতে নিয়ে বোর্ডিং-ঘরেই পড়ে থাকে। জেদি ছেলে, জলস্পর্শ পর্যন্ত করেনি।

মা'র সামান্যতম স্মৃতিও থাকার কথা নয় অন্তুর মনে। তাই মাতৃস্নেহ যে কী বস্তু তা গভীরভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছিল না তার। কিন্তু শৈশব ছেড়ে কৈশোরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার একটি আশ্রয় জুটে যায়। সে হল মণিশঙ্করের বউঠান ললিতা সিংহ। নিজের ছেলের ওপর অধিকারটা কিছু পরিমাণে ভাগ হয়ে গেলেও মণিশঙ্কর দারুণ খুশি হয়েছিলেন এই বিভাগে। সেই থেকে মণিশঙ্কর ছেলে সম্বন্ধে নিশ্চিন্তও হতে পেরেছিলেন। একটি কিশোরের ওপর একটি নারীর স্নেহ কচি চারাগাছে সজল মেঘের বর্ষণের মতোই স্নিগ্ধ শুভকর।

BanglaBook.org

ললিতা ভাবছিল তার সঙ্গে অন্তুর প্রথম দিনের পরিচয়ের কথা। সুন্দর-দর্শন একটি কিশোর এসেছিল তার কাছে একটি চাঁদার বই হাতে নিয়ে। কোন অঞ্চলে যেন বন্যা হয়েছে তার জন্য অর্থ সংগ্রহে বেরিয়েছিল স্কুলের ছেলেরা। অন্তুর ওপর ভার পড়েছিল সিংহবাড়ির চাঁদা আদায়ের।

ললিতা অন্তুর ভেতর একটা নির্ভীক, জড়তামুক্ত কিশোরের ছবি দেখেছিল সেদিন। অন্তুর ভাসা ভাসা দুটো চোখ মাতৃত্বের গৌরব থেকে বঞ্চিত ললিতাকে সেদিন দারুণ ভাবে আকর্ষণ করেছিল। সে অন্তুর হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, তুমি মণি ঠাকুরপোর ছেলে?

ছেলেটি মাথা নিচু করেছিল লজ্জায়। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

ললিতা সেদিন অনেক রকম খাবারের প্লেট সাজিয়ে অন্তুকে নিজের পাশে বসিয়ে খাইয়েছিল। প্রথমে অন্তু সংকোচ করছিল খেতে। সাধাসাধি করতে সে বলেছিল, আমি অন্য কোথাও খাই না। বাবার সঙ্গে একই সময়ে খাই আর শুই।

ললিতা বলেছিল, ভারী ভালো ছেলে তুমি। এমন পিতৃভক্ত আমি দেখিনি। তুমি বাবাকে বোলো, বড়ো মামণি আমাকে জোর করে খাইয়ে দিয়েছে।

কিশোর ছেলেটি খাবার পাতে বসার আগে বলেছিল, আমার চাঁদা?

তার ছোট্ট মনে হয়তো সংশয় জেগেছিল, খাওয়ানোর পর এই ভদ্রমহিলা চাঁদা দেবেন তো? অন্তুর মনের ভাবটি বুঝতে দেরি হয়নি ললিতার। সে হাসি চেপে একখানা দশ টাকার নোট অন্তুকে দিয়ে বলেছিল, এবারে খাবে তো?

খাব। তার আগে আপনাকে রসিদ কেটে দিই।

অন্তু রসিদ কেটে দিয়ে খেতে বসেছিল। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে ললিতা বলেছিল, তোমার কথা আমি মণি ঠাকুরপোর কাছে শুনেছি। তুমি এতদিন আসোনি কেন আমার কাছে?

অন্তু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, আমি লেখাপড়া করি, খেলাধুলো করি, তাই কোথাও যেতে সময় পাই না।

ললিতা অন্তুর কোঁকড়ানো কালো চুলে ভরা মাথাটা নিজের দুটো হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলেছিল, আর কোথাও যাও না যাও, একটিবার করে আমার কাছে চলে এসো, কেমন?

সেই থেকে প্রতিদিন একবার করে ললিতার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অন্তু। ইদানীং সে ললিতার মাতৃস্নেহের একমাত্র অংশীদার হয়ে উঠেছিল। তাই আজ ললিতার বুকে অন্তুর চলে যাবার শোকটা বড়ো বেশি করে বাজছে।

ললিতা হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল, আমি ভাবতে পারিনি ঠাকুরপো, আমার অন্তু এমন করে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে।

বউঠান, এই দুটো মাসে পাশাপাশি দুটো মহকুমায় কত মানুষ গুলিতে মরেছে তার হিসেব নিয়ে দেখো দেখি। কত মা তার জোয়ান ছেলে হারিয়েছে, কত মেয়ে স্বামীহারা হয়েছে। এবার ভাবাবেগে গলাটা কেঁপে উঠল মণিশঙ্করের, আমাদের সান্ত্বনা বউঠান, অন্তু আমাদের শহীদ হয়েছে। যতদিন বাঁচব এ গর্বটুকু নিয়েই বেঁচে থাকব।

ললিতা বলল, যাবার সময় পাগল ছেলেটা আমাকে প্রণাম করে বলল, বড়োমামণি কিছু বলবে না? অমনি আমার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন বেরিয়ে গেল, 'বাঁচি আর মরি, বাহিয়া চলিতে হবে তরী'। আমার অন্তু সেই মন্ত্র জপ করতে করতে চলে গেল। অন্ধকার রাতের তুফান পেরিয়ে তার নৌকো একদিন ঊষার কূলে ঠিকই পৌঁছবে, এই আশা নিয়ে আমরা বসে থাকব ঠাকুরপো।

সারাদিন সাধুচরণের মাথায় লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরছে একটা ভাবনা। কোনো কাজেই তার মন বসছে না। সামনে দুর্গোৎসব। এ সময় চোখে কানে দেখতে পায় না সাধুচরণ। বিরাট যজ্ঞ,

BanglaBook.org

সিংহবাড়িতে এলাহি ব্যাপার। নায়েবমশায় লাট নিয়ে নাস্তানাবুদ। সপরিবারে বৃদ্ধ আস্তানা নিয়ে বসেছে সেখানে। দেশের সবকিছু দেখাশোনার দায়িত্ব সাধুচরণের। পুজো উপলক্ষে সাধুচরণের বেশ কিছু উপরি লাভ হয়। যদিও বউরানি এস্টেটের হাল ধরার পর হিসেবপত্রে কারচুপি করা শক্ত হয়ে পড়েছে তবু এতদিনের পুরনো মাথা তো। মা, মা ডাকে ভুলিয়ে তারই ভেতর কিছু মেরে নেবার ধান্দা কবতে হয়।

সেই ধান্দাবাজির সময়ে এ কী ঢুকল তার মাথায়! একটা চিঠির ভেতর দুটো কাগজের নৌকোর কথা। বুধবার ভেসে আসছে। হ্যাঁ বুধবার, বুধবারই তো রসুলপুর নদী দিয়ে ভেসে আসছিল কেরোসিন আর খাবার বোঝাই দুটো নৌকো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের লঞ্চ পর্যন্ত আসার আগেই স্বদেশি ডাকাতগুলো তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। মণিমাস্টারের কাছে গোলাপির হাতে পাঠানো বউরানির চিঠির ভেতর যে দুটো কাগজের নৌকোর কথা আছে তার সঙ্গে অনেকটা মিলে যাচ্ছে এই দুটো নৌকো। সাধুচরণের ভাবনা ঘিরে একটা কুয়াশার পরদা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝাপটায় সেটা সরে যাচ্ছে। অমনি কিছু একটা যেন দেখতে পাচ্ছে সে।

হঠাৎ সাধুচরণ মাথা থেকে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে আসন্ন পুজোর তদারকিতে মন দিল। পুজোটা যাক, তখন বুদ্ধির ঘরটা সাফ করে আর একবার রহস্য ভেদের চেষ্টা করা যাবে।

পুজোর দিনগুলোতে কাজের চাপ থাকে বড়ো বেশি! বাইরের বিরাট কম্পাউন্ডের আগাছা পরিষ্কারের কাজে লেগে যায় জনমজুররা। রাস্তাঘাট ড্রেস করে পিটিয়ে বাঁধিয়ে ঝকঝকে তকতকে করা হয়। পুজোর মাসখানেক আগে থেকেই সিংহবাড়িতে শুরু হয়ে যায় আগমনীর ধুমধাম। তিনতলা সমান লম্বা উঁচু পাকা সানাই ঘরখানায় নতুন করে কলি ফেরাতে হয়। পুজোর পক্ষকাল আগে থেকেই সানাই বাজে। ভোর চারটেয় সারা পাড়াকে জাগিয়ে দেয় সানাইয়ের সুর। খেতের সবুজ ধানের ওপর দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সানাইয়ের সুর গড়িয়ে যায়।

এ কদিন অনেকগুলি পাত পড়ে সিংহবাড়িতে। ধোয়া-মোছার কাজ অনেক। তাই ঝি-চাকরের খাটুনির অন্ত থাকে না।

সাধুচরণ এই সুযোগে বেশি করে কাজ দেবার অছিলায় চলল একবার নাথুর মা'র ঝোপড়ির দিকে। মনে মনে হিসেব কষে চলল, একটা টোপ ফেলে দেখাই যাক না। মেয়েমানুষের আবার এত গুমোর। এখনো ভাবছে বুঝি বন থেকে টিয়ে হয়ে বেরুবে গদাই আর উড়ে এসে ওর দাঁড়ে বসে বুলি শোনাবে। হায় হায়, আশায় মরে চাষা। সাধুচরণের আর যা দোষ দাও মাথা পেতে নেবে কিন্তু তার কাজে খুঁত পাবে না, একেবারে সাফ্‌সুতরো। একটা লোমও আর খুঁজে পাবে না গদাইচন্দ্রর।

ভাবতে ভাবতে মাঠ পেরিয়ে গ্রামের প্রান্তে নাথুর মা'র আস্তানায় এসে পৌঁছল। সময়ের হিসেব আছে সাধুচরণের। এ শিক্ষা গুরু কৈলাস বকশির কাছে পাওয়া। গুরু বলতেন, দিনেরবেলা কাজের ঠ্যালা, আদর সোহাগ রাতেরবেলা।

তাই গুরুবাক্য শিরোধার্য করে বেরিয়েছে সে গস্তে। গ্রামের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে কী সূয্যি ডুবল টুপ করে। এ সময়ে মানুষ তো মানুষ, পাখপাখালিতেও ফিরে আসে ডেরায়। নাথুর মা কি আর জগতের বার? ফিরে এসেছে ঠিক পাড়ায় পাড়ায় কাজ সেরে।

ঘরের ভেতর এরই মধ্যে একটা লম্ফ জ্বলছে। ঝোরকা দিয়ে চোখে এসে পড়ছে তার আলো। কে যেন মাথা ঝুঁকে ঝুঁকে নামতা পড়ছে।

সাধুচরণ পা টিপে টিপে ঝোরকার কাছে এগিয়ে দেখল, একটা ছেলে স্লেটের ওপর খড়ির দাগ কেটে কেটে নামতা পড়ছে।

BanglaBook.org

এটা তো গদাইয়ের ব্যাটা। বেশ বড়োসড়ো হয়েছে দেখছি। কী আবার পড়ছে ও ব্যাটা! পড়াশুনো করে জজ ম্যাজিস্টর হবে! শালা, কলিতে হচ্ছে কী রে সব! ভাবতে ভাবতে খ্যে খ্যে খ্যে খ্যে করে কবার টেনে টেনে নিঃশব্দে হাসলে সাধুচরণ।

এরপর দাঁতে দাঁত চেপে, শেয়ালের মতো ধূর্ত দুটো চোখ নাথুর ওপর ফেলে মনে মনে বলল সাধুচরণ, যতই গলা ফুলিয়ে কোঁকর কোঁ করো, মোল্লার পেটে যেতেই তুমি জন্মেছ। পাঠশালায় পড়ো, আর গাছ থেকেই পড়ো, সোঁদরবনের মাল, সোঁদরবনেই যেতে হবে একদিন।

অন্ধকার ঘনিয়েছে। পাশের ডোবাটায় একটা চবর্ চবর্ শব্দ হতেই ঝট করে সাধুচরণের চোখ সেদিকে বাঁক নিল। আবছা একটা মূর্তি কোমর জলে গা ডুবিয়ে কাপড় ভাসিয়ে ধুয়ে নিচ্ছে। নিজের কপালে একটা থাবড়া মারলে সাধুচরণ, শালা, একটুকরো চাঁদও কি আজ কপালে নেই রে!

কতক্ষণ পরে সাধুচরণ সদরের বাঁশের দরজাখানা ধরে নাড়া দিলে। মোহন সুরে বললে, নাথুর মা আছ, নাথুর মা?

দরজা খুলে লম্ফ হাতে সামনে এসে দাঁড়াল নাথুর মা। মুখে আধ ঘোমটা।

এই এলাম একটা খবর দিতে।

নাথুর মা মাটির পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল, মুখে রা নেই।

সাধুচরণ ভাঙা গলায় বলল, বসতেও কি বলবি না? আমি লোকটা এতই কি খারাপ রে?

নাথুর মা একটা ছেঁড়া চাটাই এনে দাওয়ায় পেতে দিলে। পা দুটো উঠোনে ঝুলিয়ে চাটাইখানার ওপর ঝপ করে বসে পড়ল সাধুচরণ। নাথু এসে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই সাধুচরণ ইইচই করে উঠল, যা বাপ যা, পড়গে যা। হাঁ গা গদাইয়ের বউ, ছেলেটা যে পড়ছে সে কথা তো কই আমাকে বলোনি! সেরেস্তায় ওর একটা কাজের কথা তা হলে ভেবে রাখতে হয়।

মনে হল, এতক্ষণে বরফ একটু গলেছে। নাথুর মা অনুচ্চে বলল, পড়া আমি ছাড়িয়েই দিয়েছিলাম, কিন্তু পণ্ডিতমশায় নিজে বাড়িতে এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, ভালো ছেলেটাকে নষ্ট কোরো না নাথুর মা।

ঠিক ঠিক, পণ্ডিত গয়ারাম ঠিকই বলেছে। ও একটু হিসেবটা শিখিয়ে দিক, তারপর আমি তো তোর আছিই।

মুখে এমনি বলল বটে সাধুচরণ কিন্তু মনে মনে গয়াপণ্ডিতের পিণ্ডি চটকাতে লাগল। শালা তুমি এখানে এসে ঢুকেছ। বাচ্চার পেছন ধরে একেবারে তার গভ্যধারিণীর গায়ের গন্ধ শুঁকতে এসেছ। তোমার মতো অনেক ভণ্ড পণ্ডিতকে এই শর্মা ট্যাকে গুঁজে রাখতে পারে, তা জানো।

মনে মনে ভাবলেও মুখে কী যেন বিড়বিড় করছিল সাধুচরণ। তাই দেখে ছেলেমানুষ নাথু ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। অপ্রস্তুত সাধুচরণ খিঁচিয়ে উঠল, হাসছিস যে, পড়াশোনা নেই বুঝি? যা মন দিয়ে পড়গে যা।

নাথুর আচরণটা তার মায়েরও ভালো লাগেনি। সে ছেলের মাথায় একটা ছোট্ট চাঁটি লাগিয়ে লম্ফটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, পড়া শেষ না হলে খেতে পাবি না বলে রাখছি।

নাথু লোকটার ওপর গজরাতে গজরাতে ঘরের ভেতর গিয়ে সেঁধল।

এখন দাওয়ায় অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অস্পষ্ট দুটো মূর্তির একটা ঘাপটি মেরে বসে আর অন্যটা দাঁড়িয়ে। একটা চিতা যেন গুঁড়ি মেরে বসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তাল করছে।

গলায় আবেগ যেন উথলে উঠল সাধুচরণের, দাঁড়িয়ে রইলি নাথুর মা?

বলুন, কী বলতে ভর সাঁঝে এ বাড়ি এসেছেন?

উত্তাপের আঁচটা অনুমান করে নিয়ে সাধুচরণ বলল, কারো উবগার করতে নেই রে, কারো উবগার করতে নেই। যে শালা উবগার করতে এগিয়ে আসে সে শালার মতো বেকুব কেউ নেই।

BanglaBook.org

একটু থেমে আবার বলতে লাগল, এই যে গদাইয়ের উন্নতি হবে বলে কিছু করতে গেলাম তাতে মিথ্যা দুর্নামের বোঝা ছাড়া কী পেলাম। সকাল থেকে তোকে একটা কথা বলব বলব করেও কাজের চাপে বলতে পারিনি, তাই ছুটে এলাম হাঁসফাস করে এত দূর। তুইও কি বুঝলি আমার প্রাণের টানটা! বল কে আছে আমার? সংসার, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু কেউ নেই রে কেউ নেই। তাই তোদের কাছেই ছুটে আসি। তোরা লোকটাকে চিনলি না। খালি মন্দজনের কুকথায় কান ভারী করে মানুষটাকে মন্দ ভেবে বসে রইলি।

নাথুর মা এবার একটু নরম গলায় বলল, আমি তো সকালে কাজ সেরে আসবার সময় কাছারি বাড়ির সামনে দিয়েই এলাম। আপনি তো আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। কিছু তো কই বললেন না?

বিশ্বাস কর নাথুর মা, আজকাল আমার যেন কী হয়েছে। দুটো চোখ মেলে তোর দিকে চেয়ে রয়েছি কিন্তু তোকে দেখছি না। একটা মানুষ জলজ্যান্ত পাশে দাঁড়িয়ে, মনে হচ্ছে দাওয়ার একটা খুঁটির পাশে আমি বসে আছি।

একটু থেমে আবার বলল, হয় রে হয়, সে তুই বুঝবি না। মাথায় যার গোটা রাজ্যের ভার তার কি মাথার ঠিক থাকে রে। আচ্ছা শোন, আসল কথাটা বলি, পুজো আসছে, এই মাসখানেক আমাদের ওখানে সারাদিন থেকে কাজ কর না কেন। খাবিদাবি, আর মাইনেও পাবি।

নাথুর মা বলল, হক কথা বলি বকশিবাবু, এক মাস আপনি উবগার করলেন, কিন্তু তারপর তো যে কে সেই। এদিকে সারা বছর যাদের কাছে ধান ভেনে আমার সংসার চলে তাদের কাজ এক মাস ফেলে রাখি কী করে? আজ আপনি আমাকে দুপয়সার লোভ দেখিয়ে কাজে ডাকছেন, ওই কটা পয়সার লোভে যদি ছুটি তা হলে সারা বছর খাব কী?

তোকে তো আমি চিরজীবন খাওয়াতে পারি। পায়ে পা দিয়ে রাজরানির মতো বসে থাকবি, কিন্তু সে তো তোর সইবে না।

অত সুখে আমার কাজ নেই বকশিবাবু, সারাদিন ঢেঁকিতে পাড় দিয়েই আমার সুখ। আপনি আসুন এখন।

এরপর আর বসে থাকা যায় না। বেহায়াপনারও একটা সীমা আছে। সাধুচরণ দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে উঠল। যাবার সময় শুধু বলল, মানুষের অত গুমোর ভালো নয় রে। কে বলতে পারে কার ভাত কার ঘরে বাঁধা।

৮

কুঁজো হয়ে হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে পেন্নাম করে উঠে দাঁড়াল সাধুচরণ। ফতুয়ার পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে বাঁ হাতের পাতার ডান হাতের কনুই ছুঁয়ে ঘোষসাহেবের হাতে সেটিকে এগিয়ে দিলে।

খামের মুখ খুলতে খুলতে মি. ঘোষ ইঙ্গিতে সাধুচরণকে বসতে বললেন।

মান্যবরেষু,

শারদীয়ার শুভলগ্নে (১৬ই—১৮ই অক্টোবর) সিংহভবনে সিংহবাহিনীর শুভ আবির্ভাব ঘটবে। উক্তদিবসত্রয় আপনার সবান্ধব উপস্থিতিতে সিংহভবন ধন্য হোক, এই প্রার্থনা।

বিনীতা
ললিতা সিংহ

পুনশ্চ পলাশদা, কাজের অজুহাত শুনব না। আসা চাই কিন্তু।

BanglaBook.org

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কছত্র মুসাবিদার ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন ঘোষসাহেব। চিঠির প্রথম অংশে নিয়মমাফিক নিমন্ত্রণ। পুনশ্চ ছত্রটিতে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে ললিতা। যেতে তো তাঁকে হবেই। এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় সিংহভবন মানেই সুন্দরী বিদুষী বিধবা ললিতা সিংহের সান্নিধ্য।

চিঠিটা হাতে রেখে সামনে ঝুঁকে এবার ঘোষসাহেব তাকালেন সাধুচরণ সামন্তের দিকে। সাধুচরণ দাস্যসুখে হাস্যমুখে বসে ছিল।

বলুন বকশিবাবু, চারদিকের হালচাল সব কেমন দেখছেন?

সাধুচরণ প্রভুকে তুষ্ট করতে জানে। সে অমনি বলল, খুবই খারাপ ছিল হুজুর, এখন আপনার আগমনে উত্তম হয়ে গেছে।

কী রকম?

এই ব্যাটাদের ওপর উত্তম-মধ্যম কিছু পড়ায় সিধে হয়ে গেছে।

চারদিকে মানুষের মনে বেশ একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, কী বলেন?

আতঙ্ক বলে আতঙ্ক হুজুর। একেবারে জুজুর ভয়ে কেঁচো হয়ে গর্তে সিঁধিয়েছে।

ঘোষ সাহেব হেসে উঠে বললেন, আপনি ভারী মজার কথা বলতে পারেন। হ্যাঁ, আপনার দেওয়া ইনফরমেশনে অনেক সুবিধে হয়েছে।

সাধুচরণ ধুর্ত হয়েও ঘোষসাহেবের কথার তাৎপর্য সহজে ধরতে পারল না। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

মি. ঘোষ বললেন ওই যে আপনি কয়েকজন বদ জমিদারের নাম দিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ধরে এনে খুব সায়েস্তা করে দিয়েছি।

হুজুর, ওইটে একটা কাজের কাজ হয়েছে। আর সেই সবচেয়ে বদ লোকটি এসেছিল কি?

খগপতি বেরা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুরের মানুষ চেনার অসাধারণ ক্ষমতা।

তাকে আলাদা দাওয়াই দেওয়া হয়েছে। লোকটা কোনো কিছু গোপন করেনি। সে যে স্বদেশিওলাদের ওপর সহানুভূতিশীল তা বেশ বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

শয়তান হুজুর, শয়তান। দুনৌকোয় পা রেখে খেলা দেখাচ্ছে। একদিকে স্বদেশিওলাদের পিঠ চাপড়াব অন্যদিকে গ্যাঁট হয়ে বসে জমিদারিও ভোগ করব।

শায়েস্তা কিছু করা হয়েছে তবে ইনফরমেশান কিছু পাওয়া যায়নি।

কম ধড়িবাজ হুজুর! সহজে কিছু বের করতে পারবেন না। ওদের বন্দুকগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিন হুজুর। না হলে কোনদিন আবার ওগুলো স্বদেশি ডাকাতগুলোর কাজে লেগে যাবে।

মি. ঘোষ বললেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর দূরদর্শিতা আপনার। আমাদের কাজে আপনার মতো লোকই দরকার।

গদগদ গলায় বলল সাধুচরণ, আজ্ঞে হুজুর, আপনাদের সেবা করতে পারলে ধন্য হয়ে যাব।

আচ্ছা বকশিবাবু, আপনি একটু খোঁজ রাখবেন তো, অন্তু নামের কোনো লোক বা ছেলের হদিস পাওয়া যায় কিনা।

অন্তু—অন্তু—আজ্ঞে নামটা বড়ো শোনা শোনা মনে হচ্ছে। কিন্তু ওই পুঁচকে ছোঁড়াটাকে হুজুরের কীসের জন্যে দরকার?

আরে ওই ছোঁড়াটাই তো আমাদের মালবোঝাই নৌকো পোড়ানোর দলে ছিল। রাতের বেলা গুলি খেয়ে নদীর স্রোতে ভেসে গেছে।

সাধুচরণ এই মুহূর্তে নামটা ফাঁস করল না। সে চোখ তুলে মাথা নেড়ে, আবার চোখ নামিয়ে শূন্যে আঙুল নাচিয়ে নানা রকম ভাবনার অভিনয় করল। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, হুজুর মনে আসছে তো মুখে আসছে না, আবার মুখে আসছে তো মনে আসছে না।

BanglaBook.org

সাধুচরণের কথার ভঙ্গিতে আবার হাসলেন ঘোষসাহেব। বললেন, ভালো করে ভেবে খোঁজখবর নিয়ে রাখবেন। পরে যখন আসবেন তখন বলে যাবেন—বলেই আসন ছেড়ে উঠে গেলেন ঘোষসাহেব। তারপর একশো টাকার দুখানা নোট সাধুচরণের হাতে দিয়ে বললেন, এটা আপনার সরকারি পুরস্কার। দামি ইনফরমেশন হলে হাজার, দুহাজার দিতেও আটকাবে না।

সাধুচরণ নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রণাম জানিয়ে বলল, যে গভরমেন্ট মা বাপ তার বিরুদ্ধে যাওয়া মানেই তো নিজের মা বাপকে তাড়ানো। তারপর শূন্যে হাত তুলে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে বলল, ভগবান এ হাড়-হাভাতে পিতৃঘাতীদের একটু বুদ্ধিসুদ্ধি দাও ঠাকুর।

সাধুচরণ সারাটা পথ 'অন্তু'-রহস্য জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে রইল। স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহ কোনো কালেই ছিল না সাধুচরণের। তার মনে হত, এই যে থানা আক্রমণ করতে গিয়ে পাশেই ভগবানপুরে গুলিতে জখম হল মানুষগুলো এতে লাভ হল কার। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে কী ফায়দা হল তোদের, আরে বাপু, শাস্ত্রে বলেছে নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তোরা শাস্তর উলটে দিবি? যেমন কর্ম তেমনি ফল। মর ব্যাটারা মর।

সিংহবাড়িতে ঢোকার আগে বোর্ডিংয়ের মালীর মুখ থেকে খবরটা জানতে চাইল সাধুচরণ, বলি ওহে কেষ্ট, ইস্কুলটা বন্ধ বলে যে ঘাস গজিয়ে উঠল বোর্ডিংয়ের দাওয়ায়।

আজ্ঞে বকশিবাবু, বর্ষার জল খেয়ে মাটি বড়ো তেজি হয়ে উঠেছে। আজ কেটেছি তো কাল ডবল গজিয়েছে।

সাধুচরণ ধমকে বলল, হ্যাঁরে, তোদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার কি কেউ নেই এখানে? একেবারে ফাঁকি দিয়ে মাইনে টানছিস?

দিব্যি গেলে বলছি বকশিবাবু, কাজে ফাঁকি আমি কখনো দিই না। আপনি বরং মাস্টারবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন।

মাস্টারবাবু কি বোর্ডিংয়ে আছেন? সাড়া-শব্দ তো পাচ্ছি না।

আজ দিন দুই হল তিনি পলাশপুরে কুটুমবাড়ি গেছেন।

অন্তুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন বুঝি?

আজ্ঞে না। অন্তুবাবু তো বেশ কিছুদিন আগে মামার বাড়ি গেছে।

ও তাই বুঝি, আচ্ছা ভালো করে ভেবে বল তো দেখি, কী বারে এখানে থেকে রওনা হয়ে গেছে অন্তুবাবু?

ভেবেচিন্তে কেষ্ট মালী বলল, বুধবার আজ্ঞে। ওদিন ইস্কুল বাগানে নারকোল পেড়েছিলাম, পরের দিন বাজারে বেচব বলে।

তুই জানলি কী করে যে অন্তুবাবু মামার বাড়ি গেছে?

হেডমাস্টারবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম। উনি তখন অমন একটা কথা যেন বলেছিলেন। তা, অন্তুবাবু এলে কি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব?

আরে না না। তোর মতো আহাম্মক তো দুটো দেখি না। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তোর সঙ্গে দু'দণ্ড গপ্পো করে গেলাম। অনেকদিন ছেলেটাকে দেখিনি তাই খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। যা যা, তুই তোর কাজ করগে যা।

বগলের ছাতাটা খুলে সূর্যকে ঢেকে ফেলল সাধুচরণ। খর পা চালিয়ে চলতে লাগল সিংহবাড়ির দিকে। মাথায় ভাবনার ভোমরা বন্‌বন্‌ করতে লাগল।

ললিতা সিংহর চিঠি—বুধবার দুখানা কাগজের নৌকো আসছে; বুধবার অন্তুবাবু মামার বাড়ি গেছে; বুধবার রাতে রসুলপুরের নদীতে নৌকো পুড়েছে; 'অন্তু' নামে একটি ছেলে গুলি খেয়ে স্রোতে ভেসে গেছে। ওরেব্বাস, কী যোগাযোগ!

BanglaBook.org

সিংহবাড়িতে ঢুকতে গিয়ে সাধুচরণ মাথা নেড়ে নেড়ে নিজেকে বোঝাতে লাগল, একবার সাধুচরণের সেরেস্তার খাতায় যা ওঠে তা আর জন্মেও মোছবার নয়। এখন পাকা খবরটা যথাস্থানে সুযোগ বুঝে পেশ করতে পারলে সবচেয়ে মোটা পুরস্কারটা সাধুচরণের ফতুয়ার পকেটে এসে যেতে কতক্ষণ!

৯

আওয়াজটা আসছিল পশ্চিম-পাড়ার দিক থেকে। কাঁসর ঘণ্টা আর শাঁখের আওয়াজ। ক্রমে শব্দটা উত্তর দিকের পথ পরিক্রমা করে আসতে লাগল পুব-পাড়ার সিংহসদনের দিকে। বারমাসী পরিচারিকারা ততক্ষণে সিংহবাড়ি ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। নিছক কৌতূহল। নিশ্চয়ই ন কোনো ঠাকুর উঠেছে। তারই সমারোহপূর্ণ শোভাযাত্রা।

আশ্চর্য! শোভাযাত্রীরা কাছে আসতেই দেখা গেল পশ্চিম-পাড়ার পাঠশালার ছেলেরা কাঁসর ঘণ্টা আর শাঁখ বাজাচ্ছে। তাদের সামনে গয়ারাম পণ্ডিত নাথুকে কাঁধে করে বয়ে আনছেন। লজ্জায় মুখ গোঁজ করে পুতুলটির মতো পণ্ডিতমশায়ের কাঁধে বসে আছে নাথু।

সিংহসদনের সামনে এসেই নাথুকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ওপরের দিকে চেয়ে হাঁক পাড়লে পণ্ডিতমশায়, কই গো মা জননী, একটু দেখা দাও।

ললিতা সিংহ তিনতলার জানলা দিয়ে আগেই ব্যাপারটা দেখছিল। সে জানে পণ্ডিত গয়ারাম একটু খ্যাপাটে স্বভাবের। একবার উপযাচক হয়ে গয়ারামকে সিংহসদন থেকে সাহায্য করতে চেয়েছিল ললিতা, কিন্তু সে সাহায্য-প্রস্তাব মুখোমুখি প্রত্যাখ্যান করে পণ্ডিত গয়ারাম বলেছিলেন ছেলে পড়িয়ে মোটা ভাত-কাপড়ে কোনোরকমে চলে যাচ্ছে সংসার, এখন তোমার দেওয়া চাল পেটে পড়লে পড়াতে পড়াতে আলিস্যি এসে যাবে মা।

গয়ারামের ওপর রাগ করতে পারেনি ললিতা, কারণ মানুষটাই ওইরকম চরিত্রের। তা ললিতার স্বামী অর্ণব সিংহও গয়ারাম পণ্ডিতের কাছেই প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। সেদিক থেকে মানুষটি ললিতার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু ললিতা পণ্ডিতমশায়ের আজকের অনুষ্ঠানটির অর্থভেদ করতে পারল না। নীচের বৈঠকখানায় সে দ্রুত পায়ে নেমে এল।

খাসদাসী গোলাপি বাইরের উঠোন থেকে বৈঠকখানায় ডেকে আনল পণ্ডিত গয়ারামকে। পণ্ডিতমশায় নাথুর হাত ধরে ঢুকলেন বৈঠকে। ললিতা এগিয়ে এসে স্বামীর পাঠশালার গুরুদেবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। পণ্ডিত গয়ারাম দুটি হাত জোড় করে বললেন, মঙ্গল করুন মা জগদম্বা।

পরক্ষণেই নাথুকে ললিতার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, যা হতভাগা, মা জননীর পায়ের ধুলো নিয়ে আয়।

নাথু গিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই ললিতা তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করল। হঠাৎ একটা চাপা আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে তার দুচোখ প্লাবিত করে দিল। এমনি করে একটি আর একদিন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে আজ আর নেই। চোখের সামনে থেকে চিরদিনের মতো মুছে গেছে।

ললিতার এ ভাবান্তর বোধকরি বৃদ্ধ গয়ারামের নজরে পড়ল না। তিনি বললেন, আজ বড়ো সুখবর মা, মণি যা পারেনি তাই পেরেছে আমার নাথু। মণিশঙ্কর উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় মহকুমার ভেতর প্রথম হয়েছিল, আর নাথু আমার সারা জেলার ভেতর সবাইকে টপকে প্রথম হয়েছে। ইন্সপেক্টরবাবু আজ পাকা খবর এনেছেন কাঁথি থেকে। বড়ো কষ্ট করে সারা পথ হেঁটে এসেছেন। সুনিয়ার খেয়াঘাটের কাছে কংগ্রেসি ভলান্টিয়ারদের একটা লুকোনো নৌকোয় চেপে উনি নদী পার হয়েছেন। এতবড়ো খবরটা গ্রামবাসীদের জানাতে বেরিয়েছি মা। ●

BanglaBook.org

অভিভূত হয়ে ললিতা বলল, এটি কাদের বাড়ির ছেলে পণ্ডিতমশায়?

তোমাদের বাড়িতে সাতসকালে যে মেয়েটি বাসন মাজতে আসে সে-ই তো এর মা। যে গদাই তোমাদের লাটে কাজ করতে গিয়ে মরেছে, এ হতভাগা তারই ছেলে। পাঁকেই তো পদ্ম ফোটে মা।

ললিতা বলল, আশ্চর্য, ও যে লেখাপড়ায় এতখানি ভালো তা তো কেউ আমাকে বলেনি। তা হলে—

তা হলে কী করতে মা? দুধ-ভাত খাইয়ে পড়তে পাঠাতে পাঠশালায়? তা হলে আর দেখতে হত না। পড়ার পাতায় মন না থেকে তোমার দেওয়া ক্ষীর, ননী, সরেই থাকত।

দ্বিতীয়বার ললিতা হার মেনে খুশি হল। সে বলল, এই আনন্দের দিনে একটু মিষ্টিও কি আমি খাওয়াতে পারব না পণ্ডিতমশায়?

তা কেন পারবে না মা। আমার সবকটা বাঁদরছানাকে তা হলে কিন্তু ভাগ দিতে হবে। ওদের আনন্দ আজ সবচেয়ে বেশি।

সেকথা বলে দিতে হবে না পণ্ডিতমশায়। আমি সবাইকেই খাওয়াব। ওরা সবাই যে গোপালের গোষ্ঠলীলার বন্ধু।

পণ্ডিতমশায় আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, বেশ বলেছ তো মা, ভারী সুন্দর কথাটি বলেছ।

মুড়ি মুড়কি আর মিষ্টির ব্যবস্থা হল সবার জন্যে। ললিতা পণ্ডিত গয়ারামের পাশে বসে ছেলেদের খাওয়া লক্ষ করতে করতে বলল, আমি ময়দার ব্যবস্থা করতাম পণ্ডিতমশায়, কিন্তু আপনি হয়তো ভাবতেন আমি বড়োবাড়ির কারবার করছি, তাই মুড়ি মুড়কিরই ব্যবস্থা করলাম।

বেশ করেছ মা। এরা সব সাধারণ বাড়ির ছেলে। একদিন ভালোমন্দ খেয়ে কী হবে মা। অনেকেরই তো সারাদিনে একবেলা জোটে। তোমার বাড়ি খেয়ে গিয়ে বেচারাদের সে কথা বারবার মনে পড়বে আর খালি পেটে জ্বালা ধরবে।

ললিতা প্রসঙ্গ পালটে বলল, আমি আপনার ছাত্রের কাছে শুনেছিলাম, পরীক্ষার মাসখানেক আগে থেকে আপনি নাকি সারারাত ছাত্রদের পাঠশালার ভেতরে জাগিয়ে রেখে অঙ্ক কষাতেন? এখনো কি তাই করেন?

করি বই কী মা। তবে সারারাত কি আর বাচ্চারা জেগে থাকতে পারে? মাঝরাতেই ঘুমিয়ে পড়ে সব। ভোররাতে আবার জাগিয়ে দিই।

ললিতা বলল, শুনেছিলাম বাবামশায় নাকি—ছেলে পাঠশালায় রাত কাটাবে বলে নায়েবমশায়ের হাতে হ্যাজাক লাইট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর আপনি সঙ্গে সঙ্গে সে আলো ফেরত পাঠিয়ে বলেছিলেন, এত আলোতে আমার আর সব গরিব ছাত্রদের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। বাবুমশায়কে বলবেন, আলো ফেরত নিতে হবে, না হলে তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অবু আবার তোমাকে এসব কথা বলেছিল বুঝি?

হাঁ পণ্ডিতমশায়, ও আপনাকে খুবই শ্রদ্ধা করত।

পণ্ডিতমশায় খেতে খেতে দুটো হাত বাড়িয়ে বললেন, বউমা, অবুর আমার এতবড়ো একট হৃদয় ছিল। এতবড়ো বাড়ির ছেলে বলে এতটুকু অহংকার ছিল না। সমানে সবার সঙ্গে বেত খেত। হ্যারিকেনের আলোয় সবার সঙ্গে বসে ঢুলতে ঢুলতে আঁক কষত। বাড়ি থেকে মেঠাই এলে এককণা হলেও সবাইকে সমান ভাগ দিয়ে খেত।

একটু থেমে পণ্ডিতমশায় আবার বললেন, অর্ণব আমার এত অল্প বয়সে চলে গেল, পাঁজরের একখানা হাড় ভেঙে দিয়ে গেছে বউমা।

ললিতা বলল, আপনি তো আপনার ছাত্রের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিতেন না বলে শুনেছি।

BanglaBook.org

সাহায্য কি শুধু চাল ডালে হয় মা। সে গাঁয়ে ছিল মানে কতবড়ো ভরসা ছিল। বটগাছের ফল কি আমরা খাই? তবু তার ছায়াটা আমাদের কত বড়ো আশ্রয়।

খাওয়া শেষ হলে উঠে পড়ল সবাই। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল পণ্ডিতমশায়ের। বললেন, রাত জেগে পাঠশালায় পড়ার কথা বলছিলে না মা? তবে শোনো একটা কথা বলি, বড়লোকের বাড়ির ছেলের হ্যারিকেন বলে সেটাকেই আমি সারারাত জ্বালিয়ে রাখি না। বিশটা ছেলের পাঁচটা হ্যারিকেন হলেই চলে যায়। আমি সময় হিসেব করে পরপর ওগুলোকে জ্বালাই। অনেক গরিব আছে সাঁঝ প্রহরে খেয়ে নেয়, তারা তাদের ছেলেদের জন্যে কেরোসিনের জোগান দিতে পারে না। আমি তাদের তেলটা দিয়ে দিই।

ললিতা অমনি বলল, আপনি সাহায্য না করলে কি গরিব মানুষগুলোর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারত।

না মা, কথাটা ঠিক তা নয়। আমি ওদের আলো জ্বালাবার তেল দিতাম ঠিক কিন্তু দান খয়রাত নয়। তার বদলে হয় আমার ছাত্র নয় তার বাপ আমার সবজির খেতে কাজ করে দিয়ে যায়। মানুষকে দান দিলেই সে ভিখিরি বনে যায়। একেবারে অথর্ব যারা তাদের কথা আলাদা।

এবার আর দাঁড়ালেন না পণ্ডিতমশায়, চলরে চল, মণিকে একবার দেখিয়ে আনি।

পণ্ডিতমশায় তাঁর কপিসেনাদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ললিতা এই দরিদ্র অকৃতদার বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায়ের দিকে তাকিয়ে তার স্বপ্নের ভারতবর্ষের কথা ভাবতে লাগল।

১০

আমি এখনো ভাবতে পারছি না, গরিবের বাড়িতে সিংহবাড়ির রানিমা পায়ের ধুলো দিয়েছেন!

একথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না কাকাবাবু। দেখাসাক্ষাৎ না হলেও আমি আপনাকে আমার একান্ত গুরুজনের মতোই শ্রদ্ধা করি।

আমি কোথায় তোমাকে বসাব মা, কীভাবে আপ্যায়ন করব তা বুঝে উঠতে পারছি না।

আমাকে নিজের মেয়ে বলেই ভাববেন। আমি অল্প জ্যোৎস্নার আলোয় আমার বিশ্বাসী ঝি-টিকে নিয়ে অতি গোপনে আপনার কাছে এসেছি। একই লোকাল বোর্ডের বাঁধ, তাই কাউকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করতে হয়নি।

আগে তুমি বসো মা, তারপর সব কথাবার্তা হবে।

খগপতি বেরামশায় অন্দরমহলে পালঙ্কের ওপর ললিতা সিংহকে বহু যত্নে বসালেন। বেরামশায়ের স্ত্রী কিছুক্ষণের মধ্যেই খগপতিবাবুর নির্দেশমতো শ্বেতপাথরের থালায় গৃহদেবতার সান্ধ্যভোগের প্রসাদ নিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

ললিতা পালঙ্ক থেকে নেমে খগপতিবাবুর স্ত্রীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। উনি হাতের থালাখানা শ্বেতপাথরের টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে ললিতা সিংহের থুতনিতে হাত স্পর্শ করে চুম্বন করলেন। মুখে বললেন, তোমাকে কী বলে আশীর্বাদ করব মা। অর্ণব তো অকালে চলে গেল। দেশের দশের জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদুক, এই আশীর্বাদ করছি আজ।

ললিতা মণিশঙ্করের মুখে শুনেছিল, খগপতিবাবুর স্ত্রী ভৌমিক বাড়ির মেয়ে। জাতীয় আন্দোলনে সমস্ত পরিবারটিই ওঁদের উৎসর্গীকৃত। লবণ আইন অমান্য করতে গিয়ে পুলিশের কঠিন অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছেন খগপতিবাবুর স্ত্রী সুহাসিনী দেবী। প্রথম জীবনে খগপতিবাবু নাকি অত্যন্ত অত্যাচারী জোতদার ছিলেন। সুন্দরবনে একই লাটে পাশাপাশি জমি আছে সিংহ আর বেরাদের। একদিকে লোনা জলের বন্যা ঢুকলেই রাতারাতি বাঁধ কাটিয়ে অন্যদিকে সে জল ঢুকিয়ে দেওয়া নিয়ে কত লাঠালাঠি হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

বিয়ের পর নাকি খগপতিবাবুর আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। তাঁর এই পরিবর্তনের মূলে নাকি ছিলেন দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত সুহাসিনী দেবী।

খগপতিবাবুর স্ত্রীর আশীর্বাদের উত্তরে ললিতা বলল, কাকিমা, আপনার আশীর্বাদ আমার জীবনে প্রেরণা হয়ে থাকবে।

সুহাসিনী দেবী পাশে বসে ললিতাকে প্রসাদী ফল-মিষ্টি খাওয়ালেন। বললেন, আমার ছেলে শুভঙ্কর আর অর্ণব তোমাদের ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়ত। সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে এসেছিল শুভঙ্করের সঙ্গে। বড়োবাড়ির ছেলে বলে অহংকার ছিল না। বড়ো ভদ্র আর মার্জিত ছিল মা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজ অর্ণবও নেই শুভঙ্করও নেই।

শুনেছিলাম শুভঙ্করবাবু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে মারা যান?

ও একটা প্রসেশানে যাবার সময় পুলিশের লাঠির ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর হাসপাতাল থেকে ভালো হয়ে ফিরে আবার কলেজে যোগ দেয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন কলেজেই ক্লাস করার সময় ভীষণ রক্তপাত হয়। সম্ভবত মাথা থেকেই সে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। হাসপাতালে ওকে আর নিয়ে যাবার সময়ই পাওয়া যায়নি।

ললিতা বলল, কাকিমা, এঁরাই আমাদের প্রেরণা। তবে আজ আমার জন্যেই আপনাকে শুভঙ্করবাবুর এই মর্মান্তিক মৃত্যুর কথাটা স্মরণ করতে হল।

সুহাসিনী দেবী বললেন, কী বলছ মা, শত শত ছেলে দেশের কাজ করতে গিয়ে মারা গেল, তারা সবাই আমার শুভঙ্কর। তাদের কথা বলার সুযোগ পেলেই বুকটা আমার ভরে ওঠে।

ললিতার খাওয়া শেষ হলে সুহাসিনী দেবী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা এখন তোমাদের বৈষয়িক কথা বলো মা, আমি পরে আসব।

ললিতা বলল, না কাকিমা, আপনি আমাদের ভেতরেই থাকবেন। কাকাবাবুর সঙ্গে মতের মিল না হলে আপনার রায়ই আমি মাথা পেতে নেব।

হা হা করে হেসে খগপতিবাবু বললেন, তুমি তা হলে জিতে গেলে মা।

কী রকম?

প্রথম দৃষ্টিতেই তুমি তোমার কাকিমার মন জয় করে নিয়েছ। দেখছ না ওঁর চোখ-মুখ কীরকম খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সুহাসিনী দেবীর চোখ সহসা ছলছল করে উঠল। তিনি বললেন, আজ সন্ধ্যায় চাঁদের আলোর মতো একটা মেয়ে আমার ঘরখানাকে ভরে দিলে, আমি খুশি হব না?

পরিচারিকার হাতে ললিতার খাওয়া থালাখানা পাঠিয়ে দিয়ে ললিতার পাশেই পালঙ্কে বসলেন তিনি। সামনে মেঝেতে চেয়ারে বসে ললিতার মুখের দিতে চেয়ে রইলেন খগপতিবাবু।

আমি অনেকদিন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব বলে মনে করেছিলাম কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তারপর যেদিন জানতে পারলাম স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মি. ঘোষ তাঁর লঞ্চে ডেকে আপনাকে অপমান করেছেন সেদিন মনস্থির করে ফেললাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

কথাটা তুমি কী করে জানলে মা?

পলাশকান্তি ঘোষ আমার বাড়িতে এসে কথাটা বলে গেছেন।

পলাশকান্তি মানে, তুমি ম্যাজিস্ট্রেট পি. কে. ঘোষের কথা বলছ তো?

হ্যাঁ কাকাবাবু, প্রেসিডেন্সি কলেজে উনি আমার স্বামীর ক্লাস-ফ্রেন্ড ছিলেন। তা ছাড়া দক্ষিণ কলকাতায় আমার বাপের বাড়িতে বিয়ের পরও কয়েকবার উনি গিয়েছিলেন।

খগপতিবাবু বললেন, কিছু মনে কোরো না মা, লোকটি এতবড়ো পোস্টে কাজ করছেন, নিশ্চয়ই উচ্চ শিক্ষিত, কিন্তু তাঁর আচরণে শিক্ষাদীক্ষার কোনো ছাপই নেই।

BanglaBook.org

আপনার কথার সঙ্গে আমি ষোলোআনা একমত কাকাবাবু।

একটু থেমে ললিতা আবার বলল, আপনি হয়তো ভাবছেন মানুষটাকে পুরোপুরি জেনেও আমি কেন বাড়িতে ডেকে আশকারা দিচ্ছি।

না না তা কেন ভাবব মা। তোমার আগের চেনা মানুষ, এত কাছে এলে তো ডাকবেই।

না কাকাবাবু তাও নয়। আমি ওর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে কিছু ইন্‌ফরমেশান জোগাড়ের চেষ্টায় ছিলাম।

সুহাসিনী দেবী সোচ্ছ্বাসে বললেন, তুমি কি পুরোপুরি এ আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলেছ মা?

হেসে বলল ললিতা, পুরোপুরি পারলাম কোথায় কাকিমা। এখনো বিষয়-সম্পত্তির বাঁধনে পড়ে আছি। তবে এরই ভেতর অনেকেই আসেন, যাঁরা আত্মগোপন করে গভর্নমেন্ট উৎখাতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা আমার কিছু সাহায্য চান। মাঝে মাঝে আমি তাঁদের সঙ্গে গোপন আলোচনা সভায়ও যোগ দিই।

খগপতিবাবু বললেন, কিছুদিন আগে কেরোসিন আর রসদ বোঝাই নৌকো আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আমাদের ছেলেরা। তুমি কি সে বিষয়ে আগে থেকে কিছু জানতে?

মৃদু হেসে বলল ললিতা, আমি ওই নৌকো পোড়ানোর ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট পি. কে. ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ।

কী রকম।

নৌকো দুটো কোনদিন কখন আসছে তা আমি কথা প্রসঙ্গে পি. কে. ঘোষের কাছে জেনে নিই। অ্যাকশান কমিটিকে তা আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম।

খগপতিবাবু বললেন, তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণাই পাল্টে গেল মা। শুনেছিলাম, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে তুমি খুবই যোগ্য কিন্তু এখন দেখছি, দেশের নাড়ীর সঙ্গে তোমার যোগ অচ্ছেদ্য।

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে ললিতা বলল, বিশ্বাস করুন কাকাবাবু আজ আপনাকে প্রণাম জানাতেই আমি এসেছিলাম। আপনি স্পষ্টবাদী, সৎ মানুষ বলে আপনার ওপর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু আপনি পি. কে. ঘোষের কাছে আত্মবিক্রয় না করে যে সাহস দেখিয়েছেন তা জানার পর থেকে আপনার কাছে আসার জন্যে বড়ো ছটফট করছিলাম।

সুহাসিনী দেবী বললেন, এখন একযোগে তোমরা দেশের জন্যে কিছু একটা করলে আমি খুশি হই।

ললিতা সুহাসিনী দেবীর মুখের ওপর তার বড়ো বড়ো চোখের দৃষ্টি স্থির রেখে বলল, আমার মনের কথাটাই আপনি বলে ফেললেন কাকিমা।

খগপতিবাবু হেসে বললেন, তোমরা দুজনেই যখন একসঙ্গে হয়েছ তখন ভোটে আমার নিশ্চিত হার হয়েছে। এখন বলো আমি কী ধরনের সহযোগিতা করতে পারি?

ললিতা বলল, বাবামশায়ের আমলে লাটের সম্পত্তি নিয়ে আমাদের দুবাড়ির ভেতর নাকি লাঠালাঠি চলত। আসুন কাকাবাবু, আমরা সেখান থেকেই কাজটা শুরু করি।

বলো মা, তোমার প্রস্তাব আমি নির্বিচারে মেনে নেব। তোমাকে মুখোমুখি কোনোদিন দেখিনি, আজ তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে কথা বলে বড়ো ভালো লেগে গেছে মা। আমার ছেলেপুলে কেউ নেই। তুমি আমার মেয়ের স্থান নিলে আজ থেকে।

সুহাসিনী দেবী ললিতার একখানা হাত চেপে ধরে চোখের জল মুছলেন।

BanglaBook.org

পরিস্থিতি শান্ত হলে ললিতা বলল, আমি ভেবেছি কাকাবাবু, আমাদের দেশের চাষাভুষোদের জন্যে কিছু কাজ করব।

কী করতে চাও বলো?

এই দেখুন, কিছুদিন আগে দলের ছেলেরা এসে খবর দিল, কাঁথির দক্ষিণে সরিষাবেড়িয়ায় মিলিটারি ক্রুদ্ধ কৃষকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। অনেকেই মরেছে গুলিতে। আমি জানি, ছাত্র আর কৃষক মজুররাই মুখোমুখি লড়াইতে নেমে পড়ে। তাই বলছিলাম কৃষকদের জন্য আমাদের কিছু করা দরকার।

সুহাসিনী দেবী বললেন, তোমার কথায় আমার ষোলোআনা সমর্থন জানবে মা। আর কিছু করবার মতো ক্ষমতা যখন দুজনেরই রয়েছে তখন কিছু না করাটাই তো অন্যায়।

আমি মনে করেছি লাটে আমাদের যে হাজার দুয়েক বিঘে জমি আছে তার ফসলের ভাগ এবার থেকে একটু অন্যরকম হবে।

কী ভেবেছ?

ওদেরকে বলতে চাই, তোমাদের সারা বছরের খোরাকি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, বিয়ে-শাদির দায়-দায়িত্ব মিটিয়ে যা দিতে পারবে তাই দিয়ো। আমরা ফসলের আদ্দেক ভাগ চাই না।

বৈপ্লবিক ঘোষণা মা। আশপাশের লাটদারদের শত্রু হয়ে যাব আমরা।

শত্রুতার ভয় করলে কোনো মহৎ কাজ করা যাবে না কাকাবাবু। আসুন আমরা নির্ভয়ে পথ দেখাই।

খগপতি বেরা ললিতার দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে কী যেন পড়ে নিলেন। তারপর তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

সুহাসিনী দেবী বললেন, অনেক পুরুষ ধরে অনেক খেয়েছ। এখন ওদের খেতে দাও।

এই তো বিচারকের রায় বেরিয়ে গেল, আর দ্বিধার কিছু নেই। এবারের ফসল থেকেই তা হলে মা জননীর পরিকল্পনা কার্যকরী হোক।

ললিতা পালঙ্ক থেকে নেমে দুজনকেই প্রণাম করল। সুহাসিনী দেবী তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন।

ললিতা বলল, প্রথম দিনের যাত্রা আমার এতখানি সফল হবে তা ভাবতে পারিনি। আর রিক্ত জীবনে এতখানি স্নেহ পাব, তাও ছিল আমার কল্পনার বাইরে। দুটোই অপ্রত্যাশিত পেয়ে গেলাম। আজ আর এত আনন্দের ভার বইতে পারছি না। অনুমতি দিন, আজ আমি আসি।

সুহাসিনী দেবী বললেন, কথা দাও মা, শিগ্‌গির আবার আসবে?

আসব মা, তবে সময় সুযোগ বুঝে। এ সময়ে ওঁর কিংবা আমার বড়ো সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে।

সেই জ্যোৎস্নার আলোয় তিনটি ছায়ামূর্তি পথে বেরিয়ে গেল। ললিতা খগপতিবাবুকে সঙ্গে যেতে বারণ করেছিল কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না। যে বাড়ির মেয়েদের পা ঘরের বাইরের মাটি কোনোদিন স্পর্শ করেনি সে বাড়ির মেয়ে যদি প্রাণের উন্মাদনায় ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে, তা হলে তিনি তাদের সঙ্গ দেবেন না কেন? ওদের সঙ্গই তো পুণ্য।

চলতে চলতে খগপতিবাবুর হৃদয় এক মহৎ প্রেরণায় শরতের আকাশের মতো নির্মল, উদার হয়ে গেল।

BanglaBook.org

১১

ভোরের আলো তখনো ফোটেনি। সানাই বেজে উঠল ভৈরবীতে। আজ সপ্তমী তিথি। সিংহবাড়ির পূজামণ্ডপে দেবী সিংহবাহিনীর মূর্তির সামনে পেতলের দীপাধারে দীপ জ্বলছে। কিছু পরেই অনুষ্ঠান শুরু হবে। নবপত্রিকার স্নানপর্ব সমাপ্ত হলেই দেবী দশভূজার করে তুলে দেওয়া হবে অসুরবিনাশী অস্ত্র। সহসা অস্পষ্ট অন্ধকারের বুক চিরে ভেসে আসতে লাগল দীর্ঘশ্বাস। দেবীপ্রতিমা, পুরোহিত আর ঢাকিদের গায়ে এসে লাগল সে হাওয়া। ভোরের স্নিগ্ধ প্রবাহের স্পর্শ ছিল না তার মধ্যে। যেন অতৃপ্ত কোনো আত্মার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল সে প্রশ্বাস।

কাঁপতে কাঁপতে বৃহৎ পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি শিখাই একে একে নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার সরে গিয়ে দেখা গেল ভোরের আকাশ। একী! শরতের কোনো চিহ্নই নেই সে আকাশে। কোনো উদ্‌ভ্রান্ত নারীর তৈলহীন ধূলিধূসর এলোমেলো কেশ যেন উড়ছে সারা আকাশ জুড়ে। শরতের এত নীল, সূর্যের এত সোনা আকাশের এই সর্বব্যাপ্ত ধূসরতাকে দূর করতে পারল না। সভয়ে জাগরিত মানুষেরা দেখল এক রাত্রির অন্ধকার যবনিকার আড়ালে অনাগত কোনো ভয়ংকর নাটকের দৃশ্যপট রচিত হয়ে গেছে।

সিংহবাড়ির নবপত্রিকার স্নানপর্ব যথানিয়মে সমাপ্ত হল। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, চক্ষুদান, অস্ত্রসজ্জা সবই মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে সাঙ্গ হল। বাদ্যকারদের বিরামহীন বাদ্যধ্বনি পূজা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল।

বেরিয়ে পড়েছে লোকজন ঘরের বাইরে। আজ মাতৃপূজার প্রথম দিন। প্রাত্যহিক জীবনের ছকে পুজোর এই কটি দিন আর কেউই বাঁধা থাকবে না। কিন্তু ঘরের বাইরের আকাশ তাদের অবাধ আনন্দের প্রসারিত দুটি ডানাকে রোধ করে দাঁড়াল। মুহূর্তে একটা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল সবার মুখে। চোখের মধ্যে অজ্ঞাত অশুভ এক আতঙ্ক।

ছেলেরা জড়ো হয়েছে পূজামণ্ডপে। তারা কেউ বাদ্যকারদের অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করছে, কেউ কেউ নিবিষ্ট হয়ে পুরোহিতের ক্রিয়া-কলাপ দেখছে, কেউ বা শুরু করে দিয়েছে দীর্ঘ ঠাকুরদালানের সারি সারি থামের আড়ালে লুকোচুরি খেলা। সারা আকাশের গভীর ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে তাদের অনাবিল আনন্দ কলরব ছড়িয়ে পড়েছে পূজা-প্রাঙ্গণে।

ক্ষণে ক্ষণে গলা ছেড়ে হাঁক পাড়ছে বকশি সাধুচরণ। সিংহবাড়ির বিভিন্ন মহল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে চাকরবাকররা। সামনের প্রাঙ্গণে শামিয়ানা টাঙাবার জন্য বাঁশের ফ্রেমের চারদিকে উঠতে লাগল লোকজন। পিপলির তৈরি বিচিত্র কাজ করা বিরাট রঙিন শামিয়ানার নীচে অতিথি অভ্যাগতদের জন্য আসন পাতা হবে। একসময় খড়ের আস্তরণের ওপর শতরঞ্চি বিছিয়ে চাদর পেতে ফরাস তৈরি করা হত। গির্দা পড়ত স্থানে স্থানে। গড়িয়ে গড়িয়ে গল্পগুজব করতেন অতিথি অভ্যাগতরা, গড়গড়া টানতেন। কল্কে বদল হত ঘন ঘন। আর একদিকে সুন্দর সাজানো লোহার ফ্রেমের পার্টিশনের মধ্যে পাতা হত সিংহবাড়ির পুরনো আমলের সিংহাসন। তার দুপাশে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো থাকত মেহগিনি কাঠের পালিশ করা সুদৃশ্য চেয়ারের সারি। এখানে প্রায় সমপর্যায়ের জমিদার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বসতেন সিংহসদনের স্বনামধন্য জমিদারবাবু। গত কয়েক বছর সিংহাসন কিংবা চেয়ারগুলি আসরে বের করা হয়নি। অর্ণব সিংহর পিতার আমলে শেষ তাদের দেখা গেছে। তখন রুপোর আশাসোটা কাঁধে লোহার ফ্রেমের ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকত উর্দিপরা আশাবরদার। বাইরে আলোর ফ্রেমওয়ালা ফটকের তলায় পেতলের কাজ করা ঢাল আর তলোয়ার হাতে দাঁড়াত রাজপুত দ্বাররক্ষী।

অর্ণব সিংহ ওসব সাবেকি আমলের জমিদারি আড়ম্বর তুলে দিয়েছিলেন। অর্ণব সিংহর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী ললিতা সিংহ নানা দিকে আরও সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে অযথা আড়ম্বর। এখন কলকাতা থেকে আর বাজি আনানো হয় না। দেশের কারিগররাই পুজোবাড়ির বাজি তৈরির অর্ডার

BanglaBook.org

পায়। কলকাতা থেকে যাত্রা পার্টি নিয়ে আসা হত আগে, এখন ললিতা সিংহ উৎসাহ দিচ্ছে আশপাশের গ্রামের যাত্রাওয়ালাদের। অবশ্য আগের মতো মহানবমীর দিনে গ্রাম ভোজনের ব্যবস্থাটা বহাল রেখেছে ললিতা সিংহ। আর একটি বিষয়ের সংযোজন হয়েছে গত বছর থেকে। পুজোর শেষে কয়েকদিন ধরে বসে লাঠিখেলার আসর। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবং আরো কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তখন বিভিন্ন অঞ্চলে ছোরা খেলা, লাঠি খেলার প্রবর্তন করেছিলেন। যুবকেরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অনুশীলন করত সেইসব খেলার। ললিতা সিংহ সিংহবাহিনীর পূজা প্রাঙ্গণে বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলের লাঠিয়ালদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের পুরস্কারও দেওয়া হচ্ছে এস্টেট থেকে।

এবার সাধুচরণ দুটি অনুরোধ জানিয়েছিল ললিতা সিংহর কাছে। একটি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট পি. কে. ঘোষের আগমন উপলক্ষে সাবেকি সিংহাসন ও বাহারি চেয়ার সজ্জা। অন্যটি স্বদেশি আন্দোলনের কথা স্মরণে রেখে এ বছরের জন্য লাঠিখেলার প্রতিযোগিতাটি তুলে দেওয়া। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ব্যাপারটিকে সুনজরে না-ও দেখতে পারেন। প্রথম অনুরোধটিকে অনিচ্ছায় সম্মতি দিলেও দ্বিতীয় অনুরোধটি রক্ষা করেনি ললিতা সিংহ।

মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বকশি সাধুচরণ। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সিংহসদনের ঢোকার আগেই শামিয়না টাঙিয়ে, ফরাস পেতে সিংহাসনটি সাজিয়ে ফেলতে হবে। মাঝে মাঝে তাই হুংকার দিয়ে উঠছিল সাধুচরণ।

লোকগুলো বাঁশের খুঁটির ওপর উঠে দড়িদড়া শামিয়ানা টানাটানি করছিল আর নীচে দাঁড়িয়ে আঙুল নেড়ে গলা ফাটিয়ে সাধুচরণ নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল।

অতবড় শামিয়ানাখানা বহু কষ্টে টানা হেঁচড়া করে তোলা হল বিশাল বাঁশের মাচার ওপর। দড়াদড়ি দিয়ে টেনে বাঁধা হল খুঁটির সঙ্গে। কিন্তু মাচার ওপরের লোকজন নীচে নামতে না নামতেই এক দমকা হাওয়ায় বেলুনের মতো ফুলে উঠল শামিয়ানাখানা। তারপর দ্বিতীয় ঝটকায় দড়াদড়ি ছিঁড়ে শূন্যে খানিকটা উঠে সবেগে আছড়ে পড়ল মাটিতে। একটা আওয়াজ উঠল চারদিক থেকে; চাপা পড়েছে, চাপা পড়েছে! শামিয়ানার একটা অংশে দেখা গেল জালে বন্দি খাবি খাওয়া মাছের মতো ধড়ফড় করছে সাধুচরণ।

অনেক কষ্টে অত বড়ো শামিয়ানার ভেতর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করা হল সাধুচরণকে। প্রায় মূর্ছাগত। আঘাত যতখানি তার চেয়ে বেশি আতঙ্কে চোখের তারা দুটো কপালের দিকে উঠে স্থির হয়ে আছে। জলের ঝাপটা দেওয়া হতে লাগল। কিছু পরে ধাতস্থ হয়ে উঠে বসল সাধুচরণ। জলে কাদায় তার দেহ আর পরিচ্ছদ একাকার। ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাকে পোশাক বদলে শুইয়ে দেওয়া হল। ললিতা সিংহ গোলাপিকে দিয়ে গরম দুধ পাঠিয়ে দিল খাবার জন্য। ওষুধপত্র যা ছিল তাও পাঠাল সঙ্গে সঙ্গে।

এদিকে আদেশ এল ললিতা সিংহের কাছ থেকে, সবকিছু সরিয়ে পূজা প্রাঙ্গণ খালি করে ফেলা হোক। লোকজন এলে ঠাকুরদালানে বসারই ব্যবস্থা হবে। আড়ম্বরের দরকরও নেই, উপায়ও নেই।

চারদিকে যখন এই উদ্যোগপর্ব চলেছে তখন সেখানে আবির্ভূত হলেন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষসাহেব। বোঝা গেল কয়েকবার পথে আছাড় খেয়েছেন তিনি। ক্রিম রঙের শার্টে কাদার ছিটে। প্যান্টের পিছনে কাদার দাগ। এলোমেলো হাওয়ায় বিন্যস্ত কেশ সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠেছে।

তিনতলা থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের করুণ চিত্রটা চোখে পড়ল ললিতা সিংহের। অমনি লোক পাঠিয়ে সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেল ওপরে। সাহেবের আরদালি রয়ে গেল দারোয়ানের হেফাজতে।

BanglaBook.org

আধঘণ্টার মধ্যে প্যান্ট শার্ট বদলে পুজোর দিনের পুরোপুরি বাঙালিবাবু বনে গেলেন ঘোষসাহেব। অর্ণব সিংহের কোঁচানো ধুতি পাঞ্জাবি পরে মি. পি. কে. ঘোষ, পলাশকান্তি ঘোষে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন।

ললিতা সিংহ সত্যিই রহস্যময়ী। অন্তর মৃত্যুর ঘা এখনো যার বুকের মধ্যে জ্বলন্ত কয়লার মতো দগদগ করছে, তার এই নিখুঁত অতিথি আপ্যায়ন দেখলে কে বলবে সে পুত্রাধিক প্রিয়র শোকে আচ্ছন্ন।

মি. ঘোষ খোলা বারান্দায় একটা চেয়ারে বসেছিলেন। পাশে দাঁড়িয়েছিল ললিতা সিংহ। কথা হচ্ছিল তাঁদের মধ্যে। ললিতা বলছিল, অন্তত তিনটে দিন এখানে তোমাকে থেকে যেতে হবে পলাশদা।

তিনটে দিনের বেশি নয় কেন ললিতা? আমি এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলে তোমার দেশের লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, তা হলে তোমার কাছেও কি আমার সেই প্রত্যাশা?

এ কথা কেন বলছ পলাশদা, আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় তো আজকের নয়। সুতরাং শাসক শাসিতের ব্যাপারটা এখানে আসছে না।

মি. ঘোষ হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে বললেন, তোমার সাধুচরণটিকে দেখছি না তো?

পুজোবাড়ির উঠোনে শামিয়ানা টাঙাতে গিয়ে ছোটোখাটো একটা অ্যাকসিডেন্ট করে বিছানায় শুয়ে আছে। ওই শামিয়ানার নীচে সিংহবাড়ির পুরনো সিংহাসনটি পেতে তোমাকে বসাবার খুব ইচ্ছে ছিল। বেচারার সে সাধটা আর পূর্ণ হল না।

লোকটি দারুণ এফিশিয়েন্ট। ওই তো আমাকে এখানকার বদ ল্যান্ডহোল্ডারদের সম্বন্ধে ইনফরমেশান দিয়েছিল। সব কটাকে লঞ্চে ডেকে এনে এক প্রস্থ ধোলাই দিয়ে দিয়েছি।

সত্যি?

তুমি জানো না?

হেসে বলল ললিতা, আমি কী করে জানব। তুমি তো আমাকে ডাকোনি।

তোমার বকশি তোমার নাম করতে ভুলে গেছে। নাম পেলে ডাকতাম।

আমাকে তুমি শাস্তি দিতে পারতে পলাশদা?

মনের থেকে না পারলেও কর্তব্যের খাতিরে পারতেই হত। মি. ঘোষ বললেন, তুমি আমার চরিত্রটা ঠিকমতো চিনতে পারোনি ললিতা। আমি যে পোস্টে বসে আছি সেখান থেকে আমি আমার ওপরওলার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাব। আমার স্ত্রী, এমনকী আমার বাবা মা-ও পার পাবেন না কোনো সরকার-বিরুদ্ধ কাজ করে।

ললিতা বলল, তোমার সঙ্গে দেশ নিয়ে আলোচনায় আমার মতপার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু তোমার কর্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা আমি করব।

শোনো ললিতা, যে ল্যান্ডহোল্ডারগুলো এসেছিল তার সব কটাই ভেড়া। ওদের ভেতর একজনই শুধু কিছুটা বুদ্ধিমান, চালাক চতুর। তবে একগুঁয়ের ওস্তাদ। ওর ওস্তাদি ভাঙবার দাওয়াইও দেওয়া হয়েছে।

খগপতি বেরামশায় নিশ্চয়ই?

আশ্চর্য! তুমিও ওর চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল দেখছি।

মনে মনে বলল ললিতা, উনি আমার পিতৃতুল্য শুধু নন, এমন নির্ভীক উদারপ্রাণ দুর্লভ। মুখে বলল, স্পষ্টবাদিতার জন্য ওঁর সুনাম দুর্নাম দুটোই আছে।

উত্তেজিত হয়ে চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন মি. ঘোষ, এইসব লোকের দাঁত কী করে উপড়ে ফেলে দিতে হয় তা পি. কে. ঘোষ জানে। সবার সামনে ওর মেরুদণ্ডটা গুঁড়ো করে ফেলব আমি।

BanglaBook.org

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘূর্ণি হাওয়ার দাপটে মড়মড় করে সিংহবাড়ির ছাদে ভেঙে পড়ল শিরিষগাছের একটা মোটা ডাল।

শব্দের আকস্মিকতায় চমকে কাত হয়ে অদৃশ্য শক্তির আঘাতের বিরুদ্ধে যেন আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলেন ঘোষসাহেব। মুহূর্তকাল আগে উত্তেজিত মুখখানা তাঁর ভয়ে একেবারে বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেল।

সিংহবাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে তখন ডালপালা ভেঙে গ্রামের পথঘাট অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। চতুর্দিকে ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক।

শেষ রাত থেকে শুরু করে বিরামহীন ঝড়ের শাসানি। ক্রমেই বেড়ে উঠছে ক্রোধ। এখন কান পাতলে ক্রুদ্ধ অন্ধ এক দানবের গোঙানি শোনা যায়। বৃষ্টির চরিত্র বদলে গেছে। তীক্ষ্ণ তিরের ফলার মতো সবেগে ভেদ করছে শরীর। তিনতলার ছাদের কার্নিসের দুর্বল একটা অংশ ভেঙে পড়ল। নীচে হাঁস মুরগির ঘরের ওপর ছিটকে পড়ল ইট আর রাবিশের বড়ো বড় চাঁই। অসহায় কটা জীবের ক্ষীণ আর্তনাদ ঘূর্ণিঝড়ের পাকে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।

সিংহসদনের কাচের শার্সি বন্ধ করার আগেই কয়েকখানা কাচ সশব্দে পাথরের মেঝেতে পড়ে কুচি কুচি হয়ে গেল। ওই পথে গোঙানির ভয়ংকর একটা চিৎকার তুলে যেন ঢুকে পড়ল অন্ধ দৈত্য পলিফেমাস। হাতের কাছে যা কিছু পড়বে তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে যাবে সে। শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর থেকে পড়ে গেল সিংহবাড়ির সংগ্রহশালার বিখ্যাত হারকিউলিস মূর্তি। পড়ে গিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলেন মহাশক্তিধর হারকিউলিস।

নাথুর মা নাথুকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে! গ্রামের প্রান্তে ফাঁকা জায়গায় কুঁড়েটুকু। বাতাসের এখানে অবাধ গতি। কিন্তু নাথুর মা'র সৌভাগ্য চালাখানা উড়ে যায়নি। প্রবল ধাক্কায় বাঁশ-বাখারির খাঁচাসুদ্ধ চালাটা চারদেয়ালের ভেতরে মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়েছে। তাই ছোট্ট কুঁড়েটাতে হাওয়ার দাপট আর টানাটানি কম। তবে চালাটা শুয়ে পড়েছে বলে জল গড়াচ্ছে ভেতরে। নাথুকে নিয়ে নাথুর মা এক কোণে ঝুপড়ির ভেতর বসে আছে। মুখে অন্ন যায়নি। অন্ন পাকের উপায়ও নেই। দুটি কাঁচা চাল হাতে নিয়ে চিবিয়েছে নাথু।

গত রাতে কাজ থেকে ফিরে নাথুর মা নাথুর কাপড়খানা সাজিমাটি দিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল ভোরে ঠিক শুকিয়ে যাবে কাপড়খানা আর তাই পরে নাথু পুজোবাড়ি যাবে। কিন্তু কখন আকাশে নিঃশব্দে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল তা ঘুমন্ত দুটি প্রাণীর কেউই টের পায়নি। ভোরবেলা উঠে ভেজা কাপড় দেখে কান্না জুড়ে দিয়েছিল নাথু। ছেলের কান্না দেখে অসহায় মায়ের চোখ দুটোও ভিজে উঠেছিল। কিন্তু নিরুপায়ে অকরুণ আকাশের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। তারপর ক্রমেই বাড়তে লাগল ঝড়। কয়েক ঘণ্টার ভেতর শুরু হয়ে গেল প্রলয়কাণ্ড।

সন্ধ্যার দিকে ঘূর্ণিবায়ুর চরিত্র বদলাতে লাগল। এখন আর দমকে দমকে হাওয়া আসছে না, ছেদহীন একটানা একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে।

নাথু, নাথুরে...। কে ডাকছে ঝড়ের মধ্যে! অনুকূল বাতাসে মুহূর্তে শব্দটা ঢুকে এল পোড়ো বাড়ির মধ্যে।

ভীত অসহায় নাথুর মা কোনোরকমে গুঁড়ি মেরে বাইরে এসে দেখল গয়ারাম পণ্ডিত পনেরো-বিশজন ছেলেমেয়েবুড়োর একটা দল নিয়ে তাদের পুকুরপাড়ের সরু পথটা ধরে সিংহবাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছেন।

BanglaBook.org

গয়ারাম নাথুর মাকে দেখতে পেয়ে হাঁকলেন, নাথুকে নিয়ে বেরিয়ে এসো এইবেলা। রাত হলে আর পৌঁছতে পারবে না।

সত্যিই তো, যদি দেয়ালটা পড়ে যায়। নাথুকে টানতে টানতে সব ফেলে নাথুর মা বেরিয়ে এল পথে। বুড়ো পণ্ডিত হামা দিয়ে চলেছেন আগে আগে, পিছনে ছোটোখাটো একটি দল।

ভব পণ্ডা গ্রামে-বিগ্রামে যজমানির কাজ করে বেড়ান। বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে তাঁর ডাক পড়ে।

তিনিও ঘর ছেড়ে চলে এসেছেন গয়ারাম পণ্ডিতের দলে। আসতে চাননি প্রথমে, কারণ ব্রাহ্মণী গতকাল গিয়েছেন পাশের গ্রামে তাঁর পিত্রালয়ে। এ ঝড়ের মধ্যে কী দশা হল তাঁর তাই ভেবে সারাদিন কাতর হয়ে মাথার চুল টেনে বুক চাপড়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। শেষে গয়ারাম পণ্ডিতের ঘন ঘন আহ্বানে বিপদ অতি আসন্ন জেনে ব্রাহ্মণী ও গৃহ দুয়ের মায়া ত্যাগ করে আত্মরক্ষার জন্য বেরিয়ে এসেছেন।

ওরা চলতে চলতে বাতাসের প্রবল প্রবাহে পড়ে যাচ্ছে। একে আবার অন্যকে ধরে উঠে দাঁড়াচ্ছে। সিংহবাড়ির এই সামান্য পথটুকুও যেন আর ফুরোয় না।

সিংহসদনের কাছাকাছি এসে গয়ারাম পণ্ডিত একটি অবাক দৃশ্য দেখলেন। আঙুল তুলে সবার দৃষ্টি সেই দৃশ্যের দিকে আকর্ষণ করলেন তিনি। পথের ধারে বিশাল এক শিরীষ গাছ ভূমিশয্যা নিয়েছে। তারই একটি পত্রাচ্ছাদিত ডালে জড়িয়ে আছে একটি বিষধর সাপ। আর ওই ডালের সাপের ফণার ঠিক নীচে কুঁকড়ে সংকুচিত হয়ে বসে আছে সিক্তপক্ষ একটি কাক ও একটি কবুতর। কেউ কাউকে হিংসা করছে না। আক্রমণের চেষ্টাও নেই, আত্মরক্ষার তাগিদও নেই। এক ভয়ংকর পরিণামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সবাই প্রাণভয়ে সংকুচিত, স্তব্ধ।

সন্ধ্যার মুখোমুখি গয়ারাম পণ্ডিতের সম্পূর্ণ সিক্ত, আহত ও কর্দমাক্ত দলটি, জয় মা জগদম্বা, জয় মা জগদম্বা ধ্বনি দিতে দিতে সিংহবাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে প্রবেশ করল।

BanglaBook.org

১২

প্রাত্যহিক রুটিন মাফিক কুড়িটি গোরা সৈন্যকে পাঠানো হয়েছিল খগপতি বেরা মশায়ের এলাকায়। ইন্সপেক্টার শ্রীমন্ত ধর পথ-প্রদর্শক। মি. ঘোষ সিংহসদনে যাবার আগে শ্রীমন্ত ধরকে বলে গিয়েছিলেন, পূজোর দিন বলে নিত্যকর্মে যেন ঢিলে না পড়ে।

অক্ষরে অক্ষরে সে কথা রক্ষা করার জন্য প্রাতরাশের পরেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ধরসাহেব। আবহাওয়াটা সকাল থেকেই বিরূপ। তারই ভেতর ঘনবসতিপূর্ণ পাড়ায় খড়ের ঘরে পেট্রল ছড়িয়ে আগুন ধরানো হল। ঘূর্ণি ঝড়ের পাকে পড়ে সে আগুন মুহূর্তে একটা বিশাল অগ্নিকুণ্ডের আকার নিল। অসহায় মানুষগুলো হাহাকার করতে করতে ছুটে চলল খগপতি বেরা মশায়ের চকমিলানো দোতলা কোঠা বাড়ির দিকে। ওপরে প্রকৃতির তাণ্ডবের সঙ্গে নীচে ইংরাজ শাসকের নির্মম নির্লজ্জ অত্যাচার মিলে গিয়ে এক নারকীয় দৃশ্যপট মেলে ধরল। পুজোর দিনে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট পি. কে. ঘোষের এই অমানুষিক আচরণের দৃশ্য দেখে মা দশভূজার মূর্তির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন খগপতি বেরামশাই।

লঙ্কাদহন শেষ করে সশস্ত্র কুড়িজন ইংরাজ কর্দমাক্ত পথে ভারী বুট টানতে টানতে মি. ধরের পেছন পেছন সমুদ্রের নিকটবর্তী বোগার ডাকবাংলোতে হাজির হল। ওখানেই মধ্যাহ্ন আহারের আয়োজন হয়েছিল। টিনের ছাউনি দেওয়া বাংলোখানা তখন ঘূর্ণি বাতাসের দাপটে ভয়াবহ আর্তনাদ তুলছিল। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল বৃষ্টিপাত। বেলা যতই বাড়তে লাগল বৃষ্টির চরিত্র

বদলে গেল। আকাশে যেন লক্ষাধিক ঘোড়সওয়ার মহাযুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। তাদের হাতের চাবুক শন্ শন্ শব্দে সারা আকাশ কাঁপিয়ে বেজে চলেছে।

বোগার বাংলোতে কোনোরকমে ভোজপর্ব সমাধা করে বসে রইল রাইফেলধারী ইংরাজ-বাহিনীটি। এখন পথে বেরনো অসম্ভব। কে যেন অদৃশ্য লোক থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিপুল শক্তিতে গাছপালার শাখা প্রশাখা ছিন্ন করে পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বেলা বাড়ছে তাণ্ডবও বাড়ছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাবার আগেই চারদিক প্রলয়ের অন্ধকারে ঢেকে গেল।

রাইফেলগুলো একঠাঁই জড়ো করে পরস্পর গায়ে গা ঠেকিয়ে নির্বাক বসে রইল ওরা। এতদিন যারা শক্তির আস্ফালন দেখিয়ে এসেছে তারা অদৃশ্য মহাশক্তিমানের অলৌকিক শক্তির স্পর্শে ভীত সন্ত্রস্ত কবুতরের মতো কাঁপতে লাগল।

সন্ধ্যার মুখোমুখি বাংলোর দরজায় কারা যেন ধাক্কা দিচ্ছে বলে মনে হল। মি. ধর পাঁচ ব্যাটারির টর্চখানা টিপলেন। রাঁধুনি দরজা খুলে দিতেই প্রচণ্ড হাওয়ার স্রোতের সঙ্গে কয়েকটা ষণ্ডাচেহারার মানুষ ঘরের ভেতর যেন আছড়ে পড়ল। এই আকস্মিকতায় আর্ত একটা চিৎকার উঠল গৃহবন্দি মানুষগুলোর ভেতর। পরক্ষণে ওরা নিজেদের এই দুর্বলতায় বিশেষভাবে লজ্জিত হয়ে লোকগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

মি. ধরও এই আবির্ভাবে আচমকা একটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এখন লোকগুলোকে দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। তিন-চারজন মিলে বাতাসের বিরুদ্ধে দরজার পাল্লা ঠেলে বন্ধ করল।

কী চাই তোমাদের?—ভাঙা গলায় কৃত্রিম জোর এনে প্রশ্ন করলেন মি. ধর।

ওদের ভেতর একজন বলল, আজ্ঞে হুজুর, খগপতিবাবু আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনারা গাঁ থেকে বোগার দিকে এলেন কিন্তু এতক্ষণ লঞ্চের দিকে ফিরলেন না দেখে বাবুমশায় বড়ো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন! ঝড়ের গতিক ভালো নয়। তাই বোগার বাংলোর আশ্রয়টা নিরাপদ নয় ভেবে তিনি আমাদের এখানে পাঠালেন। পুজোর দিনে যদি আপনারা তাঁর কোঠাবাড়িতে আশ্রয় নেন তা হলে তিনি আশ্বস্তবোধ করবেন। বিপদের মুখে তাঁর এলাকায় এসে আপনারা বিপন্ন হবেন তা তিনি চান না।

মি. ধর সন্দিগ্ধ চোখে লোকটির দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কী করেন?

প্রাইমারি ইস্কুলের শিক্ষক স্যার।

মি. ধর চোস্ত ইংরেজিতে আর্মড্ ফোর্সের লোকদের বুঝিয়ে বললেন ঘটনাটা।

তারা তো স্তম্ভিত। যে মানুষদের ঘরবাড়ি এই কয়েকঘণ্টা আগে জ্বালিয়ে এসেছে, তারা কী করে তাদের আশ্রয় দেবার আমন্ত্রণ জানায়! ওরা এই আশ্রয়ের ভঙ্গুরতা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছিল তাই নিরাপদ আশ্রয়ের আমন্ত্রণে উল্লসিত হল। কিন্তু তাদের বাধা দিলেন মি. ধর। এতে উল্লসিত হবার কিছু নেই। এ অঞ্চলের লোকদের বিশ্বাস করা কঠিন। এই কিছুদিন আগেও তারা বারোখানা বন্দুক আর্মড ফোর্সের হাত থেকে ম্যাজিকের মতো ছিনিয়ে নিয়েছিল। তা ছাড়া নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সে সেপাইদের দিয়ে উত্তম মধ্যম ধোলাই দিয়েছিল খগপতি বেরাকে। লোকটা কি আর বাগে পেয়ে প্রতিশোধ নেবে না। এই আশ্রয় দানের ব্যাপারটা যে মস্ত বড়ো একটা ফাঁদ নয় সে কথা কে বলবে।

আমি বলছি স্যার, খগপতিবাবু অত্যন্ত বিবেচক মানুষ। তাঁর এই আমন্ত্রণকে সন্দেহের চোখে দেখার কিছু নেই।

মি. ধর বললেন, তুমি দেখছি ভালোই ইংরেজি বোঝো মাস্টার। তবে আমাদের ভালো-মন্দটা আর বোঝার চেষ্টা কোরো না, তা হলে তোমাকেই এখানে সারারাত আটক থাকতে হবে।

BanglaBook.org

অগত্যা আবার দরজা খোলা হল। ঝড়ের অন্ধকারে আমন্ত্রণকারী কটি মানুষ প্রচণ্ড বিপদ মাথায় নিয়ে হামা দিয়ে গ্রামের দিকে এগোতে লাগল।

হঠাৎ ওরা পেছন দিকে একটা শব্দ শুনতে পেল, কিন্তু তখন বাংলোতে ফিরে যাবার উপায় ছিল না। প্রবল হাওয়া তাদের প্রায় গ্রামের দিকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছিল।

বোগার বাংলোর টিনের চালা একটা দমকা হাওয়ায়, ঝড়ের মুখে পড়া পাখির মতো বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আবরণহীন ঘরে নেমে এল আকাশের যত বৃষ্টি।

কিন্তু মহাপ্রলয়ের তখনো বাকি ছিল। সমুদ্রের উত্তাল জলস্তম্ভ ভেঙে পড়ল বিপুল গর্জনে। আর সেই প্রচণ্ড জলরাশি প্রবল আক্রোশে প্লাবিত করে দিল সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল।

পরদিন দেখা গেল বোগার বাংলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সমুদ্রের প্লাবনে ভেসে গেছে পি. কে. ঘোষের পাঠানো সমস্ত বাহিনীটি। মানুষের আস্ফালনকে মহাসমুদ্র নিঃশব্দে গ্রাস করে নিয়েছে।

সারা ভুবন অন্ধকার দেখছে কানা ভুবন মিশ্র। শুকনো ডাবের খোলার মধ্যে টাকা পুরে যে মানুষটা বাইরের উঠোনে ফেলে রাখত, বাঁশের শুকনো পাবের মধ্যে নোট পুরে যে চালে গুঁজে রাখত, সে মানুষটা বান্ডিল বান্ডিল টাকার নোট নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। সারাদিনে একমুঠো চিঁড়ে চিবিয়ে কোনোরকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে ভুবন, কিন্তু মন তার ছিল না আহারে। কী করেই বা নোটগুলোকে এই প্রবল ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবে, তাই ভাবতে ভাবতে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ল সে।

প্রলয়ের দিনে পুত্রকন্যাকে মানুষ যেমন করে দুহাতের আলিঙ্গনে বেঁধে কোলে বুকে জড়িয়ে রাখে ঠিক তেমনি করে সারা ঘরময় ওই ডাবের খোলা, বাঁশের পাব জড়ো করে তারই মাঝখানে হাত আর বুক চেপে পড়ে রইল কানা ভুবন। খালের পাড়ে গামাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা বাসন-কোসনে ভরতি বস্তাগুলো খালের জলের তলায় ক্রমাগত পাক খেতে লাগল।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে কানা ভুবনের চালের আদ্দেক উড়ে গিয়ে আকাশ ভাঙা বর্ষা প্রপাতের মতো নামতে লাগল। এদিকে অন্ধকারে ফুলে ফেঁপে নদীর আকার ধারণ করল অল্প পরিসর খালটা। ভুবন মিশ্র জলে-কাদায় মাখামাখি হয়ে একটা ভাসমান কাঠের গুঁড়ির মতো লম্বা হয়ে পড়ে রইল মেঝেতে।

রাতে ঘূর্ণিঝড়ের পরিচিত সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে একটা সম্পূর্ণ অচেনা আওয়াজ আতঙ্কিত মানুষের কানে এসে বিঁধল। শত শত শঙ্খধ্বনির মতো সে আওয়াজ একটানা বেজে চলল কতক্ষণ। তারপর গুম গুম একটা ধ্বনি। শেষে ছলাৎ ছল্ আওয়াজ তুলে সমুদ্রের দিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল লক্ষ লক্ষ জল-নাগিনী। মাটির দেয়ালগুলো ওদের তীব্র গতির স্পর্শ লেগে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে খসে ধসে গেল। খড়ের চালাগুলোর বাঁধন ছিঁড়ে গেল ওদের ঘূর্ণির ভয়ংকর পাকে। বাতাসের হা হা ধ্বনির সঙ্গে মিশে গেল অসহায় ডুবন্ত প্রাণীর আর্ত হাহাকার। প্রায় নিঃশব্দ একাকী যুদ্ধ করতে করতে ভয়ংকর পরিণামের অতলে তলিয়ে যেতে লাগল শত শত অসহায় প্রাণ।

১৩

ভোর হল। কখন শেষ হয়ে গেছে রাত্রির তাণ্ডব। আকাশ নির্মল নীল। নিঃশব্দ চরাচর। শরতের শান্ত স্নিগ্ধ প্রত্যহের পরিচিত বায়ুপ্রবাহ। কেবল চরাচর উন্মুক্ত। বৃক্ষলতার বন্ধনী ঘেরা গ্রামের চিহ্ন লুপ্ত। ধূ ধূ প্রসারিত দিগন্তের মাঝে কেবলমাত্র সীমাহীন সমুদ্র। তার প্রান্ত ছুঁয়ে রক্তাক্ত একটা গোলক ছিটকে ওপরে উঠে এল। যার নাম তিমিরবিনাশী সূর্য।

BanglaBook.org

অবিরাম জলস্রোত বয়ে চলেছে। তার সঙ্গে মিশে গেছে জনস্রোত। সংগ্রাম-পরাস্ত মানুষ, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতার প্রাণহীন দেহ স্রোতের টানে ভেসে চলেছে দিগন্ত অভিমুখে। যেসকল মানুষ সারারাত্রি সংগ্রামের পর নিজেদের অস্তিত্বকে কোনোরকমে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে তারা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে, শেষ সংগ্রাম চালাচ্ছে স্রোতের সঙ্গে। আত্মরক্ষার তাগিদে কোনো কোনো বলিষ্ঠ পুরুষ বৃক্ষারোহণ করেছিল। তারা সরল অথচ দৃঢ় কাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষে নিজেদের শক্ত বাঁধনে বেঁধে ফেলেছিল। ভোরের আলোয় দেখা গেল তাদের প্রায় উলঙ্গ শবদেহগুলি ঝুলছে। লোহার শলাকার মতো বৃষ্টির চাবুকে তাদের সারা দেহ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত।

সিংহবাড়ির সামনে স্রোত ঠেলে ঠেলে এসে পৌঁছল একটি দল। অর্ধনগ্ন, দীর্ঘ রাত্রি জলের স্পর্শে থেকে কুঞ্চিত চর্ম। কারু কারু মাথায় সামান্য সামগ্রী, জলের গ্রাস থেকে যা রক্ষা পেয়েছে। একটি কিশোর বুক জল ঠেলে এগিয়ে আসছিল। তার কাঁধের ওপর একটি কুকুরের ছানা। কিশোরটি বহু কষ্টে বাচ্চা কুকুরটিকে নিয়ে উঠে এল সিংহবাড়ির প্রধান ফটকের সামনে। একটি উঁচু সোপানের ওপর কুকুরটিকে রেখে সে হাঁফাতে লাগল।

হঠাৎ পিছন থেকে বাঘের মতো গর্জে উঠল বকশি সাধুচরণ, ভাগ ভাগ শালা। নিজে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে।

কিশোর ছেলেটি হতচকিত হয়ে ভীতিবিহ্বল চোখে চেয়ে রইল সাধুচরণের দিকে। এবার সাধুচরণ এগিয়ে এসে একটা মোক্ষম লাথি কষাল নিরীহ কুকুরছানাটিকে। আর্তচিৎকার করে অসহায় জীবটি ছিটকে পড়ল জলে। কিশোর ছেলেটি অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল স্রোতের মাঝে। সে কয়েক গজ দূরে জলের ভেতর থেকে অক্ষম সাথীটিকে তুলে নিল। এখন কোথায় যাবে সে? সামনে রাজবাড়ির আশ্রয় কিন্তু এই জীবটিকে নিয়ে সেখানে দাঁড়াবার উপায় নেই। স্রোতের টানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কুকুরছানাটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে কাঁদতে লাগল। যখন সকলে নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত তখন কিশোরটি তার নিজের প্রাণের চেয়ে একটুও কম মূল্যবান ভাবতে পারছে না এই অবলা জীবটির ক্ষুদ্র প্রাণটুকুকে।

সিংহদরজার সামনে আশ্রয়প্রার্থীদের পাশ কাটিয়ে এসে দাঁড়াল ললিতা সিংহর খাস দাসী গোলাপি। তার সঙ্গে একটি পরিচারক। চাকরটি সঙ্গে সঙ্গে জলে নেমে গিয়ে কুকুরছানার সঙ্গে কিশোরটিকে টেনে আনল।

ঘাঘিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সাধুচরণ, আস্পর্ধা তো কম নয়, আমাকে ডিঙিয়ে—

জোঁকের মুখে নুন ছিটিয়ে দিল গোলাপি। চাপা গলায় বলল, খুব হয়েছে, তড়পিয়ো না আর। বউরানি ওপর থেকে সব দেখেছেন। ছেলে আর কুকুর দুজনকে এখন ওপরে তুলে নিয়ে যেতে হবে।

রাগে ক্ষোভে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল নিরুপায় অপমানিত সাধুচরণ। মনে মনে সেই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করল, সাধুচরণ বকশি যদি বাপের ব্যাটা হয় তা হলে এ অপমানের বদলা নেবেই নেবে।

১৪

ঘূর্ণিবাত্যা আর সমুদ্রের ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস সমস্ত অঞ্চলটাকে পলিমাটির একটা শূন্য প্রান্তরে পরিণত করে দিয়ে গেল। কিছুদিন আগে শরতের যে সবুজ খেত চোখের উৎসব ছিল তার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না কোথাও। এককণা শস্য নেই। সমুদ্রের জলপ্রবাহে ভেসে গেছে মানুষের সমস্ত সঞ্চয়। শুরু হয়ে গেল হাহাকার। ধনীর সঞ্চয়ের সিংহভাগ ভেসে গেছে। সামান্য সঞ্চয়ে তাদেরই দিন চলা ভার। এই বিপুল দরিদ্র মানুষগুলোর মুখে কে জোগাবে অন্ন? যেসব মানুষের অর্থ খরচের সামর্থ আছে তারা সে অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারছে না প্রয়োজনীয় শস্যকণা। এদিকে এই

BanglaBook.org

দুর্দিনের খবর প্রায় এক পক্ষ কাল প্রচারিত হল না সংবাদপত্রে। ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর ইচ্ছা করে চেপে গেলেন সংবাদ। আত্মতৃপ্ত জেলাশাসক বললেন, উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে বিদ্রোহীরা। এ অঞ্চলের মানুষদের সাহায্য দেবার কোনো অর্থই হয় না।

তবু সাহায্য এল। মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছিল সমুদ্রতীরবাসী এই স্বাধীনচেতা মানুষগুলোর জন্যে। তাঁরই চেষ্টায় বিশেষভাবে শুরু হল বিপন্ন অঞ্চলে ত্রাণকার্য।

কিন্তু আশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটল। খেজুরি থানার পশ্চিম প্রান্তে সরকারি রিলিফ বন্টনের দায়িত্ব নিয়ে এলেন খাসমহল ম্যানেজার মি. দাশগুপ্ত। দলে দলে ভুখা মানুষ ছুটল সেদিকে। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে তারা এসে পৌঁছল নির্দিষ্ট স্থানে। কতদিন সামান্য শাকপাতা সেদ্ধ করে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তারা। আজ একমুঠো ভাতের গন্ধ পাবে। খিদের জ্বালায় কাতর সন্তানের মুখে তুলে দিতে পারবে একটু ফেন, একমুঠো ভাত। কঙ্কালসার দেহগুলো আশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কোটরগত চোখগুলো জ্বলতে থাকে।

হঠাৎ একটা কথার স্ফুলিঙ্গ কে যেন জ্বেলে দিল ভুখা মানুষগুলোর মাঝে। অমনি দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আত্মাভিমানের আগুন। না খেয়ে মরতে হয় তাও ভালো তবু তারা রিলিফ নেবে না এই অফিসারের কাছ থেকে। এই তো কিছুদিন আগে থানা অধিকার করতে গিয়েছিল আন্দোলনকারীরা। ওই অফিসারটিই তো সেদিন নিরস্ত্র জনতার ওপর চালিয়েছিল গুলি। না, প্রাণ যায় তবু মান দেবে না।

এদিকে রিলিফ না নেবার জন্য শুরু হয়ে গেল অত্যাচার। বেত্রাঘাতে, বন্দুকের ভয়ে মানুষ জর্জরিত হল। সহসা ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো সেবার দায়িত্বভার নিয়ে এসে পড়ল রামকৃষ্ণ মিশন।

ললিতা সিংহ তার শেষ সঞ্চয়টুকুও বিলিয়ে দিচ্ছিল গ্রামের সম্বলহীন মানুষগুলোর জন্য। মণিশঙ্কর নিয়েছিলেন বিতরণের ভার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বন্যার স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি ললিতা সিংহের গোলার ধান।

মণিশঙ্কর সিংহ পরিবারের সমস্ত জমি-জায়গা সাময়িক ভাবে গ্রামের মানুষের ভেতর বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বন্যার পলিতে সামান্য প্রচেষ্টায় তৈরি হতে লাগল প্রচুর তরি-তরকারি। একমুঠো অন্ন ও কিছু পরিমাণ ফেনের সঙ্গে সেই তরি-তরকারি খেতে লাগল বুভুক্ষু গ্রামবাসী।

প্রতি মুহূর্তে জ্বলতে লাগল একটা মানুষ। এই অসময়ে মণ মণ ধান বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রামবাসীদের ভেতর। হায়! হায়! এককণা ধানের মূল্য আজ এক ভরি সোনার চেয়েও দামি। সেই ধান্যলক্ষ্মীকে কিনা বিনা মূল্যে বিতরণ! না, আর নয়। এখুনি বিহিত করা দরকার।

সাধুচরণ মুসাবিদা করল চিঠিখানা। সে নিজের হাতে লিখে জানাবে না, কিংবা নিজের মুখে গিয়েও বলবে না। অতি দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে তারই হস্তাক্ষরে চিঠিখানা নকল করিয়ে আনল। চিঠি পাঠাল ছদ্মনামে।

মহামহিম ন্যায়বিচারক প্রজাপালক হুজুর, আপনার শ্রীচরণ সমীপে অধীনের বিনীত নিবেদন এই,—এতদঞ্চলে আপনার আগমনের পর স্বদেশি ডাকাতরা কিছু ধৃত, কিছু কারাগারে নিক্ষিপ্ত, কিছু বা আত্মগোপন করিয়াছে।

আপনার সমীপে এ অধম জানাইতে চাহে যে ওই সকল আত্মগোপনকারীদের বড়ো ভরসার স্থল সুবদি গ্রামের সিংহবাড়ির ললিতাদেবী। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ যিনি কাজ করিতেছেন তিনি আর কেহ নহেন, ওই গ্রামের ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মণিশঙ্কর গিরি। হুজুরের মালবোঝাই দুখানি নৌকা ভস্মীভূত হইবার ঘটনাটি নিশ্চয় স্মরণে আছে। ওই নৌকাতে যে কিশোর গুলিবিদ্ধ হইয়া মারা যায় সে আর কেহ নহে ওই প্রধান শিক্ষক মহাশয়েরই পুত্র।

BanglaBook.org

একটা মানুষকে প্রায়ই জ্যোৎস্না রাতে অথবা খর দুপুরে খাল পাড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়—পরনে শতছিন্ন একটুকরো কাপড়। সে কখনো ধীরে হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করে, আবার কখনো শূন্যে দুটো হাত তুলে 'টাকা টাকা' বলে লাফ দিতে দিতে ছোটে।

গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই জানে ও কানা ভুবন। বন্যার স্রোতে সর্বস্ব খুইয়ে ও উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, সব হারিয়েও এই মুহূর্তে ওর আর কোনো দুঃখবোধ নেই। শুধু একটা অভ্যাসের বসে ও 'টাকা টাকা' বলে মহাশূন্যে টাকার সন্ধান করে বেড়ায়।

সংসার চলে না নাথুর মায়ের। ধান নেই কারো ঘরে তাই ধান ভানার প্রশ্নও নেই। বনবাদাড় ঢুঁড়ে কোনদিন কচু তুলে আনে। কোনদিন পুকুর ডোবা সাঁতরে তুলে আনে শালুক। তাই সেদ্ধ করে মায়ে-পোয়ে খায়। সেই রানিমা চলে যাবার পর থেকে আর ভাতের মুখ দেখেনি। দাতব্য বন্ধ করে দিয়েছে সাধুচরণ বকশি। হুটপাট করে খেতখামার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে গাঁয়ের মানুষগুলোকে। একবার আশকারা পেয়ে গেলে মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসবে। হঠাও শালাদের, আর তরকারি ফলাতে হবে না।

যাবার সময় কোনো আদেশ দিয়ে যেতে পারেনি ললিতা সিংহ। বড়ো তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়েছে। শুধু বলেছে, বকশিবাবু, সবকিছু রইল। দেখবেন।

আলবত দেখবে সে। দেখার জন্যেই তো সে এখানে আছে। সঞ্চিত বাকি ধানগুলো সে রাতের অন্ধকারে অনেক চড়া দামে বিক্রি করতে লাগল। এদিকে খয়রাতি খাতে বসাতে লাগল মিথ্যা নাম আর ধানের পরিমাণ।

তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল দেশজুড়ে মন্বন্তর। যুদ্ধের সময় সরকারি প্রয়োজনে সঞ্চিত খাদ্যশস্য দেশের ভেতর থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছিল ইস্পাহানি কোম্পানি। প্রয়োজনের সময় দেশের মানুষ তা আর ফিরে পেল না। অগ্নিমূল্যে অন্ধকারে সে খাদ্যশস্য বিক্রি হতে লাগল। যুদ্ধের বাজারে ফুলে ফেঁপে উঠছিল কনট্রাক্টরদের কাজকর্ম। কাঁচা টাকা, কাগজি নোট তখন একশ্রেণীর ফিকিরবাজ মানুষের হাতে অঢেল এসে যাচ্ছে। বাজারের দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেল দেখতে দেখতে। সাধারণ মানুষ এই অবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়ল। তাদের হাতে এমন টাকা ছিল না যা দিয়ে তারা সংসার চালাবার মতো খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারে।

তখন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেরুল ভুখা মিছিল। মহানগরী চিরদিনই সাধারণ মানুষের কাছে স্বর্গরাজ্য!—চলো কলকাতা। সেখানে যে করে হোক একমুঠো খাদ্য জুটবে দিনান্তে। এই মরীচিকার লোভে মিছিল এগিয়ে চলল রাজধানীর দিকে। পিছনে পড়ে রইল ছোটো ছোটো আলবন্দি খেতখামার, সবুজ গাছ-গাছালির নীচে খড়-পাতায় ছাওয়া সারি সারি কুঁড়েঘর। এখন স্বপ্নের পিছু ছোটা নয়, নির্মম বাস্তবের টানে এগিয়ে চলা। হাতে একটি করে ঊর্ধ্বমুখী পাত্র। মুখে ক্ষীণ অথচ অবিরাম উচ্চারিত কয়েকটি শব্দ—'মাগো ফ্যান দাও, একটু ফ্যান।'

সমুদ্রের সাইক্লোনে বিধ্বস্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত এই ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের ওপরেও এসে পড়ল সারা দেশব্যাপী মন্বন্তরের প্রভাব। বাতাসে ভেসে এল আহ্বান—চলো, রাজধানী চলো।

কঙ্কালসার মানুষগুলো নাথুর মা'র ঘরের সামনে দিয়ে চলে যায়। পরনে শতছিন্ন ময়লা কাপড়, হাতে একটি করে পাত্র। ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী, সব বয়সের চর্মসার বুভুক্ষু নরনারী। নাথুর মা ওদের ভেতর দু-একটি মুখ চিনতে পারে কিন্তু বাকি সব অপরিচিত। কত গ্রাম গ্রামান্তর পার হয়ে তারা চলেছে মহানগরীর পথে।

কয়েকদিনের ভেতর নাথুর মায়ের চোখে অপরিচিত বলে আর কিছু রইল না। ভুখা মিছিলের সবকটি মুখই তার কাছে অবিকল এক বলে মনে হতে লাগল।

BanglaBook.org

শত কষ্টেও ঘর ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে যেতে চাইল না নাথুর মা। সামনে মহানগরীর বিরাট প্রলোভন, কিন্তু সে প্রলোভনকেও অসীম মানসিক শক্তিতে উপেক্ষা করতে লাগল সে।

১৫

একদিন শ্মশান-পুকুরের অন্ধিসন্ধি তোলপাড় করে নাথুর মা কয়েকটা শালুক-নাল পেয়েছিল। তাই নিয়ে সে আসছিল ঘরের পথে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল পাঠশালার কাছে এসে। কে যেন পাঠশালার ভেতর ঝাঁট দিচ্ছে। ঝাঁটার খর্‌খর্‌ আওয়াজটা ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে।

নাথুর মা বাঁশের ভেজানো দরজাটা ঠেলে উঁকি দিল। একী! পণ্ডিতমশায় মেঝেতে বসে নিজেই মুড়ো একটা ঝাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝাঁট দিচ্ছেন।

নাথুর মা ক্ষীণ গলায় বলল, বাবা আপনি এখানে একা একা কী করছেন?

হাতের ঝাঁটা থামিয়ে পণ্ডিত গয়ারাম মুখ উঁচিয়ে মানুষটাকে চেনার চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ হয়ে বললেন, কে?

আমি নাথুর মা।

এতক্ষণে কথাটা কানে ঢুকল গয়ারাম পণ্ডিতের। বললেন, গাঁ তো খাঁ খাঁ, তুমি এখনো পড়ে আছ?

কী করি বাবা, ছেলেটা যে গাঁ ছেড়ে একটি পা-ও নড়তে চায় না।

পণ্ডিতমশায় বললেন, খাচ্ছ কী?

শালুক ভেটুক, শাকপাতা যা পাই সেদ্ধ করে খাই।

কী আকাল? কী আকাল! আচ্ছা, বড়োবাড়িতে তুমি যেন কী একটা কাজ করতে না? সেখানে কিছু পাও না?

বউরানিকে ফাটকে ধরে নিয়ে গেল আর বকশিবাবু একটা ঝি রেখে সব কটাকে বিদেয় করে দিলেন।

কিছু সময় নীরবতার পর নাথুর মা বলল, আপনার কী করে চলছে এখন?

তুমি তো জানো মা আমার সংসার বলে কিছু নেই। ভুতো আর হারু বলে দুটো ছেলে থাকত আমার কাছে। ডাঙা জমিটুকু কুপিয়ে কুমড়ো বেগুন ফলাত। এখন এ তল্লাটে ধান চাল কিছু নেই তাই ভাতের খোঁজে দেশ ছেড়ে শহরে চলে গেছে।

আপনার কাছে থেকে খেয়ে মানুষ হয়েছে তবু আপনাকে ছেড়ে পালাল বাবা!

দোষ দিয়ে লাভ নেই বাছা, আমিই ওদের ছেড়ে দিয়েছি, বুড়োকে একা ফেলে রেখে ওরা কেউই যেতে চায়নি। কিন্তু আমি তো জানি, দেহ একটা আগুনের কুণ্ড। ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছে আর লক্‌লকে জিভ বের করে বলছে, দাও-দাও-দাও। খিদের জ্বালায় ওরা জ্বলছিল। পথ দিয়ে কাতারে কাতারে লোক শহরের দিকে গেলেই ওরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকত। আমিই একদিন ওদের ঠেলে পাঠালাম মিছিলের সঙ্গে। এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে মরতে হবে, তার চেয়ে অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখুক বাঁচতে পারে কিনা।

উত্তেজনায় এতখানি কথা বলে হাঁফাতে লাগলেন পণ্ডিতমশায়।

নাথুর মা এগিয়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে বলল, বাবা আপনি সরে বসুন, আমি ঝাঁট দিয়ে দিচ্ছি।

পণ্ডিত গয়ারাম বললেন, চোখে ভালো ঠাওর হচ্ছে না আজকাল, তুমি মা পুকুর ঘাট থেকে যদি কলসিটা ভরে এনে দাও তা হলে বড়ো উপকার হয়। জানো তো, কলসিটা আমার শোবার ঘরেই থাকে।

BanglaBook.org

হুজুর যদি আকস্মিক ভাবে মণিশঙ্করের তোরঙ্গ ইত্যাদি অন্বেষণ করেন তাহা হইলে চিঠিপত্রাদি হইতে সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। অধীনের বিনীত নিবেদন ও আকুল প্রার্থনা, অধমের স্বাক্ষরিত নামটি যেন প্রকাশিত না হয়।

শ্রীচরণারবিন্দে সেবক
যুধিষ্ঠির মহাপাত্র।

আশ্চর্য কৃতিত্ব সাধুচরণের। এক ভোর রাতে কয়েকজন গোরা সৈন্য আর দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ স্কুলবোর্ডিং ঘিরে ফেললেন ঘোষসাহেব। মণিশঙ্করের তোরঙ্গ থেকে বেরুল কয়েকখানা চিঠি আর একখানা ডায়েরি। চিঠির ভেতর তিনখানা যে ললিতা সিংহের হাতের লেখা তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না পলাশকান্তি ঘোষের। ওই নৌকো পোড়ানোর ইঙ্গিতবাহী চিঠিখানাও তার মধ্যে ছিল।

মণিশঙ্করের ডায়েরিতে আরও অনেক তথ্যই পাওয়া গেল। অনেক নাম, অনেক সাহায্যের হিসাব।

ঘোষসাহেব থানার দারোগাবাবুর হাত থেকে একটা লকেটওলা হার নিয়ে মণিশঙ্করের চোখের সামনে তুলে ধরে বললেন, ভালো করে দেখুন তো মাস্টারমশায় হারখানা চিনতে পারেন কিনা?

মণিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না পারবার কোনো কারণ নেই। এটি শ্রীমতী ললিতা সিংহের গলায় হার।

দারোগার দিকে অর্থপূর্ণ চোখে চেয়ে বললেন মি. ঘোষ, তা হলে লোকটা দেখছি মিছে কথা বলেনি।

একটা লোক কাঁচুমাচু হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। মি. ঘোষ হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন। লোকটা কাছে এলে মণিশঙ্করকে বললেন, এই শয়তানটাকে চেনেন?

মণিশঙ্কর বললেন, শয়তান কিনা জানি না, তবে বাজারে দু-চারবার মানুষটিকে দেখেছি বলে মনে হয়।

মি. ঘোষ আবার বললেন, এর ব্যবসা হল চোরেদের দামি মালপত্র নিজের হেফাজতে রাখা। দারোগা একটা তল্লাসি চালাতে গিয়ে এই দামি হারটা পেয়ে গেছে ওর কাছে। এল. এস. খোদাই লকেট দেখে ওর সন্দেহ হয়। জেরার জবাবে ও বলে, ভুবন মিশ্র বলে কে একজন লোক ওর কাছে নাকি হারটা গচ্ছিত রেখেছিল। সেই ভুবনই নাকি ওকে বলেছিল, আপনি হারখানা ভুবনের কাছে বন্ধক রেখে গেছেন।

একটু থামলেন ম্যাজিস্ট্রেট মি. ঘোষ। তাঁকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে মণিশঙ্কর বললেন, একেবারে খাঁটি কথা বলেছে লোকটি। হারটা আমিই ভুবন মিশ্রের কাছে বন্ধক রেখেছিলাম। ভুবন মিশ্র সম্প্রতি উন্মাদ রোগে ভুগছে, না হলে তাকে ডেকে পাঠালেই সত্যতা যাচাই করা সহজ হত।

মি. ঘোষ বললেন না মাস্টারমশাই আমি আপনার কথায় অবিশ্বাস করছি না। কেবল জানতে চাই ললিতা সিংহের হার আপনি ভুবনের কাছে বাঁধা রাখতে গেলেন কেন?

সেটার উত্তরও কি দিতে হবে?

দিলে একটা সূত্র পাওয়া যেত।

মণিশঙ্কর হেসে বললেন, চিঠিপত্র থেকে অনেক সূত্রই তো পেলেন। আরো চাই।

আমরা সব রকম প্রমাণই জড়ো করতে চাই।

ললিতা সিংহের হার বাঁধা রেখে টাকা নিয়ে যেসব পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাদের সংসারের প্রত্যেকেই এখন দেশের কাজে জেল খাটছে।

BanglaBook.org

শ্লেষের হাসি হেসে বললেন মি. ঘোষ, দারুণ মহানুভবতা আপনাদের। স্কুলে গভর্নমেন্ট এড নিশ্চয়ই পান?

পাই।

তা হলে সেই সাহায্যদাতা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করছেন কোন যুক্তিতে?

মণিশঙ্কর বললেন, সাহায্যের টাকাটা সরকারের নয় দেশবাসীর। সরকার টাকাগুলো গচ্ছিত রেখে বিতরণ করেন মাত্র।

ছেলেদেরও এইসব শেখান নিশ্চয়ই?

যে কোনো ভালো শিক্ষাই মানুষকে যুক্তিনিষ্ঠ আর সচেতন করে। দেশ সম্বন্ধে তাদের সবকিছু জানা উচিত নয় কি?

বেশ। তা হলে এখন কিছুদিন ওরা যে সব শিখেছে তা হজম করুক। শিক্ষাদাতা হিসেব আপনারও কিছু নতুন অভিজ্ঞতার দরকার আছে।

মণিশঙ্কর কী উত্তর দেবেন এ কথার। তিনি চুপ করে রইলেন।

আবার জিজ্ঞেস করলেন মি. ঘোষ, অন্তু নামের ছেলেটি কি আপনার?

হ্যাঁ।

আপনার কি ওই একটি ছেলে না ওর মতো আরো আছে?

মণিশঙ্কর মুখে হাসির রেখা টেনে বললেন, ওর মতো অ-নে-ক আছে মি. ঘোষ।

গম্ভীর গলায় ঘোষসাহেব বললেন, পিতা হিসেবে দেখছি আপনি খুবই কৃতী।

মণিশঙ্করকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল। খবরটা গ্রামের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুতের মতো। সেই সকালেই দলে দলে মানুষ নীরবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে পথে ভিড় করে এল।

পরম কর্তব্যনিষ্ঠ সরকারি অফিসার ঘোষসাহেব কিন্তু এখানেই থেমে রইলেন না, সিংহসদনেও হানা দিলেন।

আশ্চর্য, ইতিমধ্যে ললিতা সিংহ এসে দাঁড়িয়েছে প্রধান ফটকের সামনে। মি. ঘোষকে দেখে হেসে বলল, আমি তৈরি মি. ঘোষ।

দুঃখিত আজ আমি কর্তব্য করতে এসেছি ললিতা।

ললিতা নয় মি. ঘোষ, আমি মিসেস সিনহা।

মণিশঙ্কর আর ললিতা দুজনে এগিয়ে চলেছে। পাশে বন্দুক উঁচিয়ে চারজন গোরা সৈন্য। সবার আগে গম্ভীর মুখে চলেছেন মি. ঘোষ।

হঠাৎ নিস্তব্ধ জনতার নীরব অভিনন্দনের মাঝে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন মণিশঙ্কর। নিচু হয়ে তাঁর পাঠশালার পণ্ডিতমশায়ের পায়ের ধূলি নিলেন। ধরা গলায় বললেন, আমি আর অন্তু দুজনেই আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে বসে পাঠ গ্রহণ করেছি। দুই পুরুষ আপনার ছাত্র। আজ আমি আছি সে নেই পণ্ডিতমশায়।

ধমকে উঠলেন পণ্ডিত গয়ারাম। ধমকটা হাহাকারের মতো শোনাল—

নেই মানে! আলবত আছে। ও আবার কখনো হারায়? ও আমার সেতুবন্ধের কাঠবেড়ালি। ভারতবর্ষের রামায়ণেও অমর হয়ে থাকবে রে, অমর হয়ে থাকবে।

BanglaBook.org

নাথুর মা ঝাঁট দিতে দিতে বলল, বাবা পাঠশালা তো বন্ধ, আপনি ভাঙা শরীরে ঘর ছেড়ে এসে ঝাঁট দেন কেন?

এখানে যে আমার মা বাস করেন গো। তাঁর থাকার জায়গায় কি ধুলো জমিয়ে রাখতে আছে? আর তা ছাড়া মায়ের এই ছোট্ট কুট্‌রিটা থেকে কত ছেলেই না পড়াশুনা করে বেরিয়ে গেল। মায়ের কত আশীর্বাদ তারা পেয়েছে। এ মাটিকে কি মলিন রাখতে পারি মা।

ঝাঁটপাট শেষ করে কলসিতে জল ভরে এনে পেছনে পণ্ডিতমশায়ের ঘরে রেখে দিয়ে এল নাথুর মা। যাবার সময় বলল, আমি যতদিন বেঁচে আছি আপনার পাঠশালায় এসে ঝাঁট দিয়ে যাব বাবা।

পণ্ডিত গয়ারাম বললেন, তা করতে এসো না মা। তুমি তো জানো বিনি পয়সায় কোনো কাজ আমি কাউকে দিয়ে করাই না। সুদিন এলে ঠিক তোমাকে ডেকে পাঠাব।

নাথুর মা মানুষটিকে চেনে তাই বেশি কিছু বলতে পারল না। সে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই পণ্ডিতমশায় বললেন, নাথুর মা, অনেক কষ্টে একটা কুমড়ো লোকের চোখের আড়ালে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। ওটা আমার খাটের তলায় আছে। আজই কাটব বলে ভাবছিলাম। তুমি ওটা কেটে আধখানা নাথুর জন্যে নিয়ে যাও মা।

অগত্যা নাথুর মাকে কাটতে হল কুমড়োটা। নিতেও হল আধখানা। ওই যে ঝাঁট দিয়ে খাবার জল এনে দিয়েছে তাতে পাওনা হয়েছে নাথুর মা'র। পণ্ডিতমশায় তার শোধ দিলেন কুমড়োতে।

দিন পনেরো এ তল্লাটে আসতে পারেনি নাথুর মা। পাগলের মতো সে পেটের ধান্দায় ঘুরছিল। একদিন নাথুকে নিয়ে পশ্চিম পাড়ার মাঠের মাঝখানে একটা পুকুর হাতড়ে দু-চারটে বেলে আর পুঁটি ধরে নিয়ে ঘরে ফিরছিল, হঠাৎ পাঠশালার পাশে এসে থমকে দাঁড়াল। কারা যেন পাঠশালার ভেতর কথা বলছে বলে মনে হল। কান পাতল ওরা। পণ্ডিতমশায়ের গলার আওয়াজ বড়ো ক্ষীণ আর ভাঙা ভাঙা।

পণ্ডিতমশায় কাকে যেন বলছেন, চিরকালই ও একটা ডুমিপিটে। একদিন এখানে বসে পড়ছে, অমনি জানালা দিয়ে দেখতে পেল একটা বেড়াল কোথা থেকে একটা ছাতারে পাখি মুখে ধরে নিয়ে চলেছে। পাখিটা তখনো বেঁচে। পাখা ঝাপ্‌টে মুক্তির চেষ্টা করছে। কোথা যাস, কোথা যাস অন্তু, বলতে না বলতেই সে ওপারের রাস্তায় হাজির। বেড়াল ছুটছে মাঠঘাট বনবাদাড় পেরিয়ে অন্তু ছুটছে তার পেছন পেছন। জানো মণি, ছেলেটা চোখের আড়ালে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখি অন্তু আমার পাঠশালায় ঢুকল। মুখে জয়ের হাসি, হাতে ওই পাখিটা। বেঁচে আছে। ডানার ততক্ষণে হলুদ আর চুনের একটা পোলেস্তারা পড়েছে।

একটু থেমে আবার বললেন পণ্ডিতমশায়, ছেলেটাকে কোথায় রেখে এলে মণি?

নাথু আর তার মা ততক্ষণে ঝোরকার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একী! মণিশঙ্করবাবু তো নেই। একা পণ্ডিতমশায় মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে কথা বলে যাচ্ছেন।

নাথুর মায়ের ভালো ঠেকল না ব্যাপারটা। পাঠশালার খোলা দরজা দিয়ে ওরা দুটিতে ঢুকে পড়ল। আশ্চর্য! পণ্ডিতমশায়ের কানে এদের পায়ের সাড়াশব্দ ঢুকল না। নাথু পণ্ডিতমশায়ের পায়ে হাত রেখে বলল, পণ্ডিতমশায়, আমি নাথু।

কোনো সাড়া দিলেন না গয়ারাম পণ্ডিত। শুধু মুখের কথাগুলো তাঁর থেমে গেল। নাথুর মা গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল। কাঠফাটা রোদ্দুরের তেজ গায়ে। মাথার কাছে একটা কলসি। সম্ভবত জ্বর গায়ে পাঠশালায় আসার সময় কলসিটাও সঙ্গে এনেছিলেন।

নাথুর মা কলসি থেকে পাশে পড়ে থাকা কলাইয়ের গ্লাসে জল গড়াতে গিয়ে দেখল, কলসি একেবারে খালি।

BanglaBook.org

পুকুর থেকে জল নিয়ে এসে ধীরে ধীরে ধুইয়ে দিতে লাগল পণ্ডিমশায়ের মাথা। একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ বুজলেন গয়ারাম পণ্ডিত। জবাফুলের মতো লাল দুটো চোখ।

কোমরের কাপড়ে জড়ানো রইল মাছ, মায়ে-পোয়ে বসে বসে পণ্ডিতমশায়ের পরিচর্যা করতে লাগল।

সন্ধ্যার মুহূর্তে চিরদিনের মতো চোখ বুজলেন পণ্ডিত গয়ারাম। জীবনে কখনো কারু কাছে নত হলেন না। নিজের সংসার সাজালেন না। কেবল পাঠশালা আর ছাত্র নিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। নিশ্বাসটুকু বেরিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে সর্বত্যাগী গয়ারাম তাঁর দরিদ্রতম ছাত্রটির হাত থেকে এক গণ্ডুস জল পান করে গেলেন। কেবল এই প্রথম আর শেষবারের মতো দান গ্রহণ করে প্রতিদান দিয়ে যেতে পারলেন না পণ্ডিতমশায়।

অভুক্ত মা আর ছেলে গয়ারাম পণ্ডিতের শব আগলে বসে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

১৬

কদিন অপথ্য কুপথ্য খেয়ে নাথুর শরীটা বিগড়েছিল। শীর্ণ পায়ের পাতা আর আঙুলগুলো বেশ ফুলে উঠেছিল। অভুক্ত নাথুর দৌড়ে দৌড়ে বনবাদাড় ঢুঁড়ে কিছু সংগ্রহ করে আনার শক্তিও আর ছিল না। অগত্যা উপায়হীন নাথুর মাকে একা ঘর ছেড়ে বেরুতে হল। নাথু রইল ঘরের মেঝেতে পড়ে। করুণ চোখে মায়ের দিকে চেয়ে সে বলল, কতদিন ভাত খাইনি মা। ভাতের গন্ধ শুঁকিনি কত কাল। তুই আমাকে খালি একটা মুঠো ভাত খাওয়াবি মা? একবার দুটি ভাত দে, আমি আর কখনো চাইব না।

রুগ্ণ অভুক্ত ছেলেকে কী প্রবোধ দেবে নাথুর মা। তার বুকখানা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। শুকনো চোখে জল এল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ অসহায় দেহ থেকে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

না, সারা দুপুর টো টো করে ঘুরে ঘুরে কোথাও কিছু পেল না নাথুর মা। বন-জঙ্গল খাল-বিল চষেও মিলল না কিছুই। শূকরের পাল যেমন করে বন-বাদাড় উলটেপালটে খাবার খুঁজে নেয় তেমনি করে ভুখা মানুষগুলো বাকি রাখেনি কিছু খোঁজার। চলার পথে যা পেয়েছে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে। পা দুটো আর টানতে পারে না নাথুর মা। হতাশায় চোখ দুটোতে নেমে আসছে ছায়া ঘোর। সিংহবাড়ির পিছন দিকে একটা বড়ো মাপের পুষ্করিণী। তার পরেই পাঁচমিশালি গাছের এলোমেলো বাগান। তার ঠিক মধ্যিখানে বড়ো রকমের একটা খামার। এখানে চাষিরা ধান ঝাড়াই মাড়াই করে। বকশি পাঠক বসে কাজ তদারকি করে, তাই কঞ্চি মাটি দিয়ে তৈরি দেয়ালের ওপর একটা চালা তুলে রাখা হয়েছে।

নাথুর মা মাঠ ভেঙে আসার পথে ওখানে একবার ঢুকে পড়ল। টুলটুলে দুপুর। চারদিকে নির্জন। আমড়াগাছে একটা ঘুঘু ডাকছে,—দিদিগো, কেথালো, পেটে পো, ভুঁয়ে থো।

নাথুর মা'র হঠাৎ চোখে পড়ল পলখড়ের গলাপচা গাদার মধ্যে কটা ছাতু ফুটে আছে। অমনি চকচক করে উঠল চোখ দুটো। সে গাদার কাছে এগিয়ে গিয়ে যেই না ছাতু তুলতে গেছে অমনি পিছন থেকে কে একজন তার হাতটা টেনে ধরল।

ভয়ানক চমকে কাঁপতে কাঁপতে পিছন ফিরল নাথুর মা। যে তার হাতখানা ধরেছে সে মুচকি মুচকি হাসছে।

সাধুচরণ এবার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, কী রে, চিনতে পারিস?

শুধু মাথাটা নাড়ল নাথুর মা। বকশি সাধুচরণকে চেনে না এমন লোক কে আছে।

তোকে তো আর চেনাই যায় না। গাঁয়ে তো মানুষজন দেখি না, কী করছিলি তুই একা একা?

এবার নাথুর মা'র গলা শোনা গেল, গাঁ আগলে পড়ে আছি।

BanglaBook.org

সাধুচরণ একটা নিষ্ঠুর কৌতুক ছুড়ে দিল, আজকাল খাওয়াচ্ছে কে তোকে?

নাথুর মা আকাশের দিকে দুটো চোখ তুলে দেখিয়ে দিল।

সাধুচরণ এবার সোজাসুজি প্রস্তাবটা ফেলল, লেনদেন চালাবি? একহাতে দাও, একহাতে নাও। রাজি যদি থাকিস তা হলে দাঁড়া, আমি চাল নিয়ে আসছি। চেহারায় যা ছিরি করেছিস এক কানাকড়ি দাম উঠবে না তোর। নেহাত আগের চেহারাখানা ভুলতে পারি না তাই।

সাধুচরণ চাল আনতে চলে গেল। খামার বাড়িতে পলখড়ের গাদার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল নাথুর মা। আগে হলে এ প্রস্তাব সে দুপায়ে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যেত কিন্তু আজ নিজের মধ্যে একটুও আগুন জ্বালাতে পারল না। 'চাল' কথাটা কাজ করল মন্ত্রের মতো। ভাত খেতে চেয়েছে নাথু। আহা রে, বাছা কতদিন চাট্টি ভাত খায়নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় নাথুর মুখের সেই কথাটা, 'কতদিন ভাত খাইনি মা', বারবার কানে এসে বাজতে লাগল।

আঁচলে চাল কটা আগেই বেঁধে নিয়েছে নাথুর মা। অন্নদানের পরে দেহদান। এরপর একটা পাপবোধ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল খামারবাড়ি থেকে। সে মাঠ ঘাট পেরিয়ে ছুটে চলল বাড়ির দিকে। আঁচলে বাঁধা চালের বোঝাটা বড়ো বেশি ভারী বলে মনে হল তার।

নাথু নাথুরে, তোর জন্যে কী এনেছি দেখ,—বলতে বলতে ঝোপড়িতে ঢুকে পড়ল নাথুর মা। কিন্তু নাথু কই! যে ছেলে পা ফুলে চলার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছে, সে ঘর ছেড়ে গেল কোথায়?

নাথু, নাথুরে—ডাকতে ডাকতে বাইরে বেরিয়ে এল নাথুর মা। হঠাৎ ডোবার দিকে চোখ পড়তেই প্রাণফাটা একটা চিৎকার করে উঠল।

খিদের জ্বালায় বোধ করি ডোবায় নেমেছিল জল খেতে। গড়িয়ে পড়েছে আর উঠতে পারেনি। দুর্বল দেহটা জলের টান থেকে নিজেকে তুলে আনতে পারেনি পৃথিবীর শক্ত মাটিতে।

নাথুর দেহটা ঘাটের পাটে শুইয়ে দিয়ে কতক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল নাথুর মা। একসময় আঁচলে বাঁধা চালগুলো ডোবার জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাহাকার করে কেঁদে উঠল, হতভাগা নিজে মরলি তার আগে আমাকেও মেরে রেখে গেলি রে।

অনন্ত স্রোত প্রবাহে নাথুর মাও এগিয়ে চলেছে। হাতে অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো ভাঙা একটা বাটি। মুখে ভুখা মানুষের বুক ভাঙা আর্ত আকুতি—ফ্যান দাও গো মা, একটু ফ্যান।

BanglaBook.org

ইস্পাতের তলোয়ার

ঘুম ভেঙে যায় রাতে। একটা ভারী জিনিস ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাই। তার পরেই চোখের ওপর ফুটে ওঠা একটা ছবি। দীর্ঘদেহী একটি মানুষ ফরেস্ট হস্‌পিটাল থেকে বেরিয়ে আসছেন। হাতে একটি ল্যাম্প। এদিক ওদিক কী যেন খুঁজে ফিরছেন তিনি।

হঠাৎ আলোটা নিভে যায়।

শনি-চা-রি-ই...।

একটা আর্ত চিৎকার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে। সারজম গাছের ওপর থেকে পাখা ঝাপটে উড়ে যায় বনমোরগ আর সারো-ময়নার দল।

এরপর কতক্ষণ স্তব্ধতা। কান পাতলে শোনা যায় দু'চারটে কথা। টুকরো টুকরো, কতক বা অস্পষ্ট।

আমি মরতে চাইনি ডাক্তার। অতি ক্ষীণ আহত একটা গলার আওয়াজ।

তবে কেন এমন করলে?

তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি, তাই।

এ বনের থেকে তোমাকে মুক্ত করে আমার দেশে নিয়ে যাব মনে করেছিলাম শনিচারি।

তোমার দেশে!

কথা অস্পষ্ট। একটা যন্ত্রণার কাতরোক্তি বলে মনে হয়।

সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি উপযুক্ত মর্যাদা দিতাম। বীরাঙ্গনার যোগ্য মর্যাদা।

আজ এই শেষ মুহূর্তে তোমাকে গ্রহণ করলাম ডাক্তার। পঙ্গু হয়ে, তোমার বিপদের কারণ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারলাম না। আমার মত আমার দেশের মানুষকেও তুমি চিরদিন ভালবাসবে। কথা দাও, কোনওদিন তাদের ছেড়ে যাবে না।

কথা দিচ্ছি শনিচারি।

এরপর সীমাহীন নীরবতা! পাহাড়ের আড়াল থেকে অতি উজ্জ্বল নীলাভ একটি দ্যুতি ফুটে উঠছে। সূর্যোদয়ের সূচনা হচ্ছে ওপারে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এ পারের ছবি।

নতজানু হয়ে বসে আছেন ডাক্তার জনসন প্রার্থনার ভঙ্গীতে। সামনে নিস্পন্দ শুয়ে আছে আদিবাসী এক কন্যা। যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে।

* * *

আপনারা যদি কেউ কখনও সিংভূমের সারান্দা ফরেস্টে আসেন তা হলে আমার মত এমনি বিচিত্র এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন কিছুকাল। সাতশোটি পাহাড় সারান্দা নাম নিয়ে সবুজ অরণ্যের পোশাক পরে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে উত্তর পূর্বে চলে গেছে। আপনি পাহাড়ি রাস্তা ধরে এগিয়ে আসবেন। একদিকে উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে পাহাড়ি খাদ। তার মাঝে অপ্রশস্ত পথ। পাহাড়ের গায়ে আদিম অরণ্য। শাল, হেসেল, বীজা, শিমূলের ঘন বসতি। অজস্র লতাগুল্মে রহস্যময় বলে মনে হবে আপনার সারান্দা বনভূমি। কুইনা রেঞ্জ ধরে চলে আসুন। কিছুদূর এগিয়ে সামনে দেখবেন একটি পাহাড়ি নদী। ভারি মিষ্টি তার নাম। কোয়েল নামের সত্যি একটা যাদু আছে। নুড়ির নূপুর বাজিয়ে কোয়েল একখানা রঙিন শাড়ি গায়ে পাক দিয়ে জড়াতে জড়াতে ছুটে চলেছে।

BanglaBook.org

নদী পেরিয়ে চলতে চলতে আপনি একসময় এসে পড়বেন 'ছোট নাগরা' নামে একটি পাহাড় ঘেরা আদিবাসী গ্রামের মাঝখানে। দূর থেকে দেখতে পাবেন আদিবাসী 'হো'দের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। লাল কালো মাটির প্রলেপ লাগানো দেওয়াল। ঐ পাহাড়ি গ্রামটিতে ঘুরতে ঘুরতে আপনি কয়েকটি চিহ্ন দেখতে পাবেন। পাথর-গড়া মন্দির আর ইঁটের তৈরি ভাঙা গড়ের ধ্বংস-স্তূপ। বনের মাঝে এ ধরনের চিহ্নগুলি সত্যিই আপনাকে অবাক করবে। আপনি ভাবতে ভাবতে গ্রামটি পেরিয়ে আসবেন। কিছুদূর বনের পথে এগিয়ে এসে বাঁক ফিরলেই আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটি পরিচ্ছন্ন শাল মহুয়ায় ঘেরা আস্তানা। বেশ খানিকটা জমি নিয়ে চমৎকার গাছপালা, লতায় ফুলে সাজানো জায়গাটি আপনাকে আকর্ষণ করবে বিশেষভাবে। আপনি পথ থেকে একটু উঠে এলেই দেখতে পাবেন কয়েকটি বাংলো টাইপের খড়ো ঘর। তাদের একটির ওপরে কাঠের সাদা রঙ করা ক্রুশ আপনার চোখে পড়বে। এই নিভৃত বনভূমিতে আপনি ক্রুশচিহ্ন দেখে যখন মনে মনে চিন্তা করবেন, কী করে এখানে এল খৃষ্টধর্ম, ঠিক সেই সময় হয়তো আপনার চোখে পড়বে আর একটি বিচিত্র বস্তু। চার্চের সামনেই একটি বাঁধানো বেদির ভেতরে ঈষৎ উঁচু একটি মঞ্চ। আপনি যদি আদিবাসী 'হো' দের সংস্কার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হন তা হলে সহজে বুঝতে পারবেন ওই মঞ্চটি 'আদিং' ছাড়া আর কিছু নয়। ওই আদিংয়ের ভেতর রক্ষিত আছে কোনও আদিবাসীর আত্মা।

আপনি নিশ্চয়ই এ দৃশ্য দেখে অবাক হবেন। একই সঙ্গে চার্চের এলাকায় এ ধরনের আদিংয়ের অস্তিত্ব কী করে থাকতে পারে এই নিয়ে যখন আপনি জটিল চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়বেন, ঠিক সেই সময় এক অতি বৃদ্ধ পাদ্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যেতে পারে।

তাঁর তুষারশুভ্র কেশ আর মুখের মৃদু হাসিটি আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

আপনি এগিয়ে গিয়ে এই বিচিত্র ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাঁর কাছে কিছু জানতে চাইবেন। তিনি অমনি মৃদু হেসে আপনার হাত ধরে নিয়ে যাবেন চার্চের ভেতরে। তারপর আপনার হাতে একখানি অতি জীর্ণ পুঁথি তুলে দিয়ে ইঙ্গিতে পড়তে বলবেন। আপনি বৃদ্ধ পাদ্রীর নির্দেশে বাইরে এসে বাঁধানো বেদির পাশে বসে একের পর এক পাতা উল্টে যাবেন। অজ্ঞাত অরণ্য-মানুষের অলিখিত এক ইতিহাস ফুটে উঠবে আপনার চোখের ওপর। 'ডাক্তার জনসনের ডায়ারি' থেকে আপনি অরণ্যের বিচিত্র অনাস্বাদিত এক রহস্যের সন্ধান পাবেন।

BanglaBook.org

ডাক্তার জনসনের ডায়ারি

উৎসর্গ ঃ যে প্রেম আমার ভেতর মহৎ ভালবাসার সৃষ্টি করেছে সে প্রেমকে নত হয়ে নমস্কার করি। যে কুমারী আমাকে সেই প্রেম দান করেছে, তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি আমার এই স্মৃতি-গ্রন্থখানি।

২০ জুন ঃ ১৮৯৮

জামদা থেকে হাডসনের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আসতে বেশ মজা লাগল। এখানে ওখানে পাহাড়গুলো ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে সমতল। কোথাও রা দু'চারটে জলের ধারা চোখে পড়ে। ইঁটের রঙের মত জলের রঙ এখানে। হাডসন বললেন, এখানকার পাথরে নাকি প্রচুর লোহা আছে।

পথের মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভালই হল। যে রকম রোদ চড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ভেতর এতটা পথ আসা সত্যিই কষ্টকর হত। প্রভুকে ধন্যবাদ, মেঘ করে বৃষ্টি এল। পাহাড়ের ওপর যখন মেঘ জমে উঠেছিল তখন আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম সেদিকে। ছোট এক টুকরো মেঘ দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের ভেতর পাহাড়ের কোল বেয়ে নামতে লাগল সে মেঘ। গুরু-দেহ পাখি যেমন পায়ের ওপর ভর রেখে কিছুটা দৌড়ে এসে আকাশে ডানা

মেলে দেয়, ঠিক তেমনি পাহাড়ের কোল বেয়ে খানিকটা নেমে এসেই মেঘটা যেন পাখা ঝাপটে উড়ে আসতে লাগল। শোঁ শোঁ শব্দ উঠল। হাডসন ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। আমাকেও নামতে বললেন। পথের পাশে কয়েকটা শালের গাছ জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। আমরা তার আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘোড়া দুটোকে সেই গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম।

মুক্তোর দানার মত এক সময় বৃষ্টি ঝরতে লাগল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তারপর অঝোর ধারায়। যেদিক থেকে বাতাস বইছিল আমরা তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়েছিলাম। ইচ্ছে করছিল, একটু জলে ভিজি। হাডসনকে আমার ইচ্ছের কথাটা জানালাম।

হাডসন হেসে বললেন, ডাক্তার, চিকিৎসার গোড়ার কথা হল প্রকৃতি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানা। তারপর ওষুধের কথা।

বললাম, তা মানি, কিন্তু এ কথা কেন?

এই যে তুমি চাইলে বৃষ্টিতে ভিজতে। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দিগর্মিতে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। যে দেশে ডাক্তারি করবে, সে দেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হয়।

কথাটা ভালই লাগল। বয়সের একটা অভিজ্ঞতা আছে। ডাক্তার হলেও আমি তরুণ, হাডসন ফরেস্ট-রেঞ্জার হলেও অনেক প্রবীণ। পুঁথিপড়া শিক্ষার চেয়ে অভিজ্ঞতার দাম অনেক বেশি।

আমরা নিজেদের বৃষ্টির ছোঁয়া থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সবটুকু পারলাম না। এলোমেলো বাতাসে কিছুটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। এদিকে শালের বড় বড় পাতা থেকে ভারি ভারি জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল আমাদের মাথা আর পোশাকের ওপর।

বৃষ্টি থামলে শান্ত হল প্রকৃতি। গরম অনেক কম বলে মনে হল। আমরা আবার ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিলাম।

বনের ভেতর ঢুকে মনে হল, দিনের বেলাতেই সূর্য ডুবে গেছে। হাডসন সামনে চলেছেন, আমি আছি পেছনে। পথের অন্ধি সন্ধি হাডসনের নখদর্পণে। তবু চারদিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন তিনি। আমার কিন্তু চারদিকের গাছপালা, লতাপাতার নিবিড়তা মনোরম মনে হচ্ছিল।

হাডসন ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। ইঙ্গিতে আমাকে থামতে বললেন। তারপর হাতের ইসারায় যে দৃশ্য দেখালেন তা কোনওদিন ভোলার নয়।

একটি একশিলা পাথরের ওপর মেঘের ছায়া এসে পড়েছে। লতায় পাতায় ফুলে জায়গাটি মনোরম। পাশের পাহাড় থেকে ঝির ঝির শব্দে ঝরে পড়ছে একটা ক্ষীণাঙ্গী ঝরণা। ওই একশিলা পাথরের ওপর পাখা মেলে নাচছে একটি ময়ূর। পাখায় কী উজ্জ্বল রঙের বাহার। কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মেঘভাঙা রোদের দু'এক টুকরো রশ্মি ইতিমধ্যে এসে পড়েছে ওর চিত্রিত পাখার ওপর। ওই যে আর একটি ময়ূর। একটা মহুয়া গাছের ডালে সে বসেছিল। এবার দ্বৈত নৃত্য শুরু হল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে লাগলাম। বনের নটনটী নেচে চলেছে আপন মনে। দর্শকের দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। মানুষের তৈরি করা রঙ্গমঞ্চে যে নৃত্য-শিল্পীরা নাচে, তারা কি এমন করে দর্শকদের ভুলে আপনার ভেতর ডুবে থাকতে পারে।

১ সেপ্টেম্বর ঃ

কয়েকমাস যেন বৃষ্টিতে ভেসে গেল পাহাড়ি দেশটা। কুমডির বাংলোতে প্রায় বসে বসেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। বর্ষার দিনে পাহাড়ে ধ্বস নেমে পথ দুর্গম করে দিয়েছে। তার ওপর দিয়ে পথ করে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

আমাদের বাংলোর দেওয়াল, মেঝে সব কাঠের। ছাউনিটা খড়ের। চাল বেয়ে টপ টপ করে যখন বৃষ্টির জল পড়ে তখন জলের রঙ প্রথম দিকে লালচে দেখায়। সামনে একটা চেয়ার ফেলে সারাদিন আমি বসে থাকি! বাংলোর চারদিকে কাঠের খুঁটির বেড়া। সেই খুঁটিগুলো আর দেখা যায়

BanglaBook.org

না। কত রকমের লতা, পাতা, ফুলে তাদের ছেয়ে ফেলেছে। বাংলোর কর্মচারীদের কাছ থেকে কয়েক রকমের ফুল আর লতার নাম শিখে নিয়েছি। একটি লতার নাম 'জনাপা'। গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুনি আর সাদা ফুলে তার সর্বাঙ্গ ভরে আছে। বনমল্লী, যুঁই আরও কত ফুল। মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়! পাশেই কারো নদী। মাঝে মাঝে বান ডাকে। শোঁ শোঁ শব্দ উঠলেই আমি বাংলো থেকে বেরিয়ে নদীর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ওপরের পাহাড়ে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেলে সেই বৃষ্টির ঢল নেমে আসে নদী বেয়ে। তার আওয়াজ ভেসে আসে বহু দূরের থেকে।

নদীতে দেখা যাচ্ছে নীল জলের প্রবাহ, পরক্ষণেই কত উঁচু একটা গৈরিক জলের ঢেউ তার ওপর এসে পড়ল। অমনি কূল ছাপিয়ে বইল জলের ধারা।

মাঝে মাঝে কুলিকামিন নিয়ে হাডসন পথের অবস্থা দেখতে বেরিয়ে যান। কখনো বা তাঁর বাংলোতে ফিরে আসার আগেই প্রবল বর্ষা শুরু হয়। মেঘের মাতামাতি চলতে থাকে। বাজের গর্জনের সঙ্গে পাহাড়ের ওপর পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা যায়। আশেপাশের পাহাড়গুলো সে শব্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাডসনের জন্যে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ি। বড় জেদী আর একরোখা মানুষ এই হাডসন। বিপদের ঝুঁকি যতটা নেওয়া চলে তার চেয়ে অনেক বেশি নিতে পারেন তিনি। তাই মাঝে মাঝে তাঁর জন্যে চিন্তিত না হয়ে উপায় থাকে না। হাডসন আমার পিতৃব্যের বন্ধু। তাঁর ভরসাতেই আমার এখানে আসা। কুলিকামিনেরা পাহাড়ি রাস্তাঘাট তৈরি করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। মাঝে মাঝে জ্বরজাড়িতে ভোগে। তাদের জন্যে সরকারী রিজার্ভ ফরেস্টে চিকিৎসকের দরকার। নতুন জায়গা দেখার একটা লোভও ছিল আমার। তাই হাডসনের ডাকে চলে এলাম।

এই বর্ষার ভেতর দু'একদিন হাডসনের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। বৃষ্টি বন্ধ থাকলেও পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘ থমকে থাকত। তারই ফাঁকে সূর্যের আলো এদিক ওদিক একটু দেখা দিলেই পাখিরা ঝাঁক বেঁধে রোদ্দুরের লোভে জড় হত। নিপুণ শিকারী হাডসনের অব্যর্থ লক্ষ। কয়েক জোড়া বন মোরগ তিতির শিকার করে বুনো লতায় বেঁধে নিয়ে আমরা বাংলোয় ফিরতাম।

রাত্রে বৃষ্টি নামত। আমাদের বাংলোটা সেই মুহূর্তে মনে হত যেন সমস্ত জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশাল সমুদ্রের বুকে একটি নিঃসঙ্গ তরণীতে আমরা দুটি প্রাণী কোথাও ভেসে চলেছি বলে মনে হত।

হাডসন যেমন শিকারী তেমনি ভোজনবিলাসী। এখানকার বাবুর্চির রান্না তাঁর আদপেই পছন্দ হয় না। রাতে বসে বসে হাডসন তাঁর সংসারের কথা তুলতেন। আগামী শরৎকালে সমস্ত পরিবারকে এনে ফেলার একটা পরিকল্পনাও তিনি এই সময় স্থির করে ফেললেন।

১৭ নভেম্বর ঃ

একদিন দেখলাম হাডসন আর বাংলো থেকে কাজে বেরুলেন না।

বললাম, কি হল, শরীর খারাপ নাকি?

হাডসন কোনও কথা না বলে আমার হাতে একখানা চিঠি এগিয়ে দিলেন।

চিঠিখানা এসেছে বোম্বে থেকে। হাডসনের এক বন্ধু সেই চিঠির রচয়িতা। সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তিনি। চিঠির মোটামুটি বক্তব্য এই, সরকার একদল মিশনারীকে সারান্দা ফরেস্টে পাঠাচ্ছেন আদিবাসীদের ভেতর খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। এ কাজে দু'দিক থেকেই লাভ হবে! অখৃষ্টানেরা প্রভু যীশুর মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে। তা ছাড়া পরোক্ষ আর একটি বড় রকমের লাভের সম্ভাবনা আছে। সেটি হল, খৃষ্টধর্মের প্রভাবে এলে আদিবাসীদের ভেতর কথায় কথায় বিদ্রোহ করবার আগ্রহ কমে আসবে। তখন সরকারের পক্ষে বনভূমিতে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করা আর ব্যবসা চালানোর সুবিধে হবে।

BanglaBook.org

বললাম, এতে তো আপনারই সুবিধে। আদিবাসীরা আপনাকে কুলিকামিন দিয়ে এখন সাহায্য করতে চাইছে না, তখন আর এ হাঙ্গামা থাকবে না।

হাডসন বললেন, চিঠির শেষ অংশটুকু পড়ে দেখ।

চিঠি শেষ করে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, কী আনন্দ, আপনার পরিবারের সবাই দেখছি ওই দলের সঙ্গেই আসছেন।

হাডসন এবার উঠে বসলেন। এমন উত্তেজিত মুখভাব আমি এর আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।

বললেন, পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছে দেখতে পাচ্ছ না?

ওঁর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে আমি বোকার মত তাকিয়ে রইলাম।

হাডসনের মুখে করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। মুহূর্তে হাডসন শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়লেন।

জনসন, এ একান্ত আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা। অন্য কারও জানার কথা নয়।

এমন বলিষ্ঠ মানুষের এমনি কোমল একটা আঘাতের জায়গা থাকতে পারে তা আগে কোনওদিন ভাবতে পারিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা।

হাডসন বললেন, তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ডাক্তার, তবু এই নির্জন জায়গায় একই সঙ্গে আমরা কাটাচ্ছি, তাই তুমি আমার বন্ধু। তোমার কাছে গোপন করার কিছু নেই আমার।

মনের কোন একটি গোপন কথা হাডসন আমাকে আজ শোনাতে চান, তাই এ ভূমিকা।

হাডসন বললেন, আমার স্ত্রী তাঁর কুমারী জীবনে পিটারের প্রতি আসক্তা ছিলেন। আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হলে পিটার অবিবাহিত থেকে যান, পরে মিশনে যোগ দেন।

হাডসনের ব্যথার কাঁটা কোথায় বিঁধে আছে এতক্ষণে তা বুঝলাম।

সান্ত্বনা দেবার ত্রুটি রাখলাম না।

বললাম, কুমারী জীবন আর বিবাহিত জীবনের ভাবনা এক হবে এমন কোনও কথা নেই। আজ উনি পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছেন বলে আমরা নিশ্চিত ধরে নিতে পারি না যে ওঁর মনে এখনও কুমারী জীবনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হাডসন হেসে বললেন, যুক্তি মনকে অনেক সময় প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মন প্রায়-ক্ষেত্রেই তাকে স্বীকার করতে চায় না।

বললাম, কোনও সন্দেহ থাকলে আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ নিতে পারতেন।

করুণ হাসি হাসলেন হাডসন।

বললেন, একবার এক হিন্দু সাধুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছিল। সাধু আমাকে বললেন, যে বাতাস আমাদের নৌকো ডোবায়, জলের ভেতর ডুবে যেতে যেতে আমরা সেই বাতাসকেই প্রতি মুহূর্তে চাই।

কথাটা মনে রাখার মত।

হাডসন বললেন, আমাদের যা পারা উচিত, বা পারা দরকার ছিল তা সব সময় পারা যায় না। যে আমাদের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটায়, অনেক সময় আমাদের মন তাকেই বেশি করে আগলে রাখতে চায়।

আমি চুপ করে গেলাম। জীবনের রহস্য সত্যিই বিচিত্র।

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। দুটি গরু কতকগুলো কাঠের ভারি বোঝা বয়ে আনছিল পশ্চিমের পথটা ধরে। তাদের পেছনে আদিবাসী একটা লোক গরুগুলোকে তাড়িয়ে আনছিল। আমি এই দৃশ্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। চেঁচিয়ে সাবধান করতে গেলেই চিতাটার নজর সম্বরের ওপর থেকে গরু আর আদিবাসীর ওপরে গিয়ে পড়বে। তখন ফল ফলবে বিপরীত।

আমি চুপচাপ প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে হরিণটা আর এক লাফ দিয়ে ওপরের বনের কাছাকাছি গেলেই বাঘটা তাকে অনুসরণ করে আরও ওপরে উঠে আসবে। তখন ওই লোকটা বেঁচে গেলেও যেতে পারে।

কিন্তু সম্বর নড়ল না, বাঘটাও বসে রইল পথের ওপর। আর তাদের মাঝে এসে পড়ল গরু দুটো আর আদিবাসী লোকটি। বাঘটাকে দেখে গরুদুটো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। লোকটা তখনও বাঘটাকে দেখতে পায়নি। সে গরুগুলোকে আয়ত্বে আনবে বলে হেঁই-হো হেঁই-হো করে তাদের পিছু পিছু দৌড়ে চলল। লোকটি যেই চিতার ধার ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে, অমনি একটা থাবা এসে পড়ল তার ঘাড়ে। বলিষ্ঠ লোকটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমি গাছের ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠলাম। পাহাড়ে পাহাড়ে আমার সে চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

গাছের ওপর থেকে চেয়ে দেখি, বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে একবার আঘাত করে আবার খেলা করে, ঠিক তেমনি লোকটাকে নিয়ে বাঘটা খেলা করতে লাগল।

সূর্যাস্ত হয়ে গেল সামনের পাহাড়ের আড়ালে। পেছনের রাস্তায় একটা হৈ চৈ শুনে তাকিয়ে দেখি কতকগুলি আদিবাসী তীর ধনু নিয়ে মশাল জ্বেলে এদিকে দৌড়ে আসছে। আমি গাছের ওপর থেকে চিৎকার করে তাদের ডাকতে লাগলাম। মশাল দেখে হৈ চৈ শুনে বাঘটা শিকারকে পথের ওপর ফেলে রেখে সরে গেল।

ওরা এসে লোকটাকে ঘিরে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। আমি গাছের থেকে নেমে এলাম। পথের ওপর থেকে কুড়িয়ে নিলাম আমার ওষুধের ব্যাগটা। লোকটির কাছে গিয়ে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে আমার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে আসতে বললাম। লোকটির তখনও জ্ঞান ফেরেনি। ওরা ওকে আমার হাসপাতালে রেখে দিয়ে গেল। আজ কদিন ধরে সমানে লোকটার চিকিৎসা চলেছে। সম্পূর্ণ আরোগ্য হতে পারেনি এখনও।

রাতে বসে বসে রহস্যময় প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, এত সুন্দর তুমি অথচ কী ভীষণ।

১৫ মার্চ ঃ ১৮৯৯

হাডসনের লোক এসে জরুরী খবর দিয়ে গেল, যেন একটুও দেরি না করে আমি কুম্‌ডির বাংলোতে যাই।

তাড়াতাড়ি হাসপাতালের কাজ গুছিয়ে আমি বাংলোতে গিয়ে পৌঁছলাম। গেটের সামনেই পায়চারি করছিলেন হাডসন। আমাকে দেখেই বেরিয়ে এলেন। বাংলোতে না গিয়ে হাডসনকে অনুসরণ করে আমরা এসে বসলাম কারো নদীর ধারে নতুন তৈরি সাঁকোটার ওপর। হাডসন আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

ব্যাপার কী বলুন তো, কোনও অঘটন কী ঘটেছে?

আমার হাত তেমনি হাডসনের হাতের ভেতর ধরা রইল।

কিছুক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে বললেন, রেবেকা পাগল হয়ে গেছে!

রেবেকা হাডসনের স্ত্রী। আমি গত সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে কথা বলে গেছি। পাগলামোর কোনও লক্ষণই তাঁর ভেতর প্রকাশ পায়নি।

বললাম, আনুপূর্বিক ঘটনাগুলো বলে যান।

BanglaBook.org

হাডসন বললেন, ইদানিং প্রায়ই উনি সাসাংদার গীর্জায় যেতেন। তুমি জান, নানা কাজে আমাকে বাইরে বাইরে যেতে হয়। আমি ওঁর সঙ্গে যেতে পারতাম না। ডরোথিকে নিয়েই উনি ওখানে যেতেন। সঙ্গে থাকত আমার আরদালী।

প্রথম দিকে গীর্জা থেকে ধর্মবিষয়ক অনেকগুলি করে বই আনতেন। রাত জেগে তাই পড়তেন। তুমি জান জনসন, কারও স্বাধীন ইচ্ছায় আমি কখনও বাধা দিতে চাই না।

উনি এক ঘরে পড়তেন, আমি অন্য ঘরে ঘুমোতাম।

এক রাতে ডরোথির সঙ্গে কী নিয়ে যেন ওঁর কথা কাটাকাটি হল। কিছুই বুঝলাম না। তারপর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছেন। গীর্জায় যান না, একা একাই ঘরের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান। কী যেন হারিয়ে ফেলেছেন, তাকেই পাতি পাতি করে খোঁজেন। প্রথমদিকে ডরোথিকে দেখলে কথা বলতেন না। এখন ওকে একেবারেই দেখতে পারেন না। কারণে অকারণে তেড়ে যান।

বললাম, কিছু যদি মনে না করেন তা হলে আমি দু'একটি কথা আপনার কাছে জানতে চাই।

স্বচ্ছন্দে, হাডসন বললেন।

ডরোথির কী আপনার ওপর কোন দুর্বলতা লক্ষ করেছেন?

হাডসন যেন আকাশ থেকে পড়লেন, আমার ওপর! ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব নিকট হলেও বয়সের পার্থক্যটা নিশ্চয়ই তুমি লক্ষ করেছ।

আপনি আপনার দিকের কথাই বলছেন, ওঁর মনের দিকটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখেননি।

চিন্তিত হলেন হাডসন।

বললেন, আমি কিন্তু কোনওদিন তার কোন আভাস পাইনি।

আচ্ছা, এটা কি লক্ষ করেছেন, আপনার কাছে ডরোথি কোনও কারণে এলে আপনার স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন?

হাডসন কিছুক্ষণ পেছনের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এক সময় বললেন, তোমার অনুমান সত্য বলেই মনে হচ্ছে ডাক্তার।

ডরোথিকে কোনও সময়ে আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকতে দেখলেই উনিও সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হন। ডরোথি চলে গেলে উনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর এদিক ওদিক কী যেন খুঁজতে শুরু করেন।

হাডসনের শেষের কথাটার ব্যাখ্যা ঠিক মত করে উঠতে পারলাম না। হাডসনের ওপর ডরোথির অনুরাগকে সন্দেহের চোখে দেখলে রেবেকা ডরোথিকে চোখে চোখে রাখতে পারেন, কিন্তু এর ভেতর খোঁজাখুঁজির প্রশ্নটা আসে কোথা থেকে।

ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিকমত পরিষ্কার হল না।

বললাম, আপনি বুঝতেই পারছেন, এ রোগটা সম্পূর্ণ মানসিক। সুতরাং মনের চিকিৎসা ছাড়া এর নিরাময় সম্ভব নয়। তবে সাময়িক উত্তেজনা যাতে খানিকটা দূর করা যায় সেজন্যে ওষধু একটা দিয়ে দিচ্ছি।

আমি আর বাংলোর ভেতর গেলাম না। হাডসন আমার সঙ্গে এলেন হাসপাতালে।

ওষুধ তৈরি করে দিয়ে বললাম, কয়েকদিন গেলে তারপর নতুন চিকিৎসার কথা ভাবা যাবে, কী বলেন?

কথা বলতে গিয়ে হাডসনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেখানে যেন উদ্বেগের কোনও ছায়া নেই।

ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে হাডসন হেসে বললেন, নিশ্চিন্ত হলাম ডাক্তার। পিটারকে নিয়ে রেবেকা সম্বন্ধে যে দুশ্চিন্তা ছিল তা আর রইল না। ডরোথির ওপর রেবেকার ঈর্ষাই আমাকে এতদিনের দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

BanglaBook.org

২৫ নভেম্বর ঃ

ইতিমধ্যে মিসেস হাডসন এসে পৌঁছেছেন। সঙ্গে অবিবাহিতা বোন, ডরোথি।

দু'জনের বয়সে যেমন তফাৎ স্বভাবেও ঠিক তেমনি।

মিসেস হাডসন অত্যন্ত বাকপটু। রসিকতার সঙ্গে সামাজিকতার চমৎকার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। সারাক্ষণ কৌতুক আর হাসির টুকরো ছড়িয়ে চলেছেন।

তাঁর বাইরের এই উজ্জ্বলতার ভেতর কোথাও যে মনের আকাশে মেঘ জমে থাকতে পারে তা একেবারেই ভাবা যায় না।

ডরোথির প্রকৃতি একটু চাপা, চেষ্টা করেও সে উজ্জ্বল হতে পারে না। স্বভাবের গভীরে কোথায় যেন তার একান্ত নির্জন বাসের একটা জায়গা আছে। সেখান থেকে তাকে কদাচিৎ বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

যে ক'দিন পাদ্রী পিটার বাংলোতে রইলেন, হাডসন অন্য-মানুষ। চেনাই যায় না যে ভেতরে তাঁর কোন ক্ষত আছে।

আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রইল না। সকাল, সন্ধ্যা পিটারের সঙ্গে চলতে লাগল নানান পরিকল্পনা। স্থির হল, সাসাংদাতে একটি চার্চ তৈরি করে সেখান থেকেই ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাসাংদায় চার্চ তৈরি হল। কাঠের বাড়ি, খড়ের চাল। চার্চের লাগোয়া আরও কয়েকখানা ঘর উঠলো। পাদ্রী পিটার আর তাঁর দলবল থাকবেন সেখানে। ফুলের জন্যে জমি তৈরি করা হল।

উদ্বোধনের দিন আমরা সবাই মিলে ঘোড়ায় চড়ে চললাম সাসাংদার চার্চে। সারা দিন রইলাম সেখানে। প্রার্থনায় যোগ দিলাম। প্রথম দিনেই একটি আদিবাসী মেয়েকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হল। মেয়েটি আমাদের বাংলোতে পরিচারিকার কাজ করত। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল তার। দীক্ষা নিয়ে মেয়েটি মিশনারীদের কাছেই থেকে গেল।

কাজকর্মের জন্য একটি লোকের দরকার ছিল। তাই চার্চেই রাখা হল মেয়েটিকে।

সন্ধ্যায় আমরা সবাই মিলে ফিরে এলাম বাংলোতে।

BanglaBook.org

২১ ডিসেম্বর ঃ

বর্ষায় ভেঙে গিয়েছিল পথঘাট, ডিসেম্বরের ভেতর সব মেরামত হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কুম্‌ডির বাংলো থেকে খানিক দূরে থলকোবাদে গড়ে উঠেছে আমার হাসপাতাল। রোগী অল্পই থাকে, আমাকে প্রায় একা একাই কাটাতে হয়। বসে বসে বই পড়ি। শিকার-কাহিনী পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। পাদ্রী পিটার কয়েকখানা বই পাঠিয়েছেন। সবই প্রায় ধর্মগ্রন্থ। এত সহজ করে বইগুলির ভেতর ধর্মের কথা লেখা আছে, যা পড়লে সাধারণ মানুষও ধর্মপথের মোটামুটি একটা হদিস পেতে পারে।

হাসপাতালের সামনে একটি চমৎকার শালের বন। তলাকার পাথরগুলো বড় পরিচ্ছন্ন। আমি বসে বসে দেখি, একটির পর একটি শালের পাতা খসে খসে পড়ছে। একটা দমকা হাওয়া লাগল, অমনি কী বিচিত্র শব্দ করে ঘুরতে ঘুরতে ওরা নেমে গেল নীচের উপত্যকার ভেতর। রাতের আকাশ ঘন নীল। জ্বল জ্বল করে জ্বলছে একটা তারা শাল গাছটার ঠিক মাথার ওপর। আরও অগুন্তি তারা আকাশে। সবার ভেতর এটি যেন একটু আলাদা।

কত কাছে আর কত স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে। যীশুর আবির্ভাবের সময় পূর্ব-দেশের সাধুরা এমনি একটি নক্ষত্র আকাশে দেখেছিলেন।

শাল গাছের মাথার ওপর ওই তারাটি দেখলে আমার মন কেমন যেন শান্ত আর গভীর হয়ে আসে।

কয়েকদিন আগে আমার হাতপাতালে একটি রোগী এসেছে। সে রাতে কিছুতেই ঘুমুতে পারছে না। ঘুমের ওষুধ দিলে কিছু সময় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে, তারপর জেগে উঠলেই শুরু হয় গোঙানি। ওর জন্যে এ ক'দিন আমার চোখেও ঘুম নেই।

মনে মনে প্রার্থনা করি, আমার হাসপাতালে যে রোগীটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রাতে ঘুমুতে পারছে না, তার ঐ তারার আলোর মত স্নিগ্ধ শান্তি আসুক। জগতের যেখানে যত রোগার্ত, শোকার্ত রয়েছে তারা সুস্থ হয়ে উঠুক, সুখী হোক।

এই শীতের রাত্রি, কুয়াশার চাদর বিছানো উপত্যকায় অতন্দ্র চাঁদের আলো, বনভূমির নিভৃতলোকে কীটপতঙ্গের বিচিত্র ধ্বনি আমাকে যেন আবিষ্ট করে রাখে।

৩০ ডিসেম্বর ঃ

সেদিনটির স্মৃতি বোধকরি ভুলতে পারব না কোনও দিন।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম কুম্‌ডির বাংলোর দিকে। পথের ধারে দেখলাম কাঞ্চন ফুল ফুটে আছে। এ দেশের গাছপালা আর ফুলের কত নামই না আমার ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে।

একটা দুটো গাছ নয়, শত শত কাঞ্চন ফুলের গাছের যেন বন তৈরি হয়েছে। আমি ঘোড়ায় বসে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ আর ফেরাতে পারলাম না। কোনও কোনও গাছে সাদা সাদা ফুল ফুটেছে, আবার কোনও গাছে বা ঈষৎ বেগুনি আভার ফুল। গাছ খুব বড় নয়, কিন্তু বড় শোভন সুন্দরভাবে ডালপালা পাতাপত্র মেলে রেখেছে।

আরও এগিয়ে চললাম। বেলা শেষের তখনও অনেক বাকি। শীতের বনভূমি এরই মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। প্রকৃতির কী বিচিত্র আয়োজন। টেকোমা ফুল ফুটে রয়েছে পথের ধারে। গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ রংয়ের ফুল। খাদের ধারে তিলাই গাছটার ছোট ছোট সাদা ফুলে তখনও মৌমাছিদের ভিড় ভাঙেনি। ওদিকে ডাইনে উঁচু পাহাড়ের গায়ে আরাবা গাছে বসে আছে এক ঝাঁক পাখি। বিচিত্র কলরব তুলেছে তারা। ডালে ডালে লাল ছোট ছোট ফুলগুলি উঁকি দিচ্ছে।

শীতের প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে অতি ধীরে এগিয়ে চলেছি, আর মনে মনে ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টির তারিফ করছি। হঠাৎ আমার ঘোড়াটা থমকে দাঁড়াল। সামনে একটি টিলা, ঐ টিলার কোল ঘেঁষেই আমার পথ। পথটা ঐ পাহাড়ের কাছে এসে কোণ তৈরি করে বেঁকে গেছে। এপারের থেকে ওপারের পথটা দেখা যায় না। ঘোড়াটা হঠাৎ থামল দেখে আমি চারদিকে তাকাতে লাগলাম। হঠাৎ যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পাহাড়টা যেখানে দুটো পথের কোণ সৃষ্টি করেছে তার নীচেই সাদা সল্ট লিকের একটা রেখা অগভীর ভ্যালির মধ্যে নেমে গেছে। ঐ সল্ট লিক্ ধরে উঠে আসছে একটা সম্বর। আর তার কয়েক হাত ব্যবধানে শাল আর হেসেল গাছের আড়ালে থেকে একটা চিতা গুঁড়ি মেরে সম্বরটাকে অনুসরণ করছে। সম্বর কিছু একটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে কিন্তু চিতাটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই লাফাতে লাফাতে সল্ট লিক্ ধরে ওপরের পাহাড়ের দিকে উঠে আসছে, আবার একটু থেমে সিধে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল। ঘোড়ায় চড়ে এই পাহাড়ি আঁকাবাঁকা খাদের পথে দৌড়ানো সম্ভব নয়। তাতে যে শব্দ হবে, চিতাটা সে শব্দে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আশেপাশে একটা গাছ খুঁজতে লাগলাম। ওই টিলার পাশেই একটা উঁচু পলাশ গাছ ছিল। জুতো খুলে তার ওপর উঠলাম।

এখন টিলার দু'পাশে দুটো পথই আমি দেখতে পাচ্ছি। সম্বরটা লাফ দিয়ে এক ধাপ টিলার ওপর উঠে এল। চিতাটা এখন পথের পাশে একটা ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসেছে।

BanglaBook.org

হাডসন চলে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম। রেবেকার খোঁজাখুঁজির অর্থটা কিছুতেই আমার কাছে পরিষ্কার হল না।

২০ এপ্রিল ঃ

মার্চে সারান্দা বনভূমিতে যেন উৎসব লেগে গেল। শীতে শালের পাতা ঝরে গিয়েছিল, বসন্তের বাতাসে নতুন প্রাণের জোয়ার এল। কোথা থেকে শূন্য ডালে জ্বলে উঠল নতুন পাতার আগুন। দেখতে দেখতে ঘন পাতায় গাছ ছেয়ে গেল। গাছে গাছে ফুল এল এক সময়। থোকা থোকা মাখন-রংয়ের ফুল।

মিষ্টি একরকম গন্ধে সারা বন মেতে উঠল। মৌমাছি পাড়ায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মধু লুটবার। পাহাড়ি ঝোরার ধারে সাংকারলা লতা ভরে সাদা সাদা ফুল এলো। হলুদ রংয়ের কেশর দুলতে লাগল।

শালের গাছে এসে বসল হাজার হাজার টিয়া। রাতদিন গাছে গাছে চলল তাদের জলসা। পাতায় পাতায় মিশে রইল তারা।

এদিকে 'বাহা' পরব শুরু হয়ে গেল আদিবাসীদের। শালের ফুল ফুটল আর ওদের মনে লাগল উৎসবের রং। নাচ গান চলল ওদের গাঁয়ে গাঁয়ে। আসর বসল শালের ছায়ায়। মহুয়ার ফুল কুড়োবার ধুম পড়ে গেল। হাড়িয়া তৈরি হল সেই ফুলে। তারপর হাড়িয়ার মদে মাতামাতি।

হো সম্প্রদায়ই এ অঞ্চলে সংখ্যায় বেশি। সাঁওতাল আর লোহার আছে অল্পস্বল্প।

পরবে মেয়েদের সাজের বাহার দেখবার মত। বনদেবতা 'জায়েরা'র আস্তানায় পুজো দিতে গেল আমার হাসপাতালের সামনের পথ দিয়ে। খোঁপায় গুঁজেছে লাল সাদা ফুল আর হরেক রকম পাতা। গান গাইছে। বিচিত্র সুর আর ভাষা। তবে এই আদিম অরণ্য পরিবেশের সঙ্গে ওদের এই গানের সুরের কোথায় যেন একটা গভীর যোগ আছে। বহু রাত অবধি শোনা যায় মাদল, নাগরা আর বাঁশির আওয়াজ।

হাসপাতালে বসে বসে শুনতে পাই ওদের গানের সুর। সেই সঙ্গে দু'এক টুকরো কথাও ভেসে আসে।

'হেসামাতা মাতালেনা, বাড়িমাতা মাতালেনা,
হেসামাতা চবজনা, বাড়িমাতা চবজনা,
সমাগেজা তুইম বন্দলেকেনা।'

আমি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ি। উৎসবের দিনগুলোতে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। ওদের গাঁয়ে আমি যেতে আরম্ভ করেছি। কেউবা সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারও চোখে বা কৌতূহল।

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে।

একটা লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল। অমনি গাঁ উজাড়। এ রোগ ধরলে কাছে পিঠে যে থাকবে তার নাকি নিস্তার নেই। কথাটা শুনেই আমি গাঁয়ে গেলাম। লোকটার ঘরে গিয়ে দেখি সে কাতরাচ্ছে। ওষুধপত্র সঙ্গেই ছিল। চিকিৎসা শুরু করলাম। কয়েকদিনের ভেতর লোকটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

একদিন বসে আছি হাসপাতালের বারান্দায়। দেখি, দল বেঁধে আদিবাসী মেয়ে পুরুষ হাজির। কারও হাতে মুরগি, কারও বা পায়রা, আবার কেউ এনেছে মাটির ভাঁড়ে হাড়িয়া। মেয়েরা ফুল এনেছে। কী ব্যাপার! ওদের ভেতর দেখি সেই লোকটি, যার চিকিৎসা আমি করেছিলাম। লোকটি ছিল গাঁয়ের মাতব্বর। সে সেরে উঠেই দলবলকে খবর দিয়েছে। তারা তো তাজ্জব। যে লোকটা নির্ঘাত মরবে সে কিনা এমনি বেঁচে গেল। তারপর সব শুনে ভেট নিয়ে এসেছে আমার কাছে।

BanglaBook.org

মেয়েরা এসে বলল, ফুল নে, তোর বউয়ের লেগে আনলাম।

আর একটি মেয়ে বলল, কই বউ দেখাবি না?

বললাম, আমার বউ নেই।

ওরা সব হেসে লুটিয়ে পড়ল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে আজও আমি বিয়ে করিনি।

তারপর সারা হাসপাতাল ঘুরে উঁকি দিয়ে আমার বউয়ের খোঁজ করতে লাগল। শেষে কোনও মহিলাকে না দেখতে পেয়ে ওরা আবার ফিরে এল। এরপর যে যার নিজেদের খোঁপায় ফুল গুঁজতে লাগল। আমি ওদের কাছ থেকে ফুল চেয়ে নিয়ে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলাম। ওরা আমার কাণ্ড দেখে হেসে অস্থির। ফুলদানিতে যে কেউ কখনও ফুল রাখতে পারে, তা ওরা ধারণাই করতে পারে না।

একজন ফুলদানির দিকে তাকিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটা তোর বউ?

অমনি হাসির ঢেউ উঠল।

এই জঙ্গলের মেয়েগুলির ভেতর এত হাসি, এত প্রাণ আছে দেখলে অবাক হতে হয়।

ওরা মুরগি আর পায়রা আমাকে খেতে দিয়ে গেল। হাসপাতালে বসেই ওরা হাড়িয়া খেল। তারপর আমার উদ্দেশ্যে যে সব প্রশংসা বর্ষণ করতে লাগল তাতে মনে হল আমি একজন ছদ্মবেশী দেবতা।

ওরা চলে গেল, আর আমি সারাদিন বসে বসে ওদের সারল্যের কথা ভাবতে লাগলাম।

৫ মে ঃ

হাডসনের বাংলোতে গিয়ে দেখলাম, কারো নদীর তীর ঘেঁষে যে খালি জায়গাটা পড়েছিল তাতে সারি সারি ক্যাম্প পড়েছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন হাডসন।

সরকার সারান্দা বনে আদিবাসীদের গাছ কাটা নিষেধ করে নাগরা দিয়েছিল। তাতে আদিবাসীরা ভয়ানক ক্ষেপে গেছে।

বললাম, ওদের আস্তানার গাছ ওরা কাটবে, তাতে বাধা দিতে গেলেই বিপত্তি আসবে, এ তো স্বাভাবিক।

কথাটা তা নয় জনসন। প্রথমে ওদের কাছে নামমাত্র খাজনা চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু ওরা আমলই দেয়নি। তখন বনের কাঠ কাটা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

বললাম, আর্মড পুলিস ফোর্স এলো কোত্থেকে?

হাডসন বললেন, আমাদের অনুগত যে ক'টি আদিবাসী নাগরা দেবার কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের একটি ছাড়া আর কেউ ফেরেনি।

খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, কয়েকটি নাগরাওয়ালাকে অগুণতি তীরে গেঁথে গাছের সঙ্গে প্রায় ক্রুশ-বিদ্ধ করে রেখে গেছে। পরিস্থিতি বিশেষ খারাপ হবার আগেই হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠিয়ে ফোর্স আনা হয়েছে।

বললাম, ব্যাপারটা ঘোরাল না করে সহজ সমাধানের একটা পথ বের করলে হত না?

হাডসন মনে হল উত্তেজিত হয়েছেন।

বললেন, রাস্তাঘাট বানাতে সরকারের কি পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে তা তুমি জান, জনসন। যদি তার থেকে ঠিকমত রিটার্ণ না পাওয়া যায় তা হলে সরকার সে লোকসান কতদিন বইতে পারবে। বৃটিশ সরকারের অনুগত কর্মচারী হিসেবে আমাদের এ কথাগুলি ভেবে দেখা দরকার নয় কি?

হাডসনের কথার কোনও জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে রইলাম। ওঁর মুখ থেকেই শুনতে পেলাম, বরাইবুরুতেও এমনি ক্যাম্প পড়েছে।

BanglaBook.org

বললাম, ওরা আমাদের এ ধরনের প্রস্তুতিকে কী চোখে দেখছে, তার খবর কিছু পেয়েছেন?

হাডসন বললেন, টাকা পয়সা আর হাড়িয়া খাইয়ে কতকগুলো ইনফরমার জোগাড় করেছি। তাদের কাছ থেকে যে খবর পেলাম তাতে ও পক্ষের প্রস্তুতি বেশ জোরালই চলেছে বলে মনে হল।

একটু থেমে হাডসন বললেন, ওদিকে ছাতমবুরুর পাহাড়ে লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে। সরকার খুব শীঘ্রই পাহাড় ভেঙে লোহা তোলার ব্যবস্থা করবে। সেজন্যে গুয়াতে একটা কলোনী গড়ে তোলারও পরিকল্পনা হয়েছে। তখন এ অঞ্চলটা অনেক বেশি সুরক্ষিত হয়ে যাবে।

বললাম, এই আদিবাসী হো সম্প্রদায় বনের এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া ওরা অশিক্ষিত। ওদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান খুব সহজ হবে বলে মনে হয় কি?

হাডসন বললেন, যতটা ভাবছ, পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের পক্ষে সে পরিমাণে অনুকূল নয়।

একটু থেমে বললেন, ইনফরমারের কথা যদি মিথ্যে না হয় তা হলে শুনছি আদিবাসী এক রাজ পরিবারের মেয়ে নাকি সমস্ত হোদের সঙ্ঘবদ্ধ করছে।

কথাটা শুনে কেমন যেন চমক লাগল। এদের ভেতর কোন প্রতাপশালী রাজার অস্তিত্ব থাকতে পারে এ আমার কল্পনারও বাইরে। তার ওপর আদিবাসী রাজ পরিবারের মেয়ে হোদের সঙ্ঘবদ্ধ করছে! সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর আমি বিরাট এক রহস্যের গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

ফেরার সময় হাডসনকে তাঁর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, নতুন একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি।

কী রকম?

হাডসন বললেন, আগে আমার কাছে ডরোথিকে দেখলে দু'জনের দিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করতেন। আজকাল ডরোথিকে আমার কাছে আসতে দেখলেই দৌড়ে ঘরে ঢুকে কপাট দিয়ে দেন। অনেক সাধ্যসাধনায় তবে দরজা খোলেন।

খুলেই কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। চোখেমুখে তখন তাঁর কেমন যেন ভয়ের ছায়া এসে পড়ে।

বললাম, পিটার আসেননি ইতিমধ্যে?

এসেছিলেন, কিন্তু রেবেকা তাঁর সঙ্গে দেখাই করলে না। ডরোথি যেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেল, অমনি ওঘর থেকে চেঁচাতে লাগলো রেবেকা।

হাসপাতালে ফিরতে গিয়ে সারাপথ নানা চিন্তায় ডুবে রইলাম। এই শান্ত নিরুপদ্রব হো'রা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল কেন? কেনই বা একজনের জন্মগত অধিকার থেকে অন্যজন তাকে বঞ্চিত করতে চায়। কী লাভ এই বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে।

মনে হল সেই হো-রাজকুমারীর কথা। এই অরণ্যের ভেতর এমন আগুনই বা ছিল কোথায়! তার শিখায় একদিন হয়তো সমস্ত বনভূমি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

১২ মে ঃ

দূর পাহাড়ে আগুন লেগেছে। হাসপাতালের সামনের দাওয়ায় বসে দেখছি। মনে হল আগুনের ফুল দিয়ে একটি মালা গাঁথা হচ্ছে। ক্রমে মালাটি বেড়ে চলল। তারপর একসময় মনে হল পাহাড়ের গলায় সে মালা সম্পূর্ণ হয়ে দুলছে।

কী প্রচণ্ড গরম এ দেশে। ঘরের বাইরে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কোনও কোনও পাহাড়ে লোহার পরিমাণ খুব বেশি, গরমও তাই প্রচণ্ড। পাথরের ওপর পাথর গড়িয়ে পড়ল, অমনি আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুনের ছোঁয়া লাগল গাছের শুকনো পাতার রাশে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তারপর সামনে কিছু পড়ল, অগ্নিনাগ সব গ্রাস করে চলল।

BanglaBook.org

গরমের দিনে বনে বনে এমনি আগুন লাগে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ বেড়ে যায় তখন। দামি গাছগুলোকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে। যেদিকে আগুন আসছে সেদিকের শুকনো পাতার রাশ বনবিভাগের লোকজন লাইন ধরে পরিষ্কার করে ফেলে। সাধারণতঃ নদী বা জলার দিকে শুকনো পাতা লাইন করে জড়ো করা হয়। আগুন ওই লাইন ধরে যেতে যেতে এক সময় নদী বা জলাশয়ে এসে নিভে যায়।

এবার যেমন গরম পড়েছে অত্যধিক, তেমনি আগুনও জ্বলছে চারদিকে। রাতে যেদিকে তাকাই সেদিকে আলোর মালা। বন পুড়ছে, আদিবাসীদের ঘর পুড়ছে, পশুপাখি পুড়ে মরছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরুলে বনে বনে বিরাট অংশ জুড়ে কালো কালো চিহ্ন দেখা যায়। আগুনের ধ্বংসলীলা এগুলি।

সেদিন বসে আছি, দশ বারোটি আদিবাসী দোলায় করে নিয়ে এল কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে। আগুনে পুড়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করলাম। সবাইকে বাঁচানো গেল না। দুটি মারা গেল। তাদের মুখ চোখ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এমন অবস্থায় বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। কিন্তু ডাক্তারের ভাবনা তা নয়, যেমন করে বাঁচুক, চেষ্টা করে যেতে হবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার।

একটি দল ভাল হয়ে গেল দেখে আগুনে-পোড়া রোগীরা দূর দূর জঙ্গল থেকে আসতে লাগল। আমার ছোট হাসপাতালে আর জায়গা দিতে পারা গেল না। এখন ঘোড়ায় চড়ে ওষুধের বাক্সপত্র নিয়ে যেতে হচ্ছে বিভিন্ন জঙ্গল এলাকায়! গ্রামের লোকদের সঙ্গে এমনিভাবে সেবার ভেতর দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে আমার পরিচিতি।

পথের দু'পাশে ওদের লম্বা ধরনের ঘর। মাটির বা পাথরের দেয়াল। খাপরার ছাউনি। ঘরের মুখগুলো কিন্তু পথের দিকে নয়।

হামা দিয়ে আমাকে অনেক সময় ঘরের ভেতর ঢুকতে হয়। এদের ঘরের মাঝে এক ধরনের উঁচু বেদি আছে। সেই বেদিকে ওরা বলে আদিং। আদিংকে ওরা বিশেষ পবিত্রভাবেই রাখে। হো-দের পূর্বপুরুষদের আত্মা নাকি থাকে তার ভেতর।

হাসপাতালে ফিরতে ফিরতে ভাবি, কত বিচিত্র সংস্কার মানুষের।

১৭ জুন ঃ

কয়েকদিন আগে হাসপাতালে ফিরে দেখি হাডসন আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, পাশে ডরোথি।

কি ব্যাপার? হাডসনকে জিজ্ঞেস করলাম।

ডরোথিকে দেখিয়ে হাডসন বললেন, বিভ্রাট বাধিয়েছে। টন্‌শিলটা এত বড় হয়েছে অপারেশন না করলেই নয়। বম্বেতে থাকার সময়ে অপারেশনের কথা উঠেছিল, কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। এখন তোমার হেফাজতেই অপারেশনের কাজটা হয়ে যাক। ডরোথিও তাই চায়।

ভর্তি করে নিলাম ডরোথিকে। জরুরী কাজ ছিল হাডসনের, থাকতে পারলেন না।

যাবার সময় বলে গেলেন, কয়েকটা দিন ডরোথি থাকবে তোমার এখানে। আমি সময়মতো একদিন এসে ওকে নিয়ে যাব।

বললাম, খুব আনন্দের কথা।

পরের দিন ডরোথির অপারেশন। সব প্রস্তুত। এনাস্থেসিয়া দেওয়া হল।

একি শুনতে পাচ্ছি! এনাস্থেসিয়ার প্রভাবে ডরোথির অবচেতন মনের কয়েক টুকরো কথা বেরিয়ে এল। কথাগুলি অসংলগ্ন, তবু তার মূল্য কম নয়।

'পিটারকে আমি ভালবাসি। তুমি বিবাহিতা।' 'কাছে এসো না আমাদের, এসো না বলছি'।

BanglaBook.org

— 'চিঠি পাবে না, কিছুতেই পাবে না।' 'সরে যাও রেবেকা, নইলে হাডসনকে তোমার সব চিঠি দেখিয়ে দেব।'

অপারেশন শেষ করলাম। ডরোথি ঝিমিয়ে পড়ে রইল। জ্ঞান আসতে দেরি আছে। হাসপাতালের বারান্দায় বসে চিন্তা করতে লাগলাম।

ডরোথি পিটারকে ভালবাসে। রেবেকা হাডসনের বিবাহিতা স্ত্রী। প্রকাশ্যে একজন পাদ্রীর ওপর সে ভালবাসা দেখাতে পারছে না। কিন্তু চিঠি এল কোত্থেকে!

হঠাৎ রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়ে গেল। রেবেকার কোনও কিছু খোঁজার অর্থ পরিষ্কার হয়ে এল। নিশ্চয়ই ডরোথি পিটারকে লেখা রেবেকার প্রেমপত্র কোনওরকমে সংগ্রহ করে লুকিয়েছে। এটা রেবেকাকে ডরোথির ভয় দেখানোর কৌশল। রেবেকাকে ভয় দেখিয়ে পিটারের কাছ থেকে দূরে রাখাই তার উদ্দেশ্য। 'হাডসনকে তোমার সব চিঠি দেখিয়ে দেব।' ডরোথি এই এক টুকরো কথায় সবকিছু স্পষ্ট করে ধরে দিয়েছে। রেবেকার উন্মাদনা তা হলে এই কারণে। প্রথম দিকে সে হাডসন আর ডরোথিকে চোখে চোখে রেখেছিল, তার কারণ ডরোথি হাডসনকে তার চিঠির কথা বলে কিনা দেখার জন্যে। পরে তার পাগলামো যখন বাড়ল তখন তার মনে হল, হাডসন নিশ্চয়ই তার গোপন প্রণয়পত্রের কথা জানতে পেরেছে। ইদানিং তাই সে ভয়ে ভয়ে থাকতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু রেবেকার চিঠিগুলো ডরোথি কোথায় লুকিয়েছে। নিশ্চয়ই ডরোথি কাছ ছাড়া করেনি সেগুলো। সুটকেশের ভেতরে ওর দৈনন্দিন ব্যবহারের পোশাক আশাক রয়েছে। নাড়াচাড়া করতে করতে তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একরাশ চিঠি।

এ চিঠি নিশ্চয়ই রেবেকার। কারণ রেবেকার হাতের লেখা আমার কাছে অপরিচিত নয়। মাঝে মাঝে বাংলো থেকে আমার নিমন্ত্রণ আসত। সেই নিমন্ত্রণের চিঠি রেবেকাই লিখে পাঠাতেন। তাঁর চিঠির ভাষাও ছিল বিশেষ উপভোগ্য।

চিঠিগুলো কাছে রেখে দিলাম, ডরোথি সুস্থ হয়ে উঠল।

হাডসনের কাছে চিঠি লিখলাম, তিনি যেন রেবেকাকে অবশ্যই পাঠিয়ে দেন হাসপাতালে। আমি তাঁর চিকিৎসা করব।

হাডসন চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই রেবেকাকে নিয়ে এলেন।

বললাম দু'বোনকে আমি কয়েকদিন এক সঙ্গেই রাখতে চাই।

হাডসন বললেন, স্বচ্ছন্দে।

উনি চলে গেলে রেবেকাকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম শালবনে বেড়াতে।

আমার কাছে রেবেকা চুপচাপ থাকেন, এটা লক্ষ করেছি। আমি আগে চলেছি, রেবেকা আসছেন পিছনে। এবার একটু পিছিয়ে ওঁর পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

বললাম, আপনার ব্যবহার আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে।

রেবেকা আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, আপনার কোনওরকম উপকার করতে পারলে আমি খুব খুশি হই।

রেবেকার মুখে কেমন যেন ভাবান্তর হল।

বললেন, আপনি আমার উপকার করতে পারেন, সত্যি বলুন?

নিশ্চয়ই পারি।

আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে রেবেকা আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন, না, আপনি পারেন না।

সামনের একটা পাথর দেখিয়ে বললাম, আসুন এর ওপর বসা যাক্।

রেবেকা আর আমি বসলাম পাথরটার ওপর।

BanglaBook.org

পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করে রেবেকার হাতে দিয়ে বললাম, দেখুন তো হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কিনা।

মানুষের মুখের এমন পরিবর্তন আমি আগে কখনও লক্ষ করিনি।

মুহূর্তে রেবেকা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, এ চিঠি আমার, এ চিঠি আমার।

পরক্ষণেই আমার দিকে তাকিয়ে কাগজের মতো রক্তশূন্য হয়ে গেলেন।

এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন ডাক্তার জনসন? ডরোথি আমার সব চিঠিই তো চার্চে গিয়ে পিটারের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে।

বললাম, আমি যদি আপনাকে আপনার সবগুলো চিঠিই ফিরিয়ে দিই।

আমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসলেন রেবেকা।

চিরদিন কৃতজ্ঞ হয়ে রইব মিঃ জনসন।

বললাম, প্রতিদানে আমি যদি কিছু চাই, দেবেন?

নিশ্চয়ই দিতে চেষ্টা করব জনসন।

বললাম, কথা দিন হাডসনকে ছেড়ে কোনও দিন আর পিটারের কাছে যাবেন না।

কতক্ষণ আপন মনে কী ভাবলেন রেবেকা। দু'চোখ বেয়ে জল নামল। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আমি আর বাধা দিলাম না। কাঁদতে কাঁদতে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেলে মানসিক যন্ত্রণার গুরুভারটা নেমে যাবে।

এক সময় শান্ত হলেন রেবেকা।

বললেন, আমি জানতে চাই না কী করে ডরোথির কাছ থেকে আপনি আমার চিঠিগুলো উদ্ধার করলেন। তবে আমি আর পিটারের কাছে যাব না কথা দিচ্ছি।

ওঁর হাতে চিঠির গোছা তুলে দিতে যেতেই উনি কী যেন ভাবলেন।

আপনি ওগুলো রেখে দিন মিঃ জনসন। মানুষের মন, কখন কী হয় বলা যায় না। চিঠিগুলো আপনার কাছে থাকলে তবু মনে একটা ভয় থাকবে।

বললাম, আপনার ভয় থাকবে কিনা জানিনা, তবে আমি নির্ভয় হয়েছি, এ কথা বলতে পারি।

চিঠিগুলো পাথরের ওপর জড়ো করলাম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

দাউ দাউ করে রেবেকার জীবনের অনেক স্মৃতি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল।

২২ আগস্ট ঃ

কয়েক মাস বর্ষার ভেতর কাটল। এবার পথের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। সরকারী বন-বিভাগের পুলিশের যাতায়াতের জন্যে হাডসন বিশেষ পরিশ্রম করে পথঘাট ভালভাবে মেরামত করেছিলেন। বর্ষায় কর আদায় কিংবা জঙ্গলের বাসিন্দাদের ওপর জোর জুলুমের কোনও চেষ্টাই করা হল না।

এই বর্ষায় আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। কাজের ভেতর থেকেও যা আমি একেবারেই ভুলতে পারছি না।

কয়েকদিন একটানা বৃষ্টির ভেতর হাসপাতালে বন্দি থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম! হঠাৎ সকাল থেকে মেঘ কেটে গেল।

বর্ষাধোয়া আকাশে সোনা রংয়ের রোদ্দুরটুকু বড় উপভোগ্য হয়ে উঠল। আমি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথের ধারে গাছপালার মখমলের মত সবুজ পাতার ওপর থেকে রোদের সোনা গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাই দেখতে দেখতে চললাম। পাহাড়ি ঝোরার ধারে ওই যে বসে আছে ধনেশ পাখি। বড় বড় বাঁকানো শান দেওয়া ঠোঁট। হরিয়াল উড়ে গেল। আকাশের গায়ে যেন মিশে

BanglaBook.org

গেল আকাশি রঙ। পথে পথে বন যুঁই। সবুজ পাতার ওপর একরাশ সাদা তারা-ফুল ফুটিয়ে রেখেছে। কী মিষ্টি গন্ধ।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি আর প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য দেখছি। দেখতে দেখতে কতদূর চলে এসেছি, বুঝতে পারিনি।

সামনে আর এক রূপের জগত আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

একটি শালগাছের তলায়, যেখানে পাথরের গর্তের ভেতর বর্ষায় জল জমে ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে শিশুকে নিয়ে মা-হরিণী।

জল খেতে এসেছে বোধহয়। ঘোড়ার পায়ের সাড়া পেয়ে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বর্ষাধোয়া রোদ তাদের সুচিক্কণ দেহের ওপর যেন পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

ওরা তাকিয়ে আছে, আমিও ওদের থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। মা-হরিণী বাচ্চাটাকে লেহন করতে লাগল। এত স্নেহ জননীর। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। কত শৈশবে মাকে হারিয়েছি।

বর্ষাধোয়া প্রকৃতির মত মনটা কেমন ভিজে নরম হয়ে গেল।

বেলা বাড়ল। আমি এপথে ওপথে চলতে লাগলাম। যখন খেয়াল হল তখন দেখি আমি চেনা পথ হারিয়েছি। একটি পথ ধরে কিছু সময় ঘোড়া ছুটিয়ে যাই, আবার অন্য পথ ধরি। এমনি ভাবে চলতে চলতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এদিকে আকাশ ঘিরে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

সামনে একটি উঁচু টিলা দেখে ঘোড়া ছেড়ে তার ওপরে উঠলাম; যদি এর ওপর থেকে কোনওরকম চেনা জায়গার সন্ধান পাওয়া যায়। টিলার ওপর উঠে সামনে যতদূর দেখা যায়, অসংখ্য পাহাড়ের রাজ্য।

নীলে সবুজে মেশা পর্বত-তরঙ্গ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কী অপরূপ সৌন্দর্য ঈশ্বর এই দুটি চোখের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন।

বামে চোখ পড়তে দেখলাম, খুব কাছেই একটি উপত্যকা। সহসা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। গাছপালার ফাঁকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা ভাঙা দুর্গের মত কী যেন আমার চোখে পড়ল।

এখানে আদিবাসী এলাকায় দুর্গ এল কোথা থেকে! ভাল করে দেখলাম, মন্দির রয়েছে একদিকে। একটি জলধারা বয়ে চলেছে দুর্গটি বেষ্টন করে।

কতক্ষণ এমনি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ একটা নাগরার আওয়াজ শুনে টিলার ওপর থেকে নেমে এলাম। কোথা থেকে নাগরার শব্দটা আসছে বোঝা গেল না, কারণ মুহূর্তে সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে-পাহাড়ে। দূরে কাছে যত পাহাড় আছে, মনে হল তাদের প্রতিটির থেকেই এ শব্দ-তরঙ্গ উঠে আসছে।

টিলার থেকে নেমেই ঘোড়ায় চড়ে যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে ফিরে চললাম। পাহাড়ি বাঁক ঘুরতেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার বিস্ময় চরমে উঠল।

ঘোড়ার ওপর চড়ে একটি মেয়ে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণ হো সম্প্রদায়ের মেয়েদের ভেতর যে ধরনের গড়ন দেখেছি তার থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। কেবল গায়ের রঙের কিছুটা মিল রয়েছে, তবু আদিবাসী হোদের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। দেহের গড়ন সুঠাম। মনে হল যেন পাথর কুঁদে দক্ষ কোনও শিল্পী এ মূর্তিটি গড়েছেন।

আমি তার উপস্থিতি ভুলে, সেই বিশেষ ধরনের পরিবেশের কথা ভুলে, তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটি প্রথমে কথা বলল, এ অঞ্চলে আসার কারণটা জানতে পারি কি?

পথ হারিয়ে হঠাৎ এসে পড়েছি।

BanglaBook.org

আস্তানা বরাইবুরু না কুম্‌ডির বাংলো?

বললাম, ও দুটোর কোনওটাতেই নয়।

তবে? কথার ভেতর সামান্য একটু ঝাঁঝ ছিল।

বললাম, থলকোবাদের হাসপাতালে আপাততঃ আমার ডেরা।

মেয়েটি সহসা ঘোড়ার থেকে নেমে মাথা নত করে আমাকে অভিবাদন জানাল।

আপনিই ডাক্তার জনসন!

কথা শুনে আমি হতবাক। এতদূরে এই রহস্যময়ী মেয়েটি আমার নাম জানলো কী করে!

আমাকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি বলল, এর আগে আপনাকে আমি না দেখলেও, আপনার নাম আমার কাছে অপরিচিত নয়।

আকাশে মেঘের ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি, বর্ষার প্রায় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে।

মেয়েটি কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, দূরে এসে পড়েছেন ডাক্তার জনসন, তা ছাড়া এই ছোটনাগরা এলাকাটিও ইংরাজদের পক্ষে খুব সুখকর নয়। আসুন, আপনাকে পথে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

মেয়েটি আগে আগে চলল, আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। ভাঙা চোরা, উঁচুনিচু কত অজানা অচেনা পথ ধরে মেয়েটি অবলীলায় এগিয়ে চলল, আর আমি তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করতে লাগলাম।

এক জায়গায় এসে দেখলাম, দুটি পাহাড়ের মাঝে গিরিসঙ্কট। সেই ফাঁকে একটি খরস্রোতা জলধারা বয়ে চলে গেছে উপত্যকার একেবারে ভেতরে। কাছাকাছি এসেই মেয়েটি বলল, সাবধানে আমাকে লক্ষ রেখে আসুন।

ওকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সেই দুর্গম স্থানটি পার হলাম।

মনে হল, এই অঞ্চল মেয়েটির একেবারে নখদর্পণে।

এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার পথ প্রদর্শিকা বলল, এখন যতদূর সম্ভব দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে আমাকে অনুসরণ করুন। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। বৃষ্টি হলেই কোয়েল নদীতে বান আসবে। তখন পার হওয়া দুঃসাধ্য হবে। পথ সংক্ষেপ করার জন্যে ওপরের পথ ছেড়ে নীচের পথেই আমাদের চলতে হচ্ছে।

বেশ কিছু সময় চলার পর আমরা কোয়েলের কূলে এসে পৌঁছলাম। পার হতে গিয়ে ঘোড়ার বুক অবধি জলে ডুবল। আমরা ঘোড়ার ওপর প্রায় দাঁড়িয়েই পার হলাম, তাই পোশাক কোনওরকমে রক্ষা পেল।

কোয়েল পেরিয়ে আসতেই চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এল। আরও কিছু পথ একসঙ্গে আসার পর মেয়েটি বলল, আশাকরি এখন আপনি আপনার চেনা পথ পেয়ে গেছেন।

এতক্ষণ ওকেই অনুসরণ করে এসেছি, তাই পথ চেনার দরকার হয়নি, এখন চোখ মেলে ভাল করে চারদিকে তাকালাম।

সামনেই কুম্‌ডির পথ চলে গেছে। দু'জনে পথের ওপর উঠে এলাম।

মেয়েটি ঘোড়ার থেকে নেমে দাঁড়াল, আমিও নামলাম।

আপনি আমাদের জঙ্গলের লোকদের ভালবাসেন, সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

বললাম, ডাক্তারের কাছে যেমন রোগের বিচার নেই, চিকিৎসাই একমাত্র ধর্ম, ঠিক তেমনি মানুষেরও বিচার নেই। সেবা করার জন্যেই আমাদের ডাক্তারী শিক্ষা।

ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে ততক্ষণে। রহস্যময়ী মেয়েটি আমাকে শেষবারের মত অভিবাদন জানিয়ে বলল, আশা করি আজকের এই সাক্ষাতের কথা লোকের মুখে মুখে রটবে না।

বললাম, ডাক্তার জনসন অকৃতজ্ঞ নয়।

BanglaBook.org

বৃষ্টি জোরে জোরে পড়তে লাগল। বাতাস বইল। মেয়েটি ঘোড়ায় চড়ে বলল, আপনি যান ডাক্তার জনসন। বান আসার আগেই আমাকে অন্ততঃ কোয়েল নদী পার হয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

দ্রুত ঘোড়া ছুটল। চোখের পলকে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল!

আমি ফিরে চললাম কুম্‌ডির বাংলো লক্ষ করে। কিন্তু অল্প দূর যেতে না যেতেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বাতাসের বেগও দ্রুত হল। একান্ত চেনা পথে আমায় বিশেষ কোনও অসুবিধেয় পড়তে হল না। কুম্‌ডির বাংলোতে বেলা শেষের আগেই পৌঁছে গেলাম। কিন্তু আমার চিন্তায় কেবল একটি কথা আসা যাওয়া করতে লাগল, বান আসার আগেই রহস্যময়ী নদী পার হয়ে যেতে পেরেছে কী!

১৯ ডিসেম্বর ঃ

প্রথমে সাসাংদা গীর্জা আক্রান্ত হল। আগুন লাগিয়ে কাঠ আর খড়ের তৈরি গীর্জা, সংলগ্ন বাসগৃহগুলি পুড়িয়ে দিল বিদ্রোহীরা।

তার আগে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল ছাতমবুরুতে। হোদের ঈশ্বর সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার আস্তানা ছিল ওই পাহাড়ে। সেখানে সরকার লোহার সন্ধান পেয়েছিল, সুতরাং সরকারী নিয়ন্ত্রণের ভেতর আনা হল ছাতিমবুরুকে। বসল সেখানে সশস্ত্র রক্ষীদল।

হোদের অসন্তোষ আগেই ধূমায়িত হয়েছিল। সরকারকে কর দেবার ব্যাপারে, বনে কাঠ কাটার ওপর নিষেধ জারির ব্যাপারে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তার ওপর ধর্মস্থান যখন বন্ধ হল তখন ধূমায়িত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

এর ফলে সাসাংদার গীর্জায় প্রথম শুরু হল বিদ্রোহীদের হানা। পিটার আর তাঁর দলবলের ওপর কোনও রকম আক্রমণ করা হল না। তাঁরা কুম্‌ডির ডাক বাংলোতেই আশ্রয় নিলেন।

সরকারী পুলিশ ফোর্স গেল সাসাংদায়। হার মানলেই বিদ্রোহীরা সুযোগ পাবে বেড়ে ওঠার। তাই নতুন করে গীর্জা তৈরির কাজ শুরু হল। কয়েকদিনের ভেতর নতুন ছাউনি উঠল। আবার পিটার চললেন তাঁর দলবল নিয়ে। এবার গীর্জা সংলগ্ন জমিতে পুলিশ ব্যারাকও তৈরি হল। গীর্জা আক্রান্ত হলে সরকারী বাহিনী তা রক্ষা করবে। এদিকে আদিবাসীদের ভেতর যারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা দলে দলে চলে এল সাসাংদার কাছাকাছি। সরকারের আশ্রয় না থাকলে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সরকারী পুলিশ সাসাংদার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও টহল দিতে শুরু করল।

কয়েকদিন চুপচাপ কেটে গেল। সরকারী বাহিনী পর্যবেক্ষণ করতে লাগল আক্রমণের প্রকৃতি। কিন্তু কোনওদিক থেকেই কোনওরকম সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল ইনফরমারদের মুখে শোনা যেতে লাগল নানান কাহিনী। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হো, লোহার, মুণ্ডা, সাঁওতাল সম্প্রদায়কে একত্রিত করা হচ্ছে। ওই একটি মেয়েই এ কাজে অগ্রণী হয়েছে।

মনে মনে মেয়েটিকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না। আমি নিশ্চয়ই দেখেছি তাকে। আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, সেই রহস্যময়ী তরুণীর দ্বারা সব কিছুই করা সম্ভব।

মেয়েটির নাম নাকি শনিচারি। নামটা বার বার উচ্চারণ করলাম। তার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল আমার চোখের ওপর। কিন্তু আমি কারও কাছে তার কথা বলতে পারলাম না। আবার খবর পেলাম সাসাংদার গীর্জা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সংলগ্ন গ্রামের একটি কুটিরও অক্ষত নেই। এত কড়া পাহারার ভেতর কী করে এমন কাণ্ড ঘটল, তা ভেবে প্রথমে বিস্মিত হলাম। পরে শুনলাম, মাঝরাতে যখন সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, শুধু দু'একজন পাহারাদার গীর্জা সংলগ্ন ব্যারাকে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তখনি আক্রমণ শুরু হয়।

BanglaBook.org

সকলে জেগে উঠে দেখে গীর্জা জ্বলছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে গ্রামখানা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বিদ্রোহীদের ভেতর একটি মানুষেরও সন্ধান পাওয়া গেল না।

ভোরে উঠে রহস্যের সমাধান হল। তীরের মুখে আগুন জ্বেলে দূর থেকে বিদ্রোহীরা গীর্জা আর গ্রাম লক্ষ করে ছুঁড়েছে। তার ফলে এই অগ্নিকাণ্ড।

সরকার এবার এক একটি গ্রাম লক্ষ করে ঘেরাও করল। কর আদায়ের জন্যে মারধোর শুরু হল। কিন্তু খবর পেলাম, একটিও মানুষের কাছ থেকে নাকি কর আদায় করা সম্ভব হয়নি। গ্রামের মাতব্বরদের ধরে নিয়ে আসা হল বরাইবুরুর ক্যাম্পে। সেখানে তাদের ওপর চলল অত্যাচার। কিন্তু কারও মুখ থেকে তাদের প্রধান ঘাঁটির খবর বের করা গেল না।

বরাইবুরুতে গড়ে উঠেছিল সাময়িক কয়েদখানা। দলে দলে আদিবাসীদের ধরে নিয়ে এসে সেখানে কয়েদ করে রাখা হত। কথা আদায়ের জন্যে চলত নানা ধরনের অত্যাচার।

একদিন বরাইবুরুর কোয়ার্টার থেকে আমার ডাক এল। গিয়ে দেখি, কয়েকটি আদিবাসী কয়েদখানার মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাদের নাকে মুখে রক্ত চাপ বেঁধে জমে আছে।

শুনলাম, তাদের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে অতিরিক্ত প্রহারের ফল।

এদের সুস্থ করে তোলার ভার পড়ল আমার ওপর। কারণ এরা নাকি অনেক কিছুই জানে। বিদ্রোহী আদিবাসী দলের অন্যতম তিনজন প্রধান এরা।

সাধ্যমত চিকিৎসা করলাম। আর্তের চিকিৎসা করা আমার কর্তব্য বলে আমি করলাম। কিন্তু যে অবস্থার ভেতর ওরা পড়েছে তাতে মৃত্যুর আগে নিষ্কৃতি পাবে বলে মনে হল না।

শুনলাম, এরা একটু সুস্থ হলেই আবার শুরু হবে জেরা। দিনরাত্রি পুলিশের লোক এদের সঙ্গে কথা কইবে। বিশ্রামের কোনও সুযোগই দেওয়া হবে না এদের। তারপর নখের ভেতর সূঁচ ঢুকিয়ে গোপন কথা আদায়ের চেষ্টা চলবে।

ফিরে এলাম হাসপাতালে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মানুষের ওপর এ ধরনের নির্দয় অত্যাচারের ভেতরে যে পশু মনোবৃত্তি আছে আমার আত্মাকে বার বার তা পীড়া দিতে লাগল। একবার ভাবলাম, চাকরী ছেড়ে চলে যাব এখান থেকে। আবার মনে হল, এখানে থাকলে তবু আহতের সেবার সুযোগ পাওয়া যাবে। সাধ্যমত তাদের সারিয়ে তোলার চেষ্টা করব। আমার জাতি, আমার দেশ আজ ভিন্ন দেশের মানুষের ওপর যে অন্যায় আচরণ করছে, তার সামান্য কিছু যদি আমার সেবার ভেতর দিয়ে লাঘব করতে পারি।

সেদিন আর একটি অমানুষিক ঘটনা ঘটতে দেখলাম।

বরাইবুরু থেকে ডাক আসতে গিয়ে দেখি, একটি মেয়ে কয়েদখানায় পড়ে আছে। দেহ তার ক্ষত বিক্ষত। পরীক্ষা করে দেখলাম, অত্যাচারের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। মানুষের পশুবৃত্তি কতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তার পরিচয় পেলাম সেদিন।

চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাঁচান গেল না।

মেয়েটি নাকি কয়েকদিন আগে উপযাচক হয়ে এসেছিল ইনফরমারের কাজ করবে বলে। তারই নির্দেশমত এখানকার পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের একটা গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধানে যায়। মেয়েটিকে কিন্তু আটকে রাখা হয় বরাইবুরুর ব্যারাকে।

পুলিশ বাহিনী মেয়েটির নির্দেশমত এসে পৌঁছল একটি পাহাড়ি নদীর কাছে। নদীতে জল ছিল হাঁটু পরিমাণ। সেখান থেকে গুপ্ত ঘাঁটির দূরত্বও ছিল অনেকখানি। তারা যখন সবাই মিলে নদী পার হচ্ছিল, তখন হঠাৎ পাশের জঙ্গল থেকে ঝাঁক ঝাঁক তীর এসে পড়তে লাগল তাদের ওপর। দু'চারটি ছাড়া বিরাট পুলিশ বাহিনীর প্রায় সব ক'টিই নিঃশেষ হয়ে গেল।

এরপর মেয়েটির ওপর শুরু হল অত্যাচার। প্রতিপক্ষের গুপ্তচরের ওপর যে ধরনের আচরণ এদের বিধানে আছে, তার সব ক'টিরই পরীক্ষা করতে লাগল এরা।

BanglaBook.org

শুনলাম, পুলিশ বাহিনীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার খবর শুনে মেয়েটি সেই যে হাসি শুরু করেছিল, অজ্ঞান হয়ে যাবার মুহূর্ত পযন্ত সে হাসি আর থামেনি।

সে নাকি অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে বলেছিল, তার স্বামীকে মেরে ফেলার প্রতিশোধ সে নিয়েছে।

মৃতের কাছ থেকে উঠে আসার সময় শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে মনে মনে বললাম, এ দেশের মানুষের ওপর আমার শ্রদ্ধা তুমি বাড়িয়ে দিলে। আমার অন্তরের অভিনন্দন রইল তোমার উদ্দেশ্যে। সর্বময় প্রভু তোমার মঙ্গল করুন।

১৪ ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯০০

একটি খবর শোনা গেল। উড়িষ্যা থেকে আদিবাসীরা দলে দলে আসছে সারান্দা বনের দিকে, হাতে তাদের তীর ধনু আর টাঙি। সরকারী গুমটির টহলরত দু'জন পুলিশ তাদের দেখতে পেয়েছিল, গতিরোধের চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু তারা সমর্থ হয়নি। এক রাত বন্দী থেকে তারা ফিরে এসেছে। তাদের মুখে শোনা গেল এক রহস্যজনক কাহিনী। একটি অশ্বারোহিণী মেয়ে, হাতে তলোয়ার নিয়ে পরিচালনা করছে সমস্ত দলটিকে। গভীর পাহাড়ি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে দলে দলে তারা এগিয়ে আসছে। রাতে মশাল জ্বেলে চলেছে তারা। দিনের বেলা ঘন বনের ভেতর আত্মগোপন করছে। তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে টহলদারী পুলিশেরা বন্দি হয়েছিল।

এক রাত তাদের নাকি কাটাতে হয়েছিল ওই আদিবাসীদের সঙ্গে। বিশেষ অভিজ্ঞতা নিয়েই তারা ফিরে এসেছে ক্যাম্পে।

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলের নেত্রীর নির্দেশে তারা সকলে মিলে প্রার্থনা করে। তারপর নেত্রী তাদের সামনে আদিবাসীদের অধিকার সম্বন্ধে, তাদের একতা সম্বন্ধে, কথা বলে যায়। সে কথা নাকি আদিবাসীরা গভীর আগ্রহে শোনে। প্রাণ দিয়েও নেত্রীর অনুগত থাকবে বলে তারা প্রতিজ্ঞা করে।

সবশেষে শুরু হয় নাচ আর গানের আসর। দীর্ঘ পথ চলতে গিয়ে তাদের মন যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে সেজন্য এই ব্যবস্থা। মণ্ডলের মাঝে ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে থাকে নেত্রী। তাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় নৃত্য আর গীত। সে এক বিশেষ উপভোগ্য দৃশ্য। টহলদার পুলিশের সামনেও এমনি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়েছে। তারপর নেত্রী পুলিশদের বলেছে, তোমরা দেশের মানুষ হয়ে কেন এমন শত্রুতা করছ আমাদের সঙ্গে।

পরের দিন সকালে অবশ্য তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তারা ফিরে আসার সময়ে নেত্রী বলে দিয়েছে, সরকারকে প্রস্তুত থাকতে বলো। আমাদের দেশের এই সরল মানুষগুলি সহজে তাদের অধিকার ছেড়ে দেবে না।

বসে বসে ভাবছি, এ নিশ্চয়ই সেই অরণ্য-কন্যা, যার ক্ষণিক সঙ্গ আমি পেয়েছিলাম। সেদিন তার চোখে মুখে যে দীপ্তি, যে পরোপকার-ব্রত দেখেছি, আজ মনে মনে তাই আর একবার স্মরণ করলাম। নেত্রী হবার উপযুক্তই বটে। কিন্তু কোথায় ছিল এ অরণ্য-অগ্নি। যে সব আদিবাসীদের সঙ্গে আমি মিশেছি, তাদের ভেতর এ স্ফুলিঙ্গ তো কোনও দিন দেখিনি।

হয়ত এমনি হয়। যখন মানুষ অত্যাচারের শেষ সীমায় এসে দাঁড়ায় তখন তারা মরিয়া হয়ে ওঠে।

তারা আঘাত হানবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সেদিন তাদের পরিচালনা করবার জন্য তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় উপযুক্ত কোনও চালক।

জোয়ান অব আর্কের কথা মনে পড়ল। আমাদের জাতির মানুষ যখন পর-রাজ্যের লোভে এগিয়েছে, তখনই নিপীড়িত মানুষের মধ্য থেকে জেগে উঠেছে মহিয়সী মহিলা জোয়ান।

BanglaBook.org

আজ আমার চোখের ওপর নতুন এক জোয়ানের আবির্ভাবের ছবি ফুটে উঠেছে। জোয়ানকে যে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছিল, দেখছি সেই অগ্নি থেকেই যেন শাণিত তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে আসছে আর এক অগ্নি-কন্যা। আমি ভয় পেলাম না। আমার জাতির অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মনে মনে তাকে স্বাগত জানালাম।

১৭ মে ঃ ১৯০০

এবার হাডসন বরাইবুরুর হেড কোয়ার্টারে একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। তার পরিকল্পনাটি ছিল এইরূপ, গ্রীষ্মকালে বনে বনে যখন আগুন লাগবে, আর সে আগুন ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে, তখন তাকে নেভাবার কোনও চেষ্টাই করা হবে না; বরং নদীর বিপরীত মুখে দুর্গম আদিবাসী এলাকায় যাতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

হেড কোয়ার্টার মেনে নিল হাডসনের এই পরিকল্পনা। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরের মত এ বছরও আগুনের ভয়াবহ খেলা শুরু হয়ে গেল।

সরকারী চেষ্টায় যে আগুনের গতি নদীর পথে চালনা করা হত, তা আর হতে পারল না। ফলে, আগুনের তাণ্ডব চলল সারা গ্রীষ্মকাল ধরে।

আমার হাসপাতালে কিছু কিছু আগুনে পোড়া রোগী আসতে লাগল। আমি তাদের সেবায় রাত দিন নিযুক্ত রইলাম। কিন্তু বেশিদিন তা করা চলল না। সরকার থেকে আমার কাছে কড়া নির্দেশ এল, আমি যেন আদিবাসী রোগীদের সরকারী হাসপাতালে ভর্তি না করি।

এর উত্তরে আমি জানালাম, আমি ডাক্তার, রোগী এলে তাদের ফেরানো আমার সাধারণ সেবাকর্মের নীতির বাইরে। সুতরাং আমাকে এই হাসপাতালের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

আমার সাফ জবাবে কতৃপক্ষ কিছুটা নরম হলেন। তাঁরা আর আমাকে বরখাস্ত বা বদলী করতে চাইলেন না।

কিন্তু আর একটি উপায় তাঁরা অবলম্বন করলেন।

বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে নাগরা পিটিয়ে ঘোষণা করতে লাগলেন যে, এরপর যদি কোনও আগুনে পোড়া রোগীকে হাসপাতালের পথে বয়ে আনতে দেখা যায় তা হলে তাদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

এই ঘোষণায় আমি খুবই আহত হলাম। কিন্তু আমার দিক থেকে এর প্রতিবাদে কোনও কিছু করার রইল না।

হাসপাতালে রোগীর আসা বন্ধ হয়ে গেল। সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম।

শেষে স্থির করলাম, রাতের বেলাতেই গোপনে আমি পাহাড়ি গ্রামে গ্রামে যাবার চেষ্টা করব।

শেষ পর্যন্ত তাই শুরু করলাম। রাতে ঘোড়ায় চড়ে পথে যেতে খুব অসুবিধে হত। অন্ধকার রাতে পথ চিনে যেতে পারতাম না। চাঁদের আলোয় বের হতাম। এ অঞ্চলগুলো আমার চেনা জানা হয়ে গিয়েছিল, তাই বিশেষ কষ্ট হত না।

রোগীর সেবা করে যখন হাসপাতালে ফিরতাম, তখন মনটা তৃপ্তিতে ভরা থাকত। পথের হিংস্র পশুর ভয় আমার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারত না।

এবার বিপদ এল অন্য দিক থেকে। ওষুধ ফুরিয়ে গেল। কর্তৃপক্ষের কাছে ওষুধ পাঠাবার জন্যে লিখতেই উত্তর এল, আগুনে পোড়া সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা নিশ্চয়ই এমন অধিক নয় যে প্রভূত পরিমাণ ওষুধ ডাক্তার জনসনের দরকার হতে পারে।

আমি প্রায় নিরুপায় হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে শুধু হাতে গিয়ে ওদের সমবেদনা জানিয়ে আসি। ওষুধ নেই, তাই আজকাল প্রায় দিন আমার আর গ্রামে যাওয়া হয় না।

BanglaBook.org

এক সন্ধ্যায় হাতপাতালে বসে বসে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। আগুন জ্বলছিল সে পাহাড়ে। আমার মনে এসেও লাগছিল সে আগুনের আঁচ। এমন সময় একটি বলিষ্ঠ মানুষ আমার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। দেখলাম, লোকটা আদিবাসী।

আমাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, ডাক্তার জনসন যদি অনুগ্রহ করে আগুনে পোড়া রোগীর ওষুধগুলো লিখে দেন তা হলে আমি আপনাকে তা আনিয়ে দিতে পারি।

লোকটির কথায় বিস্মিত হলাম। কিন্তু এখানে কাছেপিঠে এমন কোনও মেডিক্যাল স্টোর নেই যেখান থেকে ওষুধ নিয়ে আসা যায়।

বললাম, আমি লিখে দিচ্ছি, কিন্তু ওষুধ এ অঞ্চলে পাওয়া সম্ভব হবে না। তা ছাড়া আমার হাতের লেখা প্রেসক্রিপশন যেন কর্তৃপক্ষের হাতে কোনও রকমে না পড়ে।

লোকটি আমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

কয়েকদিন পরেই দেখি সেই লোকটি আবার ফিরে এসেছে। বিরাট একটি ওষুধের প্যাকেট আমার হাসপাতালের বারান্দায় নামিয়ে রেখে সে বলল, ডাক্তার জনসন, আশাকরি এরপর আপনার চিকিৎসার কোনও অসুবিধে হবে না।

লোকটি আর অপেক্ষা না করে ঘোড়ার পিঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি একটু অবাক হলাম। প্রথম যেদিন লোকটি আসে সেদিন ভেবেছিলাম দরকারটা ওরই বাড়ির। হয়ত কোনও সম্পন্ন আদিবাসী ও। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। আমি নিজের সম্প্রদায়ের ওপর দরদী ওই লোকটিকে মনে মনে অশেষ সাধুবাদ দিলাম।

এরপর আদিবাসীদের সেবা করতে আমার আর কোনও অসুবিধেই হল না।

১৫ আগস্ট ঃ ১৯০০

এবার বর্ষায় লড়াই চরমে পৌছল। হাডসন এ বছর আরও উৎকৃষ্টভাবে পথঘাট তৈরি করে রেখেছিলেন।

নতুন কয়েকটা পথও শুকনোর দিনে তৈরি করা হয়েছিল। তবে সে সব পথে আশানুরূপ কাজ এগোয়নি। কারণ আদিবাসীরা লড়াইয়ের জন্য সরকারী কাজ করতে নারাজ।

এবারও কর্তৃপক্ষ বর্ষাতে চুপচাপ থাকতে মনস্থ করেছিল, কিন্তু তার সুযোগ পাওয়া গেল না।

বর্ষা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে আদিবাসী তীর ধুনু টাঙি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন ঘাঁটি লক্ষ করে। সমানে লড়াই চলল। বাঁধান সরকারী পথ বিদ্রোহীরা জায়গায় জায়গায় কেটে দিল। বর্ষার জল সেই পথে গড়িয়ে গিয়ে ভয়াবহ খাদের সৃষ্টি করল।

যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

খবর এলো, দলে দলে আদিবাসী যোদ্ধা চলেছে ছাতমবুরুর দিকে। মারংবোঙ্গা আর সিংবোঙ্গাকে উদ্ধার করতে হবে শত্রুর হাত থেকে। তারা গভীর জঙ্গল, দুর্গম গিরিখাদ, সব কিছু পার হয়ে চলেছে। মেয়েরা চলেছে আগে আগে। তাদের মাথায় কলস। পূজার উপচার হাতে। দেবস্থান উদ্ধার হলে তারা পূজা দেবে দেবতার উদ্দেশ্যে।

বরাইবুরুর ক্যাম্প থেকে সশস্ত্র পুলিশ পাঠান হল। তারা ঘোড়ায় চড়ে চলল ছাতমবুরুর দিকে। ওখানে যে সব রক্ষী রয়েছে, তাদের দলবৃদ্ধি করাই এদের উদ্দেশ্য।

আদিবাসীরা দুর্গম পথ দিয়ে চলেছে, আর এরা চলেছে বাঁধান পথের ওপর দিয়ে। কিন্তু পদে পদে বাধা। সরকারী পথ যেখানে সেখানে আদিবাসীরা ভেঙে দিয়েছে। সেই ভাঙা পথে কোথাও কোথাও বয়ে চলেছে বর্ষার খর জলস্রোত।

সরকারী পুলিশেরা ছাতমবুরুর কাছাকাছি এসেই বিপদের সম্মুখীন হল। শাল আর শিমুলের ঘন বনের আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর-বৃষ্টি তাদের ওপর শুরু হল। ঘোড়া সমেত আরোহীরা

BanglaBook.org

এই অসতর্ক আক্রমণে ছিট্‌কে পড়ল ডানদিকের গভীর খাদে। তাদের ভেতর অতি অল্পই পৌঁছল ছাতমবুরু আক্রমণ করতে।

তখন গভীর রাত। ছাতমবুরু পাহাড়ে ওঠার পথে সারি সারি সান্ত্রী বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খবর পাওয়া গেছে আজই আদিবাসীরা ছাতমবুরু আক্রমণ করবে।

বেস ক্যাম্পে কারও চোখে ঘুম নেই। বয় বেয়ারাগুলো পর্যন্ত তটস্থ হয়ে আছে। কীট পতঙ্গ রাতের অন্ধকার চিরে চিরে শব্দ করছে। মাঝে মাঝে হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে দু'একটা হিংস্র জন্তুর। কিন্তু এসব ব্যাপার আজ কারও মনে কোন রেখাপাত করছে না। আসন্ন একটা ভীষণ বিপদের জন্য প্রতীক্ষা করছে সবাই।

পাহাড়ে ওঠার এই একমাত্র পথ। অন্য দিকগুলো ভয়ানক খাড়াই, আর গভীর জঙ্গলে পূর্ণ।

বেস ক্যাম্পে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আলো জ্বালা হয়নি। অন্ধকারে ওঁৎ পেতে সান্ত্রীরা অপেক্ষা করছে শত্রুর আগমনের। রাত তখন প্রায় দুটো।

হঠাৎ মনে হল চারদিক কাঁপিয়ে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। ছাতমবুরুর পাহাড় যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে নীচে খসে পড়ছে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কেবল পালাও, পালাও শব্দ। চারদিকে আতঙ্ক। গভীর অন্ধকারে পথ দেখা যায় না। পাথর এসে পড়ছে ক্যাম্পের ওপর। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সব। চিৎকার উঠছে। মানুষের আর্ত চিৎকার। কে কোথায় পাথরের তলায় চাপা পড়েছে, তার গোঙানি উঠেছে।

আহত ঘোড়াগুলো বীভৎস আর্তনাদ করছে।

যারা কোনও রকমে বনের আড়ালে থেকে বেঁচে গেল, তারা সভয়ে দেখল একটা, দুটো করে শত শত মশাল জ্বলে উঠছে ছাতমবুরুর ওপর। নাগরার আওয়াজ ভেসে আসছে।

তারপর পঙ্গপালের মত দলে দলে বেস ক্যাম্পের পাশ দিয়ে উঠে যেতে লাগল আদিবাসীর দল। মারংবোঙ্গা আর সিংবোঙ্গার জয়ধ্বনি দিতে দিতে তারা উঠে গেল ওপরে।

আদিবাসীরা সেই রাতে অধিকার করে নিল ছাতমবুরু পাহাড়। সিংবোঙ্গা, মারংবোঙ্গার মন্দির মুক্ত হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে ইনফরমারের মুখে খবর পাওয়া গেল, দুর্গম খাড়াই পাহাড়ের যে দিকটাতে পাহারার কোনও ব্যবস্থা ছিল না, সেই পথে কতকগুলো আদিবাসী আগের রাতে কাঁধে কাঁধে ভর দিয়ে ত্রিভুজের মত ওপরে উঠেছে। তারপর দড়ির সাহায্যে টেনে টেনে তুলেছে অন্যান্য সঙ্গীদের। তারা ওপরের পাহাড়ে শিলাখণ্ড আর নুড়িগুলোকে একত্র জড়ো করেছে।

সারাদিন এই কাজ করার পর, গভীর রাতে বেস ক্যাম্প লক্ষ করে ছেড়ে দিয়েছে সেই সব পাথরের বড় ছোট চাঁইগুলো। সারা পাহাড় কাঁপিয়ে সেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীচে। যখন বেস ক্যাম্পের লোকেরা আহত হয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন পাহাড়ের ওপর মশাল জ্বেলে আদিবাসীরা নাগরায় আওয়াজ তুলেছে। নীচে জঙ্গলের আড়ালে অপেক্ষমান হাজার হাজার আদিবাসী সেই শব্দে উল্লাসধ্বনি করতে করতে উঠে গেছে ওপরে।

বর্ষায় ছাতমবুরু পুনরাধিকার অসম্ভব। চেষ্টা করতে যাবার অর্থই হল অযথা অজস্র লোকক্ষয়। এদিকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলছে। বরাইবুরুর দিকেও নাকি এগিয়েছে দাঙ্গাকারীরা। বরাইবুরু অবশ্য সুরক্ষিত। সেখানে জঙ্গলের অংশ কম। অনেকখানি সমতল জুড়ে কয়েকশ সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রয়েছে সব সময়।

কুম্‌ডির বাংলো থেকে রেবেকা আর ডারোথিকে হাডসন বরাইবুরু পাঠাতে পারতেন, কিন্তু কী মনে করে থলকোবাদে আমার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন।

আমার হাসপাতালে আমি একটি সান্ত্রীকেও থাকতে দিইনি। তবু হাডসন আমার আস্তানাকেই সবচেয়ে নিরাপদ ভাবলেন।

BanglaBook.org

রেবেকা আর ডরোথি এল। দেখলাম ইতিমধ্যে দু'বোনের খুব ভাব হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে সারাদিন সমানে চলল ওদের রসিকতা।

ডরোথির সঙ্গে আমার নাম যোগ করে কথা বলতে ভালবাসে রেবেকা। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, সেই কৌতুকময়ী মেয়েটি আবার তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছে।

মাঝে মাঝে রেবেকা বিষণ্ণ হয়ে যান। জিজ্ঞেস করলে আমাকে জানান হাডসন সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তার কথা। যে রকম এক রোখা মানুষ, না জানি এইসব হাঙ্গামার দিনে কী ভাবে সময় কাটাচ্ছেন।

ডরোথির বিষণ্ণতা কিন্তু অন্য দিকের। রাতের আঁধার নামলেই সে চারদিকের দরজা, জানালা বন্ধ করে বসে থাকে। তার কেবলই ভয়, এই বুঝি বুনো মানুষগুলো হাসপাতাল ঘেরাও করে তাকে ধরে ফেলল।

যত বোঝাই, আর সব জায়গায় গেলেও আদিবাসীরা এখানে আসবে না, ততই ডরোথি অবিশ্বাসের হাসি হাসে। বলে, বরাইবুরুতে যেতে পারলে সব চেয়ে খুশি হত সে।

এদিক থেকে আমি তাকে খুশি করতে পারলাম না ঠিক, কিন্তু আর এক দিক থেকে সে কেমন এক ধরনের আনন্দ অনুভব করতে লাগল।

রেবেকা যখন আমার সঙ্গে ডরোথিকে জড়িয়ে কৌতুক করেন, তখন ডরোথি খুশি হয়।

সেদিন হাসপাতালে রোগী দেখে কোয়ার্টারে ফিরে ডরোথিকে দেখলাম না। রেবেকা উঠোনে বসে কী যেন একটা বুনছিলেন।

ক'দিন একটানা বৃষ্টি হবার পর সবে এক চিলতে রোদ দেখা দিয়েছে। চারদিক সেই করুণ আলোর প্রসন্ন ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ভারী উপভোগ্য মনে হচ্ছিল এই দৃশ্যটুকু। আমি হাসপাতালের পাশের পাহাড়ে উঠে এলাম। এখানে একটি ঝর্ণার ধারে কয়েকটি শালগাছ ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে, তার তলায় একটি মসৃণ পাথর। আমি সেখানে গিয়ে প্রায়ই বসতাম।

পাহাড়ে উঠে দেখি, ঝর্ণার ধারে ওই পাথরটার ওপর ডরোথি বসে আপন মনে গান গাইছে। আমি তার পেছনে ছিলাম, তাই সে আমাকে দেখতে পায়নি।

সামনে শালগাছে দড়ি বাঁধা। তার থেকে ঝুলছে আমার সদ্য ধোয়া পোশাকগুলো।

আমি পাহাড়ের আড়ালে থেকে ঝর্ণার জলে একখণ্ড পাথর ছুঁড়ে মারলাম। ডরোথি চমকে শিলাস্তূপটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকাতে লাগল। আবার একটা পাথর ছুঁড়লাম। শালগাছের কাণ্ডে লেগে সেটা পাহাড়ের ওপর গড়িয়ে চলল। এমন ভয়ের চেহারা আমি এর আগে কখনও দেখিনি।

ডরোথি কাঁপতে লাগল। আমি পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই ও প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিল। তারপর আমাকে দেখে দৌড়ে এসে ভয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরল।

যত বোঝাবার চেষ্টা করি, ততই সে ভয় পেয়ে আমাকে জড়ায়। যখন বললাম, আমিই পাথর ছুঁড়েছি, তখন ও আমাকে ছেড়ে দিয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, আমাকে কুম্‌ডিতে পাঠিয়ে দিন। আমি আর এক মিনিটও এখানে থাকব না।

সেদিন তাকে শান্ত করতে অনেক সময় কেটে গেল আমার।

পরে মুখে কয়েকবার বললেও, থলকোবাদ ছেড়ে ও আর কোথাও যেতে চাইল না।

একদিন হাডসন এলেন হাসপাতালে। তাঁর মুখেই শুনলাম, এখন হাঙ্গামা একটু কমেছে।

হাডসন বললেন, যদি এর পর বৃষ্টি না হয়, তা হলে আমাদের সুবিধে হয়ে যাবে। হেড কোয়ার্টার থেকে ফৌজ আনিয়ে তখন বুনোগুলোকে সায়েস্তা করার আর কোনও অসুবিধেই থাকবে না।

BanglaBook.org

হাডসন, রেবেকা আর ডরোথিকে কুম্‌ডিতে নিয়ে গেলেন। ডরোথির এখানে আরও কিছুদিন থেকে যাবার ইচ্ছে ছিল, সেটা সে আমার কাছে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশও করেছিল, কিন্তু রেবেকাই তাকে একরকম জোর করে নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন খোশ গল্পের মাঝে ভাঁটা পড়তেই আমি বুঝলাম, কোথায় যেন কী একটা আনন্দের সূতোয় টান পড়েছে। নিজেকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা দিল ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা। যে ভাবে বর্ষার শুরু হয়েছিল তা একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। বর্ষার দিনের মেঘের চিহ্নমাত্র রইল না। হাডসন ভাঙা পথ আবার গড়ে তুললেন। সংবাদ পাঠিয়ে বহু সংখ্যায় সশস্ত্র পুলিশ আনিয়ে রাখা হল। এবার প্রবলভাবে সরকার পক্ষের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। পক্ষকাল যুদ্ধ চলল সমানে। শেষে হট্‌তে লাগল আদিবাসীর দল। ছাতমবুরুর পাহাড় ছেড়ে দিতে হল তাদের। এবার গভীর জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল তারা।

একটি বিষয় বরাবর আমি লক্ষ করছিলাম। লড়াইয়ে যাতে কম লোকক্ষয় হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল নেত্রীর। ছাতমবুরু রক্ষার জন্য বহুদিন যুদ্ধ চালাতে পারত আদিবাসীরা, কিন্তু তা তারা করল না। অকারণ লোকক্ষয়ের থেকে সরে দাঁড়াল তারা। লড়াইতে এই সূক্ষ্ম বিবেচনা বোধ যাঁর, তাঁর ওপর গভীর শ্রদ্ধায় আমার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল।

১৭ ডিসেম্বর ঃ ১৯০০

বিধাতা সত্যিই এবার জঙ্গলের মানুষগুলির বিপক্ষে দাঁড়ালেন। বর্ষাকালে নামমাত্র বৃষ্টি দিয়েই আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেল। চারিদিকে অনাবৃষ্টি। ফসল ফলল না একরকম। এদিকে দীর্ঘকাল যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আদিবাসীরা। কয়েকমাস পরে তাদের মাঝে নেমে এল ভয়াবহ অনাহার আর মৃত্যুর আতঙ্ক। সারান্দা বন জুড়ে শুরু হয়ে গেল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর ধ্বংসলীলা।

সরকার এবার এক কৌশল অবলম্বন করল। ঘোষণা করা হল ছামবুরুতে সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার মন্দির আদিবাসীদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হবে। তাছাড়া যে সকল আদিবাসী সরকারের কাছে নতি স্বীকার করবে, দুর্ভিক্ষের দিনে তাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করবে সরকার।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘোষণাও করা হল, যে রাজকুমারী শনিচারির সন্ধান সরকারকে দিতে পারবে তাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঘোষণার পর কিছুকাল পর্যন্ত কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর একে একে সরকারী ক্যাম্পে আদিবাসীরা আসতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সারান্দা বনভূমির ক্ষুধার্ত মানুষগুলো জলস্রোতের মত বরাইবুরুর ক্যাম্পে সাহায্যের জন্য ভেঙে পড়ল।

কর্তৃপক্ষ ক্ষুধার্ত লোকগুলোকে নিয়ে শুরু করল জিজ্ঞাসাবাদ। রোজ নানা ধরনের লোক সাহায্যের আশায় আসা যাওয়া করত। কর্তৃপক্ষ তাদের একজনের কাছ থেকে প্রধান ঘাঁটির খবরটা সংগ্রহ করল। সেই হল সরকার পক্ষের ইনফরমার।

ছোটনাগরার উপত্যকার সেই ভগ্নদুর্গ, যা একদিন আমি দেখে এসেছিলাম পথ হারিয়ে, সেই দুর্গই নাকি বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি।

সরকারী পুলিশবাহিনী আর কালবিলম্ব করল না। তারা সেই ভগ্নদুর্গ আক্রমণ করল।

লড়াই চলল তীরধনু আর বন্দুকে। বেশি সময় লাগল না।

গুপ্তঘাঁটি সরকারী দখলে এসে গেল। কিন্তু দলের নেত্রী সেই রহস্যময়ী রমণী, কখন দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে তা কেউ বুঝতে পারল না।

BanglaBook.org

মনে মনে আমি পরম স্বস্তি অনুভব করলাম। প্রভু যীশুর কাছে কেন জানি না নতজানু হয়ে সেদিন শনিচারির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানালাম।

১৩ জানুয়ারি ঃ ১৯০১

একটি বিশেষ ঘটনার কথা আজ শুনলাম হাডসনের মুখে। কথাটা শুনে এদেশের মেয়েদের ওপর গভীর শ্রদ্ধায় মনটা ভরে গেল।

হাডসন যখন কথা বলছিলেন, তখন কিন্তু তাঁর গলায় আফশোসের সুরই বাজছিল। মেয়েটি মারা গিয়ে নাকি সবকিছু ভেস্তে দিয়ে গেল। নইলে শনিচারির খবর তার কাছ থেকে যে কোনও রকমেই হোক আদায় করা যেত।

ঘটনাটি এইরূপ ঃ

একদিন একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এল বরাইবুরুর ক্যাম্পে। যেখানে আদিবাসীদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল, সেখানে সে গেল না। সে পুলিশ অফিসারদের কাছে এসে কেঁদে কেটে অস্থির করে তুলল।

জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল, সে তার হারানো স্বামীকে খুঁজছে। মেয়েটি কথা বলে আর কাঁদে।

কতদিন নাকি তার স্বামী তাকে ছেড়ে এসেছে। সে খেতে পরতে না পাক তাতে দুঃখ নেই কিন্তু একা ঘরে সে কাটাবে কেমন করে। সেই যে কতদিন আগে ক্যাম্পে যাচ্ছি বলে এলো, আর ফিরে গেল না। রাত দিন সে চোখের জলে ভাসছে।

শনিচারি মেয়েটা মাঝে মাঝে তার কাছে আসে। সে বলে, তার স্বামী নাকি সরকারের কাছে ছোট নাগরা দুর্গের খবর দিয়েছে।

শনিচারি তাকে মেরে ফেলবে বলে শাসায়।

মেয়েটার কাছে এতগুলো খবর পেয়ে বরাইবুরুর ক্যাম্প ইনচার্জ চঞ্চল হয়ে উঠল। এবার তা হলে শনিচারিকে ধরা যাবে।

ক্যাম্প ইনচার্জ মেয়েটিকে এবার শনিচারি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিল।

কিন্তু মেয়েটি আর কোনও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেবল কাঁদতে লাগল। সে আগে তার মরদকে দেখবে তারপর অন্য কথা। কতদিন সে তার স্বামীকে দেখেনি।

মেয়েটির স্বামী যথার্থই ইনফরমারের কাজ করছিল। লোকটি যে ক্যাম্পে ছিল, মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল।

সে কী কান্না তার। কত অভিমান। স্বামী লোকটা বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে থামাতে পারে না।

কি করেই বা সে গাঁয়ে ফিরে যাবে। শনিচারি একবার তার সন্ধান পেলে আর আস্ত রাখবে না। সে সরকারকে ছোটনাগরার খবর দিয়েছে. এর পরে তার আর গাঁয়ে ফিরে যাওয়া চলে না।

মেয়েটি সব শুনল। ধীরে ধীরে তাদের মান অভিমানের পালা চুকলো। সে সারাদিন রইল তার স্বামীর কাছে। ক্যাম্প ইনচার্জ তাদের একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। একটু শান্ত হলে মেয়েটার কাছ থেকে অনেক সন্ধানই পাওয়া যাবে। এখন আদিবাসীরা শান্ত হয়েছে, কিন্তু ওদের ওপর ভরসা করা চলে না। দুর্ভিক্ষ কেটে গেলেই তারা শনিচারির নেতৃত্বে আবার রুখে দাঁড়াতে পারে। অতএব সবার আগে চাই শনিচারির সন্ধান।

ইনচার্জ মনে মনে পুলকিত হল।

একরাত স্বামী-স্ত্রী কাটাল ক্যাম্পে। শেষ রাতে একটা প্রাণ-ফাটানো আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই দৌড়ল সেদিকে। ইনফরমারের রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে কালকের মেয়েটা অট্টহাসি হাসছে। হাতে তার একখানা রক্তাক্ত ছোরা।

BanglaBook.org

তাকে ধরতে যেতেই সে হাতের ছোরাখানা নিজের বুকে আমূল গেঁথে দিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে বলে গেল, দেশের শত্রুর, বেইমানের সাজা সে দিয়েছে। আর কিছুই চায় না সে। আজ তার সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন।

হাডসনের মুখে কথাটা শুনে সত্যিই আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের স্বামীকে খুন করল মেয়েটি দেশের জন্যে।

আমি মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম সেই রহস্যময়ী অরণ্য-কন্যাকে, যে এই অশিক্ষিতা মেয়েটির মনেও দেশকে ভালবাসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

২৩ মার্চ ঃ ১৯০১

দূরে কোন আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের দ্রিম্ দ্রিম্ আওয়াজ ভেসে আসছিল। আকাশে চাঁদের আলো কত উজ্জ্বল, কেমন স্নিগ্ধ। সামনে শালের বনের প্রতিটি পাতা যেন গোনা যায় সেই আলোয়। মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল একটি উপভোগ্য বাতাস। পথের ধারের কত রকমের ফুলের গন্ধ সেই বাতাসের পাখায় জড়ানো।

কোন কাজ ছিল না হাতে, বসে বসে দেখছিলাম বসন্ত রাত্রির রূপ।

হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল, শালের বনের প্রান্তে দুর্গম উপত্যকা থেকে অতি কষ্টে কে যেন উঠে আসবার চেষ্টা করছে।

দ্রুত এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাছাকাছি হতেই চাঁদের আলোয় যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার সামনে একটি শালের গাছকে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সেই রহস্যময়ী রাজকুমারী শনিচারি।

আমি কোনও কিছু বলার আগেই শনিচারির মুখে ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল।

ডাক্তার জনসন, আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল।

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, কিন্তু তোমাকে ধরার জন্যে যে সবাই ওঁৎ পেতে রয়েছে।

আবার সেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল শনিচারির মুখে। বলল, ধরা যদি দিতে হয় ডাক্তার, তাহলে তোমার কাছেই দেব।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওর পোশাকের দিকে।

একি, তোমার পোশাক যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

ওকে ধরে ফেললাম।

শনিচারি বলল, ও কিছু নয় ডাক্তার, তোমাদের লোকেরা আমাকে বসন্তের রাঙা ফুল উপহার দিয়েছে।

বললাম, শিগ্‌গির এসো আমার সঙ্গে। গুলি লেগেছে নিশ্চয়ই।

ও বলল, তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাই না ডাক্তার। চলে যাচ্ছি বহুদূর, তার আগে আমার দেশের মানুষের হয়ে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতে চাই।

ও কাঁপছিল। রক্তের পরিমাণ দেখে ওর আঘাতের গুরুত্ব যে কতখানি তা আমার বুঝতে বাকি রইল না।

ওকে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালে। শুইয়ে দিলাম অপারেশন টেবিলে। পায়ের ভেতর দিয়ে গুলিটা চলে গেছে। ক্ষতটা গভীর, সারতে সময় নেবে।

পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন শনিচারি বলল, তা হলে সত্যিই আমায় ধরলে ডাক্তার?

বললাম, যতদিন সুস্থ না হচ্ছ ততদিন এ হাসপাতালে আমার নজরবন্দি হয়ে থাকতে হবে। পরে তোমার কাজ ফুরোলে যেখানে খুশি যেও।

BanglaBook.org

বামিয়া মাথা নেড়ে চলে গেল। তের চোদ্দ বছর বয়েস হবে ছেলেটার। যেমন সরল তেমনি বিশ্বাসী।

এ দেশের মানুষ মাত্রেই সহজ সরল। এই ক'বছরে কেন জানি না বড় ভালবেসে ফেলেছি এ দেশটাকে।

বাইরে বসে শনিচারির কথাই ভাবতে লাগলাম।

কী তাজা প্রাণশক্তি এই মেয়েটির। তবু শিশুর মত ভীরু। একটু কপট ক্রোধ দেখাতেই ভয়ে কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেল।

আশ্চর্য, যার ভয়ে সকলে ভীত, যার নিজের প্রাণের বিন্দুমাত্র ভয় নেই, সে একজন ডাক্তারের সামান্য কথায় ভয় পেয়ে গেল। মানুষের কী বিচিত্র রূপ।

বসে বসে ভাবছিলাম নানা কথা। বামিয়া এসে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি এক কাণ্ড। শনিচারির সামনে কেক আর দুধ রাখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সে একেবারেই ছোঁয়নি, কেবল কেঁদে চলেছে।

বামিয়াকে বাইরে যেতে বললাম। ও চলে গেলে শনিচারির কাছে গিয়ে বসলাম।

আমাকে দেখে শনিচারি তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে লাগল।

বললাম, ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গেছে কখন, কেক আর দুধটুকু খেয়ে নাও। গায়ে বল না এলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে কি করে।

ও বলল, কিছুতেই ওগুলো মুখে তুলতে পারব না ডাক্তার।

ভাবলাম, আমি খৃষ্টান, কোনও কোনও আদিবাসী খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু গোঁড়া। তাই হয়ত শনিচারি আপত্তি তুলেছে।

বললাম, দুধটুকু আপাততঃ খেয়ে নাও, বামিয়া এনেছে। তোমার আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করে দেব।

মুহূর্তে কী যেন ভেবে সামনে পড়ে থাকা প্লেট থেকে কেকটা তুলে নিয়ে ও কামড় দিল।

খেতে খেতে বলল, আমাকে ভুল বুঝ না ডাক্তার। জাতের বালাই আমার নেই। আমার বাবা ছিলেন আদিবাসী আর মা রাজপুতানী। আমি খেতে চাইনি ভিন্ন কারণে।

বললাম, কারণটা যদি দুঃখের হয় তাহলে আমি তা জানতে চাইব না শনিচারি।

ও চোখ মুছে বলল, খেতে গেলেই মনে পড়ে ওদের কথা। জঙ্গলের কত লোক না খেয়ে কাটাচ্ছে, তুমি ভাবতে পারবে না ডাক্তার।

শনিচারির ওপর শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল।

সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, যতদিন চিকিৎসা চলবে ততদিন আমার দেওয়া খাবার খেতে হবে শনিচারি। তুমি এতে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে।

এবার শনিচারির মুখে কেমন যেন ম্লান এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

সেরে উঠে কী হবে ডাক্তার, তার চেয়ে শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল।

এ কথা বলছ কেন?

কোনও দিক থেকে মানুষ যখন সফল হতে পারে না, তখনই কেবল তার মনে বাঁচা মরার প্রশ্ন জাগে।

তুমি ভাল হয়ে ওঠ, একদিন তোমার সব কিছু আবার ফিরে পাবে শনিচারি।

আমাকে স্বার্থপর ভেবো না ডাক্তার। আমি আমার সেই ভাঙা দুর্গটুকু ফিরে পাবার জন্যে মোটেই চিন্তিত নই। সারা বনের মানুষগুলো আজ পঙ্গু হয়ে গেল। এ দুঃখ কিছুতেই সইতে পারছি না।

বললাম, সুস্থ হয়ে ওঠ, তখন নতুন কিছু চিন্তা করা যাবে।

BanglaBook.org

একটা যন্ত্রণার ছায়া নেমে এলো ওর মুখের ওপর।

ওকে কথান্তরে নিয়ে যাবার জন্য আজ সকালের গল্প জুড়ে দিলাম। সেই সুবাদারদের খোঁজাখুঁজির ব্যাপার।

কথায় কথায় ওর মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়ে গেল।

হেসে বলল, পাঁচ হাজার টাকার ভাগ বুঝি আর কাউকে দিতে চাও না। নিজেই সবটা নেবে?

বললাম, নিজেকে এত অল্প দামের ভাবছ কেন শনিচারি। তোমার আসল দাম আমার অজানা নয়, তাই এত কম দামে কারো কাছে তোমাকে তুলে দিতে মন চায় না।

ও হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। কোনও কথা বলল না।

আমি দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম আমার কাজে।

কয়েকদিন এমনি কেটে গেল। নিভৃতে গল্প করি শনিচারির সঙ্গে। এ কদিনেই বুঝতে পেরেছি কী বিপুল ঐশ্বর্য ওর ভেতর রয়েছে।

আমার ডিসপেনসিং রুমের জানালাটা খুলে দিলে সামনের উপত্যকা আর তার ওপারে বড় পাহাড়টা স্পষ্ট চোখে এসে পড়ে।

গভীর রাতে যখন চারদিক ঘুমে ডুবে যায় তখন কোনও কোনও দিন আমরা দু'জনে বসে বসে গল্প করি।

টুকরো টুকরো কথার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে শনিচারির জীবনের কথা।

সেদিন এমনি সে গল্পে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। কথায় কথায় বলল, ছোটনাগরা দুর্গের কথা। আর তার মৃত পিতামাতার কাহিনী।

বলল, বাবা ছিলেন আদিবাসী হো সম্প্রদায়ের লোক। ছেলেবেলায় খেতে না পেয়ে এই বনে মনোহরপুরের জায়গীরদার অভিরাম সিং-এর ডেরায় গিয়ে ওঠেন।

অভিরাম সিং-এর একটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে ছিল বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। বাবা সেখানে অভিরাম সিং-এর আস্তাবলে কাজ করতেন। কালে সেই মেয়েটির সঙ্গে বাবার ভালবাসা জন্মে। বিয়ে করবেন বলে উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

কথাটা ক্রমে অভিরামের কানে যায়। তিনি এমন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন যে কোমর থেকে তলোয়ার খানা টেনে নিয়ে বাবাকে আঘাত করেন। ফলে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তার একটি হাত দু'খণ্ড হয়ে যায়।

অভিরামের রাগ পড়লে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। বাবাকে স্নেহ করতেন খুব। তাড়াতাড়ি লোক দিয়ে রাঁচিতে পাঠিয়ে দেন চিকিৎসার জন্য। তোমাদের দেশীয় এক ডাক্তার সেখানে বাবাকে সুস্থ করে তোলেন। তিনি নিজের দেশে ফিরছিলেন, বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

কয়েক বছর বিদেশে কাটিয়ে বাবা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরে নিজের জঙ্গল আবাসেই ফিরে আসেন তিনি।

ফিরেই দেখা করতে যান অভিরাম সিং-এর সঙ্গে।

অভিরাম তখন মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা তারাবাঈ বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

কিন্তু সরকার তারাবাঈকে নানা কৌশলে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করল। তারা কৌশলে সমস্ত মহাল খাস করে নিল।

বাবার সঙ্গে গভীর জঙ্গলে চলে এলেন তারাবাঈ। সঙ্গে আনলেন, বহুদিনের সঞ্চিত সোনা। বিয়ে হল দুজনের। ছোটনাগরায় বাবা বসতি পত্তন করলেন। পাথর সাজিয়ে সাধারণভাবে গড়ে তুললেন দুর্গ। গড়লেন 'গরাম' দেবতার মন্দির। ধীরে ধীরে জঙ্গল মহলের প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের আদিবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। তাদের দীক্ষা দিলেন জাতীয়তার মন্ত্রে।

BanglaBook.org

বাবা বলতেন, নিজের ধর্মের ভেতর দিয়ে ভগবানকে পাবার চেষ্টা করবে। ভগবানের রাজ্যে জাতির বিচার নেই। অন্যায় সহ্য করবে না।

জঙ্গলের লোকে বাবাকে তাদের রাজা বা দেবতা বলে মনে করত।

বাবা অত্যন্ত মুক্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের তদারকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন।

কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল শনিচারি। একটা বিষাদের ছায়া এসে পড়ল তার চোখেমুখে।

কিছুক্ষণের ভেতর নিজেকে সংযত করে ও আবার কথা শুরু করল।

প্রকৃতি বাদ সাধল এক সময়। পাহাড় হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠল। ছোট নাগরার দুর্গ ভেঙে পড়ল। তার একটি স্তূপের ভেতর আমার বাবা-মা চিরদিনের মত সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

এ প্রসঙ্গে ছেদ টেনে দিয়ে আমি বললাম, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিন কিন্তু আদিবাসী বলে ভুল করিনি।

শনিচারি উত্তেজিত হয়ে উঠল হঠাৎ।

আমি আদিবাসীর মেয়ে ডাক্তার জনসন। আমার দেহে আদিবাসীরই রক্ত বইছে। আমার ধর্ম আর আমার এই জংলী দেশকেই আমি ভালবাসি।

বললাম, আমি সেজন্যে তোমাকে শ্রদ্ধা করি শনিচারি। আমাকে ভুল বুঝ না।

সহজ হল শনিচারি। আমার হাতটা টেনে নিয় বলল, তোমাকে দেখে ইংরাজের ওপর সব অশ্রদ্ধা দূর হয়ে যায় ডাক্তার। আমার বাবাও তোমার মত দয়ালু এক ইংরাজ ডাক্তারের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

যত তাড়াতাড়ি পায়ের ক্ষতটা সেরে উঠবে মনে করেছিলাম, তা আর হল না। শনিচারিকে বেশ কিছুদিন ভুগতে হবে বলেই মনে হল।

মাঝে মাঝে ও অস্থির হয়ে উঠত। বনে বনে রাত্রি দিন ঘুরে বেড়ানোই যার স্বভাব, কতকাল ছোট্ট একটি বেডের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা যায়।

এক একদিন শনিচারি হাঁপিয়ে উঠত।

বলত, কতদিনে সারব ডাক্তার?

বুঝিয়ে বলতাম, আঘাতটা গুরুতর, তাই সারতে একটু সময় লাগছে।

অনুনয় করত, আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যেতে পারবে ডাক্তার। কতদিন চারদিকটা ভাল করে দেখিনি। শালের ফুল ফুটেছে। 'বাহা' পরবের ঢেউ উঠেছে সারা বন জুড়ে। আমার মন কেমন করছে ডাক্তার।

গভীর রাত। চাঁদের আলোয় বন, পাহাড় ভেসে যাচ্ছে। ওকে সাবধানে ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালের বাইরে।

কতক্ষণ একটি পাথরের চাঁই-এর ওপর বসে রইলাম দুজনে। ও কতদিন পরে চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আপন মনে মগ্ন হয়ে গেল একসময়।

বহুদূর থেকে মাদলের ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে আসছিল। শনিচারি কান পেতে সেই শব্দটুকু শুনতে লাগল। তারপর নিজেই ধীরে ধীরে গাইতে লাগল 'বাহা' পরবের গান।

সেই জ্যোৎস্নার জলে ধোওয়া বন পাহাড়ের রহস্যময় পরিবেশে সে সুর চারিদিকে আশ্চর্য স্বপ্নের জাল বুনতে লাগল। আমি মুগ্ধ হয়ে সেই অরণ্যকন্যাকে দেখতে লাগলাম।

BanglaBook.org

মাঝে মাঝে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা আর ধর্ম নিয়ে আলোচনা হত। আমি ওকে প্রভু যীশুর ত্যাগের কথা শোনাতাম। কথায় কথায় আদিবাসীদের বিচিত্র সংস্কার আর দেবতার কথা এসে পড়ত।

শনিচারি বলত, আমি জানি ডাক্তার, আমাদের ধর্মবোধের ভেতর অনেক কুসংস্কার আছে। কিন্তু নিজের ধর্মের চেয়ে অন্য কোনও ধর্মকে আমি বড় বলে ভাবতে শিখিনি।

বলতাম, তোমার মুক্ত মনের কাছে এটা একটা সংস্কার বলেই আমি মনে করি।

ও অমনি বলত, তোমার ধর্মও একেবারে কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয় ডাঃ জনসন। তাই খৃষ্টানরাও কিছু পরিমাণে সংস্কারাচ্ছন্ন।

এ তোমার তর্কের কথা শনিচারি।

ও আবার নীরব হয়ে যেত। কতক্ষণ ভাবত। তারপর বলত, প্রতি জাতির ধর্ম গড়ে ওঠে বহুদিনের সাধনা আর সংস্কারে। এক একটি জাতির কাছে তার ধর্ম তার একান্ত প্রাণের জিনিস। আমার মনে হয় কী জান, নিজের নিজের ধর্মকে ধীরে ধীরে সংস্কার করে নিলে তার ভেতর দিয়েই ঈশ্বরের সহজ রূপটি দেখা যায়।

প্রভু যীশুর প্রতি সম্পূর্ণ অনুরক্ত থেকেও শনিচারির কথাকে অস্বীকার করতে পারতাম না।

নানা আলোচনার ভেতর দিয়ে এই অরণ্য কন্যাটি ধীরে ধীরে আমার সমস্ত মন অধিকার করে বসল। আমার দিন, আমার রাত্রি, আমার সমস্ত ভাবনা কল্পনা এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে লাগল।

শনিচারির মনের বিপুল ঐশ্বর্যের ভেতর আমি ধীরে ধীরে মগ্ন হয়ে গেলাম।

কয়েকদিন পরে এক দুপুরে হাসপাতালের বারান্দায় বসে আমাদের কথা হচ্ছিল।

বললাম, ডাক্তার হয়ে বলব, তোমার অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যাক, কিন্তু আমার ভেতর আর একটা মানুষ বলছে, অসুখ সারলেই ও পালাবে। যে ক'টি দিন ও হাসপাতালে বন্দি হয়ে থাকে সে ক'টি দিনই লাভ।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল শনিচারির মুখে। বলল, খাঁচার ভেতর যে পাখি কিছুকাল বন্দি হয়ে থাকে, খাঁচা মুক্ত করে দিলেই কী সে উড়ে যেতে পারে ডাক্তার?

হেসে বললাম, বুনো পাখিরা বড় একটা পোষ মানে না। খাঁচার ভেতরে থেকে তারা কেবল পালাবার জন্যে পাখা ঝাপটায়!

হেসে ফেলল শনিচারি। তারপর হঠাৎ মুখে ভাবনার ছায়া নামল ওর। অনেকক্ষণ বসে বসে আপন মনে চিন্তার জাল বুনে চলল। আমি যে কতক্ষণ তার পাশেই বসে আছি, সে খেয়ালই নেই তার।

একসময় দেখলাম, চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শনিচারির। কী একটা ভাবনার দীপ্তিতে সে যেন ঝলমল করছে।

আচ্ছা ডাক্তার, রবার্ট ব্রুস খুব বড় সাধক ছিলেন, তাই না?

তিনি বীর ছিলেন।

না ডাক্তার, যত বড় বীর ছিলেন, তার চেয়ে সাধক ছিলেন অনেক বড়। হেরে গিয়েও তিনি হার মানেননি, চেষ্টা করে গেছেন বারবার।

বললাম, তুমিও চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সফল হতে পারবে।

ও আমার দুটো হাত চেপে ধরে বলল, তুমি বলছ ডাক্তার, আমি পারব?

বললাম, নিশ্চয় পারবে তুমি। সে বিশ্বাস আমার আছে। আমি দেখেছি তোমার দেশের সেই মেয়েটিকে যে দেশের জন্য নিজের স্বামীকে হত্যা করেছে।

BanglaBook.org

শনিচারি চমকে উঠল বলে মনে হল।

তুমি জান ডাক্তার, সে মেয়েটির কি হয়েছে?

স্বামীকে খুন করে সে নিজের বুকেও ছোরা বসিয়েছে।

দুটি হাত জোড় করে শনিচারি প্রার্থনা করল। চোখ বেয়ে ঝরতে লাগল ফোঁটা ফোঁটা জলের ধারা।

একসময় শান্ত হয়ে বলল, তোমাদের সরকারের অত্যাচার তাকে ভোগ করতে হয়নি, আমি কত সুখী হয়েছি তার মৃত্যুতে, সে তুমি বুঝবে না ডাক্তার।

একটু থেমে মনে মনে কী যেন ভাবল ও। তারপর বলল, সোনিয়া মারা গিয়ে আমার একখানা হাত ভেঙে দিয়ে গেছে ডাক্তার।

বললাম, মেয়েটির আচরণ দেখে ও যে তোমারই লোক তা বোঝা গিয়েছিল।

শনিচারি বলল, তোমাদের চার্চে সোনিয়া আর তার স্বামী দীক্ষা নিয়েছিল। আমি ওই মেয়েটিকে কী যে ভালবাসতাম। আমার কাছ থেকে ও বিদেশী সাহিত্যের বই নিয়ে পড়াশোনা করত।

একটু অবাক হয়েই বললাম, সোনিয়া শিক্ষিতা মেয়ে!

তোমরা শিক্ষিত কাকে বল জানি না, তবে সোনিয়ারা শুধু পড়াশোনার শিক্ষা পায়নি, দেশের জন্যে নিজের স্বামীর প্রায়শ্চিত্তও সে নিজেই করেছে।

জান ডাক্তার, ওর স্বামী ছিল একেবারে অশিক্ষিত। কিন্তু কী সেবাই না সোনিয়া তাকে করত। যেদিন শুনল, ওরই স্বামী সরকারের ইনফরমার হয়েছে, সেদিন ও আমার কাছে এসে বলল, ওর প্রায়শ্চিত্তের ভার আমার হাতে তুলে দাও শনিচারি।

বললাম, দেশ আমাদের সবার চেয়ে বড়, শুধু এই কথাটুকু মনে রেখো।

সে কথা সে মনে রেখেছিল। তাই ভাবি ডাক্তার, আবার আমি হয়ত দাঁড়াতে পারব।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দুর্ভিক্ষ চিরদিন থাকে না, মানুষের দুর্বলতাও চিরদিনের নয়।

আচ্ছা ডাক্তার, তোমার হাতে কী এমন ক্ষমতা নেই যাতে আমি খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারি।

কথাটা আঘাত করল আমার মনে। বললাম, তুমি কী মনে কর, ডাক্তার তার রোগ সারাবার ক্ষমতাগুলো হাতের ভেতর রেখে দিয়ে চিকিৎসা করে।

ওর মাথাটা নত হল।

আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। নিজের মনের উত্তেজনায় তোমাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি।

বললাম, আমার কাছে দেশ নেই, জাতি নেই। আমি শুধু মানুষকে ভালবাসি। তাকে সারিয়ে তোলাই আমার একমাত্র ব্রত। এখানে শনিচারির সঙ্গে হাডসনের কোনও ভেদ নেই।

তুমি মানুষকে ভালবাস, তাই আমি তোমাকে ভালবাসি ডাক্তার জনসন।

আমার হাসপাতাল দেখার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই হেসে বললাম, একজন রোগীর কাছে এত সময় দিলে বাকি রোগীদের ওপর অবিচার করা হবে।

উঠতে যাচ্ছিলাম, শনিচারি হঠাৎ হাত ধরে টেনে বসাল।

রোগ গুরুতর হলে রোগীর কাছে বেশি সময় দিতে হয় বইকি।

তোমাকে অতিরিক্ত সময় দিয়ে ফেলেছি।

শনিচারি অমনি বলল, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে গেলে আমিও তোমার কাজে সাহায্য করতে পারব। তখন শোধ দেব তোমার এই সময়ের অপচয়ের।

বললাম, তা হলে তোমার দেশোদ্ধার?

চুপ করে গেল শনিচারি। আমি হেসে হাসপাতালে উঠে এলাম।

BanglaBook.org

কয়েক দিন পরের কথা। হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলো রাউন্ড দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে দেখি বামিয়া আর শনিচারি গভীরভাবে কী যেন আলাপ করছে।

আমি এলাম, পাশের ঘরে চলে গেলাম, ওরা কথা বলায় এমনি মত্ত যে আমার আসার সাড়াই পেল না।

ভাবলাম, বেচারা পায়ে আঘাতের ফলে বাইরে বেরোতে পারছে না, তাই মনের নির্জনতাটুকু ঘোচাতে চায় যে কোনও একটি মানুষের সঙ্গে কথা বলে।

পাশের ঘরে এসে আমি পোশাক ছাড়লাম। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। বসে থাকতে থাকতে কয়েকটা কথা কানে ভেসে এল।

সাসাংদা কোথায় জানিস বামিয়া?

ওখানে তো আমার মামার বাড়ি।

দুপুরে একদিন যেতে পারবি ওখানে?

কেন পারব না। তুমি বললে আমি সব পারি।

তারপর আরও কী সব কথা হল, আমি ঠিক শুনতে পেলাম না।

শনিচারি বামিয়াকে সাসাংদায় পাঠাতে চায় কেন। কী উদ্দেশ্য ও মনে মনে পোষণ করে রেখেছে!

আমার মনে এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন জাগল, কিন্তু আমি শনিচারিকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। ও যখন সহজ মন নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করে, তখন একটি অবোধ শিশুর মত মনে হয়। একটি কিশোরী যেন চপলতা প্রকাশ করছে কথায় কথায়। আবার কখনও বা সে ভীরু চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু যখন ও গভীর হয়, আপনার ভেতর ডুবে থাকে সবকিছু ভুলে, তখন ওর দিকে সসম্ভ্রমে আমি তাকিয়ে থাকি।

আমার চেয়ে বয়সে ও কত ছোট, তবু মনে হয় কী বিপুল ব্যক্তিত্ব নিয়ে ও বসে আছে। ওর সঙ্গে আমাদের ব্যবধানটা তখন বড় বেশি করে চোখে পড়ে।

বামিয়ার সঙ্গে ওর কথা আমার কৌতূহল জাগালেও, এ নিয়ে শনিচারির সঙ্গে আমি কোনও রকম আলোচনা করতে পারলাম না।

এমনি কেটে গেল কয়েকটা দিন। এক দুপুরে কোয়ার্টারে ফিরে দেখি, বামিয়া উধাও।

এদিকে রান্নাঘরে এসে দেখি, ফল বা দুধের কোনও ব্যবস্থাই সে করে যায়নি। কিছু পরেই রোগীদের ঘরে ঘরে ফল আর দুধ দিয়ে আসতে হবে।

আমি চিন্তিত হলাম। কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় রান্নাঘরে এসে ঢুকল শনিচারি।

বললাম, তোমার না ডিসপেনসিং রুম থেকে বের হওয়া বারণ, তবে কেন এখানে এলে? এমন করে চলাফেরা করলে সহজে পাটা সারবে?

ও কোনও কথা না বলে বসে গেল ফলের ঝুড়ি আর ছুরি নিয়ে। ফল কেটে কেটে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্লেটে সাজাতে লাগল।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, আজ তুমি নিজেই এগুলো নিয়ে যাও ডাক্তার। তোমার রোগীরা খুব খুশি হবে।

বললাম, তা নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু বামিয়া কোথায়?

শনিচারি বলল, একটু বাইরে গেছে, ফিরতে খানিক দেরি হতে পারে।

আর কোনও প্রশ্ন না করে আমি নিজেই নিয়ে গেলাম ফলের প্লেটগুলো।

শেষে রান্নাঘরে এসে দেখি, শনিচারি আরও এক প্লেট ফল আর দুধ কার জন্যে যেন রেখেছে। আমাকে দেখেই বলল, আর একটু পরে তোমার খাবার সময় হবে, তখন খেও।

BanglaBook.org

আর কোন কথা না বলে ও ওর ঘরে উঠে চলে গেল। দেখলাম, বড় কষ্ট করে পাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও।

মনে হল, সারাটা বনে যে মেয়ে বিদ্যুতের মত খেলে বেড়াত, আজ সে সামান্য একটা হাসপাতালের ভেতর বন্দি হয়ে আছে।

এসব কথা ভাবতে গিয়ে মনে মনে দুঃখ পেতাম। কিন্তু অমার সাধ্যমত চেষ্টাতেও শনিচারিকে সারিয়ে তুলতে পারলাম না।

ওর পায়ের ক্ষতটা দিনে দিনে আমার চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। শনিচারির ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, বেডের ওপর শুয়ে ও একখানা ডাক্তারী বইয়ের পাতা উল্টে পাল্টে দেখছে।

ঘরে ঢুকে বললাম, তুমি ডাক্তার হলে আমাকে যে বেকার হতে হবে শনিচারি।

ও হেসে বলল, আমি পঙ্গু হয়ে পড়ে রইলাম তোমার হাসপাতালে। তুমি যখন সুস্থ রয়েছ তখন আমার কাজগুলো তুমিই কর। আর তুমি আমার কাজে গেলে তোমার কাজগুলো আমাকেই তো চালিয়ে নিতে হবে। তাই বইপত্তর দেখে রাখছি।

বললাম, তা হলে তোমার দেশের উদ্ধারও হল, আর আমার হাসপাতালও চলল।

শনিচারি বলল, দেখে নিও, একটু ভাল হলেই আমি তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কেমন ডাক্তারী করি।

বললাম, ডাক্তার হতে হলে নিজের শরীরটাকে আগে সুস্থ রাখতে হয়। আজ দুধ আর ফল খেয়েছ?

শনিচারি বলল, একজন ডাক্তার সুস্থ থাকলে অনেক রোগীই সুস্থ হতে পারে। তাই দুধ আর ফল তোমারই আগে খাওয়া দরকার। তিনটে বাজল, এখন যাও তোমার খাবার সময় হয়ে গেছে।

আমি বেরিয়ে এলাম ওর ঘর থেকে। পেছন থেকে ও ডাক দিয়ে বলল, তুমি বরং বসো এখানে, আমি এন দিচ্ছি।

বললাম, বেডের সঙ্গে এবার দেখছি তোমাকে বেঁধে রাখতে হবে।

একটা হাসির ঝলক ভেসে এল ওর ঘর থেকে।

তুমি আমাকে বাঁধবে ডাক্তার। তোমার এমন দড়ি নেই যা দিয়ে তুমি আমাকে বেঁধে রাখতে পার।

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, তবে কী দিয়ে বাঁধব বলে দাও। বিনা দড়িতে বাঁধার কৌশলটা আমাকে শিখিয়ে দাও।

আমার দেশের মানুষকে তুমি ভালবাস, সেই ভালবাসায় আমিও বাঁধা পড়ে গেছি ডাক্তার।

ফিরে এলাম কিচেনে। ওর জন্যেও প্লেট সাজালাম। তারপর দুটো প্লেটই নিয়ে গেলাম ওর ঘরে।

এসো খাওয়া যাক্।

কি যেন ভাবল ও।

তারপর বলল, জান ডাক্তার, এই দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটুখানি খাবার অনেকে একই সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছি। তাতে কারো ক্ষুধা মেটেনি, কিন্তু মন ভরেছে। একই সঙ্গে কষ্ট সহ্য করার শক্তি পেয়েছি।

বললাম, দুর্ভিক্ষই তোমাদের সমস্ত মনের বল নষ্ট করে দিয়েছে।

ও বলল, এ কথা মিথ্যে নয় ডাক্তার, তবে বনের মানুষগুলোর অনেকেই কিন্তু সাহায্য নিতে চায়নি। আমি অনেক বুঝিয়ে ওদের রাজি করিয়েছি।

তোমার বিবেচনার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে শনিচারি। মিথ্যে মানুষগুলোকে মেরে তো কোনও লাভ নেই।

BanglaBook.org

শনিচারি কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি অনেক ভেবে দেখেছি ডাক্তার, প্রকৃতির ওপর মানুষের কোনও হাত নেই। প্রকৃতি মানুষকে এগিয়ে যাবার পথে যেমন সাহায্য করে, তেমনি তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পেছনে ফেলেও দেয়।

বললাম, এত বড় বীর নেপোলিয়ানকেও একদিন প্রকৃতির আঘাতে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল।

আমি তা জানি ডাক্তার। তারপর কতক্ষণ কী ভেবে ও বলল, বৃষ্টি যদি এবছর সমানে চলত তাহলে হয়ত এতদিনে এ বনের ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেতে পারত।

সেজন্যে ভেবো না শনিচারি, বৃষ্টি আবার শুরু হবে।

কিন্তু মানুষগুলোর ভাঙা মন কী করে জোড়া লাগবে ডাক্তার?

তোমার ভালবাসার টানেই তারা আসবে।

কিন্তু আমি যে তাদের ভেতর ঘুরে বেড়াতে পারছি না ডাক্তার।

এর উত্তর আমার কাছে ছিল না। শনিচারি আমাকে প্রশ্ন করেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে বসে রইল।

ওকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। তাই বললাম, তোমাকে সারিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছি শনিচারি। নিশ্চয়ই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

শনিচারির মুখে করুণ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

সুস্থ হই আর না হই, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তোমার কথা আমার মনে থাকবে ডাক্তার।

এত অল্পেই তুমি ভেঙে পড়ছ শনিচারি! তুমি না বনের মানুষগুলোকে জাগিয়ে তোলার ব্রত নিয়েছ?

আজকাল মাঝে মাঝে কেমন দুর্বল হয়ে পড়ি ডাক্তার। মনে হয়, আমার এতবড় কল্পনার সব কিছুই কী করে যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

ওর হাতে দুধের গ্লাসটা তুলে দিয়ে বললাম, শরীরটাকে সুস্থ রাখো, তাহলে মনের দুর্বলতাগুলো সহজে জয় করতে পারবে।

BanglaBook.org

হাসপাতাল থেকে কোয়ার্টারে ফিরে আসতে সেদিন একটু রাত হয়ে গেল।

এসেই দেখি বামিয়া ইতিমধ্যে এসে গেছে। রাতের খাবার তৈরির কাজে মন দিয়েছে সে। আর তার পাশের ঘরে জানালায় বসে তাকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে শনিচারি। আমার ডিসপেনসিং রুমের জানালা খুললেই কিচেন দেখা যায়।

রাতের খাওয়া শেষ করে বারান্দায় এসে বসলাম। চাঁদের আলোয় এই বনভূমি কেমেন রহস্যময় মনে হল। কতদিন এই চন্দ্রালোক-ধোয়া পাহাড়ি পথ ধরে আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছি। বনের হিংস্র পশুর ভয় আমাকে আড়ষ্ট করতে পারেনি। আমি চলে গেছি কত পাহাড়ি বাঁক পেরিয়ে, কত ঝর্ণার পাশ দিয়ে। রাতে বনের ফুল কী মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়।

কে যে এসে তাদের গন্ধ আঘ্রাণ করে তা আমি জানি না। হয়তো কোনদিন দুধসাদা চাঁদের আলোয় মৌমাছিরা উড়ে আসে ওই সব ফুলের বনে। অথবা কোনও হরিণ ঝর্ণার ধারে শালের ফুলের গন্ধে এসে দাঁড়ায় তার সঙ্গিনীকে নিয়ে। রাতের জগত কী রহস্যময়, কী রোমাঞ্চকর। দিনের বেলা মানুষের চলাফেরার পথে, সহস্র কাজকর্মের মাঝে প্রকৃতি নিজেকে তেমন করে প্রকাশ করে না। কিন্তু রাতে যখন দিনের কর্ম কোলাহল নীরব হয়ে আসে, তখন প্রকৃতি তার মুখের ওপর ঢেকে রাখা ওড়নাখানা সরিয়ে ফেলে। তখনই তার অপরূপ রূপের দেখা পাওয়া যায়। চাঁদের আলোয় সে স্নান করে। সবুজ অরণ্যের কোমল একটা লাবণ্য গড়িয়ে পড়ে তার সর্বাঙ্গ বেয়ে।

পাহাড়ি জ্যোৎস্নার ওড়না ঢাকা গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম, আর ভাবছিলাম কত কথা।

শনিচারি পাশে এসে বসল। ডিসপেনসিং রুম থেকে আমার বাইরের ঘরের বারান্দা একটু দূরেই বলতে হবে। ওর পক্ষে ঠিক এতখানি পথ না আসাই উচিত ছিল। তবু ওকে কিছু বলতে পারলাম না। এই আশ্চর্য জ্যোৎস্নার প্রেমে কতক্ষণ দুজনেই মগ্ন হয়ে রইলাম।

শনিচারি প্রথমে কথা বলল, আমার দেশ তোমার ভাল লাগে ডাক্তার?

তোমার দেশের এই চাঁদের আলো আমার কাছে বিটোফেনের সংগীতের মত মনে হয়।

শনিচারি মিষ্টি একটা হাসি হাসল।

তুমি ডাক্তার না শিল্পী আমি মাঝে মাঝে তাই ভাবি।

হেসে বললাম, মাঝে মাঝে তা হলে আমার কথা ভাব শনিচারি!

ও বলল, তুমি আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছ।

বললাম, সেকি! ভাবতে কাউকে কখনও কেউ বাধ্য করতে পারে।

তুমি করনি ঠিক, কিন্তু আমি বাধ্য হয়েছি ভাবতে।

কথা ক'টি বলে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল শনিচারি। আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এখন যে কেউ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেই বুঝতে পারবে, সব কিছু ভুলে কী গভীর হয়ে ও ওর চিন্তার ভেতর ডুব দিয়েছে।

এক সময় ও যেন আবেগে ভেঙে পড়ল, আচ্ছা ডাক্তার, তুমি বলতে পার, কেন তুমি আমার জন্যে এত করছ? তুমি জান, আমি তোমার দেশের, তোমার জাতির শত্রু, তবু কেন আমাকে এমন করে আশ্রয় দিলে। আমি এর কোন প্রতিদানই তো তোমাকে দিতে পারব না ডাক্তার।

বললাম, বার বার তুমি একটি ভুল করছ শনিচারি। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, আহতকে সেবা করা আমার ধর্ম। যে কোনও ঘটনাতেই হোক, আমরা সেদিন যখন ওই শালের বনে মুখোমুখি হলাম, তখন সুস্থ নও। তার পরের কর্তব্যটুকু আমি স্বাভাবিকভাবেই করেছি। সুতরাং এখানে দান প্রতিদানের কথাই আসে না।

এবার কী ভেবে হাসি ফুটল শনিচারির মুখে।

বলল, বেশ আছি ডাক্তার! বনে বনে অভুক্ত থেকে কোথায় যে ঘুরে বেড়াতাম তার ঠিক ঠিকানা নেই। এখন নিশ্চিত আরামে তোমার আশ্রয়ে যে ক'টা দিন কাটানো যায়, সেই লাভ।

অন্য কথার অবতারণা করলাম, বামিয়াকে কোথায় পাঠিয়েছিলে শনিচারি?

ও আমার ডান হাতটা ওর দুটো হাতের ভেতর নিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, আমাকে ও প্রশ্ন এখন কোরো না ডাক্তার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, তোমার দেওয়া অধিকারের অপব্যবহার করছি, তাই না? কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। অধিকার যখন দিয়েছ, তাকে পুরোপুরি ভোগ করতে দাও।

বললাম, বামিয়া ছেলেটা যেমন বিশ্বাসী তেমনি কাজের, তাই না?

ও বলল, আমার দেশের সব ছেলেমেয়েরাই তাই।

তাই তোমার দেশকে এমন ভালবেসে ফেলেছি শনিচারি।

ও বলল, যখন তোমার দেশের মানুষ আমার দেশে এসে শোষণ আর অত্যাচার শুরু করল তখন তাদের ক্ষমা করতে পারিনি। আমি প্রতিদিন তাদের বিরুদ্ধে আমার মনের ঘৃণাকে সঞ্চয় করেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে ধারণা বদলে গেছে ডাক্তার। কতকগুলো মানুষকে দেখে একটি জাতকে বিচার করা যায় না।

বললাম, তোমাদের ওপর ইংরাজদের ব্যবহারে আমি লজ্জিত হই শনিচারি।

তুমি কেবল ইংরাজ হলে আমি তোমাকে ভালবাসতাম না ডাক্তার। তুমি একটি সুন্দর হৃদয়বান মানুষ বলে তোমার ওপর আমার এত আকর্ষণ।

BanglaBook.org

বললাম, আচ্ছা শনিচারি, তুমি দেশকে ভালবাস, না মানুষকে?

তোমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না ডাক্তার। একটু সহজ করে বুঝিয়ে বল।

মনে কর একটি দেশকে তুমি ভালবাস, আবার একটি মানুষও তোমার কাছে প্রিয়। সেখানে প্রয়োজন হলে তুমি কাকে ত্যাগ করতে পার?

এ প্রশ্ন কেন ডাক্তার?

এ আমার নিছক কৌতূহল শনিচারি।

ও স্থির হয়ে বসে রইল কতক্ষণ। তারপর বলল, দেশ চিরদিনই মানুষের চেয়ে বড়, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে।

যেমন?

যদি কোনও মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্ক থাকে তা হলে সে ক্ষেত্রে দেশ মানুষের চেয়ে বড়। কিন্তু যেখানে একটি মানুষ নিজের আশ্চর্য ক্ষমতায় দেশের গণ্ডীর বাইরেও মনটাকে তুলে ধরতে পারেন, সেখানে দেশের চেয়ে আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি।

বললাম, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত নই শনিচারি। একটি মানুষ যত বড়ই হোন, দেশের চেয়ে কী করে তাঁকে বড় বলব তা বুঝতে পারি না।

শনিচারির গলার স্বর গম্ভীর হল। দেখেছি, মনের কোনও গভীর উপলব্ধির কথা বলতে গেলে সে খুব জোরের সঙ্গে তা বলার চেষ্টা করে।

দেশকে একান্ত করে ভালবাসার ভেতর একটু স্বার্থপরতা মিশে আছে। সেখানে মানুষের মন দেশে দেশে বিভেদের গণ্ডীকে মুছে ফেলতে পারে না। কিন্তু যে মানুষ দেশের মোহ কাটিয়ে সবার জন্যে নিজেকে দান করেন, তিনি দেশের চেয়েও বড়।

তুমি তা হলে তোমার দেশের জন্যে সংগ্রাম করছ কেন?

আমি দেশের জন্যে সংগ্রাম করছি না বলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি বললেই ঠিক হবে। সে অন্যায়টা যেহেতু আমাদের দেশের মাটিতেই ঘটছে, তাই তাকে দেশের হয়ে যুদ্ধ বলতে পার।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম শনিচারির দিকে। সেই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে আমার মনে হল পৃথিবীটা কত কাছে সরে এসেছে। সারান্দার এই শৈলঘেরা বনভূমির সঙ্গে আমার দেশের কোথায় যেন হুবহু একটা মিল আছে। এই অরণ্য-কন্যাটির মুখে আমি সারা পৃথিবীর ছায়া-মণ্ডল দেখতে পেলাম।

১০ জুন ঃ

বামিয়া আর শনিচারি প্রায় রোজই-একটা খেলা খেলে। আমি সে খেলার একমাত্র দর্শক।

আমার কোয়ার্টারের পেছনেই একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপরে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা শালের গাছ। ডিসপেনসিং রুমের জানালা দিয়ে শনিচারি তীরের খেলা খেলে। তার পাশে থেকে শিক্ষানবিশি করে বামিয়া।

বামিয়া শাল গাছের কোনও একটি স্থান নির্দেশ করে। অমনি সুঁই করে ছুটে যায় একটা তীর। আমি অবাক হয়ে যাই শনিচারির লক্ষ্যভেদের কৌশল দেখে। নির্দিষ্ট স্থানের ঠিক মধ্যবিন্দুতে শনিচারির তীর বিদ্ধ হয়ে যায়। আমার মনে হয়েছে হাডসনের চেয়েও লক্ষ্যে একাগ্র শনিচারি। হাডসন সুটিং-এ বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। এ বনে হাডসনের তুল্য দক্ষ শিকারীও কেউ নেই। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে শনিচারি হাডসনের চেয়েও দক্ষ।

আমার কোয়ার্টার থেকে ওরা লক্ষ্য ভেদ করে। হাসপাতাল থেকে কেউ তা দেখতে পায় না। আমি বারান্দায় বসে বসে ওদের খেলা দেখি। আজকাল বেলাশেষের কিছু আগে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই চলে আসি ওদের খেলা দেখতে।

BanglaBook.org

এই ব্যাপারটা আমাকে কেমন যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে।

ইতিমধ্যে তীরের খেলায় আমাকে প্রায় অবাক করে দিয়েছে বামিয়া। লক্ষ্যে প্রায় অব্যর্থ সে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বারান্দায় বসে আছি। লক্ষ্যভেদের খেলা তখনও শুরু হয়নি। আমি তাকিয়েছিলাম পাহাড়ের ওপর শাল গাছগুলোর দিকে। দেখি, পাহাড় বেয়ে বামিয়া উঠছে। ব্যাপারটা দেখবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

যেখানে দুটো শাল গাছ গায়ে গায়ে জড়াজড়ি হয়ে উঠেছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল বামিয়া। কিছুক্ষণের ভেতর এক অদ্ভুত কাণ্ড। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটছে তারদিকে। উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হবার জোগাড়। কিন্তু বামিয়া দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচুর মত। তার মাথা ঘেঁষে, কান, বুক, হাত ঘেঁষে তীরগুলো বিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে শালের গাছে।

একসময় তীর ছোঁড়া শেষ হল। বামিয়া বেরিয়ে এল। মনে হল, শালের গাছে তীর দিয়ে আঁকা হয়েছে একটি মানুষের অবয়ব।

উঠে গেলাম ডিসপেনসিং রুমে। জানালার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে শনিচারি; পায়ের কাছে পড়ে আছে ধুনকটা। আমার পায়ের সাড়া পেয়ে ও ফিরে তাকাল। মুখে মিষ্টি একটা হাসি লেগে আছে।

বামিয়ার জন্যে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলে, তাই না ডাক্তার?

বললাম, তোমার ওপর ভরসা থাকলেও ভয় আমি পেয়েছিলাম।

ও অমনি বলল, আমার ওপর তোমার বিশ্বাসের চরম পরীক্ষা আজ করছিলাম।

হেরে গেলাম, তাই না?

ওর মুখের কেমন যেন পরিবর্তন ঘটে গেল। মনে হল একটা বেদনা ধীরে ধীরে ছায়া ফেলছে ওর মনের ওপর। ও নীরব হয়ে রইল কতক্ষণ।

একসময় বলল, তোমার ওপর বিশ্বাস হারালে আমার আর কী রইল ডাক্তার। একটা পঙ্গুকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ। যখন তার মাথার লোভে তোমারই দলের লোক ঘোরাঘুরি করছে, তখন সে পরম নিশ্চিন্তে স্থান পেয়েছে তোমারই কাছে। এর চেয়ে বিশ্বাসের পরীক্ষা আর কী হতে পারে। আর যা হই, আমাকে তুমি অকৃতজ্ঞ ভেবোনা ডাক্তার।

পরিস্থিতিটা সহজ করবার জন্যেই বললাম, বামিয়ার কিন্তু তোমার ওপর অগাধ বিশ্বাস। তুমি তীর ছুঁড়ছ, আর ও দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল হয়ে। অন্য কেউ হলে, সে একেবারে দাঁড়াতেই পারত না।

ও আমাকে ভালবাসে ডাক্তার।

বললাম, ভালবাসাই বিশ্বাসের জন্ম দেয়।

আমার কথা শুনে চুপ করে রইল শনিচারি। কতক্ষণ এমনি থেকে হঠাৎ এক সময় বলল, তুমি তা হলে আমাকে ভালবাস ডাক্তার?

হেসে বললাম, এ ধারণা তোমার কী করে হল?

তুমিই তো বললে, ভালবাসা থেকেই বিশ্বাস জন্মায়। তুমি আমাকে ভাল না বাসলে আমি তোমাকে এতখানি বিশ্বাস করতাম কী করে।

বললাম, তোমাকে আমি যেমন ভালবাসি, তেমনি শ্রদ্ধাও করি। তোমার ভেতর জোয়ান অব আর্কের মত আগুনের ছোঁয়া পেয়েছি বলেই শ্রদ্ধা করি শনিচারি।

আর ভালবাস কেন ডাক্তার?

তুমি আমার পেসেন্ট বলে। প্রতিটি রোগীকেই আমি ভালবাসি।

এবার অন্যমনস্ক হল শনিচারি। কিছুক্ষণ পরে বলল, তুমি জোয়ান অব আর্কের কথা বলছিলে না ডাক্তার। আমি তাঁর কথা ইতিহাসে পড়েছি। তিনি তো তোমার দেশের শত্রুই ছিলেন।

BanglaBook.org

শত্রু ছিলেন কিনা জানিনা, তবে তিনি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের শ্রদ্ধার পাত্রী, এ কথা বলতে পারি।

শনিচারি আমার ডান হাতখানা আবার তুলে নিল, তুমি জাতির চেয়ে মানুষকে শ্রদ্ধা কর, তাই তোমাকে আমিও শ্রদ্ধা করি ডাক্তার।

ইতিমধ্যে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। হাসপাতাল থেকে সন্ধেবেলা রাউন্ড দিয়ে কোয়ার্টারে ফেরবার পথে দেখি পাহাড়ের তলায় একটা সাদা কালোয় মেশা প্রকাণ্ড ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে দেখি, পাশের একটি পাথরের সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ঘোড়াটা দেখে বিস্মিত হলাম। হাডসনের ঘোড়া আমি চিনি। আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সব ঘোড়াই আমার চেনা। তা হলে এই নতুন ঘোড়া এলো কোথা থেকে। কোয়ার্টারে গেলাম। সম্ভবতঃ নতুন কোনও অতিথি এসে থাকবেন। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখলাম না। বামিয়াকে জিজ্ঞেস করেও কোন হদিস পাওয়া গেল না।

ডিসপেনসিং রুমে গিয়ে শনিচারিকে এই রহস্যময় ঘোড়ার কথা জানালাম।

আমার মুখে কথাটা শুনে মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল শনিচারি। তার চোখে মুখে প্রবল এক উত্তেজনার আভাস ফুটে উঠল। বললাম, কী হল তোমার শনিচারি। হঠাৎ এভাবে উঠে দাঁড়ালে কেন?

তুমি আমাকে একবার ওর কাছে যাবার অনুমতি দেবে ডাক্তার?

তুমি কেন যাবে, আমিই নিয়ে আসছি ওকে।

না, আমার যাওয়া দরকার। ও আমারই ঘোড়া। তা ছাড়া আমার লোকেরা নিশ্চয়ই কাছে পিঠে কোথাও আছে।

একা তোমার পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয় শনিচারি। আমি তোমাকে বরং সাহায্য করতে পারি।

তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে ওরা কিছুতেই কাছে আসতে চাইবে না ডাক্তার।

তা হলে?

শনিচারি মুহূর্তকাল চিন্তা করল। তারপর বলল, বামিয়াকে আমার সঙ্গে দাও। ওর ওপর ভর রেখে আমি এটুকু পথ চলে যেতে পারব।

বামিয়াতে নিয়ে শনিচারি চলে গেল। আমি বারান্দায় এসে বসলাম। এলোমেলো কত কথা আমার মনে আসতে লাগল। সেই প্রথম দিনটির কথা, যেদিন শনিচারির সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়েছিল সেদিনও বোধকরি এমনি একটি ঘোড়ায় চড়ে আমার পথ রোধ করে ও দাঁড়িয়েছিল।

তারপর কী ক্ষিপ্রতায় ও আমাকে বর্ষার ভেতর আমার পরিচিত পথের ওপর পৌঁছে দিয়ে গেল।

কতদিন কত কথা শুনেছি ওর সম্বন্ধে। কত নতুন বুদ্ধির খেলা ও দেখিয়েছে লড়াইয়ের সময়। ওর বিচক্ষণতাকে দূর থেকে আমি সম্ভ্রমের চোখে দেখেছি।

তারপর একদিন ও এসে ধরা দিল আমারই কাছে। কী বিশ্বাসের ছবি ও প্রথম দিন দেখেছিল আমার চোখে, যে জন্য নির্ভয়ে সে আমার কাছে চলে আসতে পারল।

আমি মানুষকে ভালবাসি, তাই ও আমাকে বিশ্বাস করেছে।

মানুষকে ভাল না বাসলে ডাক্তার হব কী করে। মানুষে মানুষে ভেদ, দেশে দেশে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেন অসুস্থ রাজনীতিজ্ঞেরা, কিন্তু ডাক্তারের বৃত্তি তো তা নয়। আমাদের কাছে প্রতিটি মানুষের মূল্যই এক। দেহের অস্থিমজ্জার গঠনে রাজা প্রজা বলতে তো কোন ভেদ নেই।

শনিচারি আমার এই মনোভাবের প্রশংসা করে। কিন্তু ও ডাক্তার হলে বুঝতে পারত এতে প্রশংসা করবার কিছু নেই। এ আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম।

BanglaBook.org

আচ্ছা, আমি কি শনিচারিকে আশ্রয় দিয়ে অন্যায় করছি না। আমি আমার সরকারের অর্থ নিচ্ছি, তার সেবা করা, তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই কী আমার উচিত নয়। শনিচারি আমাদের সরকারেরই তো বিরুদ্ধাচরণ করছে।

কিন্তু অন্যায় করছে আমার সরকার। শনিচারি তার দেশকে ভালবাসে, এটা তার অপরাধ হতে পারে না। পরদেশের মানুষের কাছ থেকে আঘাত পাওয়া স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায়না।

আমার দেশ, আমার জাতি মানুষকে পীড়ন করে যে অন্যায় করেছে, আমার সেবা দিয়ে যদি তার সামান্য পরিমাণও স্খালন করতে পারি।

আচ্ছা, শনিচারি যদি আর ফিরে না আসে। সে যদি তার দলের লোকজনের সঙ্গেই চলে যায় গভীর অরণ্যে।

কথাটা ভাবতে গিয়ে মনটা কেমন দমে গেল। একটা দুর্জন অভিমান আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ও কি যাবার আগে একবারও আসবে না আমার কাছে। শনিচারি কৃতজ্ঞতা জানাক তা আমি চাই না। আমি কর্তব্য করেছি, কৃতজ্ঞতা আমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু এতদিন একই সঙ্গে রইলাম, তাই যাবার আগে স্বাভাবিক সৌজন্যটুকু দেখিয়ে যাবে না।

কি এলোমেলো ভাবছি আমি। শনিচারি রক্তাক্ত দেহ নিয়ে একদিন যদি তার দেশের মানুষের হয়ে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসতে পারে তা হলে আজ আমি তার আচরণকে সন্দেহ করব কেন।

কত সময় এমনি ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার সামনে শনিচারি এসে দাঁড়িয়েছে। তার পেছনে বামিয়া। হাতে খাবারের প্লেট।

আজ এইখানে বসেই তোমার ডিনার হোক্।

ওকে দেখে মন হঠাৎ খুশিতে ভরে উঠল।

বললাম, এসো আমরা একসঙ্গে বসে খাই।

শনিচারি ইঙ্গিত করল। বামিয়া আমার খাবার রেখে ওর খাবারটা আনতে গেল।

তুমি এতক্ষণ আসনি দেখে মনে মনে বেশ চিন্তিত হচ্ছিলাম।

হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর মুখে।

বলল, ভাবনা হচ্ছিল বুঝি, যদি আর ফিরে না আসি।

চলে গেলেও যে বলে যাবে, সে ধারণা আমার আছে।

বড় দেরি হয়ে গেল আমার, তাই না?

বললাম, রাত কত হল তা ঠিক বুঝতে পারিনি। টুকরো ভাবনার ভেতর সময়টা কেমন নিঃসাড়ে কেটে গেল।

কি ভাবছিলে ডাক্তার?

যদি বলি, তোমার কথা।

শনিচারি হেসে বলল, খুব স্বাভাবিক। এত বড় একটি রোগী বাইরে বেপরোয়া ঘুরে বেড়ালে ডাক্তারের ভাবনা হবে বইকি।

বামিয়া খাবার দিয়ে গেল। আমরা দুজন গল্প করতে করতে খেতে লাগলাম।

শনিচারি বলল, আজ বহুকাল পরে আমার দলের কোনও কোনও সর্দারের সঙ্গে দেখা হল ডাক্তার!

বললাম, শুভ সংবাদ, কিন্তু কী করে তারা তোমার সন্ধান পেল?

তুমি কিছু অনুমান করতে পার?

এদিকে ওদিকে ভেবে বললাম, বামিয়া ওদের খবর দিয়েছে নিশ্চয়।

BanglaBook.org

পারলে না ডাক্তার।

তবে?

তোমার মত ওরাও আমার তীরের খেলা লক্ষ করেছে।

সে কী!

হ্যাঁ, ডাক্তার। কয়েকদিন থেকে আশপাশ ঘুরে ওরা তীরের খেলা দেখছিল। যেদিন বামিয়াকে দাঁড় করিয়ে তীর ছুড়লাম, সেদিন ওরা আমার এখানে থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে।

তারপর?

ওরা ভেবেছিল আমি এখানে আহত অবস্থায় বন্দি হয়ে আছি। তাই আমার ঘোড়াটাকে সাহায্যের জন্য এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তোমার ঘোড়া কোথায় ছিল?

যেদিন গুলিতে আহত হলাম, সেদিন ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা তাকে বনের পথে ধরেছিল। কিন্তু আমি কোথায় আছি তা জানতে পারেনি।

এখন কি করবে তুমি?

হেসে বলল, তোমার চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হয়ে উঠব।

তাড়াতাড়ি সারতে না পারলে?

কোনও ক্ষতি নেই। ওরা আমার সন্ধান জেনে গেল। এখান থেকেই আমি ওদের পরামর্শ দিতে পারব।

বললাম, এটা সরকারী হস্‌পিটাল, পলিটিক্যাল মিটিংয়ের জায়গা নয়।

তুমি যে জায়গায় হাসপাতাল করেছ, এটা আমাদেরই দেশের মাটি ডাক্তার।

আচ্ছা, এটা যে তোমাদের জায়গা তা না হয় মানলাম, কিন্তু হাসপাতাল এলাকায় মিটিং করা কী উচিত?

শনিচারি হেসে বলল, চিন্তা করোনা ডাক্তার। যেদিন মিটিং হবে সেদিন আমি তোমার হাসপাতাল থেকে দূরে চলে যাব।

যদি তোমাকে অনুমতি না দিই।

আমাকে তুমি বেঁধে রাখতে পারবে ডাক্তার?

এ কি বলছ তুমি শনিচারি! ডাক্তার যদি রোগীকে বাইরে যাবার অনুপযুক্ত মনে করে, তা হলে রোগী কি তার অবাধ্য হবে?

আমার কথা শুনে শনিচারি হঠাৎ মুখ নিচু করল।

আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। যদি অশোভন কিছু বলে থাকি, সে জন্যে মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

বললাম, চিন্তিত হয়ো না। তেমন বুঝলে অবশ্যই তোমাকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে।

১৭ আগস্ট ঃ

কী বিপুল কর্মের উদ্যম দেখলাম শনিচারির। দুটি মাসের ভেতর সিন্ধবাদের গল্পের সেই অতিকায় পাখির মত দুটি ডানা মেলে সারা বনভূমি আচ্ছন্ন করে ফেলল।

কী অসাধারণ প্রাণের জোয়ার। আমার কতটুকু সাধ্য ওকে বাধা দিয়ে রাখতে পারি। প্রথম প্রথম এক আধটু বাধা দিয়েছি; অমনি আমার দুটি হাত ধরে ও অনুনয় করেছে, আমাকে একবারটি যেতে দাও ডাক্তার। এই বর্ষার সুযোগ হারালে আর কখনও দাঁড়াতে পারব না।

ওকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। যে ইচ্ছা করলে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে, সে যখন অনুমতি ভিক্ষা করে, তখন তাকে বাধা দেবার মত মনের শক্তি থাকে না।

BanglaBook.org

মাঝে মাঝে আমি বিশেষ দুঃখিত হয়েছি। বলেছি, নিজের পাখানাকে দিনের পর দিন এমন করে জখম করছ কেন শনিচারি?

ও উত্তর দিয়েছে, সারা জীবন পঙ্গু হয়ে, পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না বলেই তো এমন করে পাখানাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ডাক্তার।

আমি আর কোনও কথাই বলিনি। বোধহয় বলতে পারা সম্ভব ছিল না।

বর্ষার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করল শনিচারি। পাহাড়ী বন্যার মত আদিবাসীরা ভেঙে পড়ল বরাইবুরুর পুলিশ ক্যাম্পগুলোর ওপর।

গত লড়াইয়ের পর সরকারী আর্মড ফোর্সের বেশি অংশই বন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আদিবাসীরা ওই সুযোগ পেয়ে গেল। তারা বরাইবুরু দখল করে নিল।

হাডসন ছাতমবুরু থেকে কিছু সংখ্যক ফোর্স আনলেন কুমড়ির বাংলো রক্ষার জন্যে।

খণ্ড খণ্ড লড়াই চলল। বহুক্ষেত্রে আদিবাসীরাই জয়ী হল। এই বর্ষাই তাদের একমাত্র ভরসা। প্রকৃতির এই সহযোগিতার সদ্ব্যবহার করতে না পারলে আর কোনও আশাই থাকবে না তাদের।

একদিন শনিচারি ফিরে এল হাসপাতালে। দেখলাম, ক্ষতস্থান দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। ক্ষোভের সঙ্গেই বললাম, হয় তুমি একেবারে বাইরে চলে যাও, নয়তো চিকিৎসার ভেতর থাক কয়েকদিন।

ও বলল, এই চরম মুহূর্তে তুমি কী বলছ ডাক্তার। আমার দেশের মানুষগুলো একমাত্র আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে।

উত্তেজনায় কাঁপছিল ও।

বললাম, এমনভাবে রক্ত পড়তে থাকলে আর দু-চারদিনও তারা তাদের নেত্রীকে তাদের মাঝে পাবে না।

শরীরের অবস্থাটা কী খুব খারাপ ঠেকছে ডাক্তার?

তোমার মত আমি উত্তেজিত হইনি শনিচারি। আমি ডাক্তার। রোগীর অবস্থাটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় উত্তেজনার কারণ।

শনিচারি আমার নির্দেশে কয়েকদিন চিকিৎসার ভেতর থেকে গেল। একটা উত্তেজনার তাড়নায় ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল; বুঝতে পারেনি, ভেতরে ভেতরে ও কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

উত্তেজনার পরেই অবসাদ। মাঝে মাঝে শনিচারি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই অবস্থায় কেবল যুদ্ধের প্রলাপ চলতে থাকে। আমি সাধ্যমত সেবা করি। যখন ও জ্ঞান ফিরে পায় তখনই বামিয়াকে নির্দেশ দিয়ে পাঠায় তার দলবলের কাছে। এমনিভাবে কাজ চলতে থাকে।

এক সন্ধ্যায় ফিরে এল বামিয়া। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল, কোথায় যেন কী একটা অঘটন ঘটেছে।

গোপন খবরটা শনিচারিকে দেবার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু তখন শনিচারি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে।

আমি বামিয়াকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বললাম, খবর যত গুরুতরই হোক্, শনিচারির অসুখ তার চেয়েও গুরুতর। সুতরাং একটু সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তার কাছে কিছু বলা চলবে না।

মনে হল ও আমার সামনেই কেঁদে ফেলবে।

বললাম, কি ব্যাপার বামিয়া?

ও যা বলল তার অর্থ হল, শনিচারির দলের প্রধান সর্দার আজ গুলির ঘায়ে মারা গেছে। দলের সাধারণ লোকেদের মনে ক'দিন থেকেই এ রকম একটা ধারণা জন্মেছিল, শনিচারিকে সরকার নাকি

BanglaBook.org

বন্দি করে ফেলেছে। সে খবর শুনে দলের ভেতর ভাঙন ধরেছিল। তারপর আজ সর্দার মারা যেতে সবাই বরাইবুরু ছেড়ে বনের ভেতর আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যাচ্ছে।

এ সময় শনিচারি সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াতে পারলে ওরা সবাই ফিরে আসত।

শনিচারির কাছে গেলাম। ও তেমনি পড়ে আছে আচ্ছন্ন হয়ে। মনে হল, ওর জাতির এই চরম অবস্থার কথা ওকে একবার জানানো দরকার। নইলে আমিই হয়ত ওদের এই পরাজয়ের জন্য দায়ি হয়ে যাব।

কাছে গেলাম, ধীরে ধীরে ওকে জাগাবার চেষ্টাও করলাম, কিন্তু ও একবার চোখ মেলে পরক্ষণে গভীর ঘুমে ডুবে গেল। বামিয়া আর আমি শনিচারির জাগার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

পরের দিন খবর এল, সরকারী নতুন ফৌজ-বাহিনী জামদা থেকে মার্চ করে আসছে। আদিবাসীরা সে খবর পেয়ে গভীর বনের ভেতর লুকিয়েছে।

এবারের পরাজয় আদিবাসীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেল। যে উদ্যম নিয়ে ওরা শুরু করেছিল, সেটুকু শেষ অবধি বজায় রাখতে পারলে, সরকার হয়ত বনের আদিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারত। চিরস্থায়ী একটা সুযোগ সুবিধেও ভোগ করতে পারত তারা। কিন্তু বিধাতার উদ্দেশ্য তা নয়। শনিচারির আঘাত আজ সমস্ত অরণ্যের মানুষদের ওপর চরম আঘাত হানল।

২৩ অক্টোবর ঃ

পায়ের আঘাত থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছে শনিচারি, কিন্তু মনের ক্ষত আরোগ্য হবে কী করে।

সারাদিন বসে থাকে ঘরের ভেতর। ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে দূরের উপত্যকার দিকে। উপত্যকার শেষে ছোটনাগরার সীমানা। ওর পিতার রাজ্য, ওর বাল্য, কৈশোরের স্বপ্নভূমি। হয়ত ও ভাবে ওর অতীত জীবনের কথা। স্বপ্ন দেখে আবার সে রাজ্য সে ফিরে পেয়েছে। সেখান থেকে জড়ো করেছে অরণ্যের সাধারণ মানুষদের। আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলছে তাদের।

আজকাল আমি যখন ওকে ডাক দিই তখন কেমন অসহায় দুটো চোখ মেলে ও আমার দিকে তাকায়। যা বলি, কোন প্রতিবাদ না করে তাই শোনে।

ওর এই অসহায় ভাবটা আমাকে বড় পীড়া দেয়। যার ইঙ্গিতে সারা বনের মানুষ প্রাণ দিতে পারত, আজ সে সামান্য একটা ঘরের ভেতর অন্যের আশ্রয়ে তার দুর্ভাগ্যকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

একদিন বসলাম ওকে প্রবোধ দিতে।

বললাম, রবার্ট ব্রুসের সাধনার কথা তুমি জান। তা হলে এমন ভেঙে পড়ছ কেন শনিচারি।

ও আমার দিকে তাকাল। মুহূর্তে মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আবার কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

বলল, কোনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না ডাক্তার।

এখন তোমার তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথা দিয়ে কেমন করে যে সুযোগ এসে যাবে তা তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না।

আমার দেশের মানুষ কী আর সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইবে।

তুমি শক্তি জোগালে তারা আবার জাগবে।

তুমি জান না ডাক্তার, যে খাবার দেয়, মানুষ তার কাছে নিজেকে বিক্রি করে। তোমাদের সরকার আমার দেশের সাধারণ মানুষকে খাবার দিয়ে বশ করেছে।

আমার মনে হয় আদিবাসীদের পরাজয়ের প্রধান কারণ তোমার অনুপস্থিতি। আর একটা কারণ, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব। তীর আর বর্শা নিয়ে বন্দুক বা বোমার সঙ্গে লড়াই করা যায় না।

শনিচারি কতক্ষণ বসে বসে কী যেন চিন্তা করল।

তারপর একসময় বলল, তুমি ঠিক বলেছ ডাক্তার। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া লড়াইতে দীর্ঘস্থায়ী জয়লাভ অসম্ভব।

BanglaBook.org

বললাম, অস্ত্রশস্ত্রের দিকে নজর দাও।

কেমন বিষণ্ণ করুণ একটা হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে।

বলল, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল ডাক্তার। আমার যা কিছু সম্বল, সবই ফেলে এসেছি ছোটনাগরায়। আমি জানি, ইংরাজরা তার খোঁজ হয়ত পাবে না, কিন্তু আমার সেগুলি আনার পথ যে বন্ধ হয়ে গেছে।

বললাম, চেষ্টা করে দেখ, একটা কিছু উপায় বের হবেই।

ও আবার ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে ভুলে গেল আমার অবস্থিতি। আমি কাজে বেরিয়ে এলাম হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে ডিসপেনসিং রুমে গিয়ে দেখি শনিচারি গভীরভাবে বামিয়ার সঙ্গে কি যেন আলোচনা করছে।

আমাকে দেখে শনিচারি উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

তুমি খুব ভাল ডাক্তার।

কী হল আবার। হঠাৎ আমার প্রশংসা শুরু করলে!

না ডাক্তার, তুমি না বললে আমি হয়তো আর চেষ্টা করার শক্তিই পেতাম না।

নতুন কি পরিকল্পনা নিচ্ছ?

শনিচারি হেসে বলল, সে অতি গোপনীয়। পরে পরে প্রকাশ পাবে। তবে এখন সোনার খনিতে ঢোকার চেষ্টা করছি।

ও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, বামিয়াকে হাসপাতাল থেকে কয়েকদিন বাইরে রাখতে হবে ডাক্তার।

বললাম, বামিয়া কি এখনও আদেশের অপেক্ষায় আছে?

শনিচারি গম্ভীর হল। একসময় মুখ তুলে বলল, জানি, তোমার ওপর আমাদের অত্যাচার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

তা ভেবে কিন্তু কথাটা বলিনি শনিচারি। এ নিছক কৌতুক।

ও বলল, কৌতুক হলেও কথাটা সত্য।

ওকে সহজ করে দেবার জন্যে বললাম, তুমি বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ আজকাল। বামিয়াকে বাইরে পাঠাবে, এর জন্যে আমার অনুমতির দরকারটা কী পড়ল তা বুঝতে পারছি না। সাধারণ রোগী আর তোমার মধ্যে পার্থক্যটা কি নতুন করে বলে দিতে হবে।

শনিচারি সহজ হল।

বলল, বামিয়াকে ছোটনাগরায় পাঠাব।

সে কী, সেখানে যে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

শনিচারি কপট ক্রোধের ভান করে বলল, এ তোমার ভারী অন্যায় ডাক্তার। বামিয়া চিরদিন তোমার কাছে চাকরী করবে এমন দাসখত সে লিখে দেয়নি। তার এখন ইচ্ছে হয়েছে, ছোটনাগরার নতুন মনিবদের কাছে দু'দিন চাকরি করে।

এতক্ষণে ওদের পরামর্শের বিষয়টা আমার বোধগম্য হল।

শনিচারি ছোটনাগরায় বামিয়াকে পাঠিয়ে তার সঞ্চিত গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করবে, আর তাই দিয়ে কিনবে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

হেসে বললাম, বামিয়া তার নতুন মনিবদের চিত্ত আর বিত্ত দুইই হরণ করে ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক, এই কামনা করি।

ঝর্ণার কলধ্বনির মত হাসির ঢেউ তুলল শনিচারি।

সে হাসিতে আমিও যোগ দিলাম। শুধু বামিয়া বসে রইল অনুগত আজ্ঞাবহের মত।

BanglaBook.org

২৫ ডিসেম্বর ঃ

হঠাৎ ডরোথি আর রেবেকা হাসপাতালে হাজির।

কী ব্যাপার!

ডরোথি অমনি বলল, অসুখ না হলে বুঝি আসতে নেই?

বললাম, তা কেন, তবে আমার কোয়ার্টার ঠিক কুম্‌ড়ির বাংলোর মত সুসজ্জিত কিংবা আরামদায়ক নয়, তাই বিশিষ্ট অতিথিরা এলে সঙ্কোচ বোধ করি।

রেবেকা আমাদের কথা শুনে মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন।

এবার মুখ খুললেন, ডরোথি হাসপাতালে আসবে বলে ক'দিন থেকে অস্থির করে তুলেছে।

নিজেকে এ জন্যে ভাগ্যবান মনে করছি।

ভাগ্যটা ঠিক কোন্ পক্ষের তা এখুনি হলফ করে বলা যায় না মিঃ জনসন।

ডরোথি এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আমি ওদের ড্রইংরুমে এনে বসালাম।

বললাম, ব্যাচিলারের ডেরায় যখন এসে পড়েছেন তখন সবকিছু নিজেদের করে নিতে হবে কিন্তু।

রেবেকা বললেন, ও ভয় আমাদের দেখাবেন না ডাক্তার। আপনাদের চেয়ে ঘরকন্নার কাজ আশা করি আমরা আর একটু ভাল করেই করতে পারব।

ওঁরা ঘরে ঢুকলেন, আমি কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। শনিচারিকে এঁরা কেউ চেনেন না ঠিক, ওকে পেসেন্ট বলে চালিয়েও দেওয়া যায়, কিন্তু হাসপাতালে না রেখে ডিসপেনসিং রুমে রাখার কী কৈফিয়ৎ দেব আমি।

অবশ্য গোপন করা যেতে পারে সবকিছু, কিন্তু তার জন্যে দরকার প্রচুর সাবধানতা।

শনিচারিকে ওদের উপস্থিতির কথা জানাতেই ও বলল, রান্নাঘরের দিকে জানালাটা একেবারে বন্ধ করে দিলে তোমার কোয়ার্টারের সঙ্গে আমার আর কোনও যোগাযোগই রইবে না।

বললাম, সব কিছু খুব সাবধানে করে যেতে হবে।

শনিচারি বলল, আমাকে নিয়ে তোমার ভাবনার কোনও কারণ নেই, কেবল বামিয়ার জন্যে যা কিছু ভাবনা।

কেন, বামিয়া যে আমার এখানে কাজ করে তাতো ওদের অজানা নয়। সুতরাং তার হঠাৎ এসে পড়াতে ক্ষতি কি?

তুমি সত্যিই বোকা ডাক্তার। বামিয়ার হঠাৎ করে আসাটাকে কেউ লক্ষ না করলেও ওর হঠাৎ করে চলে যাওয়াটা কারো লক্ষ এড়াবে না।

ওকে একবার সাবধান করে দিলে ও রাতে আসতে পারবে।

সেই ব্যবস্থাই করতে হবে, বলল শনিচারি।

বেলা শেষে আজকাল ডরোথি আর রেবেকাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতে হয়। আমি যত রকমের ফুল আর লতার নাম জেনেছি, তাই ওদের এক এক করে চেনাই। ডরোথির এসব শিক্ষায় আগ্রহের শেষ নেই। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার ডরোথি যে শিল্পী তা আমার জানা ছিল না। ও সঙ্গে এনেছে ওর ছবি আঁকার সরঞ্জাম। পথে বেরুলেই সঙ্গে নিয়ে চলে স্কেচের খাতা। পাহাড়ি আঁকবাঁক, শালগাছ, আদিবাসীদের ঘর দোরের ছবি আঁকায় ওর বিশেষ আগ্রহ।

পাহাড়ি বস্তিগুলোতে প্রতিদিন ওদের একবার করে যাওয়া চাই। রেবেকা আদিবাসীদের সহজ সরল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী। ওদের সমাজজীবনের খুঁটি নাটি খবর লিখে রাখেন ওঁর ডায়েরীতে। বিবাহ পদ্ধতি, ধর্মকর্ম, গান, উপকথা, ইতিহাস বহু পরিমাণে সংগ্রহ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে।

BanglaBook.org

ডরোথি স্কেচের পর স্কেচ করে যাচ্ছে। মেয়েদের দল বেঁধে খোঁপায় ফুল গুঁজে নাচ, ছেলেদের আদুল গায়ে তীরধনু নিয়ে শিকার, ঝর্ণা থেকে মাথায় কলস বসিয়ে মেয়েদের ঘরে ফেরা, এইসব ডরোথির বিশেষ প্রিয় সাবজেক্ট।

সন্ধেবেলা কোয়ার্টারে ফিরে আমি একবার হাসপাতালে রাউন্ড দিয়ে আসি। তারপর বারান্দায় বসে বসে গল্প শুরু হয়। দেশের গল্প। আত্মীয় পরিজনের কথা। লণ্ডনের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে আমাদের চোখের ওপর।

কতদিন নিজের দেশ দেখিনি। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কত দূরে সরে এসেছি। মাঝে মাঝে দু'একখানা চিঠি আসে। কতবার ফিরে ফিরে সে চিঠি পড়ি। আমার মেডিক্যাল কলেজের বন্ধুদের চিঠি।

মাকে হারিয়েছি ছেলেবেলা। বাবা প্রচুর অর্থের মালিক। তিনি আবার বিয়ে করলেন। আমার বিমাতার অনেকগুলি সন্তান। তারা লণ্ডনেই লেখাপড়া করছে। নিজের একটিমাত্র বোন। কত আদরই না তাকে করতাম। সে এখন সুখেই টমাসের ঘর করছে।

মনে মনে এমনি আমরা তিনটি প্রাণী হারিয়ে যাই আমাদের ফেলে আসা পুরনো জীবনে।

গল্পের ভেতর একদিন আমি পিটারের কথা তুলেছিলাম। ডরোথি দেখলাম একটুও আগ্রহ প্রকাশ করল না। ও প্রসঙ্গ থেকে সে নিজেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল। রেবেকা দু'চার কথা বললেন। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা করলেন তিনি।

বুঝলাম, পিটার মুছে গেছেন ওঁদের মনের ক্যানভাস থেকে।

ডরোথি ভার নিয়েছে আমার পোশাক পরিচ্ছদের। আমি প্রথম প্রথম বিব্রত বোধ করেছিলাম, কিন্তু রেবেকাই মাঝে পড়ে আমার সংকোচ দূর করে দিয়েছেন।

রেবেকা বললেন, কুমারী মেয়ের কিছু কিছু সংসারের কাজ হাতে কলমে করা দরকার। ডরোথি যদি পোশাকগুলো যত্ন করে রাখতে পারে তাহলে সেটা তার শিক্ষা। সে সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারেন না ডাক্তার।

হেসে বললাম, আপনারা কোনও কাজে বিরক্তবোধ না করলে আমার দিক থেকে বিব্রত বোধ করার কোন কারণই থাকে না।

ডরোথি আজকাল আমার কাছে কাছেই থাকতে চায়।

সেদিন বলল, আমি আপনার সঙ্গে হাসপাতালের কিছু কিছু কাজ করতে চাই।

বললাম, বেশ ভাল, কিন্তু কি কাজ করবেন?

কিছু না পারলেও নার্সিং তো করতে পারব।

বললাম, নার্সিং খুব সহজ কাজ নয়। তবে মন বসাতে পারলে সব কাজই সহজ হয়ে আসে।

আমি চেষ্টা করব।

হেসে বললাম, কিন্তু কতদিন সে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবেন?

ও বলল, যতদিন না আপনি আমাকে বরখাস্ত করেন।

বললাম, মিঃ হাডসন আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হবে না।

কি করে বুঝলেন?

এখানে রোগীদের ভেতর আদিবাসীর সংখ্যাই বেশি। ওদের সঙ্গে সরকারের যে ভাবটা চলেছে তাকে কোনমতেই সদ্ভাব বলা চলে না। এ অবস্থায় আদিবাসীর সেবা অমার্জনীয় অপরাধ।

আপনি করছেন কি করে?

আমি প্রথমে ডাক্তার, তারপর সরকারের লোক। আমার কাছে সব মানুষের জাতই এক।

ডরোথি চুপ করে রইল।

BanglaBook.org

বললাম, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল হওয়া তৃপ্তির বা গৌরবের সন্দেহ নেই, কিন্তু সবার জীবন এক ধারায় বয় না।

আমি যদি সে জীবন গ্রহণ করি?

তাতে বাধা দেবার কিছু নেই। তবে আপনি যে জীবন পেয়েছেন তা চেষ্টা করলেই পাওয়া যায় না।

ডরোথি বিস্মিত হয়ে আমার দিকে চাইল।

হেসে বললাম, ফুল যদি তার নিজের গন্ধের কথা জানতে পারত তাহলে সে আত্মগর্বের জন্যে মানুষের কাছ থেকে এতখানি স্তুতি পেত না।

আমাকে বড় বেশি বাড়িয়ে তুলছেন ডাক্তার জনসন।

আপনার শিল্পসত্ত্বাকে আমি শ্রদ্ধা করি জানবেন। ছবি আঁকতে চাইলেই আঁকা যায় না। ও প্রতিভা আসে ভেতরের অলক্ষ কোন ক্ষমতার থেকে।

ডরোথি কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে রইল।

একদিন এসে পড়লেন হাডসন। হৈ হৈ জুড়ে দিলেন। কাজকর্মের বাইরে মানুষটি বিশেষ আমুদে।

বললেন, ডাক্তার তোমার রোগীরা কেমন আছে বল?

বিশেষ কোন জটিল কেস এখন হাতে নেই। মোটামুটি ভালই বলতে পারা যায়।

আমি কিন্তু তোমার হাসপাতালের সাম্প্রতিক দুই রোগীর কথাই বিশেষ করে জানতে চাইছি।

ডরোথি, রেবেকা আর আমি হেসে উঠলাম।

বললাম, রোগের বিশেষ কোন লক্ষণ এখনও ধরা পড়ছে না।

হাডসন বললেন, রোগ ধরার দু'রকমের চোখ আছে। আমাদের এই দুটো চোখে দেহের রোগ হয়তো ধরা পড়ে, কিন্তু মনের রোগ ধরার আলাদা চোখ চাই।

ডরোথি অমনি বলল, অপবাদটা বড় বেশি সোজাসুজি হয়ে যাচ্ছে।

হাডসনের হাসি আর থামতেই চায় না।

ডরোথি যে বিশেষ ধরনের রোগে ভুগছে, আশাকরি এ কথা না বলে দিলেও তুমি বুঝতে পারছ ডাক্তার।

মোটেই তা নয়, ডরোথি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু তা কি করে বিশ্বাস করি বল। আমরা ভুক্তভোগী। তোমার অবস্থা আমরা পার হয়ে এসেছি। অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আমাদের আছে, তোমার কিংবা ডাক্তারের নেই।

আবার তেমনি উচ্ছল হাসি ছড়াতে লাগলেন হাডসন।

বললাম, ডাক্তার কিন্তু নিজের চিকিৎসা করতে চায় না।

হাডসন বললেন, এ ব্যাপারে ডিগ্রি না থাকলেও আমার ওপর চিকিৎসার ভার ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

বললাম, আক্রমণটা কিন্তু প্রথমে আমার দিকে ছিল না।

হাডসন বললেন, এ এক অদ্ভুত শিকার ডাক্তার জনসন। এ শিকারে একসঙ্গে দু'জনকেই লক্ষ করতে হয়।

এবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম।

আপনার আর একটা শিকার কিন্তু অনেক দিন দেখিনি। উড়োপাখি শিকার।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন হাডসন। বললেন, মানুষ শিকারের কাজ এখন বন্ধ আছে, চল সবাই মিলে পশুপাখি শিকার করে বেড়াই।

BanglaBook.org

কবে যাচ্ছেন? ডরোথির গলায় কৌতূহল।

কালই চল।

চারটে ঘোড়া এল। আমরা শিকারে চললাম সদলবলে। আমাদের সঙ্গে রইল আদিবাসী কয়েকটি কুলি কামিন।

সারাদিন বনবাদাড় ভেঙে চলল শিকার পর্ব। ডজন খানেক বন মোরগ, আর কয়েকটা খরগোস কপালে জুটল। বনের মাঝে মিলল একটি খোলামেলা জায়গা। বড় সুন্দর জায়গাটি, পাশেই একটি ঝর্ণা। তার দু'দিকে বড় বড় নুড়ি পাথর পড়ে আছে। পাশে বেশ খানিকটা অংশ সবুজ সমতল।

আমরা কতদিন পরে কাজের বাইরে একই দেশের কজন মানুষ একসঙ্গে মিললাম।

গান গাইলেন রেবেকা। চমৎকার সুরেলা গলা। আগেও আমি রেবেকার গান শুনেছি। কিন্তু বনের এই নিভৃত লোকে রেবেকার গান বড় অদ্ভুত শোনাল।

রান্নার ভার পড়ল রেবেকার ওপর।

হাডসন সত্যিই সুখী। মনে হল, রেবেকার জীবন প্রভু যীশুর কৃপায় সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মাংস তৈরির ভার আমার ওপর।

হাডসন বললেন, কেমন অপারেশন কর তা আজকে দেখা যাবে।

ডরোথি আর রেবেকা কাছে এল। আমি জীবদেহের এক একটা অংশ ওদের কাছে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে লাগলাম।

ডরোথি বলল, আজকের ঘটনার সবচেয়ে ইনটারেস্টিং বিষয় এই ডিসেকসন পর্ব।

হাডসন বললেন, এটা তোমার মত না সবার সেটা যাচাই করে দেখতে হয়।

রেবেকা বললেন, আমিও ডরোথির সঙ্গে একমত।

হাডসন বললেন, মন্ত্র জান ডাক্তার। ক'দিন হাসপাতালে থেকে ওরা তোমার ভক্ত হয়ে গেছে।

ডরোথি অমনি বলল, আপনিও এমনি হাসপাতালের ভার নিন, তাহলে আমরা আপনারও ভক্ত হয়ে পড়ব।

হাডসনের আবার সেই হাসি।

আমি খোদ চিড়িয়াখানার ভার নিয়ে বসে আছি।

আমাদের চিড়িয়া ভাবলেন নাকি?

আমার চিড়িয়াখানার চিড়িয়া না হলেও বিধাতার চিড়িয়াখানার জীব, এটা অস্বীকার করতে পার না।

হাসি, গল্প, গানে আমাদের সারাদিনের আসর জমে উঠল।

বেলা শেষে ফেরার উদ্যোগ করছি, এমন সময় খবর এল, পথে হাতি দেখা গেছে।

ডাইনে পাহাড়, বাঁয়ে খাদ, এর মাঝে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা, ঘোড়ায় চড়ে যাই কেমন করে। এদিকে বেলা শেষ হয়ে আসছে। অন্ধকার পথে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল।

আদিবাসীরা আমাদের বনের ভেতর অপেক্ষা করতে বলে আশেপাশে বস্তির খোঁজে খাদ বেয়ে নেমে গেল। আমরা কতক্ষণ ওই একই জায়গায় বসে রইলাম। সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলল সমস্ত বনভূমি।

চোখের ওপর পাহাড়ি পথটা মুছে গেল এক সময়। আদিবাসী লোকগুলো আর ফিরে এল না।

কারো মুখে কথা নেই। বিচিত্র সব কীট পতঙ্গ ডাকতে শুরু করল।

কিসের একটা খস্ খস্ শব্দ হতেই ডরোথি ভয়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরল।

হাডসন বললেন, আমার মনে হয়, কুলিরা পথ হারিয়েছে। ওদের নিশানা দেবার জন্যে ফায়ার করা যাক্।

BanglaBook.org

বলার সঙ্গে সঙ্গে হাডসন বন্দুক তুলে ফায়ার করলেন পর পর কয়েকটা।

আধঘণ্টা কাটল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। একই জায়গায় স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করে আছি যে কোনও রকম একটা অঘটনের।

হঠাৎ রেবেকা চিৎকার করে উঠলেন, ওই যে বনের আড়ালে সারি সারি মশালের আলো দেখা যাচ্ছে!

আমরা উৎফুল্ল হয়ে সেদিকে তাকালাম।

হাডসন বললেন, আমার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার দেখছি কাজ দিয়েছে।

কিছু সময়ের ভেতর মশালধারীরা এসে পড়ল আমাদের কাছে।

কিন্তু একি, এদের ভেতর আমাদের পরিচিত লোকগুলি কই! দেখলাম, চেনা লোকগুলির একটিমাত্র রয়েছে ওদের সঙ্গে।

ওরা এসে প্রথমেই হাডসনের হাতের বন্দুকটা টেনে কেড়ে নিলে।

হাডসন এ রকম ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

ওরা এবার দু'দলে বিভক্ত হয়ে আমাদের আগে পিছে চলতে লাগল। বুঝতে পারলাম, আমরা আদিবাসীদের হাতে বন্দি হয়েছি।

এবার চড়াই উৎরাই ভেঙে আমাদের চলতে হল। কিছুক্ষণ চলার পর চাঁদ উঠল। আমরা এসে পৌঁছলাম একটা ভ্যালির এক প্রান্তে। দু'দিকে পাহাড় উঠে গেছে, মাঝে গিরিখাদ। ঐ গিরিখাদের ঠিক নীচেই ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর থেকে একটি আলোর রশ্মি এসে পড়েছিল। আমরা কিছু সময়ের ভেতর সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। কাছে যেতে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর চোখে পড়ল। পাথরের তৈরি দেয়াল। খড়কুটোর ছাউনি।

সারারাত সেখানে আমরা বন্দি হয়ে রইলাম। রেবেকা আর ডরোথিকে কোথায় যেন ওরা সরিয়ে নিয়ে গেল। ছেড়ে যাবার সময় দেখলাম, ওদের চোখমুখে ভীতির ছায়া। আমাদের সামনের দরজাটা এক সময় চোখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সেই নির্জন রহস্যময় বনের ভেতর বন্দি হয়ে রইলাম।

হাডসনের মুখে কথা নেই। গভীরভাবে কী যেন ভাবছেন তিনি। হয়তো ভাবছেন মুক্তির উপায়, হয়তো বা ভাবছেন পরিণতির কথা।

সামনের দরজা আবার খুলল। কয়েকখানা রুটি আর সেদ্ধ ডিম ওরা রেখে গেল আমাদের সামনে। এবার ঘরের ভেতর বসিয়ে দিয়ে গেল একটা টেমি। টিম টিম করে জ্বলতে লাগল টেমিটা।

হাডসন চুপচাপ বসে আছেন দেখে বললাম, কিছু খান।

এ অবস্থায় কিছু খাওয়া যায় না জনসন। কথা কটি বলে আবার চিন্তায় ডুব দিলেন হাডসন।

কতক্ষণ পরে বললেন, ডরোথি আর রেবেকাকে কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, ওদের জন্য দুর্ভাবনা বেড়েই চলেছে।

বললাম, চিন্তার কোনও কারণ আছে বলে মনে হয় না আমার। তাহলে এত খাবার দাবার হয়তো দিত না।

মজার অনুমান তোমার জনসন।

বললাম, আমার যা ধারণা হয়েছে তাই বললাম।

আমাদের ঘরের একদিকে খুব ছোট জানালার মত ফাঁকা একটা ফোকর ছিল। তার ভেতর দিয়ে বাইরের চাঁদের আলো এসে পড়েছিল।

হাডসন সেখানে উঠে গিয়ে কী যেন দেখতে লাগলেন। কতক্ষণ কি যেন সব পরীক্ষা করে ফিরে এলেন।

BanglaBook.org

কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললেন, একটা পাথর সরালেই ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।

বললাম, ক্ষেপেছেন। আমাদের ঘরের চারদিকে নিশ্চয়ই পাহারা বসেছে। তাছাড়া অপরিচিত পথে গিয়ে কী শেষে বুনো জানোয়ারের মুখে প্রাণটা হারাবেন।

হাডসন বিমর্ষ হয়ে বললেন, তা ছাড়া রেবেকা ডরোথি রয়েছে, ওদের ছেড়ে পালানো সম্ভব নয়।

বললাম, বিপদ যখন এসেছে, তখন শেষ পর্যন্ত তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করা ভাল।

এরপর কোনও কথা হল না। আমরা পাশাপাশি দুজনে বসে রইলাম।

রাত তখন কত ঠিক জানি না, বোধকরি শেষ হয়ে এসেছিল, হঠাৎ দরজা খুলে গেল। আমরা প্রায় চমকে উঠলাম।

একটি লোক আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। আমরা ঘরের বাইরে এলাম। আরও কয়েকটি লোক আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের নির্দেশে আমরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের আলো। আমরা কয়েক মিনিটের ভেতর একটি খোলামেলা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। চারিদিকে পাহাড় আর বন, মাঝে এই খোলা জায়গাটুকু।

আমরা এসেই দেখলাম, বনের কোল ঘেঁষে অনেকগুলি লোক তীরধনু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা সেই ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে ভেসে এল। কিছুক্ষণের ভেতর অশ্বারোহিণী এক মহিলা আমাদের একটু দূরে এসে দাঁড়াল। সমস্ত শরীর তার ঘোমটায় ঢাকা।

রহস্যময়ী রমণী বলল, মিঃ হাডসন, স্বেচ্ছায় আমাদের এলাকায় এসেছ, সেজন্যে ধন্যবাদ। অনেক চেষ্টা করেও তোমার দেখা পাইনি।

হাডসন বললেন, ধরা যখন পড়েছি, তখন তোমাদের যা খুশি তাই করতে পার।

হাসল মহিলাটি। বলল, আমার দেশের মানুষকে যেভাবে শাস্তি দাও, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সেভাবে শাস্তি দিতে পারি; কিন্তু তাতে কোনও কৃতিত্ব নেই। কাপুরুষ যারা, তারাই শুধু ব্যক্তি বিশেষের ওপর অত্যাচার করে আনন্দ পায়।

একটু থেমে আবার বলল, আর তাছাড়া কোন একটি ইংরাজকে শাস্তি দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তোমাকে হত্যা করলে, তোমার জায়গায় আর একজন আসবে।

তবে আমাকে নিয়ে তোমরা কি করতে চাও?

কিছু নয়, শুধু একটি অনুরোধ করব, আমার দেশের মেয়েদের ওপর, আমার দেশবাসীর ওপর পশুর মত অত্যাচার করো না।

আমরা সরকারের কর্মচারী। সরকারের নির্দেশ আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকি।

মহিলা বলল, আমি ইংরাজ জাতিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমাদের দেশে যে কাজ করছ, যে কোন শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজ তা সমর্থন করবে না।

হাডসন বললেন, তোমরা সরকারকে স্বীকার করে নিলে কোন অত্যাচারের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ইংরাজ সরকার তোমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা করে দেবে।

বনের হরিণকে তুমি যতই খেতে দাও হাডসন, ঘরের থেকে সে কেবল বনে পালাবার চেষ্টা করবে।

হাডসন বললেন, সে নিতান্ত বোকা বলে।

মিঃ হাডসন, যার মন বলে কিছু আছে, সে নিশ্চয়ই তোমার কথা মেনে নেবে না।

হাডসন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

BanglaBook.org

মহিলাটি বলল, একটু কষ্ট করে অপেক্ষা করতে হবে, এখুনি সঙ্গিনী দুটি ভদ্রমহিলাকে হাজির করছি।

মহিলাটি চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতর একটি লোক এসে আমাকে তার সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত করল। হাডসন রইলেন, আমি চললাম।

কিছু পথ গিয়ে একটি ঘর দেখতে পেলাম। ঘরের সামনে পৌঁছে দিয়ে সঙ্গের লোকটি কোথায় চলে গেল।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়েছিলাম, ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শনিচারি।

বললাম, পায়ের ক্ষত নিয়ে এই রাতে এত পথ না এলেই হতো না?

ওরা তো ক্ষেপে গিয়েছিল, হাডসনকে খুন করবে বলে।

আমাকে বাদ দেবার কারণ?

শনিচারি হেসে বলল, তুমি কি মনে কর, ডাক্তার জনসনকে চিনতে আমার দেশের কারও বাকি আছে।

বললাম, কেমন করে তুমি আমাদের বিপদের কথা জানলে শনিচারি?

তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে।

ওর পায়ের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, রক্তে ওর পোশাক ভিজে গেছে।

বললাম, তুমি হাসপাতালে তাড়াতাড়ি ফিরে না গেলে পা নিয়ে খুবই বিপদে পড়তে হবে।

শনিচারি হেসে বলল, তার চেয়েও ডাক্তার জনসনের সেবার লোভে ফিরে যেতে হবে।

বললাম, কখন যাচ্ছ?

তোমাদের আগে নিশ্চয়। সেখানে ডাক্তার জনসনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একজন লোক অন্তত রইবে।

আবার ফিরে এলাম মিঃ হাডসনের কাছে। এসে দেখি, ইতিমধ্যে রেবেকা আর ডরোথি সেখানে এসে গেছে।

আমাদের ঘোড়াগুলো আনা হল। আমরা ঘোড়ায় চড়ে আবার রওনা হলাম। ওদের কয়েকজন লোক আমাদের হাসপাতাল অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল। হাডসন কেবল সেই দুর্গম বন-প্রদেশে তাঁর সাধের বন্দুকখানা রেখে আসতে বাধ্য হলেন। সেদিনের শিকার পর্ব আমাদের এমনি এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শেষ হল।

১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ১৯০২

ডরোথি আর রেবেকাকে আমার হাসপাতালে রেখে দিয়ে হাডসন ফিরে গেলেন কুম্‌ডিতে। যাবার সময় আদিবাসীদের সম্পর্কে আমাকে খুব হুসিয়ার করে দিয়ে গেলেন।

মনে মনে হেসে বললাম, আদিবাসীদের থেকে আপনাকেই বেশি সাবধান হতে হবে মিঃ হাডসন।

ডরোথি, রেবেকা আর আমি বেলাশেষে আজকাল হাসপাতালের বারান্দায় বসে গল্প করি। রেবেকা কিছুতেই আর বাইরে বেড়াতে যেতে রাজি নয়। আবার যদি আদিবাসীদের হাতে আমরা ধরা পড়ে যাই।

আমি বলি, আদিবাসীরা কিন্তু লোক খারাপ নয়। সেদিন ওরা আমাদের মেরে ফেলতে পারত কিন্তু কেমন ভদ্রতা করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেল।

ডরোথি বলল, আচ্ছা ওই মেয়েটিই কি শনিচারি, ওদের দলের নেত্রী?

বললাম, তাইতো শুনেছি।

BanglaBook.org

রেবেকা বললেন, ওকে ঠিক মত দেখতে পেলাম না। সারা শরীর ওর কালো পোশাকে ঢাকা।

ডরোথি বলল, ঐ মেয়েটিকে নিয়েই যত হাঙ্গামা, ওকে ধরতে পারলে সব গোল চুকে যায়।

রেবেকা বললেন, আমার কিন্তু সেদিন মেয়েটির ব্যবহার বড় ভাল লেগেছিল।

কী রকম?

আমরা যে ঘরে ছিলাম, সেখানে এসে ও বলল, একটি অনুরোধ তোমাদের কাছে করব, তোমরা আমারই মত মেয়ে। আমাদের দুঃখ তোমরা যতটা বুঝবে আর কেউ তেমন বুঝবে না। আমাদের মেয়েদের ওপর যে বর্বর অত্যাচার করা হয়, তার বিরুদ্ধে তোমরা একটু প্রতিবাদ কর। নিজের দেশকে ভালবাসা তাদের কোনও অপরাধ নয়।

ডরোথি বলল, ওর খামখেয়ালীর জন্যেই তো তাদের ভুগতে হয়।

রেবেকা বলল, এ তোমার ভুল ধারণা ডরোথি। আমাদের দেশের খুব কম মেয়েই ওর মত সাহস আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে।

ডরোথি কথা না বাড়িয়ে চুপ করে রইল। আমি ইচ্ছে করেই আলোচনার ভেতর নিজেকে জড়ালাম না। শুধু বললাম, লক্ষ করেছেন বোধহয়, ও আমাদের দেশের ভাষাতেই কথা বলে।

ডরোথি এবার আমার পক্ষে এসে গেল।

বলল, শুধু আমাদের ভাষায় নয়, ওর উচ্চারণ কি করে এমন বিশুদ্ধ হল, তাই ভাবি।

রেবেকা বললেন, আমি বুঝতেই পারি না, একজন আদিবাসী মেয়ে ইংরাজী ভাষাটা শিখল কি করে।

বললাম, যাদের নেতা হবার ক্ষমতা থাকে, তাদের কাছে আপনাদের ওটুকু বিস্ময় কিছুই না।

শনিচারির প্রসঙ্গ শেষ করলাম। অনেকগুলি কথার ভেতর জড়িয়ে পড়লে নিজের মনের কথাই বেরিয়ে আসবে। তখন কোন্ ছিদ্র দিয়ে কি অঘটন যে ঘটে যাবে তা বলা যায় না।

ডরোথি আমার খুব কাছাকাছি থাকতে চায়। আমার পরিচর্যার ভার ধীরে ধীরে সে-ই হাতে তুলে নিয়েছে। এসব কাজে কাউকে বাধা দেওয়া যায় না। মাঝে মাঝে ও আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, কিছু যেন বলতে চায়, কিন্তু আমার ভেতর বিশেষ কোন ভাবান্তর লক্ষ না করে অন্য কথার অবতারণা করে। আমি ওর মনের ভাব বুঝতে পারি। ডরোথির শিল্পসত্তাকে আমি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু মনের যে আশ্রয়টুকুতে একটি মাত্র নারীকে এনে বসান যায়, সেখানে ডরোথির ছায়া পড়ে না। ডরোথি একদিন পিটারের প্রতি আসক্ত ছিল বলে আমি ওকে দূরে সরিয়ে রেখেছি, একথা মনে করলে ভুল হবে। আমি ডরোথিকে ঘৃণা করার কোনও কারণই খুঁজে পাই না। তবে মন ভালবাসার ক্ষেত্রে তার নিজের একটা পথ ধরে চলে; সেখানে বাইরের যুক্তি, বিবেচনার কোন ধারই সে ধারে না।

একদিন ডরোথি বলল, আজ বাইরে একটু বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনার আপত্তি না থাকলে আমার সঙ্গে যাবেন কি?

বললাম, আপনার দিদি হাসপাতালের বাইরে যেতে কি রাজী হয়েছেন?

না।

তাহলে দু'জনেই যাওয়া যাক্।

ডরোথি বলল, আমাদের কোয়ার্টারের ঐ পেছনের পাহাড়টাতে একটু ঘুরে আসি চলুন। ওখান থেকে চারদিকটা খুব সুন্দর দেখায়।

বললাম, সে তো খুব ভাল প্রস্তাব। দূরে কষ্ট করে যেতে হবে না, অথচ কাছে থেকে দূরের আশ্চর্য জগতটাকে নিকটে পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

ডরোথি একটা মন্তব্য করে বসল।

আপনি আসলে কিন্তু কবি। ডাক্তার হয়েছেন, কেবল একটা বৃত্তিকে গ্রহণ করতে হয় বলে।

হেসে বললাম, এ কিন্তু আমার বৃত্তির ওপর কটাক্ষ করা হচ্ছে। সরকার আপনার মুখের এই বাক্যগুলি শুনলে আমাকে এই হাসপাতালে রেখে বেশি দিন কবিত্ব করার সুযোগ দেবে না।

ডরোথি আমার কৌতুকের ওপর কিছুটা গুরুত্ব দিয়ে বলল, আমি কিন্তু আপনার বৃত্তির ওপর কোন মন্তব্য করছি না। বরং আপনার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করার চেষ্টা করছি।

খুশি হলাম আপনার কথায়। নিজে শিল্পী বলে প্রতিটি মানুষকে আপনি সেই দৃষ্টিতে দেখেন। এখন চলুন আমরা পাহাড়ের ওপর উঠি।

ডরোথি বলল, আপনার পোশাক আমি শোবার ঘরে রেখে এসেছি।

কেন, যে পোশাকটা পরে আছি সেটা পরে গেলে হয় না?

আমার অনুরোধ; ডরোথি চোখেমুখে অনুনয়ের ভাব ফুটিয়ে বলল।

পোশাক ছাড়তে ঘরে গেলাম। আমার বিশেষ সখের একটি পোশাক ছিল, ডরোথি আজ তাই বের করে দিয়েছে। কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হলে সে পোশাক আমি ব্যবহার করি।

প্রথম যখন সাসাংদাতে চার্চের উদ্বোধনে যাই তখন এ পোশাকখানা পরেছিলাম। আজ হঠাৎ আবার এখানা পরতে হল।

বেরিয়ে এসে দেখি ডরোথি ইতিমধ্যে তার পোশাক পরিবর্তন করে ফেলেছে।

আমরা হাসপাতালের পেছনের পাহাড়টাতে উঠলাম। ডরোথি আমাকে ইসারায় ঝর্ণাটার কাছে যেতে বলল, ঝর্ণার ধারে কয়েকটা শালগাছ। শালগাছের পাশেই একশিলা একটা পাথর পড়ে আছে। আমরা ঐ পাথরটার ওপরে গিয়ে বসলাম।

ডরোথি আঙুল দেখিয়ে বলল, দেখুন ডাক্তার জনসন, সামনের ঐ ভ্যালি আর দূরের পাহাড়গুলো কি চমৎকার দেখাচ্ছে।

বললাম, ঐ অঞ্চলটাই ছোটনাগরা।

ডরোথি একটু ভেবে নিয়ে বলল, ওখানে আমাদের সঙ্গে আদিবাসীদের একটা লড়াই হয়েছিল না?

আপনার মনে আছে দেখছি।

সে যুদ্ধে আমাদেরই জয় হয়েছিল।

বললাম, যুদ্ধ ছাড়াও ঐ জায়গাটা আর একটি বিশেষ কারণে বিখ্যাত।

ডরোথি আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

বললাম, ঐ ছোটনাগরাই ছিল আদিবাসীদের নেত্রী শনিচারির রাজধানী। আর ওখানকার দুর্গে থেকেই শনিচারি ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

ডরোথি কিছুক্ষণ কি ভেবে বলল, আমার কিন্তু শনিচারিকে একেবারে আদিবাসী মেয়ে বলে মনে হয় না।

আপনার অনুমান মিথ্যে না হলেও একেবারে সত্য নয়। শনিচারি আদিবাসী এক রাজার মেয়ে। সেই আদিবাসী লোকটি ঘটনাচক্রে ইয়োরোপে গিয়ে শিক্ষিত হয়ে এসেছিল। আর শনিচারির মা ছিল রাজপুতানী।

ডরোথি বলল, ভারী মজার ইতিহাস। এ আপনি সংগ্রহ করলেন কি করে?

লোকমুখে শুনেছি।

ডরোথি বলল, রাজপুতদের ইতিহাস আমি বম্বে থেকে পড়েছিলাম। অত্যন্ত চমকপ্রদ। রাজপুত মেয়েরা অসি নিয়ে যুদ্ধ করে। তাছাড়া নিজেদের সম্মান রাখার জন্যে আগুনে পুড়ে মরতেও নাকি ভয় পায় না।

BanglaBook.org

বললাম, সেই রাজপুত রক্ত ঐ শনিচারি মেয়েটির মধ্যে রয়েছে, তাই ওর এতখানি সাহস।

ডরোথি হঠাৎ বলে বসল, আর শনিচারির প্রসঙ্গ ভাল লাগছে না ডাক্তার জনসন, এখন আপনি আপনার নিজের গল্প করুন।

হেসে বললাম, আমার গল্প!

হ্যাঁ, আপনার জীবনের কথা। আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলুন। আপনি নিশ্চয়ই এই বুনো জায়গায় খুব বেশি দিন কাটাবেন না।

জায়গাটা আপনার ভাল লাগছে না বুঝি ?

আপনিই বলুন, বেশি দিন এই বন কার ভাল লাগে। প্রথম প্রথম ছবি আঁকার মোহে পড়েছিলাম, এখন আর একটুও ভাল লাগছে না।

বললাম, আমার বেলা ঠিক উলটো। প্রথমে আমার এখানে এসে একটুও মন বসেনি, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই আমি এ বনের মোহে পড়ে যাচ্ছি।

আপনি কি দেশে একেবারেই ফিরবেন না?

একেবারে ফিরব না এ কথা কেমন করে বলি। তবে এই বন আমাকে কি যেন এক মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে।

কিছুসময় চুপচাপ মুখ নিচু করে বসে রইল ডরোথি। তারপর হঠাৎ বলল, আপনি যতদিন না দেশে ফেরেন ততদিন আর একটি মেয়েরও দেশে ফেরা হচ্ছে না জানবেন।

সে কি, কে সে মেয়ে! আমার জন্যে তার দেশে ফেরা বন্ধ থাকবে কেন?

হ্যাঁ, তার জায়গাটা ভাল না লাগলেও সে থাকবে এখানে।

ভাল না লাগলে সে থাকবেই বা কেন?

এই বন ছাড়াও তার এমন কেউ আছে, যার জন্যে তাকে এখানে থেকে যেতে হবে।

সে মানুষকে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলতে হবে, একটি মেয়ে যার জন্যে নিজের দেশের মায়া কাটিয়েও এইখানে থেকে যেতে চায়।

সে মেয়েটির ওপর আপনার কি একটুও মায়া হয় না? ডরোথি জিজ্ঞাসু চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, সে মেয়েকে আমি শ্রদ্ধা করি জানবেন।

হঠাৎ একটি শব্দে চমকে উঠলাম। আমাদের একেবারে পাশেই যে শালের গাছটা দাঁড়িয়েছিল, তার গায়ে এসে বিঁধে গেছে একটা তীর। আশ্চর্য, সেই তীরের সঙ্গে বাঁধা একটি সুতো থেকে দুলছে একগুচ্ছ মরশুমী ফুল।

ডরোথি ভয়ে, কৌতূহলে আমার হাতখানা জড়িয়ে ধরে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

আমি পেছন ফিরে তাকালাম। ডিসপেনসিং রুমের জানালায় বিদ্যুতের মত এক ঝলক হাসির রেখা দেখা দিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। ডরোথি আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে তাকাবার আগেই জানালাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

হাসপাতাল থেকেই আমি খাবার নিয়ে যাই শনিচারির ঘরে। রাতে যখন হাসপাতালের কাজ শেষ করে খাবার নিয়ে ওর ঘরে ঢুকলাম, দেখি, শনিচারি জানালার কাছে বসে গরাদ ধরে সামনের ভ্যালির দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ভিতরে ঢুকলাম, কিন্তু ও আজ আর ফিরে তাকালো না। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল।

খাবারটা টেবিলে রেখে দিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

BanglaBook.org

সারা ভ্যালি বিচিত্র রহস্যময় হয়ে উঠেছে। শীতের শেষ, তবু একেবারে শীত চলে যায়নি। চাঁদের আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল, কিন্তু কুয়াশার একটা পাতলা চাদর ভ্যালির ওপর কে যেন পেতে রেখেছে।

সেদিকে তাকিয়ে বসেছিল শনিচারি।

বললাম, কি ভাবছ?

আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ও বলল, দেখ ডাক্তার, কি আশ্চর্য সুন্দর আমার এই দেশ।

তাইতো তোমার দেশকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না শনিচারি।

ও আমার দিকে তাকাল; তোমার অশেষ অনুগ্রহ ডাক্তার। আমার দেশের মানুষের হয়ে তোমার নতুন জীবনের উদ্দেশ্যে শুভ-কামনা জানাচ্ছি।

একটু থেমে ম্লান একটা হাসি হেসে বলল, করে দেশে ফিরছ?

হঠাৎ দেশে ফেরার কথা কেন শনিচারি; আমি কি তোমাদের দেশের মানুষের সেবা যত্ন ঠিক মত করতে পারছি না?

এ কথা বলে আমাদের দেশের মানুষকে অপরাধী করো না ডাক্তার। আমি শুধু বলছিলাম, মিলিত জীবন সাধারণত মানুষ নিজের দেশেই কাটায়। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, কবে দেশে ফিরছ।

আমি তো মিলিত জীবন অনেকদিনই যাপন করছি শনিচারি।

অবাক দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

বললাম, তোমার দেশের মানুষের সঙ্গে আমার জীবন অনেক আগেই মিলিত হয়েছে। ফুলের উপহার আরও আগে আমার পাওনা ছিল শনিচারি।

ও কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমার দুটো হাত ওর হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বলল, ক্ষমা কর ডাক্তার, আমি তোমাকে চিনেছি বলে মনে মনে একটা গর্ব ছিল, কিন্তু সে গর্ব আমার আজ ভেঙে গেছে। তুমি আমার চেনার সীমানাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছ।

আমাকে এত বড় করে দেখবার চেষ্টা করে লজ্জা দিও না। তোমাদের দেশের মানুষের কাছে থাকতে পেরে, তাদের ভালবাসা পেয়ে আমি মনে মনে গর্ববোধ করি শনিচারি। আমি তোমাদেরই একজন, এটুকু অন্তত আমাকে সহজ করে ভাবতে দাও।

শনিচারি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আমার হাতখানা সে আরও নিবিড় করে ধরে রইল তার হাতের মধ্যে।

১৪ মার্চ ঃ

আজও নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারছি না। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই মুখখানা। ডান দিকটা আগুনে পুড়ে ঝলসে গেছে। চৌদ্দ পনের বছরের কিশোর।

যেদিন প্রথম আগুনে পুড়ে এল আমার হাসপাতালে, সেদিন তার ভেতর যে সহ্য শক্তি দেখেছিলাম, তা আমার ডাক্তারী জীবনে নতুন এক অভিজ্ঞতা হয়ে আছে।

সেই মা বাপ হারা কিশোরটি ভাল হয়ে উঠল একদিন। হাসপাতাল থেকে যেদিন ডিসচার্জ করলাম, সেদিন ও এসে আমার কোয়ার্টারের আশেপাশে কেবল ঘুরতে লাগল।

ডেকে বললাম, বামিয়া তুই ভাল হয়ে গেছিস, এখন আর হাসপাতালে থাকতে হবে না, ঘরে ফিরে যা।

কোন কথা না বলে ও আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। ভোরে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, কে যেন হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি বামিয়া।

BanglaBook.org

সারারাত ছেলেটা কিছু না খেয়ে এখানে পড়ে আছে। কেমন কষ্ট হল। ওকে উঠিয়ে রুটি আর দুধ খাওয়ালাম।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে চুপচাপ মুখ নিচু করে ও বসে রইল দাওয়ার এক কোণে।

কাছে ডেকে বললাম, কে আছে রে তোর বাড়িতে ?

ও মুখখানা আরও নিচু করে বসে রইল।

বললাম, বাবা নেই?

ও মাথা নেড়ে জানাল, নেই।

মা?

তাও না। মা বাপ, ভাই বোন কেউ নেই তার। কলেরা মহামারীতে সব উজাড় হয়ে গেছে।

বললাম, কি করতিস তাহলে তুই তোর গাঁয়ে?

বামিয়া এবার মুখ খুলল, গাঁয়ের মাতব্বরের ক্ষেতে কাজ করতাম। দিনে একবেলা করে খেতে দিত। রাতে শুয়ে থাকতাম 'জায়েরা'র আস্তানায়।

বললাম, এখন গাঁয়ে ফিরে যা।

ও চুপচাপ বসে রইল।

মনে হল, হাসপাতালে ক'দিন খেতে পেয়ে ছেলেমানুষ আর কষ্টের ভেতর ফিরে যেতে চাইছে না।

বললাম, যখন খুব ক্ষিদে পাবে তখন না হয় চলে আসিস এখানে।

ও হঠাৎ উঠে এসে আমার দুটো পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলে।

পা ছেড়ে দে, কাঁদছিস কেন?

বামিয়া তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিও না সাহেব। খেতে না দাও, তবু হাসপাতাল ছেড়ে যেতে বলো না। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

সেই থেকে বামিয়া রয়ে গেল আমার কাছে। ও আমার পোশাক-আশাক পরিষ্কার করত ; আর হাসপাতালে খাবার দিয়ে আসত। যে কোন কাজ আমার বলবার আগেই ও করে রাখবার চেষ্টা করত। কথা বলত না বেশি। নীরবে কাজ করে যেত।

শনিচারি আসার পর ঘটনাচক্রে ও সরে গেল আমার কাজের ভেতর থেকে। আমি ওকে আর বাধা দিলাম না। দেশের কাজে বামিয়াকে দীক্ষা দিল শনিচারি। ঘরে বসেই ওকে করে তুলল দক্ষ তীরন্দাজ।

শনিচারিকে কি ভালই না বাসত ও। শনিচারির মনের কোণের একটি পাথর কি করে ও সরিয়ে ফেলেছিল। তার থেকে অজস্র ধারায় ঝরে পড়ত স্নেহ। সেই স্নেহের ধারায় স্নান করত বামিয়া।

কতদিন আড়াল থেকে আমি দেখেছি, বামিয়ার মাথায় চিরুণী দিয়ে দিচ্ছে শনিচারি। একসঙ্গে একই থালায় দু'জনে গল্প করতে করতে খাবার খাচ্ছে। বামিয়া ঘুমিয়ে থাকলে মায়ের চোখ মেলে কতক্ষণ তাকিয়ে ওকে দেখছে শনিচারি।

তাহলে কেন এমন হল। কত যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। কোথায় যেন একটা অস্থিরতার উৎস-মুখ খুলে গেছে। প্রবল গতি তার। শত চেষ্টাতেও যুক্তির পাথর চাপিয়ে তার প্রবাহ-পথ বন্ধ করা যাচ্ছে না। ইদানিং ও আমার হাসপাতালে বড় একটা আসত না। কোনদিন রাতে শনিচারিকে খাবার দিতে গিয়ে হঠাৎ দেখতাম, বামিয়া তার কাছে বসে আছে। উত্তেজনার ছবি আঁকা হয়ে থাকত ওর চোখেমুখে। আমাকে দেখে ও মাথা নিচু করত। তেমনি সংকোচ, প্রথম যেদিনটি ও হাসপাতালে বহাল হল, সেদিন যেমন সংকোচ দেখেছিলাম।

হেসে বলতাম, কি বামিয়া, হাসপাতাল ছেড়ে আজকাল কেমন আছ?

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে জানাতো, সে ভাল আছে।

বলতাম, তুমি না আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না বলেছিলে?

আমার কথা শুনে ও অপ্রস্তুত হয়ে যেত।

শনিচারি হেসে বলত, ও এখন দেশের কাজ করছে ডাক্তার। দেশ ওর কাছে এখন সব চেয়ে বড়।

বামিয়াকে উৎসাহ দিয়ে বলতাম, দেশের কাজে ডুব দিয়েছ, খুব খুশি হয়েছি বামিয়া।

ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

শনিচারি বলত, জান ডাক্তার, বামিয়ার মত আর দু'একটা ছেলে পেলে আমি তোমাদের হাত থেকে আমার দেশটাকে ছিনিয়ে নিতে পারতাম।

উত্তর দিতাম, তোমার বামিয়া যথার্থ কাজের ছেলে।

শনিচারি ওকে প্রথমে পাঠাল ছোটনাগরায়। উদ্দেশ্য, শনিচারির মায়ের সঞ্চিত প্রচুর সোনা বামিয়ার সাহায্যে উদ্ধার করা। সেই সোনা দিয়ে কেনা হবে বন্দুক, রাইফেল, লড়াই চলবে সমানে সমানে।

নিঃশব্দে কাজ চলল কিছুদিন। কোন কোন রাতে দেখতাম, বামিয়া এসেছে। হয়ত সঙ্গে এনেছে একতাল সোনা।

শনিচারি সোনার তালটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলত, এটা কি বলতো?

কেন, সোনার তাল।

শনিচারি অমনি মাথা নেড়ে বলত, হল না ডাক্তার, ওটা হল, পাঁচখানা বোমা আর তিনখানা রাইফেল।

হেসে বলতাম, আজ থেকে নতুন চোখ দিয়েই দেখব।

আচ্ছা ডাক্তার বলতো, ওটা কার সম্পত্তি?

এবার ভেবে চিন্তেই জবাব দিতাম, তোমার মায়ের।

না ডাক্তার, তোমার মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই। ওটা হল সারান্দা বনের প্রতিটি অধিবাসীর সম্পত্তি। আমার দেশের মানুষ এ সবের অধিকারী।

বলতাম, হার মানছি। তোমার মনের নাগাল পেতে গেলে আমাকে আরও কিছুদিন সাধনা করতে হবে।

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠত শনিচারি।

বামিয়া মাথা নিচু করে বসে থাকত চুপচাপ।

কিছুদিন থেকে লক্ষ করছিলাম, ওদের কর্মব্যস্ততা বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে শনিচারিকে বাইরে যেতে হত। অবশ্য আমার দৃষ্টি এড়িয়ে ও বেশি দূর যেতে সাহস করত না। রাতে হাসপাতালের পেছনের পাহাড়ে অনেকগুলি লোকের আসা যাওয়ার সাড়া পেতাম। বারান্দায় বসে বসে শুনতাম ঘোড়ার খুরের শব্দ।

অনেক রাতে চুপি চুপি ডিসপেনসিং রুমের কাছে গিয়ে দেখতাম, শনিচারি তখনও বসে বসে কি যেন করছে।

দরজায় টোকা দিতাম। আমার হাতের শব্দ ওর চেনা ছিল। দরজা খুলে যেত।

ঘরে ঢুকে কোনও দিন দেখতাম, একরাশ নোট নিয়ে হিসেবপত্র করছে। আবার কোনও দিন নিজের হাতে ম্যাপ তৈরি করছে।

বলতাম, তোমার গোপন আড্ডার খবরটা এবার সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে।

BanglaBook.org

হেসে ও বলত, আমার আড্ডা উঠে যাবে ঠিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে হাসপাতালও ছাড়তে হবে।

আচ্ছা শনিচারি, তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে, তোমরা আমাকে শাস্তি দেবে?

শনিচারি কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলত, শাস্তি তুমি নিজের মনের থেকেই পাবে। অন্য কারও কাছ থেকে শাস্তি পাবার দরকারই হবে না তোমার।

বলতাম, যত অপরাধই আমি করি, তুমি কিন্তু আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না।

শনিচারি গম্ভীর হয়ে বলত, হয় তুমি এখান থেকে যাও, নয় চুপচাপ বসে থেকে আমাকে কাজ করতে দাও। এ দুটোর বাইরে গেলেই আমি তোমাকে ঠিক শাস্তি দেব।

কি শাস্তি দেবে তুমি আমাকে?

এখুনি ঘোড়ায় চড়ে সারা বন বেড়িয়ে আসব। দেখ, ঠিক ঘুরে আসব আমি। তোমার কোন কথাই শুনব না।

এই আমি যাচ্ছি, তুমি তোমার কাজ কর। আর বেশি রাত্তির জেগে থেকোনা কিন্তু।

আমি উঠে পড়লেই ও হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বলত, কাজ কতদূর এগিয়েছে শুনবে না?

তোমার গোপন ব্যাপার যদি ফাঁস হয়ে যায়।

আবার সেই কথা! তুমি চুপচাপ বসে শোন, আমি বলে যাচ্ছি। তোমার মনে কোন রকম প্রতিবাদের ইচ্ছে জাগলেই কিন্তু বলে ফেল। তাতে আমার কাজের সুবিধে হবে।

বেশ বল।

শনিচারি বলত ছোটনাগরা থেকে সে কেমন করে বামিয়াকে দিয়ে সোনা সরাচ্ছে। তার পূর্বপুরুষদের আদিং বা আত্মা যে বেদির তলায়, সেখানেই রয়েছে তাল তাল সোনা। ছোটনাগরায় পুলিশদের কাছে ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ নিয়ে ঢুকেছে বামিয়া। এই সুযোগে সে সরিয়ে আনছে সোনা।

এখন সেই সোনা বেচে সংগ্রহ করা হচ্ছে নোট আর টাকা। তারপর শুরু হবে অস্ত্র সংগ্রহ। এ কাজ অত্যন্ত জটিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে কোন কাজই অসমাপ্ত থাকে না।

শনিচারি তার পরিকল্পনার কথা বলে যেত, আমি চুপচাপ বসে বসে শুনতাম। লক্ষ করতাম, কত সূক্ষ্ম আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে এই অরণ্য-কন্যা।

সেদিন হাসপাতাল থেকে এসে বসেছিলাম বারান্দায়। আমার পাশে বসেছিল ডরোথি আর রেবেকা। রোজকার মত গল্প হচ্ছিল সেদিনও।

হাডসনের কাছ থেকে ডাক এসেছে। ওরা দু'এক দিনের ভেতরেই হাসপাতাল থেকে চলে যাবে।

ডরোথি একটু বিষণ্ণ। ও আমার কাছ থেকে ওর প্রশ্নের সকৌতুক উত্তরই শুধু পেয়ে গেল, আমার মনের কথা জানতে পারল না। ওর মনের গুরুভার আমি বুঝি। কিন্তু সেই ভার সরিয়ে দেবার মানুষ আমি নই। এ সত্যটুকু আকারে প্রকারে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার অক্ষমতা, আমি ওকে তা কোনওরকমেই বোঝাতে পারিনি।

রেবেকা বললেন, এবার অনেকদিন একসঙ্গে আমরা কাটালাম, এ কথা বহুদিন মনে থাকবে।

বললাম, আপনাদের যাবার পরই কিন্তু দুঃখ শুরু হবে আমার।

রেবেকা বললেন, আপনার কিসের দুঃখ, ডাঃ জনসন?

একা একা ছিলাম একরকম। এখন আপনাদের সেবা পেয়ে বড় বেশি আয়েসী হয়ে পড়েছি। আবার তো সব নিজেকেই ঠিকঠাক করে নিতে হবে।

একটা করুণ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল ডরোথি।

BanglaBook.org

মনে মনে ভাবলাম, কথাটা বলে ঠিক করিনি। অন্য একজনের মনের ক্ষতটাকেই খুঁচিয়ে তুললাম শুধু।

বেলা শেষ হয়ে আসছিল। বসন্তকালের এই সময়টুকু এ অঞ্চলে বড় তৃপ্তিদায়ক। ধীরে ধীরে বাতাস বইছিল। শাল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল পাশের বন থেকে। আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বেলা শেষের প্রকৃতির এই দানটুকু প্রাণ ভরে উপভোগ করছিলাম।

হঠাৎ একটা আওয়াজ ভেসে এল কানে। গুলির আওয়াজ। পর পর কয়েকটা শব্দ হল। আমরা বারান্দা থেকে পথের ওপর নেমে এলাম। ওদিকের পাহাড়ি রাস্তা ধরে একটি ছেলে প্রাণপণ হাসপাতালের দিকে দৌড়ে আসছে। তার পেছনে তাড়া করে আসছে একটি অশ্বারোহী পুলিশ। সে বার বার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে ছেলেটিকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। তার হাতে ঘুরে চলেছে একটা ফাঁস। ওটা ছুঁড়ে আটকাতে চাইছে পলাতককে।

ছেলেটার কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে একবার পাহাড়ে উঠছে, আর একবার পথে নেমে এঁকে বেঁকে দৌড়চ্ছে। কিছু দূরের থেকে চিনতে পারলাম। বামিয়া দৌড়ে আসছে হাসপাতালের দিকে।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি আর রেবেকা। আমি চিৎকার করে বামিয়াকে থামতে বললাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। বামিয়া পথের ওপর বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়াল। বোধহয় পায়ে লেগেছে গুলি। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কিছুটা এগিয়ে এল। পাশের উপত্যকার অশ্বারোহী ততক্ষণে প্রায় তার কাছাকাছি এসে গেছে। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, বামিয়া পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল।

কি হল বামিয়ার! গুলির আওয়াজ নেই। ও হঠাৎ পেছন দিকে ছিটকে পড়ল কেন!

অশ্বারোহী পুলিশ এরপর কি ভেবে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল। তারপর সে বামিয়াকে তুলে নিয়ে আমার হাসপাতালের দিকেই এগোতে লাগল।

এতখানি দূর থেকে কি হল আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। অস্থির উন্মাদনায় তাদের আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বামিয়াকে ওরা হাসপাতালে এনে তুলল। কি আশ্চর্য, আমি স্তম্ভিত হয়ে বামিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম! একটি তীর ওর বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে।

তখনও বুকে সামান্য স্পন্দন ছিল। একটু বাতাসের জন্য ও প্রাণপণ জোরে শ্বাস টানছিল।

দৌড়ে গেলাম ডিসপেনসিং রুমে। চাবি খুলে ঢুকতেই যে দৃশ্য দেখলাম, তার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদছে শনিচারি। পাশে পড়ে আছে তার ধনুক। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ও উঠে দাঁড়াল। এমন উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি আমি আর কখনো দেখিনি।

একটা ওষুধ নিতে যাচ্ছিলাম, শনিচারি আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

বামিয়াকে একটু শান্তিতে মরতে দাও, ডাক্তার। ওকে ওষুধ দিয়ে বাঁচালে ওরা তিলে তিলে মেরে ফেলবে।

কঠিন সুরে বললাম, আমি ডাক্তার শনিচারি। রোগীর সেবা আমার একমাত্র কাজ। পথ ছাড়, এক মুহূর্ত নষ্ট করার সময় আমার নেই।

ওষুধ নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম। শনিচারি কঠিন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চেষ্টা করলাম। আমার সমস্ত শিক্ষা প্রয়োগ করলাম বামিয়াকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু না, শনিচারির ইচ্ছাই পূর্ণ হল। বুক থেকে তীরটা বের করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বামিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। সে শ্বাসটুকু সে আর ফিরিয়ে আনতে পারল না।

BanglaBook.org

সরকারী পুলিশ নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। সে অনেক আশা করেছিল বামিয়াকে জীবিত অবস্থায় ধরে নিয়ে যাবে। তার কাছ থেকে আদায় করবে প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ।

কিন্তু কিছুই হল না। বামিয়া জীবন দিয়ে গুপ্তধনের খবরটুকু গোপন রেখে গল।

তখন গভীর রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ। কেউ কোথাও জেগে নেই। বারান্দায় পায়চারী করতে করতে ডিসপেনসিং রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। মনে হল, এখুনি হয়ত শনিচারির ঘরে শুরু হবে গোপন পরামর্শ।

কোথাও কোন সাড়া নেই। দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভেজান ছিল, নিঃশব্দে খুলে গেল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, শনিচারি অন্ধকার এক কোমে মেঝের ওপর পড়ে আছে। খোলা জানলার ফাঁকে যেটুকু আলো এসে পড়েছিল, তাতে দেখলাম তার রাশিকৃত খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে। সেই চুলের রাশে ডুবে গেছে তার সমস্ত মুখখানা।

মেঝেতে নতজানু হয়ে বসে শনিচারির মাথায় হাত রাখলাম। ও ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর কেমন অর্থহীন চোখ মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বামিয়া শান্তিতেই চলে গেছে শনিচারি। তোমার তীর লক্ষভ্রষ্ট হয়নি।

আমার দিকে তাকিয়ে ও অদ্ভুত হাসি হাসল। পরক্ষণেই আবার কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

বললাম, তোমার ইচ্ছার কাছে আমাকে হার মানতে হল, শনিচারি।

ওকে কিছুতেই বাঁচাতে পারলে না, ডাক্তার?

বললাম, তুমি তো ওকে বাঁচাতে চাওনি।

ওকে মেরে সারা দেশকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু এখন ভাবছি, ওকে ছাড়া সারা দেশটাই মরে গেল।

BanglaBook.org

শনিচারিকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার ছিল না। কতক্ষণ শুধু বসে রইলাম নীরবে। ও তাকিয়ে রইল জানালার ফাঁকে উপত্যকার দিকে। দূরের পাহাড় আলো অন্ধকারে রহস্যময়। কি ভাবছে শনিচারি, কে জানে। ঐ তো সেই পাহাড়টা, যার কোলের পথ বেয়ে কয়েক ঘণ্টা আগে বামিয়া প্রাণপণে দৌড়ে আসছিল। এই সেই জানালা, যার ভেতর দিয়ে ধনুক থেকে তীরখানা ছুটে গিয়েছিল; শনিচারির অব্যর্থলক্ষ্য তীর।

হাসপাতালে এখনও শুয়ে আছে বামিয়া। ভোরের অলোর স্পর্শ পেলে সে হয়তো জেগে উঠবে। জেগে উঠেই লজ্জিত হবে। সংকোচে সে ঢুকবে গিয়ে খাবার ঘরে। কত আয়োজন করতে হবে, অথচ ঘুম ভেঙে উঠতে কত দেরী হয়ে গেল তার।

না, সে আর কোনওদিনও জাগবে না। আমার মিথ্যা কল্পনার পথ বেয়ে সে আর ফিরে আসবে না থলকোবাদের হাসপাতালে।

স্বপ্ন ভাঙল শনিচারির কথায়।

কেন এমন হল ডাক্তার।

নীরবে বসে রইলাম। শনিচারি বলে চলল, আমি তো ওকে মারতে চাইনি। ওকে আমার এই বুকের ভেতর আগলে রাখতে চেয়েছিলাম। আমি চাইনি, কেউ ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তিলে তিলে হত্যা করুক।

বললাম, তাই হয়েছে শনিচারি। আর কেউ তোমার কাছ থেকে বামিয়াকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

শনিচারি কিছু ক্ষণ থামল। তারপর একসময়ে বলল, কেন তুমি ওকে বাঁচাতে পারলে না, ডাক্তার। তোমার ওপর কি বিশ্বাস, কি ভারসাই না আমি রেখেছিলাম।

সাধ্যমত তোমার বিশ্বাসের যোগ্য হবার চেষ্টা করেছি শনিচারি, কিন্তু পারলাম না। যুদ্ধ করেছি, শেষে হার হয়েছে আমার।

আরও কতক্ষণ এমনি কেটে গেল। কত অসংলগ্ন চিন্তার ঢেউ বয়ে গেল দু'জনের ওপর দিয়ে।

একসময় শনিচারি আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে অজস্র যন্ত্রণা দিয়ে গেলাম, ডাক্তার। শুধু বিশ্বাস কর, প্রাণের থেকে তোমাকে কোনওদিন দুঃখ দিতে চাইনি।

তোমার ভেতর এই আশ্চর্য দেশের মূর্তি আমি দেখেছি, শনিচারি। তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমাকে এখানে আশ্রয় দিয়েছি। বামিয়া মরেছে, সে আঘাত আমার বুকের ভেতর ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে। কিন্তু তুমি না থাকলে আমি সে যন্ত্রণার ভার বইতে পারতাম না। তোমার দিকে তাকিয়ে আমি আমার চরম দুঃখের সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি, শনিচারি।

ও আমার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

আমি যে নিজের ভাইকে হত্যা করেছি, ডাক্তার।

এ হত্যা পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসে গৌরবের, শনিচারি।

ও অশান্তভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

আমি অসাধারণ হতে চাই না ডাক্তার। আমি গৌরব চাই না, চাই না এ বন্য মানুষের নেতৃত্ব। আমাকে শুধু সাধারণ একটি মেয়ে হয়ে বাঁচতে দাও। মা যেমন করে তার সন্তান মারা গেলে আকুল হয়ে কাঁদে, আমার বামিয়ার জন্য আমাকে তেমনি করে কাঁদতে দাও।

ঝর ঝর করে শনিচারির চোখ বেয়ে জলের ধারা বইল। ওকে একা কাঁদতে দিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

দূরের পাহাড়ে ভোরের অস্পষ্ট আলোর আভাস, পেছনের পাহাড়ে তখনও জমাট অন্ধকার। একটা বাতাস বয়ে এল। সামনের শালবনের পাতাগুলো কেঁপে উঠল থর থর করে।

তারপর দমকা হাওয়ায় তলাকার শুকনো পাতাগুলো করুণ একটা মর্মর ধ্বনি তুলে উপত্যকার দিকে উড়ে চলে গেল।

BanglaBook.org

২ এপ্রিল

ডরোথি আর রেবেকা চলে গেছে। হাডসন এসে ওদের নিয়ে গেলেন। হাসপাতালে এসে খুব দুঃখ করলেন হাডসন।

বললেন, কয়েকটা ঘণ্টা যদি ছেলেটা জ্ঞান ফিরে পেত, তাহলে কত গোপন খবরই না বের করে নেওয়া যেত ওর মুখ থেকে।

বললাম, যেত বলা যায় না, মিঃ হাডসন। প্রথমবারের লড়াইতে কত চেষ্টাই তো করলেন, কিন্তু পারলেন এক কণা খবর বের করতে। প্রাণে মরল, তবু মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল না।

হাডসন কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, ওদের এবার চূড়ান্ত শায়েস্তা করতে হবে। গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে দেওয়াই হবে আমাদের প্রথম কাজ। যারা সরকারের কথা মেনে চলবে, রোজ হাজিরা দিয়ে যাবে, তাদের জন্যে গড়ে তুলব নতুন আস্তানা। দেখি, বুনো জানোয়ারগুলোকে শায়েস্তা করতে পারা যায় কিনা।

হেসে বললাম, চেষ্টা করলে একটা কিছু ফল হয়তো পাওয়া যাবে।

হাডসন সক্ষোভে বললেন, ফল আগেই পাওয়া যেত। কেবল ঐ মেয়েটার জন্যে বার বার লড়াই লাগছে। তুমি দেখো, ওকে একবার ধরতে পারলে আর কোন হাঙ্গামাই থাকবে না।

বললাম, একটি জ্বলন্ত বাতি থেকে প্রথমে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু পরে আর ঐ বাতিটার প্রয়োজন হয় না। আমার মনে হয় অরণ্যে যে আগুন জ্বলছে, এখন হয়তো আর শনিচারির দরকার হবে না।

তুমি জান না, জনসন, এই বনের মানুষগুলো একেবারে অশিক্ষিত। ঐ মেয়েটাই পেছনে থেকে সবকিছু চালাচ্ছে। শুনেছি ওর নাকি যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা আছে। ওর বাবা আমাদেরই দেশ থেকে শিক্ষিত হয়ে ফিরে এসেছিল।

হেসে বললাম, এতো আমাদের আনন্দের কথা, মিঃ হাডসন। শনিচারি তাহলে আমাদের শিক্ষার ভেতর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

হাডসন এবার দেশের ওপর শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন, সে কথা ঠিক, ডাক্তার জনসন; ঐ মেয়েটির কৃতিত্ব দেখে মাঝে মাঝে আমার শ্রদ্ধা হয়। অবশ্য ওর সবটুকু কৃতিত্বই আমাদের দেশ থেকে পাওয়া।

প্রশংসার শেষে হাডসন নিজের দেশটিকে জুড়ে দিয়ে খুশি হলেন মনে মনে।

হাডসন ওদের নিয়ে যাবার পর আমার হাসপাতালের কাজেই সারাদিন নিজেকে ডুবিয়ে রাখলাম। আমার আগের জীবন আবার ফিরে এল। নিজের হাতে পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম। বাবুর্চির কাজ কখনো কখনো আমি নিজেই করতাম। এমনি করে কাজের ভেতর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ফেলে মনের দিক থেকে অনেকখানি হালকা হয়ে গেলাম। কেবল যখন শনিচারির ঘরে ঢুকতাম, তখন একটা ভারী আবহাওয়া আমার চারদিকে এসে ভীড় করত। বামিয়া মারা যাবার পর শনিচারি তার অসমাপ্ত কাজে আর হাত দেয়নি। রোজ গিয়ে দেখতাম, হাঁটুর ভেতর মাথাটি গুঁজে শনিচারি বসে বসে কি যেন ভাবছে। ওকে দেখে মনে হত, একটি জ্বলন্ত বনস্পতির প্রজ্বলন ক্রিয়াটা হঠাৎ থেমে গেছে। এখন তার অগ্নিদেহটা শত রেখায় ভেঙে খসে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বলতাম, আর কাজ করবে না, শনিচারি?

ম্লান হেসে ও বলত, হেরে গেছি ডাক্তার।

হার স্বীকার করলে চলবে কেন, শনিচারি। তোমার ওপর সারা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

বার বার লড়াই-এর ভেতর জয়ের কোন আশাই আমি আর দেখতে পাচ্ছি না ডাক্তার। মনে হয়, তোমার মত যদি মানুষের সেবা করে, বা অশিক্ষিত মানুষগুলিকে শিক্ষা দিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে অনেক কাজ হত। আর এতে নিজের মনেও শান্তি খুঁজে পেতাম।

কথার ভেতর লক্ষ করতাম, শনিচারি আজকাল কত শান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু এই শান্ত পরিবেশের মাঝখানেও শনিচারির ভেতর কোথায় যেন একটা ব্যথার ছায়া আমি লক্ষ করতাম। নিজের মনের সেই গভীর যন্ত্রণাকে সে নানাভাবে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করত, কিন্তু তার থেকে সে মুক্তি পাবার কোন চেষ্টাই করত না। আমার মনে হয়েছে, বার বার ব্যর্থতা, বামিয়ার মৃত্যু, সবকিছুকেই ও মনের গোপনে লালন করবার চেষ্টা করত।

আজকাল মাঝে মাঝে ওর কাছে বসে গল্প করি। ও নিবিষ্ট হয়ে আমার গল্প শোনে। আমি আমার দেশের গল্প করি। আমার দেশের নদীর নাম, নগরীর নাম ওকে শোনাই। নগর জীবনের ছবি এঁকে যাই। এই সময়টুকু মনে হয় ও কিছুটা আনন্দ পায়। অতীতকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে ও নিজেই আলোচনায় যোগ দেয়।

আমাদের দেশের দু'চারটে নদী আর শহরের নাম ও উল্লেখ করে। এগুলো ওর বইয়ের থেকে জানা নয়, ওর বাবার মুখে ছেলেবেলায় শোনা।

আমি ওর কাছে বাইবেলের গল্প বলার চেষ্টা করেছিলাম একদিন।

ও হেসে বলল, বাইবেলের গল্প আমার মুখস্থ রয়েছে, ডাক্তার। বাবার কাছ থেকে তোমাদের ইংরাজী ভাষাটাই শুধু শিখিনি, বই পড়ার নেশাটাও পেয়েছি।

আমি অমনি বললাম, তাহলে তোমার দেশের উপকথা আমাকে শোনাও।

BanglaBook.org

ও আমাকে অনেকগুলি বিচিত্র উপকথা শোনাল। কোন কোন উপকথার সঙ্গে আমাদের দেশের উপকথার আশ্চর্য মিল দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

মনে হল, সারা পৃথিবীর মানুষ জাতির মধ্যে কোথায় যেন একটা চিন্তার অবিচ্ছিন্ন মিল রয়েছে। প্রকৃতির নদ নদী, সমুদ্র পর্বত যতই ব্যবধানের সৃষ্টি করুক, সেই অদৃশ্য চিন্তাধারার মিলটুকুকে তারা নষ্ট করতে পারে না।

ইতিমধ্যে একদিন দুপুরে ডরোথি হঠাৎ হাসপাতালে হাজির।

স্বাগত জানিয়ে বললাম, কি মনে করে?

বলল, স্কেচের খাতাখানা সেদিন ফেলে গেছি এখানে। বড় অসুবিধে হচ্ছে, তাই চলে এলাম।

মনে হয়, ডরোথির খাতাখানা ফেলে যাওয়া একটা ছলনা। ও আমার সঙ্গে সবার আড়ালে কোন কিছু বলতে চায়।

হেসে বললাম, স্কেচের খাতা ফেলে না গেলে কি আসতে নেই?

ডরোথি বলল, হাসপাতালে আসার আর একটি মাত্র পথ আছে।

কি?

কোন একটা অসুখে পড়ে যাওয়া।

তাহলে অবশ্য সে পথ দিয়ে আসতে আপনাকে বারণ করব। যদিও যে কোন ভদ্রলোকের পক্ষে যে কোন ভদ্রমহিলাকে আসতে বারণ করা অভদ্রতা।

ডরোথি বলল, আমি যে আপনার এখানে আজ এসেছি, একথা দয়া করে কাউকে না জানালে খুশি হব।

কেন, বাড়িতে কাউকে বলে আসেননি বুঝি?

দিদিকে, এই আসছি বলেই চলে এসেছি।

বললাম, এ সময় একা একা পথে বের হওয়া কি ভাল?

ভালমন্দ বুঝি না, আসাটা আমার প্রয়োজনের তাগিদে।

হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। শনিচারির মনটাকে হালকা করে দেবার জন্যে আমি ছোটখাট দু'একটা কাজের ভার ওকে দিয়েছিলাম। দুপুরে রোগীদের জন্যে ফল আর দুধ ও সাজিয়ে রেখে যেত। এ সময়টা ও এসে ঢুকতো রান্নাঘরে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডরোথির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলাম, হঠাৎ দেখলাম ডরোথির মুখে ভাবান্তর উপস্থিত হল। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রান্নাঘরের দিকে।

মুহূর্তে পেছন ফিরে যা দেখলাম, তাতে সহসা আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

ডিসপেনসিং রুম থেকে বেরিয়ে শনিচারি রোজকার মত কিচেনে আসছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেছে ডরোথির।

ও কে, ডাক্তার জনসন?

মুখে হাসি টেনে বললাম, উনি যে আমার সমজাতীয় নন, তা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

ডরোথি বলল, দয়া করে এ সময় তাড়াতাড়ি আমার স্কেচের খাতাটা এনে দেবেন কি?

ডরোথি তাহলে অন্য কিছু সন্দেহ করেনি। ও নিছক কৌতূহল বশে শনিচারির একটা স্কেচ করতে চায়।

তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর ঢুকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে ওর খাতাটা এনে দিলাম।

ততক্ষণে শনিচারি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। ডরোথি স্কেচের খাতাখানা নিয়েই দৌড়ল সেখানে। এগিয়ে যেতে যেতে আমাকে ডাক দিয়ে বলল, আসুন ডাক্তার, মুখের এমন গড়ন আর পাওয়া যাবে না।

BanglaBook.org

রান্নাঘরের ভেতর থেকে ডরোথি ওর হাত ধরে বাইরে টেনে আনল।

ডরোথির পেছনে থেকে আমি শনিচারিকে ইঙ্গিতে কোন কিছু বলতে বারণ করলাম।

শনিচারি বাইরে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ডরোথি কাঠের একটা টুলের ওপর বসে রেখায় রেখায় ওকে ফুটিয়ে তুলতে লাগল। স্কেচ শেষ হলে দেখলাম, শনিচারির নিখুঁত চেহারাখানা কাগজের বুকে ফুটে উঠেছে।

আঁকা শেষ হলে শনিচারি চলে যাচ্ছিল। ডরোথি জিজ্ঞেস করল, কি নাম তোমার?

ও ডরোথির দিকে রহস্যময় দু'টি চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, ও আপনার কথা বুঝতে না পেরে দেখুন কেমন অবুঝের মত তাকিয়ে রয়েছে। ক'দিন আগে ও এখানে এসেছিল কাজের খোঁজে। ওকে রান্নাবান্নার কাজে বহাল করেছি।

ডরোথি বলল, এ ধরনের মুখ কিন্তু আদিবাসীদের নয়। আমি এই মুখখানা এনলার্জ করে আঁকব।

বললাম, অন্য কোন জাতের মেয়ে হবে হয়তো। ভারতবর্ষে মানুষদের মুখের চেহারা এত বিভিন্ন, দেখলে অবাক হতে হয়।

ডরোথি এবার আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথের দিকে এগিয়ে চলল। আমিও উৎসাহের সঙ্গে নানা কথার অবতারণা করে ওর মন থেকে শনিচারির ছবিটা মুছে দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ডরোথি বলল, আমাদের বাংলোতে কবে যাচ্ছেন বলুন?

বললাম, যবে ডেকে পাঠাবেন।

তাহলে আজই চলুন।

হেসে বললাম, বেশ তাতে আমি রাজি আছি। শুধু আপনার দিদির কাছে গিয়ে বলব, আপনি আমাকে ডেকে এনেছেন।

ডরোথি এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, নিমন্ত্রণ এখান থেকেই আসবে।

বললাম, তখন যাবার জন্য অবশ্যই তৈরি থাকব।

ডরোথি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। আমি দ্রুত ফিরে এলাম ডিসপেনসিং রুমে।

শনিচারি আমাকে দেখে বলল, ধরা পড়লাম এতকাল পরে, এতে অগৌরবের কিছু নেই, কি বল?

বললাম, তা হয়ত নেই, কিন্তু ধরা পড়ার দুর্লভ সৌভাগ্যটুকু তুমি এখনও অর্জন করতে পারনি।

কি রকম?

দেখলে তো, ও তোমার নামটুকু পর্যন্ত জানতে পারল না।

শনিচারি বলল, ডরোথি আবার কুমুডির বাংলোতে গিয়ে গল্প না করে।

হেসে বললাম, সে পথ ও নিজেই বন্ধ করে এসেছে।

কৌতূহলী হয়ে উঠল শনিচারি।

কি রকম?

বললাম, আমার এখানে আসাটা ও গোপন রেখেছে।

হাসি আর থামতে চায় না শনিচারির। এতদিন পরে ওর মুখে প্রাণ খোলা হাসি শুনতে পেলাম। বলল, তাহলে এই হাসপাতালটা সবার গোপনীয় স্থান, কি বল ডাক্তার।

হেসে বললাম, আর আমি সেই গোপন জায়গার মালিকানা ভোগ করি, তাই না?

কিছুক্ষণ থেমে কি ভাবল শনিচারি। তারপর বলল, তোমার ভেতর কেমন একটা আকর্ষণ শক্তি আছে, ডাক্তার। সবাই দেখি তোমাকে খুব ভালবাসে।

BanglaBook.org

বললাম, শুধু একজন ছাড়া।

কি করে তুমি বুঝলে?

তাকে আমি জানি বলে।

শনিচারি অমনি বলল, আমি তাকে তোমার চেয়ে কিছু কম জানি না ডাক্তার।

এরপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ!

এক সময় শনিচারি বলল, ডরোথি খুব ভাল ছবি আঁকে, তাই না?

হঠাৎ কথার মোড় ফিরল। আমি একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

ও আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখেছে। খুব নিখুঁত ওর হাতের কাজ।

কথা শুনতে শুনতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল শনিচারি।

বলল, আমি যদি ছবি আঁকা শিখতাম, তাহলে আমার দেশের এই পাহাড়, শালের বনের কত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে পারতাম।

বললাম, কত মানুষ মনে মনে তোমার ছবি আঁকছে। তুমি আবার কার ছবি আঁকবে!

শনিচারি হঠাৎ বলল, আমি আমার বামিয়ার ছবি এঁকে রাখতাম। কেন আর্টিস্ট হলাম না, ডাক্তার।

আবার সেই পুরনো কথায় ও ফিরে এসেছে। এখুনি গভীর এক যন্ত্রণার ভেতর তলিয়ে যাবে ওর এই প্রসন্ন মনটা।

তাই তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে ফেললাম, ডরোথির ছবি দেখলে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে, শনিচারি।

ও আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল।

তুমি ডরোথিকে খুব ভালবাস, তাই না ডাক্তার।

এ কথা কেন?

তার ছবি তোমার খুব ভাল লাগে।

যে গুণী, তার ওপর সকলেরই আকর্ষণ থাকে।

ও কি ভেবে বলল, আমি যদি গুণী হতে পারতাম।

বললাম, ফুল তার নিজের গন্ধ সম্বন্ধে কিছু জানে না বলেই কি ফুলের কোন গন্ধ নেই?

তাহলে তোমাদের সরকারী লোকেরা কেন আমাকে একটুও পছন্দ করে না।

গুণীরাই গুণীর আদর বোঝে। সরকারী লোক না বুঝলে কিছু এসে যায় না।

তুমি খুব ভাল, ডাক্তার। তোমার মত গুণী আমি দেখিনি।

শনিচারির মধ্যে আমি যেন অন্য কোন এক জীবনের স্পন্দন অনুভব করলাম। নিজের বিরাট শক্তির কথা ভুলে সামান্য ডরোথির মত মেয়ে হতে পারলে ও যেন সুখী হয়। আমি ডরোথিকে ভাল বলেছি, তাই শনিচারির গোপন মনে হয়ত একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা উঁকি দিচ্ছে। ও জীবনের যে দিক সম্বন্ধে এতকাল সচেতন ছিল না, আজ ধীরে ধীরে সেই দিকের একটি দরজা মনে হল খুলে যাচ্ছে। শনিচারির মনে এক চিরন্তনী নারীকে আমি যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে দেখলাম।

১১ এপ্রিল ঃ

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তখনও প্রকৃতির অগ্নিলীলা শুরু হয়নি। বসন্ত শালের বনে অজস্র ফুল ফোটানোর খেলায় মেতে আছে, পাখীরা ডালে ডালে ফলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছে। আদিবাসীদের গাঁয়ে গাঁয়ে মাদলের বোল বাজছে। বাহা পরবের স্রোত বইছে গানের সুরে। আগুন লাগল। সরকারের অশ্বারোহী পুলিশবাহিনী বনের অন্ধিসন্ধি খুঁজে পেতে আদিবাসীদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিতে লাগল।

BanglaBook.org

হাহাকার উঠল চারদিকে। অসহায় মানুষগুলো পশুর মতো খোলা জায়গায় বনের ভেতর আশ্রয়হীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। আকাশ পথে পাখীরা সারান্দা ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গেল অন্য কোন আশ্রয়ের সন্ধানে।

হাডসনের এ পরিকল্পনা সরকারকে অনেকদিনের একটা জটিল সমস্যার হাত থেকে মুক্তি দিল। শুনতে পেলাম, বনের মানুষগুলো দলে দলে সরকারী শিবিরে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা কথা দিচ্ছে, আর কোনওদিন সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। সরকারকে তারা সাহায্য করবে মানুষ দিয়ে, শ্রম দিয়ে আর সাধ্যমত কর দিয়ে।

কথাগুলো আমার কানে এলো। শনিচারি পাছে দুঃখ পায় সেজন্য তাকে আর কোন কথা বললাম না।

যখন দূরে কোথাও আগুন লাগতো, তখন ও বারান্দায় বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত সেদিকে। আমি পাশে বসে থাকতাম।

এমনি বসে থাকতে থাকতে একদিন শনিচারি বলল, জান ডাক্তার, এ আমার পাপের ফল।

এ কথা কেন বলছ, শনিচারি?

অনেক ভেবে দেখেছি, যাদের রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, তাদের শুধু ধ্বংসের ভেতর ঠেলে দেবার কোনো অধিকারও নেই। আমি ওদের দুর্ভিক্ষের সময় খেতে দিতে পারিনি, তাই শুধু উত্তেজনার সৃষ্টি করলে কোন ফলই ফলবে না। অসহায় মানুষগুলো আরও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

বললাম, তুমি যা করেছ, দেশকে ভালবেসেই করেছ। তোমার দেশের মানুষকে সত্যিকারের মানুষের মত বাঁচাতেই তুমি চেয়েছিলে। সেখানে কোন খাদ নেই তোমার চিন্তায়। তবে আজ যাকে পরাজয় বলে মনে করছ, একদিন হয়ত দেখবে, সেই পথেই তোমার জয় আসছে।

শনিচারি নির্বাক বসে তাকিয়ে রইল দূরের আকাশের দিকে, সেখানে সূর্যাস্তের রঙ আগুনের রঙের সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে।

সেদিন সন্ধ্যা নামল। জ্যোৎস্নার ঢেউ আকাশ ছাপিয়ে উপচে পড়ল বনভূমির ওপর। কত শান্ত আর স্নিগ্ধ সে স্পর্শ। মনে হল, আর্ত সন্তানের গায়ে মায়ের কোমল হাতের সান্ত্বনা।

আমরা পৃথিবীর এই বিচিত্র রূপের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলাম। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ বলেই মনে হল।

শনিচারি তাড়াতাড়ি উঠে পাশের ঘরে আত্মগোপন করল।

দেখলাম, ঘোড়ার চড়ে হাসপাতালের দিকে কে যেন আসছে।

কাছে আসতেই দেখলাম রেবেকা। এগিয়ে গেলাম।

কি ব্যাপার, আপনি এ সময়, একা!

রেবেকা ঘোড়া থেকে নেমে হাঁপাতে লাগল।

সময় নেই ডাক্তার জনসন। জীবনে অনেক উপকার করেছেন আপনি, তাই যদি আপনার কোন উপকার হয় সে জন্যে দৌড়ে এলাম।

বললাম, হাঁপাচ্ছেন আপনি, বসুন এখানে।

রেবেকা বসলেন না। বললেন, এখুনি ফিরে না গেলে সবাই আমাকে সন্দেহ করবে। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।

তাকিয়ে রইলাম রেবেকার দিকে।

রেবেকা বললেন, সেই আদিবাসী মেয়েটি নাকি আপনার আশ্রয়েই রয়েছে। ডরোথির আঁকা একখানা ছবি দেখে ক্যাপ্টেন স্মিথ তাকে চিনতে পারেন। তিনি নাকি তাকে ছাতমবুরুর লড়াইয়ের সময় দেখেছেন! তারপর ডরোথিকে ওরা জিজ্ঞেস করে সব কথা জেনে নিয়েছে।

আজ শেষ রাতে পুলিশের লোকেরা আপনার হাসপাতাল ঘেরাও করবে। সাবধানে থাকবেন ডাক্তার জনসন।

BanglaBook.org

রেবেকা কথা ক'টি বলেই ঘোড়ায় চড়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বসে বসে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম। গোপনতা কেন; আজ যদি ওরা আসে তাহলে শনিচারিকে নিয়েই বের হব ওদের সামনে। যদি কোন সেবা করে থাকি সরকারের, তাহলে তার পুরস্কার স্বরূপ চেয়ে নেব এই অরণ্য কন্যাটিকে। ওকে নিয়ে আমার দেশে চলে যেতে চাইলে আশা করি ইংরাজ সরকার বাধা দেবে না। তাহলে এই সারান্দার মানুষগুলোকে ক্ষেপিয়ে তোলার যে ভয়, তা আর থাকবে না সরকারের।

শনিচারিকে কিছু বললাম না। রেবেকা আর আমার কথাগুলো বোধ করি শোনেনি শনিচারি। তাহলে গভীর চিন্তায় ডুবে আছি দেখেও এমন সহজ মুখ-ভাব নিয়ে ও আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারত না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শনিচারি অত্যন্ত শান্তভাবে বলল, আমাকে আজ একটি অনুমতি দিতে হবে ডাক্তার; আর কোনও দিন এমন করে তোমার কাছে চাইব না।

কিসের অনুমতি?

আগে কথা দাও আমার ইচ্ছা পূর্ণ করবে?

কথা দিলাম।

এই জ্যোৎস্না রাতে বনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে বড় ইচ্ছে করছে। চল আমরা দু'জনে একটু ঘুরে আসি।

একটু ভেবে বললাম, ঘোড়া মাত্র একটি, দু'জনে যাব কি করে?

আমার ঘোড়া সন্ধে হলেই হাসপাতালের পেছনের পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তুমি তৈরি হয়ে এসো, আমি ওদিক দিয়ে পথে বেরিয়ে যাচ্ছি।

আমি পোশাক পরে বেরিয়ে এলাম ঘোড়া নিয়ে। পথের বাঁকে পৌঁছে দেখি শনিচারি তার ঘোড়ায় চেপে অপেক্ষা করছে।

ওর মুখোমুখি হয়েই গম্ভীর গলায় বললাম, পথ হারিয়ে এ অঞ্চলে এসে পড়েছ বুঝি। এ জায়গাটা আদিবাসীদের নেত্রীর পক্ষে খুব নিরাপদ নয়।

আমার কথা বলার ভঙ্গি দেখে ও হেসে ফেলল।

তুমি আমার কথার শোধ নিচ্ছ ডাক্তার জনসন?

বললাম, মনে আছে শনিচারি, ছোটনাগরার পাহাড়ের বাঁকে যেদিন আমাদের প্রথম দেখা হয়, সেদিন তুমি আমাকে এমনি একটা কথা বলেছিলে।

সেখানেও এমনি পাহাড়ের বাঁকে আমরা ঘোড়ায় চড়ে মুখোমুখি হয়েছিলাম।

বললাম, সেদিন তুমি আমাকে বর্ষার আগেই নদী পার করে দিয়ে গেলে। আমরা বিদায় নেবার ঠিক পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি সারাপথ আসতে আসতে কেবল ভেবেছি, নদীতে বান আসার আগেই তুমি পেরিয়ে যেতে পেরেছ কিনা।

শনিচারি বলল, আজও কিন্তু তোমার সেকথা জানা হয়নি।

বললাম, তোমাকে সশরীরে হাসপাতালের ভেতর পেয়ে আর সব কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

পাশাপাশি পথ চলতে চলতে ও বলল, প্রায় সারাটি রাত আমাকে সেদিন কাটাতে হয়েছে নদীর এপারে।

আমি খুবই লজ্জিত শনিচারি।

ও হেসে বলল, এই সামান্য কারণে এতদিন পরে তুমি যদি লজ্জা পাও তাহলে তোমার কাছে আমার লজ্জার যে সীমা থাকে না।

BanglaBook.org

আমরা একটি ঝর্ণার ধারে এসে পৌঁছলাম। এখন ঝর্ণাটি ক্ষীণাঙ্গী, তবু নুড়ির নূপুর বাজিয়ে সে উপত্যকার দিকে ছুটে চলেছে।

শনিচারি সেখানে দাঁড়াল। আমিও তার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

কতক্ষণ সে ঝর্ণাটির দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, জান ডাক্তার, এই ঝর্ণার ধারে একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা আজও আমার কাছে বড় রহস্যজনক হয়ে আছে।

ঘটনাটি শোনার জন্যে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

শনিচারি বলতে লাগল, বেশ কয়েক বছর আগে আমরা একবার এই পথ দিয়ে ছোটনাগরার দিকে যাচ্ছিলাম। তখনও বেলা ছিল। আমরা এই ঝর্ণাটার প্রায় কাছাকাছি এসে একটা চিৎকার শুনতে পেলাম।

কাছে এসে দেখি, ঝর্ণার জল খেতে এসে হরিণ বাঘের কবলে পড়েছে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল এই যে, ভয়ে হরিণটা একটা বাচ্চা প্রসব করে ফেলেছে। আসন্ন প্রসবা ছিল সে। আমরা হৈ চৈ করায় বাঘটা সরে গেল বনের ভেতর। আমি বাচ্চাটাকে তুলে নিলাম কোলে। হরিণটা তখুনি মারা গেল। বাচ্চাটা নিলাম, কিন্তু তাকে লালন-পালন করা এক সমস্যা। যাহোক অনেক চেষ্টায় বাচ্চাটা বড় হল। দেখতে দেখতে সে বিরাট আকার ধরল। শিং জোড়া হল তার দেখবার মত। ওকে ছেড়ে দিতাম, সারাদিন ঘুরে ফিরে ও আবার ঠিক ফিরে আসতো আমার ঘরে।

একদিন চরতে গিয়ে ও আর ফিরে এলো না। পরের দিন চারদিকে লোক পাঠালাম ওর খোঁজে।

এক রহস্যময় খবর পাওয়া গেল। এই ঝর্ণার ধারে আমার হরিণটি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, আর তার ধারাল শিংয়ের ভেতর বিঁধে আছে একটা চিতা বাঘ। বাঘটাও মারা গেছে।

আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবতে লাগলাম, আমার আস্তানার কাছেপিঠে এত ঝর্ণা থাকতে হরিণটা এত দূরেই বা এল কেন!

এ রহস্যের সমাধান আজও পাইনি।

কথাটা শুনে আমিও বিস্মিত হলাম। হরিণটা কি তার মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিল।

আমরা ঝর্ণটা পেরিয়ে এলাম।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা। ওপরে বন, নিচে উপত্যকার কোথাও কোথাও বন; আবার কোথাও লোক বসতি। আমরা বনের পথ পার হয়ে চললাম।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল শনিচারি। পাহাড়ের ওপর থেকে একটা সন্টলিক্ নিচে ভ্যালির দিকে নেমে গেছে। ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব সাবধানে আমার পেছন পেছন নেমে এসো।

আমি ওকে অনুসরণ করে নিচে নামতে লাগলাম। আমরা খুব ধীরে ধীরেই নামলাম। ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে মাঝে মাঝে নুড়ি পাথর ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়তে লাগল। নামতে নামতে শনিচারি আমাকে বারবার হুঁশিয়ার করে দিল।

এক সময় আমরা নেমে এলাম পাহাড়ের ওপর থেকে নিচের উপত্যকায়। কিছু পথ বনের ভেতর দিয়ে চলার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। মনে হল এ স্থানটা একটা আদিবাসী গ্রাম ছিল।

শনিচারি বলল, এ গ্রামখানা সরকার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। দেখছ না, ভাঙা দেওয়াল, কালো কালো পোড়া চিহ্ন।

বললাম, এই নির্জন কবর ভূমিতে হঠাৎ এলে কেন? এখানে তো কোন মানুষ আছে বলে মনে হয় না।

ও কতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, দেবতা জেগে আছেন ডাক্তার, আর রয়েছে মৃত মানুষের আত্মা।

BanglaBook.org

কতক্ষণ এদিকে ওদিক ও যেন কি খুঁজতে লাগল। এক সময় আমরা গাঁয়ের প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। এখানে পোড়া জিনিসের আর কোনও চিহ্ন নেই। এক জায়গায় কতকগুলো গাছ জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। শনিচারি সেখানে এসে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল। ঐ গাছগুলোর নিচে অজস্র পাথর ঠিক বেদির মত করে বাঁধান রয়েছে।

ও তারই তলায় প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে পড়ল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। অর্ধ উচ্চারিত একটা সুরেলা ধ্বনি মাঝে মাঝে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

একসময় ওর প্রার্থনা শেষ হল। ধীরে ধীরে উঠে এল বেদির কাছ থেকে। জ্যোৎস্নালোকে আমি দেখলাম, ওর মুখ বেদনায় থম থম করছে; কিন্তু একটি বিশেষ দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে ওর মুখে।

ও ঘোড়ায় উঠল। আবার আমরা ফিরে চললাম।

একসময় ও বলল, জান ডাক্তার, যে বেদির কাছে বসে আমি এতক্ষণ প্রার্থনা করলাম, ওখানে আমার বামিয়া রাতে এসে ঘুমিয়ে থাকত। কোন আশ্রয় ছিল না আমার বামিয়ার। বন দেবতা 'জায়েরা' তাকে রাতের আশ্রয় দিত। ওর আত্মার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে গেলাম।

আমরা সবাই সেই সন্ট লিক ধরে পাহাড়ের ওপর উঠে এলাম।

শনিচারি বলল, ঐ যে দূরে পাশাপাশি দুটো পাহাড় দেখছ, ওর তলায় যে উপত্যকা, সেটি আমার জন্মস্থান। আমার কত দিনের খেলার আশ্রয়। সব ফেলে এসেছি ডাক্তার। ঘোড়া থেকে নেমে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। একসময় বলল, জান ডাক্তার, এই সময়ে সারা বন জুড়ে চলত বাহা পরব। এই বনভূমির প্রতিটি গ্রাম থেকে বাহা পরবের দল আমাদের ঐ ছোটনগরায় গিয়ে ভীড় জমাত। মেয়ে পুরুষের নাচ গান আর উৎসব আনন্দে ক'দিন ছোটনাগরার আকাশ বাতাস, বন পাহাড় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হত।

ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। যেন কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, হাজার হাজার মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। ভেসে আসছে, শত শত অরণ্য কন্যার কণ্ঠের বিচিত্র সুরধ্বনি।

শনিচারিও তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। গুন গুন করে তার সুরেলা গলা তুলতে লাগল বিচিত্র সুরের ঢেউ।

আমি ঘোড়া থেকে নামলাম। শনিচারি আমাকে লক্ষ করল না। সে আপন মনে সেই জ্যোৎস্না ধোয়া আকাশের নিচে অরণ্যবাসরে তার অতীত দিনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে চলল।

আমি মুগ্ধ হয়ে রাজকুমারী শনিচারিকে দেখতে লাগলাম।

একসময় পাহাড়ের কাছে গিয়ে লতাগুল্মের থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করে আনলাম।

আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম শনিচারির কাছে। ও তখনও নিজের ভেতর মগ্ন হয়েছিল। কাছে গিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। কেমন মোহাচ্ছন্ন চাহনি মেলে ও আমার দিকে তাকাল। এ দেশের মেয়েরা যেমন করে খোঁপায় ফুল গোঁজে, আমি তেমনি করে ওর খোঁপায় একরাশ ফুল পরিয়ে দিলাম। ও কেমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ওর হাত ধরলাম। দু'জনে একবার তাকালাম ছোটনাগরার সেই ধূমল পাহাড়ের দিকে।

একসময় ফিরে এলাম আমাদের পরিচিত জগতে। থলকোবাদের হাসপাতালে যখন এসে পৌঁছলাম তখন চাঁদ অস্ত গেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এসেছে।

আমরা রাতে খেতে বসলাম একই সঙ্গে। ও আমাকে পরিবেশন করতে লাগল। ওর চোখেমুখে আজ যেন কিসের তৃপ্তি উপচে পড়ছে।

আমিও মনে মনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

বিছানায় যাবার সময় ও আজ এল আমার কাছে।

BanglaBook.org

বলল, তুমিও শোও ডাক্তার, আমি আজ তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ও বসে বসে আমার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগল। কি যাদু ওর হাতের, আমি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা ভারী জিনিস ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। ল্যাম্প জ্বেলে ঢুকলাম শনিচারির ঘরে। ঘর শূন্য। বেরিয়ে এলাম পথের ওপর, অন্ধকার তখনও জমে আছে। আলো নিয়ে খুঁজতে লাগলাম। ঐ তো, শনিচারি পড়ে আছে পথের ওপর! রক্তে ভেসে যাচ্ছে পথ। হাসপাতালের পেছনে খাড়াই পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে।

তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে নিলাম ওর দেহটা। পরীক্ষা করলাম, শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

শ-নি-চা-রি.....

থরথর করে আমি কাঁপতে লাগলাম।

অতি ক্ষীণ আহত গলায় ও বলল, আমি মরতে চাইনি ডাক্তার।

তবে কেন এমন করলে!

তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি, তাই।

এ বনের থেকে তোমাকে মুক্ত করে আমার দেশে নিয়ে যাব মনে করেছিলাম শনিচারি।

তোমার দেশে! অস্পষ্ট যন্ত্রণার কাতরোক্তি করল ও।

হ্যাঁ শনিচারি, আমার দেশে। সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতাম। বীরাঙ্গনার যোগ্য মর্যাদা।

যন্ত্রণার ভেতরেও একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল শনিচারির মুখে। ওর একেবারে কাছে আমার মুখটা নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল ও।

কাছে গেলাম। ও ধীরে ধীরে বলল, আজ এই শেষ মুহূর্তে তোমাকে গ্রহণ করলাম ডাক্তার। পঙ্গু হয়ে, তোমার বিপদের কারণ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারলাম না। কথা দাও, আমার দেশের মানুষকে আমার মতই তুমি ভালবাসবে। কোনওদিন তাদের ছেড়ে যাবে না।

ওর হাতখানা আমার দুটি হাতের মধ্যে তুলে নিলাম।

ও নীরব হয়ে গেল।

অন্ধকার সরে গিয়ে পাহাড়ের আড়ালে আবির্ভাব হচ্ছে জ্যোতির্ময় আলোর। আমি নতজানু হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

আপনি ডাক্তার জনসনের ডায়ারি পড়া শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াবেন, তখন সেই বৃদ্ধ পাদ্রীটি আপনার সামনে এসে, ঐ বেদি বাঁধানো আদিংয়ের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তারপর আপনার হাত থেকে ঐ ডায়ারিখানা নিয়ে মৃদু হাসি হাসতে হাসতে ঢুকে যাবেন চার্চের ভেতর।

ফিরে আসতে আসতে আপনার মনে হবে, ইনিই কি ডাক্তার জনসন! আমারও তাই মনে হয়েছিল।

BanglaBook.org

সমুদ্রের স্বর

দমকা হাওয়া হই হই করে ঢুকছে খোলা জানালা দিয়ে। মশারিটা উড়ছে ডানামেলা পাখির মতো। ঘুম ভেঙে গেল শ্রুতির।

অদূরে জেলখানার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

সমুদ্রের ডাক শোনা যাচ্ছিল। এ অঞ্চলের ভাষায়,—সুমুন্দর বাউলটিয়া হেইছি।

মাটির একখানা কুঠি ঘর, টিনের ছাউনি দেওয়া। এক চিলতে উঠোন, কাঁচা ইটের পাঁচিল ঘেরা। মাথায় খড় চাপানো। কোনায় রক্তকরবীর ঝাড়,—সারা বছর ফুল ফোটে।

ঘরের বাঁদিকে দিঘির মতো শান বাঁধানো বিশাল পুষ্করিণী। নন্দকুমারের পুকুর নামে পরিচিত।

কাছেপিঠে লোকবসতি নেই। দিঘির উত্তর-পূর্ব কোণে জঙ্গল ফুঁড়ে কয়েকটা নারকেলগাছ আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে।

ওদিকে বালি ভেঙে নেমে গেলে বাদামজঙ্গলের ধারে ধারে মুসলমান-পল্লী। গরিব, খেটে-খাওয়া মেয়ে পুরুষের বাস।

শ্রুতির বাসাবাড়িখানার সামনে অবারিত ফাঁকা মাঠ। মাঠের বাঁ দিক বরাবর বালিয়াড়ি। বিশাল উঁচু পাঁচিলের মতো। বাদাম আর বনঝাউ বালিয়াড়ির কোলে কোলে সবুজের ছোঁয়া লাগিয়েছে।

প্রবল বর্ষণে বালিয়াড়ির তলায় বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে জল জমে যায়। ঘাস গজিয়ে ওঠে। মুসলমান পল্লীর হাঁসগুলো ওই জলে সারাক্ষণ গা ভাসায়। চবর চবর শব্দ তুলে জলে ঠোঁট গুঁজে গেঁড়ি গুগলি খোঁজে।

হাওয়া দিচ্ছিল দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে। শ্রুতি অন্ধকারে মশারিটা খুলে রাখল। কিন্তু জানালাটা বন্ধ করল না। শেষ রাতটুকু বিছানায় জেগে কাটিয়ে দিল।

কাজের মেয়ে নেকজান দুদিন ছুটি নিয়েছে। দারুয়া গাঁয়ে লাগার হাটের কাছে মুসলমান পল্লীতে মা মেয়ের সংসার। একটা ঝুপড়িতে থাকে ওরা।

বাপ নসরুল্লা দশ বছর কালাপানির পারে। ডাকাতদলকে ধরতে এসে গভীর রাতে ছোটো দারোগা দোহা তার বাপকেও ধরে নিয়ে গেল।

সাদাসিধে মানুষ, দশাসই চেহারা, দিনমজুরি করে খেত নসরুল্লা। মসজিদে যেত রোজ, নামাজ পড়ত। বিবি নাসরিন বাদামগাছের তলায় ঝাঁট দিয়ে শুকনো পাতা কুড়োত। ভারি সুন্দরী নাসরিন-বিবি। এই সৌন্দর্যই হল তার কাল।

পথ চলতে দারোগা দোহার চোখে পড়ল। অমনি সেপাই এলো নসরুল্লার বাড়ি কাজের প্রস্তাব নিয়ে। সারাদিন ঝাড়পোঁছ, মাজঘষার কাজ, সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা। খাওয়াপরা বাদ মাস মাইনে তিন টাকা।

গরিবের সংসার, হাতে স্বর্গ পেল নাসরিন বিবি। কিন্তু পুরো একটা মাসও কাটল না, নাসরিন বিবি টের পেয়ে গেল দারোগা দোহার মতলব।

এমন ডাকসাইটে দাপুটে দারোগা, বিল্লির মতো মিউ মিউ করে এক সন্ধ্যায় কুপ্রস্তাব রাখল নাসরিন বিবির কাছে।

রাতের আঁধারে ইজ্জত বাঁচিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল নেকজানের মা। আর শহরমুখো হল না সে। দারোগার বাড়িতে পড়ে রইল তার মাসমাইনের টাকা।

BanglaBook.org

সেই রাগ পুষে রেখেছিল দারোগা দোহা। থানার বড়োবাবু হওয়ার পর রাতে টহলে বেরুত। মুসলমানপাড়ায় ডাকাত ধরতে গিয়ে একরাতে ডাকাত দলের সঙ্গে নসরুল্লাকেও বেঁধে ফেলল।

স্বামীকে ছাড়িয়ে আনতে অনেক কান্নাকাটি করেছিল নাসরিন বিবি। কিন্তু বরফ গলেনি। পাতাকুড়ুনির এত দেমাক,—এবার দেখ।

ডাকাত দলের সঙ্গে সৎমানুষটাও চালান হয়ে গেল আন্দামানে।

এরপর বড়ো একটা কেউ কথা শোনেনি নাস্‌রিন বিবির মুখ থেকে। নেকজানকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে কাজে বেরুত। ধান ভেনে, খোলা সমেত আস্ত কাজুবাদাম ভেঙে সে যা পেত, দিনান্তে তাতেই চলে যেত তার।

নেকজানের বেশ মনে আছে, রাতে ঘুম ভাঙলেই সে শুনতে পেত, মায়ের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ।

এ সব পারিবারিক কষ্টের কাহিনি নেকজানের মুখে থেকেই শুনেছে শ্রুতি।

বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল সংবাদপত্রে। কাঁথি চন্দ্রমণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন অঙ্কের শিক্ষিকা প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখপূর্বক দরখাস্ত করুন।

সম্মান দক্ষিণার উল্লেখ ছিল। বহিরাগত হলে তার বাসস্থানের ব্যবস্থাদি করে দেবার প্রতিশ্রুতি ছিল।

ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন শ্রুতির বাবা-মা। ওঁরা ভারতের সব দর্শনীয় স্থানে বেড়িয়ে বেড়াতেন। মেয়ে কলকাতায় মামাবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। হৃষীকেশ থেকে ফেরার পথে রাতের ট্রেনে ঘুমের ভেতর অজানা কোন্ লোকে চলে গেলেন দুই চির ভ্রাম্যমান।

কৃতি ছাত্রী শ্রুতি। পড়ানোর ব্রত নিয়েছিল সে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই চাকরিটাও পেয়ে গেছে।

থাকার জন্য তিনটি বাড়ি দেখানো হয়েছিল বহিরাগত শিক্ষিকাকে।

শহরের নির্জন প্রান্তে নন্দকুমার পুকুর-সংলগ্ন মাটির বাড়িটাই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল শ্রুতির।

অবশ্যই একজন কাজের মেয়ের দরকার ছিল তার।

শ্রুতি যেহেতু বহিরাগত আর কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা, সেজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পরম পূজনীয় দিবাকর বেদান্ত, পঞ্চাননমশায়ের কাছে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিল একটি গৃহকর্মনিপুণা বামুনের মেয়ের জন্য। নতুন শিক্ষিকার কাছে থাকবে এবং তাকে দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করবে।

প্রায় সপ্তাহকাল শ্রুতি ছিল ইতিহাসের শিক্ষিকা অপর্ণা ষড়ঙ্গীর বাড়ি। আদর যত্নের অভাব ছিল না। তবু সংকোচ কাটেনি শ্রুতির।

সে একসময় বেরুল ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠীর খোঁজে। সে জানত দিবাকর পণ্ডিতমশায়কে একটি সারাক্ষণ কাজের মেয়ের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাসস্থান পছন্দ হলেও কাজের মেয়ের অভাবে সেখানে সংসার সাজিয়ে বসা সম্ভব হচ্ছে না।

ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠীর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল শ্রুতি।

একটি দিব্যদর্শন তরুণ বেরিয়ে আসছিল চতুষ্পাঠীর ভেতর থেকে। সৌন্দর্যের সঙ্গে যখন শুদ্ধতা মেশে তখন মুখে চোখে একটা আলোর দীপ্তি ফুটে উঠতে দেখা যায়। শ্রুতির মনে হল, তরুণটি তার থেকে তিন চার বছরের ছোটোই হবে।

সে এগিয়ে গিয়ে বলল, এটিই তো ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠী?

তরুণ বলল, সঠিক আপনার অনুমান।

এখন বেদান্ত পঞ্চাননমশায়ের সঙ্গে কি দেখা হওয়া সম্ভব?

BanglaBook.org

ছুটি হয়ে গেছে। উনি পাশের কুঠিতে রয়েছেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি খবর দিচ্ছি।

তরুণ ভেতর দিকে এক পা বাড়িয়ে পাশে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনি কি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষিকা?

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল শ্রুতি।

অল্প সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল শ্রুতিকে। চতুষ্পাঠীর পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন দুজন। এবার সেই কান্তিমান তরুণের সঙ্গে রয়েছেন ষাটোর্ধ্বের এক পুরুষ। গৌরবর্ণ, ঈষৎ স্থূলকায়। লালপাড় ধুতির ওপর একখানা শুভ্র উত্তরীয়।

সেই সৌম্যদর্শন পুরুষের দিকে তাকালে আপনি মাথা নত হয়ে আসে।

শ্রুতি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করল।

দিবাকর পণ্ডিতমশায় তার মাথায় হাত রেখে বললেন, চির কল্যাণময়ী হও।

এক একজন মানুষ আছেন যাঁর সামনে দাঁড়ালে মনে হয় তাঁর স্নেহের ধারায় শুদ্ধ স্নান হল।

এই মুহূর্তে তেমনি এক অনুভূতি হল শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

পণ্ডিতমশায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণকে বললেন বাবা রমেশ, স্কুল বাজারে গোপাল ময়রার দোকান থেকে আধসের বাদাম বরফি নিয়ে এসো। সন্ধ্যায় বীণাবাদিনীকে নিবেদন করতে হবে।

শ্রীমান রমেশচন্দ্র নন্দ, পণ্ডিত দিবাকর বেদান্ত পঞ্চাননমশায়ের স্বগ্রাম মৈতনা নিবাসী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ছাত্র। সম্প্রতি ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠীতে বেদ অধ্যায়নে রত।

রমেশচন্দ্র স্কুলবাজার লক্ষ্য করে দ্রুত বেরিয়ে গেল। দিবাকর পণ্ডিতমশায়, এসো মা, বলে ভেতরে ডেকে নিলেন শ্রুতিকে।

ছোট্ট ঘর। জানালা দিয়ে তখনও দিনান্তের আলো এসে পড়ছিল ঘরের মেঝেতে। কোনো আসবাবপত্র ছিল না ঘরে। তিনভাগ জুড়ে তালপাতার চাটাই বিছানো। তার ওপর দেওয়াল ঘেঁষে সবং-এর একটি মসলন্দ মাদুর, সরু কাঠির অপূর্ব কাজ। চওড়ে পদ্মকলি ধরে এগিয়ে চলেছে হাসের সারি।

শ্রুতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে দেখে পণ্ডিতমশায় বললেন, সবং-এর একটি ছাত্র আমার জন্য এই মসলন্দ মাদুরটি এনেছে। গরমের উত্তাপে বড়ো শীতল এর স্পর্শ। বোস মা।

শ্রুতি যতটা সম্ভব মসলন্দ মাদুরটির স্পর্শ বাঁচিয়ে চাটাইয়ের ওপর বসল।

পণ্ডিতমশায় পাশের দাওয়ায় রাখা একটা বেতের মোড়া এনে শ্রুতির মুখোমুখি বসলেন।

মৃদু হেসে বললেন, আমি মা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাই। পা মুড়ে মেঝেতে বসতে পারি না।

শ্রুতি বললে, আমার বড়ো মামাবাবু বাতের রোগী। শরীর একেবারে বেঁকেচুরে গেছে, তাঁর কষ্ট দেখা যায় না।

পণ্ডিতমশায় বললেন, কলকাতার মতো জায়গায় চিকিৎসা হল না তাঁর।

সবরকম চিকিৎসাই করা হয়েছে, ফল-শূন্য।

দিবাকর পণ্ডিতমশায় হেসে উঠে বললেন, তুমি যে মা অঙ্কের শিক্ষিকা তা তোমার কথাতেই বোঝা যাচ্ছে।

বুদ্ধিমতী শ্রুতির মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠল।

আপনি বাতের চিকিৎসা করান না?

দিবাকর বললেন, আমার এক ধন্বন্তরী চিকিৎসক আছেন। তাঁর চিকিৎসার গুণে এখনও আমি শয্যাশায়ী হইনি।

কবিরাজমশায় কি এই কাঁথি শহরেই থাকেন?

BanglaBook.org

দিবাকর বললেন, নন্দকুমার পুকুরের প্রায় সংলগ্ন দারুয়া গ্রাম। ওই দারুয়ার পাশের গ্রাম আযোধ্যাপুরে ওঁর বাড়ি। পাঁচ-সাতখানা গ্রামজুড়ে ওঁর নাম ডাক। প্রতি সকালে পালকি চড়ে বেরিয়ে যান, ফেরেন সেই সন্ধ্যা নামলে।

আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

জলোদরি হয়েছিল আত্মীয়টির। তিনি ধনী ব্যক্তি। কলকাতা গিয়ে সিরিঞ্জের মাধ্যমে পেট ফুটো করে জল বের করার কথা হচ্ছিল।

কেউ বললেন, কলকাতা যাবার আগে উপেন কবরেজমশায়কে একবার দেখিয়ে নেওয়া যাক।

পাল্‌কিতে করে কবরেজমশায় এলেন। শ্যামকান্তি দশাসই পুরুষ। আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম।

উঁচু পেটখানাতে হাত বুলিয়ে দেখলেন। নাড়ির গতি পরীক্ষা করলেন। জিভ আর চোখ দেখলেন।

গৃহস্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, রোগীর অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যায়নি। আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।

উপেন কবরেজমশায়ের কথাগুলো আমার দৈববাণীর মতো মনে হল। এমন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উনি কথাগুলি বললেন, যার পর আর প্রশ্ন করার অবকাশ ছিল না।

শ্রুতি জানতে চাইল, কি নির্দেশ দিয়েছিলেন উনি?

একবিন্দু জল খাওয়া চলবে না।

সেকি! তেষ্টা পেলে মানুষ জল না খেয়ে থাকতে পারে?

কবরেজমশায় বলেছিলেন, যখনই তেষ্টা পাবে তখনই জলের পরিবর্তে একেবারে খাঁটি দুধ খেতে হবে রোগীকে।

আমিই প্রশ্ন করেছিলাম, জল তেষ্টা কি দুধে মিটবে? তাছাড়া এত পরিমাণ খাঁটি দুধ হজম করবে কি করে?

কবিরাজ বললেন, প্রাণের থেকে প্রিয় আর কি আছে বলুন। তাকে বাঁচাবার জন্যে মাস দুয়েক জলের বদলে দুধই খান না। আর এত খাঁটি দুধ হজম করা সত্যিই অসম্ভব। সেজন্যে আমিই তো রয়েছি। এমন ওষুধ দেব, যাতে সব দুধ হজম হয়ে যাবে।

শ্রুতি বলল, সুস্থ হয়েছিলেন রোগী?

যাকে বলে পরিপূর্ণ সুস্থ মানুষ। এত দুধ খাওয়ার ফলে দেহের কি কান্তি। শুনেছি স্বর্ণ পরপটি আরও কিসব ওষুধ খাইয়েছিলেন। শুধু ওষুধ খাওয়ালেই হবে না, পর পর মাত্রা কমাতে বাড়াতে হবে।

সেই থেকে ধন্বন্তরী কবিরাজটিকে আমি আর ছাড়িনি।

ছাত্র রমেশচন্দ্র ভেতর দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, পুজোর আয়োজন হয়ে গেছে।

পণ্ডিতমশায় মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মৃদু হেসে বললেন, একটু বোসো মা, আমি সন্ধ্যারতিটা সেরে আসি। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

পণ্ডিতমশায়ের উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিও উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, আপনি সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করুন, আমার কোনো তাড়া নেই।

ভেতর থেকে একসময় ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল শ্রুতি। আবছা অন্ধকারে বসে সে দুটি হাত-জোড় করে রইল।

হঠাৎ বন্ধ চোখের ওপর আলোর ছোঁয়া লাগতেই শ্রুতি চোখ মেলল। ভেতরের দরজার চৌকাঠের বাইরে পিলসুজের ওপর বড়ো আকারের একটা প্রদীপ জ্বলছে।

BanglaBook.org

প্রদীপের ওপর ঝুঁকে পড়ে সলতেটা উসকে দিচ্ছে একটি মহিলা। পাঞ্চাশোর্ধ বয়স, কিন্তু অত্যন্ত সুঠাম গঠন। জীর্ণ পোশাক দেখে মনে হল, কাজের মেয়ে।

শ্রুতির চোখে চোখ পড়তেই মহিলাটি চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাল মহিলাটিকে।

দিদিমণি আমি নাসরিন। বাবার টোলে ঝাড়পোঁছের কাজ করি।

সত্যিই কাজের মেয়ে নাসরিন। সে আর কথা বাড়াল না। মৃদু হেসে একদিকে সরে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝকঝকে একখানা কাঁসার রেকাবিতে কিছু ফল মিষ্টি আর চুমকিতে এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকল তরুণ রমেশচন্দ্র।

নাসরিন বিবি একটা আসন পেতে দিয়ে গেল ঘরের ভেতর।

তরুণ বলল, নস্‌রিন চাচি আমাদের অনেক কাজ করে দেয়, আপনার কোনো সংস্কার থাকলে চাটাইয়ের ওপরে বসে বীণাবাদিনীর প্রসাদটুকু খেয়ে নিন।

শ্রুতি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার কোনো সংস্কার নেই। নাসরিন চাচির সঙ্গে আমার আগেই আলাপ হয়েছে। যেখানে শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত সংস্কারমুক্ত সেখানে আমি কে!

নাসরিন বিবির পেতে দেওয়া আসনের ওপর বসে প্রসাদি ফলমিষ্টি খেতে লাগল শ্রুতি।

ফলার শেষে হাতমুখ ধুয়ে আবার চাটাইয়ের ওপর বসল।

ঘরে ঢুকে পণ্ডিত বেদান্ত পঞ্চাননমশায় মোড়াটি টেনে নিয়ে শ্রুতির মুখোমুখি বসলেন।

রমেশ আমার বড়ো প্রিয় ছাত্র। যেমন মেধা তেমনি প্রখর স্মৃতিশক্তি। এই বয়সে ও যেভাবে বেদবিদ্যা অধিগত করেছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ও প্রাচীন তপোবনের ঋষি বালকের মতো গুরুসেবা করে।

শ্রুতি বলল, আমি বয়সে রমেশচন্দ্রের থেকে কিছু বড়ো হব, কিন্তু কয়েক দণ্ডের আলাপে উনি আমার শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

তোমার সঙ্গে এখনও আমার আসল কথা শুরু হয়নি, এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠল। কোনো চিন্তার কারণ নেই মা, রমেশ তোমাকে ষড়ঙ্গীবাবুদের আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

পণ্ডিতমশায় এবার আসল কথাটি পাড়লেন।

একটু আগে যে মেয়েটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেল সে নাসরিন। ও আমাকে বাবা বলে, আমি ওকে নিজের মেয়ের থেকে কম ভালোবাসি না। তুমি নন্দকুমার পুকুরের ধারে যে আস্তানাটি বসবাসের জন্য নির্বাচন করেছ, তার কিছুদূরে মুসলমান পল্লীতে নাসরিন আর তার মেয়ে নেকজান একখানা ঝুপড়িতে বাস করে। মিথ্যা ডাকাতির মামলায় নেকজানের বাবাকে জড়িয়ে আন্দামানে চালান করে দিয়েছে।

এই সৎ দুস্থ, পরিবারটির কথা আমি জানতে পারি কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ পালমশায়ের কাছে। তিনি দরুয়ার দেওয়ান বাড়ির গৃহ চিকিৎসক। যখনই ও বাড়িতে ডাক পড়ে, রোগী দেখে ফেরার পথে কবরেজমশাই তাঁর পালকি থেকে নেমে মুসলমান পাড়ায় বিনি পয়সায় রোগী দেখেন। তাঁর মুখেই নাসরিনের দুর্ভাগ্যের কথা জানতে পারি।

শ্রুতি জানতে চাইল, আপনি কি নাসরিন চাচিকে ডেকে কাজ দিলেন?

ঠিক তাই মা, অচেনা দুঃখী মেয়েটির জন্য প্রাণ বড়ো কাঁদল।

সারা রাত বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলাম, আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাড়ির সন্তান, এই বেদ বিদ্যালয়ে একজন ভিন্ন ধর্মের মহিলাকে কাজ দেব! এখানে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাবাদিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছি, শুদ্ধাচারে নিত্য তাঁর অর্চনা করি। এখানে খাদ্যাখাদ্যের বিচারহীন বিজাতীয় এক মহিলাকে কি প্রবেশের অধিকার দেওয়া যায়। তার থেকে কিছু অর্থ পাঠিয়ে মেয়েটিকে সাহায্য করলে কেমন হয়।

BanglaBook.org

পরক্ষণেই মনে পড়ল উপেন কবরেজ মশায়ের কথা। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, নাসরিন বিবি আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। ওর মেয়ে নেকজান তখন কঠিন রক্তাল্পতায় ভুগছিল। আমি তাকে ওষুধ পথ্য দিয়ে মাস তিনেকের ভেতর সুস্থ করে তুলি।

একদিন রোগী দেখার ঘরে বসে আছি, মা মেয়ে এসে প্রণাম করল।

আমি নেকজানের দিকে তাকিয়ে দেখি, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার স্বাস্থ্যে ভরা চোখ-মুখ।

নাসরিনকে বললাম, ভালো ছেলে দেখে মেয়ের শাদির ব্যবস্থা করো, খরচাপাতি আমি সব দেব।

সঙ্গে সঙ্গে নাসরিন বলল, বাবামশায়, আমি আপনার কাছে এক গলা ঋণে ডুবে আছি, আগে ঋণ শোধ করতে দিন, পরে মেয়ের শাদির কথা ভাবব।

যে কথা সেই কাজ। বাদামবন ঘুরে ঘুরে মা মেয়ে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে বস্তা ভরে আনত। মন মন ধান সেদ্ধ হত সেই জ্বালনে। তাছাড়া বাদামবাগানের মালিক বাগান পরিষ্কার রাখার জন্য ওদের কয়েক সের করে বাদাম দিত। ওরা কড়ায় খোসা সমেত বাদাম জ্বালন দিয়ে তেল বের করত। ওই তেল নাসরিন আমাকে জোগান দিত। আমার চিকিৎসার কাজে লাগত ওই তেল। তাছাড়া জাঁতিতে বিচি কেটে বাদাম বের করত। সেগুলো বাজারে না বেচে আমাদের খেতে দিত।

দাম দিতে গেলে বলত, আগে ঋণ শোধ হোক বাবা, পরে ঠিক দাম নেব।

বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলাম, যে মেয়ের এতখানি আত্মসম্মানবোধ তার দিকে তো অযাচিত দাক্ষিণ্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওকে আমার চতুষ্পাঠী পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ দিলে কেমন হয়।

হঠাৎ আমার মনে হল, মিথ্যা জাত্যাভিমানের অহমিকায় নিজেকে আচ্ছন্ন করব না। ব্রহ্ম সর্বভূতে বিরাজিত। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।'

একই পরমদেবতা সকল প্রাণীর মধ্যেই বিরাজমান। তিনি সর্বব্যাপী, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা।

জাতপাত আর সংস্কারের বাঁধন মুহূর্তে খসে পড়ে গেল।

ঝলকে ঝলকে সমুদ্রের বাতাস বয়ে আসছে। ভোরের সূচনা লগ্ন।

আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম সমুদ্র বার্তা পাঠাচ্ছে প্রবাহিত হও, প্রবাহিত হও, নিত্য শুদ্ধ থাকবে। বদ্ধ জীবনই মৃত্যু। চির চলিষ্ণুতাই নিয়ে যাবে অনন্ত জীবনের পথে।

ভোরবেলা উঠে রমেশকে ডেকে আমার অনুভূতির কথা বললাম।

আমি ভাবতে পারিনি একটি গ্রাম্যবালক এতখানি সংস্কারমুক্ত হতে পারে।

রমেশ বলল, আপনি আদেশ করলে আমি মুসলমান পল্লী থেকে নাসরিন বিবিকে ডেকে আনতে পারি।

সেই থেকে নাসরিন আমার এখানে কাজ করছে।

শ্রুতি বেদান্ত পঞ্চাননমশায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তার মনে হল, জীবনে সে এমন একজন সংস্কারমুক্ত শুদ্ধাত্মা মানুষের দেখা পায়নি।

কলেজে পড়ার সময় তথাকথিত এক নিম্নশ্রেণীর বিত্তবান বণিক কন্যা তার সহপাঠী ছিল. তার মুখে সে একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানের কথা শুনেছিল।

মহা সমারোহে ভরা সেই উৎসব। নিমন্ত্রিত ছিলেন মহানগরীর বহু বিশিষ্ট জন।

তাঁরা মণ্ডপাদি সজ্জার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। শেষে সারি সারি ভোজ্যবস্তু দর্শন করে যাবার সময় বলেছিলেন, এমন সুসজ্জিত ভোজের পাত তাঁরা বহুদিন দেখেননি।

শ্রুতি জানতে চেয়েছিল, সে কি! নিমন্ত্রিতরা শুধু কি ভোজের পাত দর্শন করেছিলেন, আহার করেননি?

BanglaBook.org

নিমন্ত্রিতদের ভেতর যাঁরা উচ্চ বর্ণের তাঁরা কেবল ঘুরে ঘুরে পাত পরিদর্শন করেছিলেন। আর স্বজাতীয়রা শুধু বসে পড়েছিলেন ভোজের আসনে।

এই গল্পটি শ্রুতি দিবাকর পণ্ডিতমশায়কে শোনালে পণ্ডিতমশায় বলেছিলেন, জাতপাতের শৃঙ্খল বড়ো শৃঙ্খল মা।

কৃতকীর্তি রানি রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে কি কাণ্ডই না হল।

শূদ্র বংশোদ্ভূতা রানি, এই অজুহাত তুলে কোনো ব্রাহ্মণই মন্দির প্রতিষ্ঠা কিংবা দেবীকে অন্নভোগ দেবার ব্যাপারে সম্মত হলেন না। শেষে ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীর মুক্তমনা পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়মশায়ের বিধানেই মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং দেবীকে অন্নভোগ দানের ব্যবস্থাদি সুসম্পন্ন হল।

সেই বিরাট অনুষ্ঠানে সংস্কারমুক্ত যেসব ব্রাহ্মণ যোগ দিয়ে কর্মসমাধা করেছিলেন, তাঁদের ভেতর আমাদের কাঁথি মহকুমার কয়েকজন উদারমনস্ক ব্রাহ্মণও ছিলেন। গড় বাসুদেরপুরের ব্রাহ্মণ রাজবংশের রাজসভার পণ্ডিত ছিলেন তাঁরা। নবকুমার চূড়ামণি, গুরুচরণ শিরোমণি, ভুবনেশ্বর বিদ্যালংকার আজও আমাদের নমস্য।

দরজার ওপারে নাসরিন বিবির মুখখানা দেখা গেল।

স্বল্পবাক শান্ত স্বভাবের মহিলা। আদেশ পালনের জন্য যেন সদা প্রস্তুত হয়ে আছে।

পণ্ডিতমশায় বললেন, তুমি বাড়ি ফিরবে নাসরিন?

আমার কাজ শেষ। আর কোনো কাজ করতে হবে কি বাবামশায়? নেকজান এসেছে, দুজনে মিলে তাড়াতাড়ি করে ফেলব।

তোমরা মা মেয়ে ভেতরে একটু অপেক্ষা করো, খুব তাড়া নেই তো বাড়ি ফেরার?

নাসরিন মাথা নেড়ে জানাল, তার কোনো তাড়া নেই।

নাসরিন সরে গেলে দিবাকর পণ্ডিতমশায় বললেন, আমি তোমার কাছে থাকার জন্য উপযুক্ত কোনো ব্রাহ্মণ বিধবার খোঁজ করছি। কিন্তু এই মুহূর্তে একটি মুসলমান মেয়ে আমার সন্ধানে রয়েছে, যে তোমার প্রায় সমবয়সি হবে মা, সে তোমার সব কাজই করে দিতে পারবে। রান্নাটুকু যদি নিজের হাতে করে নাও।

হাতে যেন স্বর্গ পেল শ্রুতি। সে বলল, কালই তাহলে আমি নতুন বাড়িতে চলে যাব।

পণ্ডিতমশায় নাসরিনের নাম ধরে ডাক দিলেন।

নাসরিন বিবি দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পেছনে লাজুক চোখে তাকাচ্ছিল নেকজান।

পণ্ডিতমশায় বললেন, এই দিদিমণি মেয়েদের স্কুলে পড়ান। নন্দকুমার পুকুরের ধারে একটা বাসা পেয়েছেন। কাজের লোকের অভাবে যেতে পারছেন না। নেকজান কি ওঁর কাছে থাকতে পারবে?

নাসরিন বলল, মেয়ে এমন একটা কাজ পেলে আমরা বেঁচে যাই বাবা।

দিবাকর পণ্ডিতমশায় বললেন, শ্রুতি-মা এখুনি ষড়ঙ্গীবাবুদের বাড়ি যাবেন, তোরা ওঁর সঙ্গে যা, পথে বাকি কথাগুলো সেরে নিবি।

শ্রুতি দিবাকর পণ্ডিতমশায়কে প্রণাম করে বেরিয়ে এল রাস্তায়। দুর্ভাবনা মুক্ত হয়ে নিজেকে বড় হালকা লাগছিল তার।

মেয়েটি মায়ের থেকেও লম্বা আর স্বাস্থ্যবতী। বড়ো করুণ দুটি চোখের চাহনি। নেকজানকে দেখে মনে মনে ভারি খুশি হয়ে উঠল শ্রুতি। প্রায় একই বয়সের দুজন এক সঙ্গে থাকবে এর থেকে আনন্দের আর কি থাকতে পারে!

শ্রুতি ভাবল, আমাদের আত্মীয়রা যদি শোনে আমি একজন মুসলমান মেয়েকে নিয়ে সংসারের কাজকর্ম চালাচ্ছি তাহলে আমাকে আর ঘরে তুলবে না। কিন্তু দিবাকর বেদান্ত পঞ্চাননের মতো

BanglaBook.org

এমন একজন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ যে কাজ করতে পারেন সে কাজ করার ভেতর কোনো লজ্জা আছে বলে আমি মনে করি না।

মাস মাহিনা নিয়ে কোনো কথাই বলল না নাসরিন বিবি। শ্রুতি কথাটা তুলতেই নাসরিন বিবির চোখ দুটো জলে ভরে এল। ভাঙা গলায় সে বলে উঠল, আপনি যে আমার মেয়েটাকে একটু ঠাঁই দিলেন তাতেই আমি কেতাথ হয়ে গেছি দিদিমণি। ওকে দুবেলা দুমুঠো পেটভরে খেতে দিতে পারিনি। আপনার কাছে থাকলে অভাগি মেয়েটার পেটের জ্বালা মিটবে, এর চেয়ে শান্তির আর কি আছে বলুন।

ষড়ঙ্গীবাবুদের বাড়ি এসে গেল। শ্রুতি নাসরিনকে বলল, তুমি কাল সকালে নেকজানকে নিয়ে নন্দকুমার পুকুর ঘাটে আসবে। আমি চাবি নিয়ে যাচ্ছি।

নাসরিন বলল, আপনি কিচ্ছু ভেবো না দিদিমণি, আমরা মা মেয়েতে মিলে আপনার বাসাবাড়ি একেবারে ঝকঝকে তকতকে করে তুলব।

সুবাতাস বয়ে আসছে সমুদ্র থেকে। দিনে ঢেউ ভাঙার আওয়াজ পাওয়া যায় না। জাগ্রত শহরের জনকোলাহল অন্য সব শব্দকে ছাপিয়ে ওঠে। রাত যত নিশুতি হয়, শহর জনপদ, পথপ্রান্তর নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তখন চির জাগ্রত সমুদ্রের শব্দ বাতাসে ভর করে ঘুমন্ত প্রাণীকুলকে বলে, তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোও, আমি জেগে আছি।

মহকুমা কাঁথির, প্রাণপ্রবাহ এই সমুদ্র। নারী পুরুষের রক্তের প্রবাহে, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সারাক্ষণ সমুদ্র খেলা করে। তাদের চিন্তা চেষ্টা, ভাবনা আর কর্মোদ্যমের অদৃশ্য নিয়ামক এই সমুদ্র।

পৌষসংক্রান্তির মেলা বসে জুনপুট সমুদ্রতীরে। হাজার হাজার মানুষের মহামিলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে তখন এই সমুদ্র বিধৌত ভূমি।

এখানকার মানুষজন সংক্রান্তির এই মেলাকে বলে, পাতা-যাত্রা। বাংলা ওড়িয়ার মিশ্রিত ভাষা ও সংস্কৃতি কাঁথি অঞ্চলের মানুষের নিত্যদিনের ক্রিয়া কর্ম সংস্কারে।

সংক্রান্তির সমাবেশের আগের দিন থেকেই গ্রাম গ্রামান্তে সাজ সাজ রব পড়ে যায়।

একাধিক রাস্তা কাঁথি শহরে এসে মিলিত হয়েছে। আবার কাঁথি থেকে চওড়া একটা পথ চলে গেছে জুনপুট সমুদ্রের দিকে।

রসলপুর আর কালিনগরের রাস্তা যেখানে এসে মিলিত হয়েছে, সেখানে রাতে দাঁড়ালে অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ত। শত শত আলোর মালা দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। দিঘা কিংবা খড়্গপুরের রাস্তার পাশে দাঁড়ালেও এ দৃশ্য চোখে পড়ত।

আসলে তখন প্রতিটি সম্পন্ন বাড়িতেই থাকত গরুর গাড়ি ওটাই ছিল চলাচলের যান। উটের গাড়ি ইত্যাদি অনেক দূরে পাড়ি দিলেও, গ্রাম থেকে গ্রামান্তে যেতে সম্পন্ন গৃহস্থ গরুর গাড়িই ব্যবহার করত।

দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে সন্ধ্যা নামতে না নামতে, মেলার উৎসাহী যাত্রীরা নিজের নিজের গরুর গাড়িতে বিছানাপত্র বিছিয়ে, মুড়ি মিষ্টি ইত্যাদি পেতলের ঘড়ায় ভরে, কলসিতে জল নিয়ে মেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। গাড়োয়ান গাড়ির সামনে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখত।

শত শত গাড়ি সারি দিয়ে চলত মেলার দিকে। দূর থেকে ওই চলন্ত আলোর লণ্ঠনগুলো দেখলে মনে হত, অন্ধকারের স্রোতে ভেসে আসা আলোর ফুলমালিকা।

শহর থেকে ঝাঁক ঝাঁক তরুণ কিশোর, যুবক যুবতী হেঁটে যেত মেলার দিকে। কেউ কেউ বাঁধা রাস্তা ধরে যেত, আবার কেউ বা যেত বনঝাউ আর বাদাম বনের ভেতর দিয়ে বালিয়াড়ির বালি

BanglaBook.org

ভেঙে ভেঙে। বালিয়াড়ির পথে যাওয়া কিছু কষ্টকর হলেও, দেড় ক্রোশ পেরোলেই বিশাল সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়ানো যেত।

নেকজানের মুখে মেলার কথা শুনে, শ্রুতি মেলাতে যাওয়ার জন্য দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। নেকজান তাকে, দুটো পথের কথাই বলেছিল।

কাজুবাদামবনের ভেতর দিয়ে বালির পথটাই বেছে নিল শ্রুতি।

শেষ রাতে শ্রুতির বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল দুজনে সঙ্গে কোনো খাবার নিল না।

শ্রুতি বলল, খাবার বানিয়ে, সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবার কোনো মানেই হয় না। শুনেছি মেলায় প্রচুর খাবার দোকান, এমনকি ছাউনি দেওয়া খাবার হোটেলও থাকে। আমরা সেখানেই খেয়ে নেব।

এসব পথ নেকজানের একেবারে মুখস্থ। সে অন্ধকার রাতে, তারার আলোয় দিব্যি পথ দেখতে পায়।

তখন খদ্দরের চাদরের খুব চলন। পছন্দ করে এক জোড়া খদ্দরের চাদর কিনেছিল শ্রুতি। একখানা নেকজানকে দিয়ে বলেছিল, এটা তোকে খুব ভালো মানাবে, নেকজান। আমরা দুজন যখন একই চাদর গায় দিয়ে বেরুব তখন লোকে বলবে দু'বোন চলেছে।

নেকজান বিস্মিত হয়ে বলে, কি যে বলো দিদিমণি! কার সঙ্গে কার তুলনা।

কেন, তুই একটু ভালো সাজগোজ করলে আমার থেকেও তোকে সুন্দর দেখাবে।

কোনো কথা না বলে, ঘাড় কাত করে, শ্রুতি দিদিমণির মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নেকজান।

আজ এই পৌষের শীতের রাতে ঠান্ডা যেন কামড়ে ধরতে চায়। বিশেষ করে বালু-পথের চরিত্রই আলাদা। গরমকালে দুপুরবেলা বালিতে পা রাখলেই পায়ে ফোসকা পড়ে যাবে। আবার শীতের দিনে, সাঁঝসকালে বালি এমনি ঠান্ডা হয়ে ওঠে যে, তার ওপর পা রাখলে, পা অসাড় হয়ে যায়।

উৎসাহে টগবগ করে ফুটছিল দুই যুবতী-কন্যা। তারা তখন সমুদ্রতীরে মেলার স্বপ্ন দেখতে মশগুল।

নেকজান উঁচু বালির ঢিবির ওপর ওঠার সময় শ্রুতির হাত ধরে টেনে তুলছিল। ওপরে উঠে খনও বা টাল সামলাতে না পেরে হাঁটু ভেঙে গড়িয়ে পড়ছিল শ্রুতি। তাকে দু'হাতে টেনে তুলে, ঝিকিমিকি তারার হাসি হাসতে হাসতে নেকজান সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

অবশেষে ওদের শ্রম সার্থক হল। ওরা একটা বালির ঢিবির ওপরে উঠে, সামনে দেখল আবছা কালো সমুদ্রের ঢেউ বালু-তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। ঝলসে উঠছে ফসফরাসের আলো।

সমুদ্রের হাওয়াতেও পৌষের শীতের কামড়। শ্রুতির মনে হচ্ছিল পশমি শালটা গায়ে দিয়ে এলে ভালো হত। কিন্তু না, নেকজান বেচারা শীতে কাঁপবে, আর আমি গরম চাদর গায়ে দিয়ে আরাম করব, তা হয় না।

সেদিন দুজনে মেলায় ঘুরে ঘুরে দু'বন্ধু অথবা দুই বোন হয়ে গিয়েছিল।

ভোরবেলা নুলিয়ারা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে ঘটির সামনে ঢেলেছিল। তারপর ঝুড়ি ভর্তি নিয়ে গিয়েছিল কাঁথির বাজারে বিক্রি করতে। বাকি মাছ ওরা বিছিয়ে দিয়েছিল বালির ওপরে। ওগুলো শুটকি হয়ে চালান যাবে কলকাতায়। সেখান থেকে বাংলাদেশের বাইরেও চলে যায়।

ওরা ঘুরে ঘুরে দেখছিল, নুলিয়া মেয়েরা একটু বড়ো বড়ো মাছ দড়িতে গেঁথে গেঁথে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। ছোটো ছোটো মাছগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে বালির ওপর।

BanglaBook.org

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল ওরা দুজনে নুলিয়া মেয়েদের মাঝখানে বসে প্রশ্ন করছে আর তাদের সুখদুঃখের গল্প শুনছে।

পুরুষরা যখন গভীর সমুদ্রে যায়, তখন যদি মেঘ ঘনিয়ে ঝড় ওঠে, ছোটো ছোটো চালার ভেতর থেকে মেয়েরা বাইরে বেরিয়ে আসে। উদ্বেগ আকুল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে উত্তাল সমুদ্রের দিকে। কচি কাঁচাগুলোর ভয়-ডর বলে কিছু নেই। তারা অতশত কিছু বোঝে না। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে ডিগবাজি খায়। ছোটো থেকে এমনই ওস্তাদ হয়ে ওঠে যে অনেক দূর অবাধ সমুদ্রে ভেসে যেতে পারে। তারপর আবার ঠিক ফিরে আসে সাদা ফেনার মতো ঘোড়ার কেশর ধরে একেবারে বালির তীরে।

সংক্রান্তির মেলা প্রবল আকার নেয় সূর্য যখন মাঝ আকাশে ওঠে। তখন দু'দিকের বিরাট জলাধারের মাঝখানের রাস্তাটা জনসমুদ্রের আকার নেয়। একদল সমুদ্রতীর থেকে ফিরছে, অন্যদল যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। এই ঠেলাঠেলিতে বড়োদের হাত থেকে ছিটকে হারিয়ে যাচ্ছে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা। খোঁজাখুঁজি, হুড়োহুড়ি, হাঁকডাক চেঁচামেচিতে মেলা সরগরম। কোথাও ঢিবির ওপরে তাঁবু টাঙিয়ে সার্কাস চলছে, সেখানে ভিড়। বাউল বৈষ্ণব গান গাইছে—সেখানে হাঁ করে গান শুনছে ভক্ত মেয়েপুরুষরা।

পুরি, কচুরি, তেলেভাজার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

সূর্য মধ্যাহ্নের আকাশ থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়তেই দেখা গেল দুদিকের মাঠে কয়েকশো গরুর গাড়ি ঘরে ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছে।

শ্রুতি বলল, আমরা কি যে পথে এসেছি, সেই পথেই ফিরব, নেকজান?

বালি ভেঙে যেতে তোমার খুব কষ্ট হবে, তাই না দিদিমণি?

শ্রুতি বলল, না না, আমি ঠিক যেতে পারব।

নেকজান বলল, তুমি যদি শহরের রাস্তা ধরে যাও, তাহলে একটু ঘুরপথ হলেও পায়ের কষ্ট কম হবে।

শ্রুতি তাকে ঠেলা দিয়ে বলল, হাজার লোকের ভিড় ঠেলে যাওয়ার চেয়ে, নির্জনে বালিয়াড়ি আর বনঝাউ পেরিয়ে যাওয়া ভালো।

একটা হোটেলে দুপুরের খাওয়া খেয়েছিল তারা। বাঁধাকপির ডালনা আর তেলতাপ্‌ড়ি মাছের ঝাল দিয়ে মোটা মোটা চালের ভাত। কি মিষ্টি সে ভাতের স্বাদ! এই সামান্য আয়োজন, কিন্তু কি অসামান্য তৃপ্তি।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে বাতি জ্বালল নেকজান। দুজনেরই রাতের খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না।

নেকজান বলল, দিদি তোমার বড়ো কষ্ট হয়েছে, আমি বিছানা করে দিচ্ছি, তুমি একটু গড়িয়ে নাও।

শ্রুতি বলল, তোরও তো কষ্ট হয়েছে, তুইও বিশ্রাম কর।

নেকজান হেসে উঠল। বলল, আমার বাড়ি থেকে রোজ আমি বিশবার বালির পাহাড়ে উঠি আর নামি,—ওটা আমার রোজদিনের খেলা আর আনন্দ।

আজ রাতে আর রান্না-খাওয়ার হাঙ্গামা নেই। দুজনে বিছানায় আরাম করে শুয়ে গল্প জুড়ে দিল।

পৌষের শীতে দুটো লেপ বানিয়ে ছিল শ্রুতি। একই রকম এক জোড়া। নেকজান তাকে খুব বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, একটা ছেঁড়া ক্যাঁথা হলে যার সারা শীতকালটা কেটে যায়, তাকে তুমি লেপ তোশক দিয়ে বিবি বানিয়ে তুলছ।

BanglaBook.org

শ্রুতি ধমক দিয়ে বলে, তুই থাম তো। এবার যখন কলকাতা থেকে ফিরব, তখন দু'জোড়া করে একই রকম শাড়ি আনব। তুই এক জোড়া তো আমি এক জোড়া পরব।

নেকজান বলল, তোমার সঙ্গে রাস্তায় বেরুলে লোক আমার দিকে আঙুল তুলে দেখাবে, আর বলবে নেকজানবিবি সেজেছে।

শ্রুতি বলল, একদিন তো তোকে বিবি সাজতেই হবে।

রক্ষে করো দিদি, সে সাধ আমার মিটে গেছে।

বিস্মিত শ্রুতি বলে, সে কি! শাদি না করতেই শাদির সাধ মিটে গেল?

হারিকেনের আলোতে বড়ো বিষণ্ণ দেখাল নেকজানের মুখখানা। বলল, দিদি, এক বনেদি মুসলমানের বাড়িতে আমার শাদি হয়েছিল, কিন্তু সে শাদি আমার টেকেনি।

কেন?

আমি হতদরিদ্রের বাড়ির মেয়ে, আর ওরা খানদানি বড়লোক। আমার চালচলন ওদের ভালো লাগেনি।

ওরা তো তোকে পছন্দ করেই বিয়ে করেছিল!

আমার শরীরটাই কাল হয়েছিল দিদি। লাগারহাটে তাজিয়া নিয়ে এসেছিল ওদের গাঁয়ের লোক। সেই সঙ্গে কামরান এসেছিল তলোয়ার খেলায় অংশ নিতে। আমরা সবাই বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দলের লাঠি ছোরা আর তলোয়ার খেলা দেখছিলাম।

দারুণ জমে উঠেছিল লড়াই। একে একে প্রায় সবাইকে হারিয়ে দিল কামরান। ওকে মেলাসুদ্ধ লোক হাততালি দিয়ে তারিফ করতে লাগল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, বালিয়াড়ির আড়ালে সূর্য শেষ রশ্মির ঝিলিক দিয়ে ডুবে গেল। আমরা ক'টি মেয়ে হাত ধরাধরি করে ঘরে ফিরে এলাম।

পরের দিন কামরানের বাড়ি থেকে লোক এল শাদির প্রস্তাব নিয়ে। মা আর আমি তো অবাক! কী করে এতজনের ভেতর আমাকে চিনে নিল ওই তলোয়ার খেলোয়াড়।

শ্রুতি কৌতূহলী হয়ে উঠল, কেমন দেখতে কামরানকে?

বনেদি বাড়ির ছেলে, খানাপিনার অভাব নেই তাছাড়া বেশ তাগদওয়ালা চেহারা।

একটু থেমে আবার বলল, কী জানো দিদি, বাইরের চেহারা দেখে তো কাউকে বোঝা যায় না। মা একেবারে রাজি ছিল না, আমরা যেমন লোক তেমনি ঘরে আমার মেয়ের শাদি হবে, এত খানদানি বাড়িতে মেয়ে দিলে আমি লোকলৌকিকতা করতে পারব না, তাতে আখেরে আমার মেয়েরই ক্ষতি হবে।

খুব বলিষ্ঠ মনের মেয়ে আমার মা, খাওয়াদাওয়া প্রায়ই জুটত না তবু কোনোদিন পড়শির বাড়ি চেয়েচিন্তে আনেনি। শুধু নুনভাত খেয়েছি কতদিন, আবার তাও জোটেনি কোনো কোনো দিন। মা নির্বিকার। প্রাণ যখন দিয়েছেন আল্লা তখন বাঁচিয়ে রাখার দায় তাঁর।

পড়শিদের ভেতর অনেকেই গোপনে আমার বদনাম করে তাদের মেয়েকে গছাবার চেষ্টা করেছিল! ওতেই আমার মায়ের মাথাটা কেমন বিগড়ে গেল। আর আপত্তি না করে এই শাদিতে রাজি হয়ে গেল মা।

প্রথমদিকে কামরানের খুব পেয়ার পেয়েছিলাম দিদি। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বড়োলোকের বেটার নজর পালটে গেল। স্বাদ বদলের জন্য চোখ চালাতে লাগল চারদিকে। দ্বিতীয় শাদি হতে দেরি লাগল না। প্রায় তিন বছরের ভেতর আরও তিনটে শাদি করে ফেলল কামরান।

শ্রুতি বলল, শুনেছি মুসলিমদের চারটে পর্যন্ত সাদির রেওয়াজ আছে।

ঠিকই বলেছ দিদি, এরপরও শাদি করতে গেলে ওদের ভেতর একজনকে তালাক দিতে হবে।

BanglaBook.org

শ্রুতি বলল, তাই বুঝি?

নেকজান বলল, দেওয়ান বাড়ির একটি মেয়ে আমাকে খুব পছন্দ করত। তাদের কাজুবাদামের বাগানে আমি কাজ করতাম। মাঝে মাঝে সে আমাকে তার বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে গল্প করত। আমরা সমবয়সি ছিলাম। তার মুখে শুনেছি, সৌদি-আরবে শেখেরা নাকি অনেকগুলো শাদি করে।

শ্রুতি বলল, তাহলে যে চারটের বেশি হয়ে গেল।

সেদিক থেকে ওরা নিয়মভঙ্গ করে না। চারটের পর আর একটা বউ আনতে গেলে আগের চারটের একটিকে তালাক দেয়। শুনেছি বিদেশ থেকে অনেক সুন্দরী মেয়ে ওদের বিপুল ধনদৌলতের লোভে শেখেদের শাদি করতে রাজি হয়ে যায়।

শ্রুতি বলল, যে মেয়েটা তালাক পেল তার আর দুর্ভাগ্যের শেষ রইল না।

না দিদি, তাকে নাকি বিপুল ধনদৌলত বাড়ি ঘর দিয়ে বিদেয় করে।

তা না হয় হল, কিন্তু স্বামীসুখ থেকে তারা তো বঞ্চিত হল।

একদম না, তালাক পাবার পর তারা ইচ্ছেমতো শাদি করতে পারে। শেখের বাড়ির বিবি ছিল জানলে তাদের কদরই আলাদা। বহু রহিস আদমি তাকে শাদি করবে বলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হাজার হোক শেখেদের খানদানি গন্ধ মাখা আছে তো মেয়েটার গায়।

শ্রুতি বলল, সেই থেকে আমার বোন আর শাদির নাম করে না, তাই না?

ওতে ছেদ টেনে দিয়ে বেঁচে গেছি দিদি। মায়ের হাতের নুন ভাত আর গিরিয়া শাকের ভাজা, কোরমা-কাবাব ফেলে খেতে হয়।

ঘুমিয়ে পড়েছে দুজনে, সমুদ্র কিন্তু ঘুমোয়নি। বাতাসে তার কানাকানি ফিশফিশানি শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে খুশির কলধ্বনি।

ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের বহু অনুরাগী ছিলেন কাঁথি মহকুমায়। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা কাঁথিতে একটি 'প্রার্থনা সমাজ' গঠন করেন। সেখানে নিয়মিতভাবে ব্রহ্ম উপাসনা এবং প্রার্থনা সংগীত গীত হত। কাঁথি মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও নিয়মিতভাবে ব্রহ্মোপাসনার আসর বসত। পরবর্তীকালে এই প্রার্থনা সমাজই কাঁথির ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হল।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কাঁথিতে প্রতিষ্ঠিত হল ঐতিহাসিক ব্রাহ্ম মন্দির। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীমশায় এ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। দহ সোনামুই নিবাসী মহান দাতা রাধাকৃষ্ণ মাইতিমশায় সহধর্মিণী শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবীর নামে 'কাঁথি চন্দ্রমণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করলেন। এটি ছিল কাঁথি মহকুমার প্রথম মহিলা শিক্ষায়তন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা।

এর তিনবছর আগে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম 'মহিলা সমিতি' স্থাপিত হয়েছিল। বাইশজন সদস্যার ভিতর বারোজন ছিলেন কাঁথি শহরাঞ্চলের, আর বাকি দশজন সদস্যা ছিলেন মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের। বছরে চব্বিশটি অধিবেশন হত এই মহিলা সমিতির। নারীদের অগ্রগতির বিষয়ে বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হত।

কাঁথি ব্রাহ্ম সমাজ ট্রাস্টডিডের বিভিন্ন ধারা উপধারায় আমরা দেখতে পাই নিম্নলিখিত কয়েকটি সুমহান মৌল শর্ত

(ক) সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন। অন্য আর কিছুই ছিল না। তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

(খ) তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্যা, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, নিরবয়ব, নির্বিকার, একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

(গ) একমাত্র তাঁহার উপাসনার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

BanglaBook.org

(ঘ) তাঁহাকে প্রীত করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

(ঙ) সুবিশাল এই বিশ্বই পবিত্র ব্রহ্মমন্দির, সুনির্মল চিত্তই তীর্থ, সত্যই অবিনশ্বর শাস্ত্র, বিশ্বাসই ধর্মের মূল, প্রীতিই পরম সাধন, স্বার্থনাশই বৈরাগ্য।

(চ) ক্ষুদ্র ও মহৎ শাস্ত্র হইতে কুশল মনুষ্য সার গ্রহণ করিবে। যেমন ষট্‌পদগণ পুষ্প হইতে মধু গ্রহণ করিয়া থাকে।

(ছ) প্রত্যেক মনুষ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসনার অধিকারী। ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে কোনো মধ্যবর্তী নাই।

(জ) মানবাত্মা—অমর ও অনন্ত উন্নতিশীল।

কেবলমাত্র কতকগুলি নিষেধ ছিল।

যেমন এই মন্দিরে কোনো সৃষ্ট বস্তুর পূজা বা আরাধনা হইবে না। কোনো মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড়পদার্থ, ঈশ্বর জ্ঞানে বা ঈশ্বরের সমান জ্ঞানে বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে এখানে পুজিত হইবে না। এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও উদ্দেশে বা কাহারও নামে প্রার্থনা বা সংগীত, স্তব হইবে না।

কোনো সম্প্রদায়বিশেষ কর্তৃক পূজার্থ ব্যবহৃত কোনো খোদিত বা চিত্রিত বা মৃন্ময় প্রতিমূর্তি, অথবা কোনো বাহ্যিক চিহ্ন এখানে রক্ষিত হইবে না।

এই মন্দিরে বা তৎসংলগ্ন ভূমিতে কোনো বলি-উপকরণ বা সৃষ্টি বস্তু উপাসনার অঙ্গীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

আবার একথাও বলা হয়েছে,—এখানকার উপাসনায় কোনো সৃষ্ট জীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা তাহাকে অবমাননা করা হইবে না। কোনো গ্রন্থ বা শাস্ত্র ঈশ্বর প্রণিত বা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত বা সমাদৃত হইবে না। কিন্তু কোনো গ্রন্থ বা শাস্ত্র যাহা বিশেষ সম্প্রদায়কর্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বা হইবে তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না।

কোনো সম্প্রদায়কে নিন্দা, উপহাস বা অবমাননা করা হইবে না।

যদ্দারা সকল নরনারী জাতি বর্ণ-নির্বিশেষে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন এবং উদার ও পবিত্র ধর্মের সাহায্যে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান, ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন, এমনভাবে ও প্রণালীতে উপাসনা হইবে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য প্রধানত লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া সর্বপ্রকার সত্য প্রচারের জন্য, কার্যনির্বাহক সভার অনুমত্যানুসারে, এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

এই গৃহে কোনো ধর্মসমাজের সভ্য কিংবা প্রচারক কি কোনো সচ্চরিত্র ব্যক্তি, কার্যনির্বাহক সভার অনুমত্যানুসারে ধর্ম, নীতি, সামাজিক উন্নতিকর কি অন্যপ্রকার দেশহিতকর বিষয়ে বক্তৃতা কিংবা আলোচনা করিতে পারিবেন।

ব্রাহ্ম সমাজের এই উদার সর্বব্যাপ্ত কল্যাণকর মানসিকতার কথা শ্রুতি জানতে পেরেছিল তার এক ব্রাহ্ম বান্ধবীর কাছ থেকে। ব্রাহ্ম মন্দির-গৃহে বহিরাগত উদারমনস্ক কয়েকজন বক্তার বক্তৃতা সে শুনেছিল। তার মনে হয়েছিল, বড়ো শুদ্ধ মুক্ত চিন্তাধারা এই সব মানুষের।

তার সব থেকে ভালো লেগেছিল, পরধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ না করে নিজধর্মের আচরণবিধিগুলিকে অনুসরণ করে যাওয়া।

এই নিয়মাবলির ভেতর কোনো ধর্মকে আঘাত দেবার উল্লেখ নেই, বিরূপ সমালোচনাতেও নিষেধ আছে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য ঈশ্বরের প্রার্থনায় আহ্বান আছে।

শ্রুতি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মদের এই সংস্কারমুক্ত সমন্বয়বাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল।

BanglaBook.org

একদিন কোথা থেকে এক দরবেশের আবির্ভাব ঘটল। ব্রাহ্ম সমাজের কেউ তাঁকে ব্রাহ্ম মন্দিরে নিয়ে এলেন কিছু বলার জন্য।

অদ্ভুত এক আলখাল্লায় তাঁর সমস্ত শরীরটা আবৃত। বিভিন্ন বর্ণের টুকরো টুকরো ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড জুড়ে সেই আলখাল্লা প্রস্তুত হয়েছিল। তাঁর মাথার টুপির শীর্ষদেশ ছিল খানিকটা উঁচু এবং সেটা পশমের তৈরি। দীর্ঘদেহী, সারা মুখ কাঁচপাকা দাড়িগোঁফে ভর্তি।

সবাই আশ্চর্য হয়ে শুনল তাঁর বাংলা-ভাষণ।

সুফিরা যে একমাত্র আল্লাকে বিশ্বাস করেন সেকথা তিনি জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। তিনি জানালেন, একমাত্র ঈশ্বর বা আল্লাই সত্য। যত সাধনা তা ওই একমাত্র ঈশ্বরকে লাভ করার জন্যই।

জাগতিক সর্বভূতে সমস্ত দৃষ্ট জগতে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে হবে।

তিনি বললেন, প্রত্যেক সুফি সাধককে প্রথম অবস্থায় ধর্মের কতকগুলি বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান করতে হয়। এই ধর্মাচারের নাম শরিয়ত। দ্বিতীয় স্তরে উঠে সাধক ওই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম পরিত্যাগ করেন এবং ভগবত ধ্যান ও ধারণায় নিমগ্ন হন। এই অবস্থাকে তরিকৎ বলা হয়।

তৃতীয় স্তরে উঠলে সাধক দীর্ঘকাল ভগবদ্‌আরাধনার ফলে সত্যের অবস্থায় উন্নীত হন এবং ত্রিকালদর্শী হয়ে থাকেন। এই স্তরের নাম হকিকত।

চতুর্থ স্তরের নাম শরিফত। এই অবস্থায় উন্নীত হতে সাধককে দীর্ঘকাল কঠোর উপবাস ও নির্জন বনে বা মরুদেশে অবস্থান করে একাগ্রমনে ভগবৎ চিন্তায় বিচরণ করতে হয়। এই সময় গুরুসঙ্গ ছাড়া অন্য লোকের সাক্ষাৎ আলাপ একেবারে নিষিদ্ধ। এই কঠিন ও কষ্টকর সাধনায় উত্তীর্ণ হতে পারলে সাধক সিদ্ধ হন। তখনও সাধকের আত্মা ভগবদাত্মায় সম্মিলিত হয়। তখন তিনি ভগবানের চিন্তায় বিভোর হয়ে ভগবানের প্রকৃতিই লাভ করেন। ঈশ্বরের ন্যায় তখন তিনি জগতে প্রেম বিতরণ করতে থাকেন এবং জগতের অশেষ মঙ্গল করেন।

তিনি ব্রাহ্ম মন্দিরে দু-রাত ভাষণ দিয়েছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইশাই সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন মানুষও সেই দরবেশের সভায় ভিড় জমিয়েছিল।

শ্রুতিও গিয়েছিল এই মানুষটির আশ্চর্য সব কথা শুনতে।

দ্বিতীয় দিনে তিনি তাঁর আরব, তুরস্ক, মিশর ভ্রমণের বিচিত্র সব কাহিনির বর্ণনা দিয়েছিলেন। সে সব কাহিনি ছিল বড়ো চিত্তাকর্ষক। এক সাধকের চোখে দেখা ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষজন, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, তাদের স্বভাব ধর্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কত পরিচয়।

মরুভূমি পার হবার সময় তীক্ষ্ণ রৌদ্র দাহে যখন তিনি ক্লান্ত মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছেন তখন ঈশ্বরের করুণার মতো এক মরুচর বেদুইন তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। নিজের মশক থেকে তৃষ্ণার সুশীতল বারি ঢেলে দিয়েছেন তাঁর অঞ্জলিতে। জলপান করতে করতে তাঁর মনে হয়েছে এ শুধু জল নয়, ঈশ্বরের করুণাধারা।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে খলিফা হারুণ-অল-রশিদ যখন রাজত্ব করছিলেন তখন ফজল আবু আলি তালিকানী নামে এক খোরাশানবাসী দস্যু ব্যবসায়ী কোরানের কোনো বাক্য পাঠ করে এমনই উদ্দীপ্ত হন যে তিনি তাঁর নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করে ফকির হয়ে যান।

অনেক বড়ো সাধক ছিলেন মিশরবাসী জুউন্‌-নুন। কায়রো নগরে তাঁর সমাধি দেখতে গিয়েছিলেন আমাদের সেদিনের বক্তা দরবেশটি। তিনি বলেছিলেন, জীব হিংসা কিংবা পাপগ্রস্থ হবার ভয়ে তিনি নিজেকে বহু সময়ে শেকলে আবদ্ধ করে রাখতেন।

দরবেশের পোশাক সম্বন্ধে সে রাতের সভায় কেউ প্রশ্ন তুললে তিনি বলেছিলেন, সুফি তৌষ আবু আবদুর রহমন সুফি ধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সুফি সম্প্রদায়ের একটি বেশ নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত পোশাক ছিল এইরকম

BanglaBook.org

মাথায় পশমের উঁচু চূড়াকৃতি টুপি ও পশমে ঢাকা একটি দণ্ড। খণ্ড খণ্ড ছিন্নবাস জুড়ে তৈরি হত আলখাল্লার মতো একটি ঝোলা জামা,—যার নাম খিরকা।

কেউ বললেন, আমাদের দেশের বাউল সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকেই এ ধরনের পোশাক পরে থাকেন।

ওঁর মতে তুরস্ক দেশে সুফি মতের প্রভাব সব থেকে বেশি। তুরস্কের রাজধানীকে কেন্দ্র করে সুফিদের প্রায় দুইশত মঠ তৈরি হয়েছিল।

কথায় গানে সুফি সাধকটি প্রায় সারা শহরটাকে মাতিয়ে দিয়ে গেল। যেমন কোনো সংবাদ না দিয়ে আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর, ঠিক তেমনি তৃতীয় দিনে সবার অজ্ঞাতে কোথায় মিলিয়ে গেলেন তিনি। তিনি চলে গেলেন কিন্তু সবার অন্তর জুড়ে রেখে গেলেন তাঁর ঐশ্বরিক আলোর স্পর্শ।

শ্রুতির জীবনে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এ দুদিন ঘোরের ভেতর থেকে শ্রুতি লক্ষ্য করেনি নেকজান সেই যে তার মার সঙ্গে দেখা করতে দারোয়ার মুসলমান পল্লীতে গিয়েছিল, আর আসেনি।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় স্কুল থেকে ফিরে এসে শ্রুতি দেখল, নেকজান বন্ধ দরজার সামনে হেলান দিয়ে বসে আছে।

শ্রুতির পায়ের সাড়া পেয়ে সে উঠে দাঁড়াল। শ্রুতি দেখল নেকজানের চোখে কিসের যেন একটা ঘোর লেগে আছে।

কী ব্যাপার, মায়ের শরীর খারাপ ছিল বুঝি?

এতক্ষণে মুখ খুলল নেকজান, না দিদিমণি, মা সুস্থই আছে।

আর কিছু জানতে চাইল না শ্রুতি। নেকজান ফিরে আসায় সে এখন আরাম বোধ করছে।

নিয়মমতো রান্না খাওয়া শেষ হল। প্রথম দিকে রান্নার কাজটা নিজের হাতে করত শ্রুতি। কিন্তু পরপর সে সংস্কারও চলে গিয়েছিল তার। এখন রান্নার সব দায়িত্ব নেকজানের ওপর ছেড়ে দিয়েছে সে।

খাওয়ার শেষে কাছাকাছি শুয়ে আছে দুজনে। খাটের ওপর শ্রুতি, নীচের বিছানায় নেকজান।

এরপর শুরু হয় কথা। সারাদিন স্কুলের অভিজ্ঞতার গল্প করে যায় শ্রুতি আর মুগ্ধ শ্রোতার মতো সেসব শুনতে থাকে নেকজান। শ্রুতি নতুন দরবেশের সম্বন্ধে অজস্র কথা বলে চলল। কিন্তু মানুষটা যে কতখানি রহস্যময় সে কথা বলতে ভুলল না। এত অনুষ্ঠান আয়োজন যাকে ঘিরে সে মানুষটি তার নামটিও না জানিয়ে গতরাতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথা থেকে এল কোথায় গেল কেউ তার হদিস পেল না। মুগ্ধ হয়ে তারা শুধু শুনল সেই সহজ হৃদয় ফকিরের নানা ধর্মীয় উপলব্ধির কথা। পরিব্রাজক মানুষটির আরব, পারস্য, মিশর, তুরস্ক ভ্রমণের কাহিনি।

হঠাৎ বিছানার ভেতর থেকে নেকজান বলে উঠল, ব্রাহ্ম মন্দিরে তোমাকে আমি দেখেছি দিদিমনি।

সে কি! তুই সেখানে কী করতে গিয়েছিলি?

বিদেশ থেকে দরবেশ এসেছে শুনে আমি আর মা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম,—তাঁর কথা শুনতে গিয়েছিলাম। ফকির বড়ো মিষ্টি গলায় কথা বলেন, কিন্তু আমি তাঁর সব কথার মানে বুঝতে পারিনি।

তোদের মুসলমান পাড়ার আর কেউ যেত?

অনেকে ভিড় জমাতো দিদিমনি। দেওয়ান বাবুরা তাঁকে তাঁদের বাড়িতে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে সাড়া দেননি। ব্রাহ্ম মন্দির থেকে বেরিয়ে তিনি কোথায় যেতেন কেউ জানতে পারেনি।

BanglaBook.org

কাল রাতেই কেবল মায়ের মুখে শুনেছি ফকির রাতের বেলা বালিতে ঢাকা ভাঙা মসজিদটার এক ঢালে শুয়ে রাত কাটাতেন। অনেকে তাঁকে খাবার নিবেদন করতেন কিন্তু তিনি তার থেকে সামান্য কিছু তুলে নিয়ে তাঁর ঝোলার মধ্যে রেখে দিতেন। সেই খাবারে তাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি হত।

কথা বলতে বলতে বেশ কিছুক্ষণ থেমে গেল নেকজান।

এক সময় বলে উঠল, জীবনটা বড়ো অদ্ভুত, তাই না দিদি?

হঠাৎ একথা কেন নেকজান?

চাঁদের আলো জানালা দিয়ে এসে পড়েছিল মেঝেতে। সেই আলোয় একমুঠো কাঠচাঁপা ফুল হাতের পাতায় ধরে নেকজান বলল, তুমি দেখতে পাচ্ছো দিদি, এগুলো গোলাচ ফুল। ভারি মিষ্টি একটা গন্ধ আছে এর।

শ্রুতি তখন বিছানার ওপর উঠে বসেছে। সে বলল, এ ফুল তুই কোথায় পেলি?

মা দিয়েছে। ওই যে বালিঢাকা ভাঙা মসজিদটার পাশে কাঠচাঁপার গাছ, তারই ফুল এগুলো।

তোর মা সেখানে গিয়েছিল বুঝি?

সে অনেক কথা দিদিমনি। চোখের জলের সঙ্গে সে সব কথা মিশে আছে।

বিস্মিত শ্রুতি বলল, তুই যে আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিলি রে নেকজান!

ততক্ষণে নেকজান তার বিছানা ছেড়ে শ্রুতির খাটের নীচে হাঁটু গেড়ে বসেছে। সে শ্রুতির একখানা হাত জড়িয়ে ধরে কতক্ষণ বসে রইল। তার হাতদুটো কোঁপে কেঁপে উঠছিল।

শ্রুতিও ততক্ষণে বিছানার বাইরে বেরিয়ে এসে নেকজানের হাত জোর করে চেপে ধরে বলল, কী হল তোর নেকজান! এমন করে কাঁপছিস কেন?

ভাঙা গলায় নেকজান বলল, এই ফুলগুলো দরবেশ আমার মাকে দিয়ে গেছে।

জীবনে কোনো কিছুতেই এমন বিস্ময় বোধ করেনি শ্রুতি। সে বলল, ফকিরসাহেব তোর মাকে ফুল দিয়েছে!

হ্যাঁ দিদি। কেউ আমার একথা বিশ্বাস করবে না। আর কাউকে আমি একথা বলতেও পারব না। তুমি আমার দিদি তাই তোমাকে বললাম।

আমার মাথা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে নেকজান, তুই খোলসা করে বল।

নেকজান যেন একটা অবলম্বন পেতে চাইছে। সে শ্রুতির হাতটাকে আরও চেপে জড়িয়ে ধরল।

যেন ভিন জগৎ থেকে নেকজানের মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এল, ওই দরবেশ আমার আব্বাজান দিদি।

কতক্ষণ মুখে কথা সরল না কারুর।

একসময় নীরবতা ভেঙে শ্রুতি বলল, তুই কী করে জানলি?

আমি মায়ের মুখ থেকে সব শুনেছি।

তাই!

গতরাতে আমি আর মা ঝুপড়ির ভেতর শুয়ে ছিলাম। ভাঙা পাঁচিল আর ফুটো চাল দিয়ে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছিল। মায়ের বুকে হাত রেখে আমি ঘুমোই। হঠাৎ আমার হাতটা কে যেন আস্তে আস্তে বিছানার ওপর রেখে দিল। ঘুম জড়ানো চোখে দেখলাম মা কঞ্চির বেড়াটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ভারি কৌতূহল হল আমার। ওদিকে তো বাদামবাগানের রাস্তা, রাতে তো মা ওদিকে যায় না!

মা গাছের ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে আমি হাঁটু গেড়ে ফাটা দেওয়ালটার ফাঁকে চোখ রাখলাম।

কী আশ্চর্য বাদামবনের আলো ছায়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন সেই দরবেশ, আর মা সম্মোহিতের মতো চলেছে তাঁর পেছন পেছন।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের ভেতর আমার দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল ওরা দুজন। আমি ঘুমোতে পারলাম না। কেবল মনে হতে লাগল, ব্রাহ্ম মন্দিরে দরবেশের বক্তৃতার সময় মা আমাকে সব কাজ ফেলে টানতে টানতে নিয়ে যেত সেখানে।

কী হতে পারে, আমি কোনো কিছুই ভাবতে না পেরে সেই ফাটা দেওয়ালে চোখ রেখে আলো-অন্ধকারে তৈরি জগৎটার দিকে চেয়ে রইলাম।

আমি তখন সত্যিই কিছু কল্পনা করতে পারছিলাম না। আমি জানতাম আমার মায়ের মতো পবিত্র চরিত্রের মেয়ে আমাদের পাড়ায় খুব কমই আছে। পড়শিরাও মায়ের স্বভাবচরিত্রকে খুব সম্ভ্রমের চোখে দেখত। মাকে নিয়ে আমার গর্ব ছিল খুব। আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। অবসন্ন হয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকে বসে রইলাম।

কখন যে মা ঘরে ঢুকেছে তা জানতে পারিনি। হঠাৎ পেছন থেকে একটা হাত আমার গলা জড়িয়ে ধরল। আমি চমকে পেছন ফিরে দেখি আমার মা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

কী দয়া দিদি, চাঁদের আলোয় আমি মায়ের মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। জ্যোৎস্নার মতো কোমল উজ্জ্বল পবিত্র সে মুখ। চোখের পাতায় দু বিন্দু জল চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল।

আমি আবেগে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

তুমি কোথায় গিয়েছিলে মা?

মা বলল, বালিয়াড়ির নীচে সেই ভাঙা মসজিদের ধারে।

এত রাতে সেখানে?

মা বলল, সেখানে একজন হারিয়ে যাওয়া মানুষের খোঁজ পেতে গিয়েছিলাম।

আর কোনো কিছু গোপন না রেখে প্রশ্ন করলাম, তোমাকে যে আমি সেই দরবেশের সঙ্গে যেতে দেখলাম?

তুই ঠিকই দেখেছিস মা। দরবেশই আমাকে ওই মন্দিরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

বললাম, তোমার সঙ্গে দরবেশের আবার আলাপ হল কখন?

হিন্দুরা বলে, পরিচয় জন্ম জন্মান্তরের। সেই পরিচয়ের টানে আমি গিয়েছিলাম।

বললাম, খুলে বলো মা। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওই ফকিরই তোর হারিয়ে যাওয়া আব্বাজান।

ততক্ষণে আমি আবেগে কান্নায় মাকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ ঘষে চলেছি।

কতক্ষণ পরে আবার প্রশ্ন করলাম, আমার আব্বাজান তো কালাপানির পারে বন্দি হয়ে আছে। তিনি কী করে সাধু হয়ে এখানে এলেন!

মা বলল, সে অনেক কাহিনি। শুধু এইটুকু শুনে রাখ, আরবদেশের একটা জাহাজ একবার আন্দামানে ভিড়েছিল। ব্যাবসা বাণিজ্যের ভেতরে তাদের আলাপ হয়েছিল জেলের কয়েকজন রক্ষীর সঙ্গে। তারা আরব বণিকদের কাছ থেকে নতুন নতুন অনেক জিনিস উপহার পেয়েছিল। পরিবর্তে একদিন কারারক্ষীরা আন্দামানের কিছু সামুদ্রিক শঙ্খ ইত্যাদি তাদের উপহার দেবার জন্য তোর বাবার হাতে রাতে ওই জাহাজে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে বন্দর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল জাহাজটা। তোর আব্বাজান উপহারের জিনিসগুলো নিয়ে লাফিয়ে উঠল সেই জাহাজে। জাহাজ তার নিজের গন্তব্যপথে চলে এসে থামল একেবারে আরবসাগরের এক বন্দরে। সেই থেকে তোর বাবা নসরুল্লা খান নিজের নাম হারিয়ে হয়ে গেল বিবাগি বৈরাগী। দুনিয়া ঘুরে ফকিরের বেশে এল তার নিজের জায়গায়। না, এখানে থাকতে আসেনি তোর আব্বাজান, শুধু দেখতে এসেছিল তার বহু বছর আগে ফেলে যাওয়া বিবি আর বাচ্চাকে।

তুমি কি আব্বাজানকে চিনতে পেরেছিলে মা?

BanglaBook.org

আমি দুদিন ধরে চেষ্টা করেছিলাম মানুষটাকে চিনতে।

আমি বললাম, তুমি কি ফকিরকে আমার বাবা বলে সন্দেহ করেছিলে?

মা বলল, সারা দেহ ফকিরের আল্লাখাল্লায় ঢাকা। মাথায়ও লম্বা টুপি। আর মুখ দেখে চিনব কি, কাঁচাপাকা বিরাট দাড়িগোঁফ। কিন্তু গলার স্বর আমার বহুদিনের চেনা বলে মনে হয়েছিল। দূরে একটা বাঁশের বাঁশি বাজলে যেমন তার সুর মনকে উদাস করে দেয়, ওঁর কথাও তেমনি আমাকে টানছিল। তাই আমি বারবার ওঁর কথা শোনার জন্য ব্রাহ্ম মন্দিরে ছুটে গিয়েছি। তোকেও সঙ্গে নিতে ভুলিনি।

বললাম, আজ কি তাহলে বাবাই এসেছিল তোমার খোঁজে?

হ্যাঁ, মা। হঠাৎ ওই ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে আমার নাম ধরে ধীরে ধীরে কেউ যেন ডাকল। মনটা আমার কদিনই বড়ো চঞ্চল ছিল। তাই সামান্য ডাকেই ঘুম ভেঙে গেল। আমি ওই ফাটা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, দরবেশ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর একটিমাত্র ডাক মনে হল সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে এল। কতযুগ পরে, কত ঘটনার স্রোত ঠেলে আমার কানে যেন মধু ঢেলে দিল। আমি কোনোকিছু চিন্তা না করে পেছনের দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলাম।

ওঁকে সেলাম করতেই উনি আমার দুটো হাত ধরে বললেন, ফকিরকে সেলাম করছ-না নসরুল্লা খানকে?

আমি আবেগে কোনো কথা বলতে পারছিলাম না, ওঁর পায়ের কাছে ভেঙে পড়ে কান্নায় ভিজিয়ে দিচ্ছিলাম মাটি।

উনি বললেন, আমি কিন্তু ব্রাহ্ম মন্দিরে তোমাকে দেখে চিনতে পেরেছিলাম। তোমার মেয়েটিকেও দেখেছি।

বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে এল। বললাম, মেয়ে কি তোমার নয়?

উনি বললেন, আমি এখন সংসার বিবাগি ফকির, আমি এখন কারও পিতা বা স্বামী নই। আল্লাই আমার একমাত্র আরাধ্য। আমি তাঁরই খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি দেশ বিদেশে।

এরপর ওঁর সঙ্গে আমি সেই ভাঙা মসজিদের দিকে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ একবার থেমে গিয়ে বললাম, তুমি একবারটি তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে যাবে না?

উনি পেছন ফিরলেন না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, মায়া বড়ো বন্ধন নাসরিন, ব্রাহ্ম মন্দিরে দাঁড়িয়ে এক ঝলক যে মেয়েটিকে তোমার পাশে দেখেছি সে আল্লার কৃপার দান, আল্লাই তাকে দেখবেন।

আমি বালি-ঢাকা সেই আধখানা মসজিদের ওপারে দরবেশকে অনুসরণ করে কাঠচাঁপা গাছের তলায় হাজির হলাম।

আমার প্রশ্নের উত্তরে উনি বলে যাচ্ছিলেন বন্দিদশা থেকে ওঁর মুক্তির কাহিনি। শেষে যখন উনি আল্লার আনন্দময় জগতে প্রবেশের কথা বলছিলেন তখন আমার চোখ দিয়ে জল ঝরছিল।

উনি বললেন, তুমি কাঁদছ নাসরিন!

বললাম, এ কোনো দুঃখের কান্না নয়। এত আনন্দ আমি ধরে রাখতে পারছি না বলে কাঁদছি।

ওঁর সঙ্গে আর বেশি কোনো কথা হল না। আকাশে শুকতারা জ্বলছিল, সমুদ্র থেকে ঝলকে ঝলকে বাতাস বয়ে এসে বাদামগাছের পাতায় করতালি দিচ্ছিল।

উনি বললেন, এই সমুদ্র, এই চেনা পরিবেশ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে না পারলে আবার আমাকে পিছিয়ে আসতে হবে। তুমি প্রস্তুত হও আমাকে বিদায় দেবার জন্য।

নেকজান বলল, মা তখন বলেছিল, কেমন করে তোমাকে বিদায় দেব, তুমি যে আমার সারা মন জুড়ে রয়েছ। নমাজ পড়ার সময় একবার তোমার মুখ আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠবে।

BanglaBook.org

শেষে একটি ঘটনা ঘটেছিল দিদি।

শ্রুতি বলল, কী এমন ঘটনা?

দরবেশ চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর আলখাল্লার পকেট থেকে একটা থলে বের করলেন। মাকে বললেন, আমি যখন আবর দেশে ঘুরছিলাম তখন এক শেখ আমাকে এই থলেটি দিয়ে বলেছিল, যদি কখনও আপনার কোনো দরকার হয় তাহলে আমার এই সামান্য দান গ্রহণ করলে আমি ধন্য হয়ে যাব। আমি থলেটি শেখকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি। পরে এক সময় থলের মুখ খুলে দেখেছিলাম অনেকগুলো সোনার মোহর আছে। তুমি জানো ফকির দরবেশের কোনো কিছু সঞ্চয় করতে নেই। সেই থলেটা আজও আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। এত দুঃখের ভেতরে তোমার যদি কিছু কাজে আসে তাহলে এটা তোমার কাছে রেখে দাও।

মা অমনি বলে উঠেছিল, আমার বুকের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকে আমি আল্লার চরণে উৎসর্গ করে দিয়েছি, এই সামান্য ধন নিয়ে আমি কী করব ফকির।

ফকির অমনি মায়ের দুটো হাত ধরে বলেছিলেন, তুমি তোমার অন্তরে যে সম্পদের সঞ্চয় রেখেছ নাসরিন আমি এতকাল আল্লার আশ্রিত হয়েও তা পাইনি। আল্লা তোমাকে একদিন করুণা করবেন।

কয়েকটা ফুল সমুদ্রের হাওয়ায় কাঠচাঁপায় গাছ থেকে ঝরে পড়েছিল বালুর জমিনে। ফকির সেই ফুলগুলি কুড়িয়ে নিয়ে মায়ের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, আমি চললাম নাসরিন।

মা অমনি বলে উঠল, তুমি যাবে কোথায় ফকির, তুমি তো আরও বেশি করে রয়ে গেলে আমার মনের মধ্যে। এ ফুলের মধুর গন্ধ হয়তো একসময় মিলিয়ে যাবে কিন্তু তোমার স্মৃতি থাকবে অক্ষয় হয়ে।

বালিকা বিদ্যালয়টি বড়ো ভালো লেগে গিয়েছিল শ্রুতির। সহকর্মীরা যেমন সম্ভ্রান্ত তেমনি বন্ধুবৎসল। উমা ষড়ঙ্গী ভূগোল পড়াত। তার সঙ্গে শ্রুতির বড়ো ভাব জমে গিয়েছিল। একই বয়স, দুজনে বেশ খোলামেলা। সামান্য কথাতেই দুজনে প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারত।

নন্দকুমার পুকুরপাড়ের নিজের বাসায় উঠে যাবার আগে এই উমা ষড়ঙ্গীর বাড়িতেই দিন দশেক থাকতে হয়েছিল শ্রুতিকে।

মেয়ের বন্ধু হলেও শ্রুতিকে মায়ের স্নেহ দিয়ে যেমন করে আগলে রেখেছিলেন বন্ধু উমার মা তাতে তাঁকে পর বলে মনে হয়নি শ্রুতির। একেবারে মাতৃস্নেহের মূর্ত প্রতিমা বলা যায়। তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা বললে মনে হত তাঁর চোখ দিয়ে স্নেহ উপচে পড়ছে।

শ্রুতি কেবল তার ওপরেই যে বন্ধু উমার মায়ের ভালোবাসা দেখেছিল তা নয়, সকলের ওপর তাঁর সমান মমত্ব ছিল।

গোয়ালে ষড়ঙ্গীরা দুধেলা গরু পুষতেন। গোরুর দেখাশোনা করত যে ছেলেটি সেও উমার মায়ের স্নেহে ভেসে যেত।

উমার কাকার ছেলেমেয়েরা তাদের সকল আবদার অভিযোগ জানাত বড়ো মা বিন্দুবাসিনীকে। ছেলেগুলো স্কুল থেকে ফিরে যে যার মায়েদের ঘরে জামা ছেড়ে ছুটে আসত বড়োমার কাছে। বড়োমা নিজের হাতে একমুঠো কি একগাল খাইয়ে না দিলে ছেলে-মেয়েদের খাওয়াই হত না। তিন ভাইয়ের পাশাপাশি তিনটে আলাদা সংসার ছিল, কিন্তু সব বাড়ির কচিকাচাদের আবদার বড়োমাকে ঘিরে।

প্রথম দিন যখন উমা শ্রুতিকে নিয়ে গিয়ে তার মার সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে বলল, আমাদের স্কুলের নতুন অঙ্কের টিচার, কাজের লোকের অভাবে নিজের বাসায় যেতে পারছে না।

BanglaBook.org

বাকিটুকু আর উমাকে শেষ করতে হয়নি। উমার মা বলেছিলেন, যতদিন না লোকের ব্যবস্থা হয় ততদিন তুমি মা আমার কাছেই থাকবে। দেখছি বয়সে তোমরা দুটিতে প্রায় এক। গল্পগুজবে আনন্দে দিব্যি তোমাদের কেটে যাবে।

শ্রুতি বলেছিল, আমার বড়ো সংকোচ হচ্ছে মাসিমা। হুট করে আপনার বাড়ি এসে পড়ে আপনাদের বিব্রত করলাম।

অবাক হয়ে বিন্দুবাসিনী দেবী কিছুক্ষণ শ্রুতির দিকে চেয়ে রইলেন। একসময়ে বললেন, আমি ঝামেলা ছাড়া থাকতে পারি না মা, আমাদের তিন ভাইয়ের সংসারে গোটা বারো ছেলেমেয়ে। ওঠাবসা শোয়া আমার এই ছোট্ট খরটার ভেতরে। হাঁড়িতে নাড়ু পাটালি তুলে রাখার জো নেই। আমাকে বলারও দরকার নেই ওদের। টুল টেনে নিয়ে তার ওপর উঠে ছোটোটাও সব বের করে চেঁচেপুঁছে খেয়ে নেবে।

আমার সংসার মা শ্রীহরির সংসার। সব হাট করে খোলা। তিনি দিচ্ছেন, তিনি ভরছেন আবার তিনি বিলোচ্ছেন। আমি শুধু তাঁর ভাণ্ডারী মা। কোনো সংকোচ রেখো না, যতদিন খুশি আমার উমার সঙ্গে থেকে যাবে।

এতখানি উদারতা শ্রুতির ভাবনারও অতীত ছিল। সে তার কলকাতার জীবনে এমন একটা অবারিত সংসার দেখেনি। তার মনে হয়েছিল এই সব বাংলা মায়ের কাছ থেকেই শরৎচন্দ্র তাঁর অমর উপন্যাসগুলির কাহিনির উপাদান সংগ্রহ করে চলেছেন। এগুলি এত সত্য বলে প্রতিটি হৃদয়ে তাঁর এমন প্রবল প্রতিষ্ঠা।

শ্রুতির মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে, চারদিকে যে উদার মনগুলির পরিচয় সে পাচ্ছে সেগুলির সৃষ্টি কি করে হল।

পরে তার মনে হয়েছে, এই সদা চলমান সমুদ্র, তার উন্মুক্ত অবারিত হাওয়া এখানকার নরনারীর মনগুলোকে এতখানি উদার করে তুলেছে।

সে দেখেছে রোজকার আহারের আয়োজনে বিশেষ কোনো আড়ম্বর নেই। আয়োজনের অভাবটুকু আন্তরিকতায় উপচে উঠেছে।

তবু মাঝে মাঝে সংস্কারাচ্ছন্ন মনে কোথা থেকে সংকোচ এসে যায়। সে তার পছন্দ করা বাসাটিতে নিজের একটা ছোটো গৃহস্থালি রচনা করতে চায়।

পুকুরপাড়ে তার নতুন বাসায় যাবার দিন বিন্দুবাসিনী দেবীর সে কি কান্না! যেন নিজের মেয়েটিকে পরবাসে পাঠাচ্ছেন। তিনি রাতে একটু ভালোমন্দ খাবার আয়োজন রেখেছিলেন। শেষ পাতে কাজু আর কিশমিশ দিয়ে তৈরি খাঁটি দুধের পায়েসটা বড়ো ভালো লেগে গিয়েছিল শ্রুতির। সে তার ভালোলাগার কথাটা বলেও ফেলেছিল। তারপর থেকে প্রতি শনিবার মেয়ে উমার হাত দিয়ে কৌটো করে পায়েস পাঠাতেন মাসিমা। তাছাড়া ঘনঘন ভালোমন্দ আয়োজন হলেই ডাক পড়ত তার খাবার।

একদিন বিন্দুবাসিনীদেবী মেয়ের মুখে খবর পাঠিয়েছিলেন তিনি শ্রুতির বাসায় আসবেন।

খবরটা পেয়ে মনে মনে যেমন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল শ্রুতি তেমনি একটু শঙ্কিতও হয়ে পড়েছিল। হাজার হোক হিন্দু মুসলমান বলে কথা। মানুষের বহুকালের সংস্কার। সবাই পণ্ডিত দিবাকর বেদান্ত পঞ্চানন অথবা সংস্কারমুক্ত রমেশচন্দ্র নন, তাই নেকজানকে নিয়ে তার সংকোচ ছিল।

তারুণ্যের ধর্মে জাতপাত উপেক্ষা হয়তো করা যায় কিন্তু সংস্কারে আবদ্ধ বয়স্ক নরনারীরা এই মিশ্রণকে কিভাবে নেবেন তা নিয়ে সংশয় ছিল শ্রুতির মনে।

বিন্দুবাসিনী দেবী এলেন, সন্ধানী চোখে সারা ঘরদোর ঘুরে দেখতে লাগলেন।

BanglaBook.org

বাঃ! তুমি তো সুন্দর সাজিয়েছ তোমার ঘরখানা! ধবধবে বিছানা, টেবিলের ওপর ফুলদানিতে গন্ধরাজ ফুল রেখেছ, সারা ঘরে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ফুলের। ওই তো সরস্বতীর ছবি, ধূপ জ্বালিয়ে দিয়েছ তাঁর দুদিকে।

শ্রুতির থুতনিতে হাত দিয়ে বললেন, তুমি আমার বিদ্যাধরী মা।

শ্রুতি অমনি বলে উঠল, মাসিমা, আমার এই ছোট্ট ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে আর একজন।

বিস্ময়ে বলে উঠলেন বিন্দুবাসিনী দেবী, কে সে?

সব সংকোচ কাটিয়ে মনে শক্তি এনে বলে ফেলল শ্রুতি, নেকজান, দারুয়ার মুসলমান পাড়ার মেয়ে ও। আমার সংসারের দেখভালের ভার ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি আমি।

শ্রুতির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করলেন তিনি। একসময় বললেন, মেয়েটির নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে, ও কি নাসরিন বিবির মেয়ে?

সবিস্ময়ে শ্রুতি বলল, আপনি কি নেকজানের মাকে চেনেন?

এতবড় একটা সাচ্চা মেয়ে তাকে চিনব না?

আপনার কি ওর সঙ্গে আগে থেকে পরিচয়?

নাসরিনকে আমি দু একবার পথ দিয়ে চলে যেতে দেখেছি, কাছে বসে কথাবার্তা হয়নি কোনো দিন। তবে গুন্ডা দোহা দারোগার হাত থেকে ও যেভাবে রাতের অন্ধকারে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেকথা এ শহরের সকলেই জানে। মেয়েটি অত্যন্ত নম্র বিনয়ী আর দুর্দান্ত সাহসী। বেচারার ভালোমানুষ স্বামীটা দোহার খপ্পর থেকে ছাড়া পেল না। সবাই জানে তাকে আন্দামানে চালান করে দিয়েছে। শাসমলসাহেব সে সময় বিলেত গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে, তিনি থাকলে ওই মিথ্যে মামলার একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়তেন।

রোজ সকালে নেকজান পুকুরের কোনায় একঘর গোয়ালার বাড়ি থেকে দুধ নিয়ে আসে। গোয়ালা নিজে দুধ দিয়ে যাবে বলেছিল শ্রুতিকে কিন্তু শ্রুতির পাশে দাঁড়িয়ে নেকজান বলেছিল, তোমাকে এতটা পথ কষ্ট করে আসতে হবে না গোয়ালার পো, আমি ভোরবেলা গিয়ে দুধ নিয়ে আসব। আমি গেলে তবে দুধ দুইবে কিন্তু।

সেই থেকে সাতসকালে ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে ঘটি নিয়ে গোয়ালার বাড়ি হাজির হয় নেকজান।

শ্রুতি অবাক হয়ে যায় যখন দেখে মায়ের বয়সি বিন্দুবাসিনী দেবী নেকজানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

মুখে হঠাৎ বলে উঠলেন, মায়ের মতো চরিত্রের বল যেন তোমার হয় মা।

নেকজানও তেমনি, আবেগে হঠাৎ টিপ করে একটা পেন্নাম ঠুকে বসল বিন্দুবাসিনী দেবীর পায়ে।

কী সংস্কারমুক্ত মহিলা। তিনি জড়িয়ে ধরলেন নেকজানকে।

আরও বললেন, তুমি যে লম্পট স্বামীটাকে মেনে নিয়ে লাথিঝাঁটা খেয়ে পড়ে থাকোনি সেজন্য আমি তোমাকে মনে মনে অনেক আশীর্বাদ করেছি মা।

শ্রুতি বুঝল, নেকজানের স্বামীগৃহ পরিত্যাগের কাহিনি এ অঞ্চলে অবিদিত নয়।

যেন নিজের মেয়ের সংসার। বললেন, দড়িতে ভালো ভালো শাড়িগুলো ঝুলিয়ে রেখেছ কেন?

শ্রুতি বলল, ধোপার বাড়ি থেকে যে শাড়িগুলো ইস্ত্রি করে এনেছে নেকজান, সেগুলো আমি ট্রাংকে গুছিয়ে তুলে রেখেছি মাসিমা।

BanglaBook.org

বিন্দুবাসিনী বললেন, সে ঠিক আছে, কিন্তু স্কুল থেকে ফিরে এসে পাটভাঙা শাড়িগুলোকে ওভাবে দড়িতে ঝুলিয়ে রেখো না। আমি একটা আলনা পাঠিয়ে দেব, তুমি তাতে তোমার পোশাকগুলো ভালো করে রেখে দিতে পারবে।

বিন্দুবাসিনী ঘরে ফিরে গিয়ে তাঁদের বাড়ির একটা পরিষ্কার আলনা বাহক মারফত পাঠিয়ে দিলেন।

বাঙালি মায়ের ঔদার্যে একেবারে অভিভূত আর অভিষিক্ত হয়ে গেল কলকাতা নগরীর সংস্কারাচ্ছন্ন, স্বার্থদীর্ন একটি বাড়ির মেয়ে।

স্কুল থেকে শুনেই এসেছিল শ্রুতি সে দারুয়া ময়দানে বীরেন্দ্রনাথ মিটিং করছেন।

শাসমলসাহেব যখন কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলেন তখন তাঁর অন্তরের গভীর থেকে সে সব কথা উচ্চারিত হয়। কংগ্রেসি স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁর বক্তৃতামঞ্চের চারদিকে গান্ধিটুপি পরে তাঁকে ঘিরে থাকেন। আর মেয়ে পুরুষ সর্বশ্রেণীর শ্রোতায় ভরে যায় দারুয়ার বিশাল প্রান্তর।

এই মানুষটির কথার ভেতর কেমন যেন একটা সম্মোহনী শক্তি থাকে। মুহূর্তে তিনি কথার জাদুতে জয় করে নিতে পারেন শ্রোতাদের অন্তর। বক্তৃতার শেষ লগ্নে মনে হয় বীরেন্দ্রনাথ যদি দেশজননীর শৃঙ্খল মোচনের জন্য দেশবাসীকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন তাহলে তারা নির্দ্বিধায় তাই করবে। দেশবাসীর এত বড়ো বিশ্বাস এই মানুষটির ওপর।

অমিত বীর্যবান প্রদীপ্ত পুরুষ, আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত এই মহান নেতা দেশজননীর চরণে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

এই আপসহীন সংগ্রামী মানুষটি উন্নত মস্তকে বিচরণ করতেন। তাঁর হৃদয় ছিল জননীর মতো। তাঁর আহ্বানে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন করেছিল দেশবাসী। কিন্তু ইংরেজ সরকারের কাছে পল্লী বাংলার এই দীনদুঃখী মানুষগুলিকে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। ইংরেজ কর্মচারীরা ক্রুদ্ধ হয়ে এইসব সাধারণ মানুষের আসবাবপত্র এমনকি সামান্য থালাবাসন পর্যন্ত পর্ণকুটির থেকে টেনে বের করেছিল। যারা ইউনিয়ন বোর্ডের খাজনা দিতে অস্বীকার করেছে তাদের গৃহস্থালির সবকিছু নিলামে চড়িয়েছিল উদ্ধত ইংরেজ কর্মচারীরা। তারা ভেবেছিল নিলাম ডেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে সেগুলি ধার্য হবে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স হিসেবে। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথের প্রেরণাই দরিদ্র মানুষকে সত্যের জন্য সর্বত্যাগী হতে শিক্ষা দিয়েছিল। একজনও সেই নীলামের ডাকে সাড়া দেয়নি।

ইংরেজ কর্মচারীরা ইউনিয়ন বোর্ড ট্যাক্স আদায়ের জন্য কম চেষ্টা চালায়নি। তারা কয়েকজনের নামে মিথ্যা একটি মামলা রুজু করে। সাতজন ফতেপুরবাসী ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স তো দেয়ইনি তার ওপর ইউনিয়ন বোর্ড সভাপতির ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে বলে সভাপতি ফৌজদারি আদালতে জানায়।

তখন শাসমলসাহেব তমলুক এবং কলকাতায় তাঁর প্রচার কার্য চালানোয় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এসব ঘটনার কিছুই জানতেন না।

এই সাতজন ফতেপুরবাসীর বেয়াদপির শাস্তি স্বরূপ একপক্ষ করে কারাদণ্ড হয়েছিল।

এই ঘটনা যখন শাসমলসাহেবের কানে পৌঁছল তখন কাঁথি জেলে বন্দি ওই মানুষগুলোর খালাস হতে আর ছ'দিন মাত্র বাকি ছিল।

এক মঙ্গলবার সকাল ছটার সময় কাঁথির জেল থেকে খালাস পাবে জেনে কাঁথির মানুষজন তাদের একটা সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিল। কারণ তারাই ছিল ইউনিয়ন বোর্ড আন্দোলনে কাঁথি মহকুমার সর্বপ্রথম বন্দি।

তাদের নিয়ে একটি শোভাযাত্রা এবং সেদিন বিকেলে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

BanglaBook.org

ওইদিন যাতে শাসমলসাহেব শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারেন সেজন্য বারবার অনুরোধ এসেছিল কাঁথিবাসীর পক্ষ থেকে।

বীরেন্দ্রনাথ এই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি জানতেন ওইদিন যে করেই হোক বন্দিদের সম্বর্ধনা সভায় তাঁকে উপস্থিত থাকতেই হবে।

তিনি তখন ছিলেন তাঁর বীরকুল কাছারিতে। কাঁথি শহর থেকে ওই কাছারি বাড়ির দূরত্ব বিশ মাইলেরও বেশি।

বীরেন্দ্রনাথ স্থির করলেন যে করেই হোক তিনি ওইদিন কাঁথি শহরে পৌঁছবেন আর ওই বন্দিদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। কিন্তু তখন প্রচণ্ড বর্ষা। ভেসে যাচ্ছিল পথঘাট। উনি পালকিতে কাঁথি যাবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু স্থানে স্থানে জলমগ্ন কর্দমাক্ত পথ দিয়ে বেহারারা এতবড় বিশালদেহী মানুষটিকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাওয়া দুরূহ বলে মনে করল।

তখন তিনি বারো মাইল দূরে দেউলী ডাকবাংলোতে তাঁকে পৌঁছে দিতে বেহারাদের অনুরোধ জানালেন। তিনি ভেবে রেখেছিলেন, যদি বেহারারা অপারগ হয় তাহলে তিনি তাঁর সঙ্গী স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে ওই কর্দমাক্ত পথ হেঁটেই কাঁথি শহরে পৌঁছবেন।

বেহারারা দেউলী পর্যন্ত যেতে রাজি হওয়ায় শাসমলমশায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কারণ তিনি জানতেন দেউলীর ডাকবাংলোর পাশে দু-চারখানা গরুর গাড়ি মজুত থাকে। সেই গাড়ি করে তিনি কাঁথি পৌঁছবেন।

পথে দুর্যোগের জন্য সন্ধ্যার অনেক পরে তিনি দেউলীতে পৌঁছেছিলেন। সেখানে কিন্তু তিনি গরুর গাড়ি পেলেন না। সেখান থেকে তাঁকে ক্লান্ত বেহারারা আরও দুমাইল পথ এগিয়ে ইসলামপুরে পৌঁছে দিল।

তখন রাত্রি দশটা। তিনি ক্লান্ত বেহারাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে সন্তুষ্ট করে বললেন, তোমরা আমার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করলে তাকে অর্থ দিয়ে দূর করা যাবে না। তোমাদের কথা আমি চিরদিন মনে রাখব।

সেই দুর্যোগের রাতে তিনি মাত্র দু-চারজন স্বেচ্ছাসেবীকে নিয়ে কর্দমাক্ত পিচ্ছল পথে দেড় মাইল পথ অতিক্রম করে পিছাবনিতে পৌঁছলেন।

পিছাবনিতে একটি খাল রয়েছে। একটি ডিঙি নৌকো প্রতিদিন যাত্রীদের পারাপার করে। কিন্তু সে রাতে পিছাবনির খাল প্রায় দ্বিগুন চওড়া হয়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড জলস্ফীতি হয়েছিল সেই খালে। পারাপারের নৌকো উধাও। আর তাছাড়া এত গভীর দুর্যোগের রাতে মাঝিকে পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল।

দেশের সেবায় যিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর কাছে জীবনের মূল্য ছিল তুচ্ছ। তিনি দেশবাসীর কাছে ইউনিয়ন বোর্ড-ট্যাক্স বর্জনের কথা বলেছিলেন, আর তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই যে মানুষগুলি বন্ধনদশা স্বীকার করল, তাঁদের মুক্তির দিনে তিনি তাঁদের পাশে থাকবেন না—এ হতেই পারে না।

তিনি স্বেচ্ছাসেবীদের বললেন, তোমরা কি প্রস্তুত? আমি সাঁতরে নদী পার হতে চাই।

স্বেচ্ছাসেবী যুবকেরা বীরেন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে মৃত্যুবরণ করতেও রাজি ছিল।

তারা সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমরা এই নদীতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত।

সহসা বিদ্যুৎ চমকে দেখা গেল আলপথ ধরে দুটি লোক এগিয়ে আসছে। তারা অল্প সময়ের ভেতরেই এসে পৌঁছল।

বীরেন্দ্রনাথকে রাস্তার ওপর দেখতে পেয়ে তারা প্রণাম করে বলল, আমরা এই অঞ্চলেরই মানুষ, সারা দেশের জন্যে আপনি কাজ করছেন, আপনাকে কি এই বিপদের মুখে আমরা ঠেলে

BanglaBook.org

দিতে পারি? আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমরা দেখছি পারাপারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

আশ্চর্য! সেই গভীর রাত্রে বিদ্যুৎ বিদীর্ণ আকাশের তলায় ওই দুটি মানুষ একটি নৌকো নিয়ে পারঘাটে হাজির হল। তারা বীরেন্দ্রনাথকে সেই বর্ষাস্ফীত নদী পার করে দিল।

বীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, এই মানুষগুলি ঈশ্বর প্রেরিত।

শোনা যায় মেদিনীপুরের আর এক মহান সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মায়ের ডাকে স্ফীত দামোদর নদ ঝাঁপ দিয়ে পার হতে চেয়েছিলেন।

প্রায় দশ মাইল দীর্ঘ কর্দমাক্ত পথ পেরিয়ে কাঁথিতে পৌঁছেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ।

তিনি সভায় বন্দিদের কণ্ঠে মাল্যদান করেছিলেন। অসাধারণ সেই বাগ্মীপুরুষ সেদিন সভায় বলেছিলেন, তোমরা সত্যের জন্য, দেশজননীর জন্য অসীম দুঃখ বরণ করতে প্রস্তুত। তোমরা আজ শত শত যুবক যুবতীর প্রেরণাস্বরূপ। আমি দেখতে পাচ্ছি, একে একে সমস্ত বন্ধ দ্বার খুলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সূর্যোদয় দেখব আমরা। সেই শুভলগ্ন আসন্ন। সেই প্রভাতের দূত হয়ে এসেছ তোমরা।

মুক্ত জেলবন্দিরা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলল, আপনার জন্যে আমরা সমস্ত দুঃখ কষ্ট বরণ করতে রাজি আছি।

বীরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমার জন্যে নয়, বল—দেশজননীর জন্য।

স্কুল ছুটির পর পথ দিয়ে যেতে যেতে সেদিন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শ্রুতি। এই মানুষটির অনেক কাহিনি সে শুনেছিল কাঁথিবাসীর কাছ থেকে। কিন্তু সেদিন সে মুখোমুখি মানুষটিকে দেখে ভেবেছিল সত্যই ইনি স্বাধীনতা সংগ্রামে সেনাপতি হওয়ার যোগ্য। এঁর পরিচালনায় একদিন উত্তাল হয়ে উঠবে কেবল কাঁথিবাসী নয় সমস্ত দেশের সংগ্রামী জনতা।

মাঝে মাঝে শ্রুতির মনে হত চন্দ্রামণি বালিকা বিদ্যালয়ের অগণিত ছাত্রী আর শিক্ষিকারা এক পরিবারভুক্ত। তার মনে হত এটাই তার আপন গৃহ। এখানকার এক একান্নবর্তী পরিবারে সে বাস করছে।

পরীক্ষা শেষে যখন ছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে চলে যেত তখন শিক্ষিকাদের প্রণাম করতে এসে তাঁদের জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না তাদের। যেন নিজবাস থেকে কোনো সুদূর পরবাসে চলে যাচ্ছে তারা।

ইউনিভার্সিটির রেজাল্ট বেরোবার সময় ছাত্রীদের যত উদ্বেগ, তাদের থেকে কম উদ্বিগ্ন ছিলেন না শিক্ষিকারা।

একদিন কমলা নামে একটি মেয়ে তার মাকে নিয়ে হাজির হয়েছিল তার নন্দকুমার পুকুরপাড়ের বাসায়।

কমলার মা চোখের জল ফেলে বলেছিল, সে বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে মেয়েটিকে লেখাপড়ার টাকা জোগায়। সব বিষয়ে পাশ করে যায় কমলা কিন্তু অঙ্কে সে পাশ করতে পারে না। সামনে তার শেষ পরীক্ষা, সেখানে অঙ্কে পাশ না করতে পারলে বড়ো দিদিমণিরা বলেছেন, তার পক্ষে আর ম্যাট্রিক পাশ করা সম্ভব হবে না।

শ্রুতি জানত মেয়েটি বেশ ঠান্ডা প্রকৃতির। সে পড়াশোনাতে যে খুব অমনোযোগী তা মনে হত না। তবে অঙ্ক বিষয়টাতে সে সত্যিই কাঁচা ছিল। বাড়ি থেকে কোনো দিনই সে অঙ্ক কষে আনত না। বিধবা মা যার ধান ভেনে সংসার চালায়, তার পক্ষে মেয়েকে পড়া দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রুতি বলল, রোববার বিকেলে আমার কাছে এসে তুমি অঙ্ক কষবে। একবার মাথায় যদি অঙ্ক ঢুকে যায় তাহলে সারাজীবন তাকে আর ছাড়তে পারবে না। ব্যাপারটা কঠিন নয়, ভয়েরও নয়। কেবল একমনে অনুশীলন করে যেতে হবে। তুমি আমার কাছে বসে অঙ্ক কষবে, দেখবে সব ভয় ভেঙে গেছে।

BanglaBook.org

কমলার মা বলল, আমি গরিব তবু কিছু আমি আপনাকে দিতে চাই। বলুন আমি কী দেব আপনাকে?

শ্রুতি বলল, আপনি আমের আচার তৈরি করতে পারেন?

কমলার মা বলল, মধুসূদন জানা বাবুর বাড়িতে আমি কাজ করি।

শ্রুতি তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, নীহার পত্রিকার সম্পাদকমহাশয়ের বাড়িতে তুমি কাজ করো?

হ্যাঁগো দিদিমণি, তেনার বাড়িতে। সেখানে আমি পিঠে তৈরি করি। আমের অনেক রকম টকমিষ্টি আচার তৈরি হয়। সে সব আমাদের দু-তিনজন কাজের মেয়েকে দিয়ে তৈরি করান গিন্নিমারা।

শ্রুতি বলল, আমি আমের আচার খুব ভালোবাসি গো কমলার মা। তুমি আমাকে এক বয়েম আমের আচার দেবে, টকমিষ্টি হলে ভালো হয়। তোমার মেয়ের অঙ্কের ভার আমার ওপর রইল।

প্রথম যেদিন এল কমলা সেদিন সঙ্গে এক বয়েম-আমের আচাব নিয়ে এল।

শ্রুতি একবিন্দু মুখে ফেলে বলল, কী ভালো—কী ভালো।

টেস্ট পরীক্ষায় অঙ্কে লেটার পেল কমলা। সবাই তো অবাক। শ্রুতি ওকে অঙ্ক পড়ার কথাটা গোপন রাখতে বলেছিল।

সারা টিচার্সরুম জুড়ে কমলার এই কৃতিত্বের কথা মুখে মুখে ঘুরে ফিরতে লাগল।

ফাইনাল পরীক্ষাতেও লেটার পেল কমলা। তখন সকলের সঙ্গে শ্রুতিও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিল, কিন্তু তখনও বলেনি যে সেই তাকে অঙ্কের ভয়ংকর বৈতরণিটা পার করে দিয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণিতে এসে ভর্তি হল একটি মেয়ে। দইসাই থেকে তার বাবা তাকে রোজ স্কুলে দিয়ে যায়। মেয়েটির নাম সীতা। ওর বাবা ধোপার কাজ করে। পিঠের বিরাট পোঁটলাটা স্কুলের দাওয়ায় নামিয়ে রেখে মানুষটি দুদণ্ড বিশ্রাম নেয়। আবার চারটেতে স্কুল ছুটি হলে সীতার বাবা খালি হাতে হাজির হয়। তখন সব কাচাকাপড় তার বাড়ি বাড়ি বিলি হয়ে যায়।

বালিকা সীতার দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। তার চোখ মুখ গড়ন যেন কোনো শ্রেষ্ঠ ভাস্করের তৈরি। চাঁপাফুলের মতো গায়ের রং। এক ঢেল মাথার চুল। কোজাগরির লক্ষ্মীপ্রতিমা যেন।

সীতার বাবার আকৃতির সঙ্গে কোনো মিলই নেই সীতার।

পড়া না পারলে দিদিমণিরা বকুনি দেন। পদ্মফুলের মতো সীতার নিটোল গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। বড়ো করুণ চোখে সে চেয়ে থাকে সেই দিদিমণির দিকে।

সহকারী প্রধানশিক্ষিকা নমিতাদির সঙ্গে শ্রুতির বড়ো আনন্দমধুর সম্পর্ক।

নমিতাদি ইংরেজি পড়ান। তিনি বয়সে কিছু বড়ো শ্রুতির থেকে। তবু দুজনের বন্ধুত্বে কোথাও আটকায়নি। মাঝে মাঝে তিনি শ্রুতির এই নির্জন নিবাসে আসেন। তখন দুজনে নানা গল্প কথায় মেতে ওঠেন। নতুন নতুন জলখাবার তৈরিতে ওস্তাদ নমিতাদি। কোনো দিন মুড়ি ফুলুরি, কোনো দিন বা মাছের চপ দিয়ে তারা সান্ধ্য জলযোগ সারেন।

নমিতাদি চলন্ত বিশ্বকোষ। দুনিয়ার প্রায় সব খবরের সঞ্চয় তাঁর ভেতর।

একদিন কী করে যেন সীতা মেয়েটির প্রসঙ্গ উঠে পড়ল।

নমিতাদি কতক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন শ্রুতির মুখের দিকে। তিনি সম্ভবত পড়ে নিলেন শ্রুতি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য।

বললেন, আজ নয়, অন্য একদিন এ প্রসঙ্গে আলোচনা হবে।

সেই অন্যদিনটি এসে পড়ল এক কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর রাতে।

ওই রাতটি নমিতাদির সঙ্গে কাটাতে চেয়েছিল শ্রুতি।

BanglaBook.org

নমিতাদি সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলেন। হঠাৎ একটা পরিকল্পনা জেগে উঠল শ্রুতির মাথায়। সে বলল, নমিতাদি, আজ জাগরণের রাত্রি। আকাশে পূর্ণ চাঁদ আর চরাচর জেগে থাকবে। উত্তাল সমুদ্রও আজ তার সংগীত শোনাবে। নেকজানকে নিয়ে আমরা যদি আজ সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি, তুমি কি খুব আপত্তি করবে?

এই প্রথম নমিতাদি শ্রুতিকে তুই বলে সম্বোধন করলেন।

তোর মাথায় তো দেখছি দারুণ সব প্ল্যান গজিয়ে ওঠে শ্রুতি।

হেসে বলল শ্রুতি,—আমার প্ল্যানটা তুমি অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা বললে না তো?

কোনো বাধা নেই, তবে রাতের খাবার কী হবে?

নেকজানের রান্না করা খাবার খেতে কি তোমার খুব আপত্তি?

একটুও না। আমাদের এ অঞ্চলে অনেকদিনই হিন্দু বাড়ির ছেলেমেয়েরা মুসলিমদের পরবে খেয়ে আসে। তবে আমি দেখেছি কাঁথি মহকুমা থেকে যত দূরে যাব জাতপাতের বাঁধনটা তত জোর চেপে বসতে দেখা যাবে।

শ্রুতি বলল,—নমিতাদি, এই মহকুমার মানুষগুলো এতখানি সংস্কারমুক্ত হল কি করে?

একটুও না ভেবে নমিতাদি বলল,—কাঁথিবাসী মানুষেরা তাদের জাতপাতের সব সংস্কার ভাসিয়ে দিয়েছে ওই বাহার দরিয়ার জলে। সমুদ্রই ওদের শিক্ষক।

শ্রুতি বলল,—নেকজানের হাতে কিশমিশ আর কাজুবাদাম সহযোগে আলুর দম তৈরি। কাঁটা বেগুনের চাকা চাকা ভাজা করেও রাখা হয়েছে। ভেবেছিলাম, তুমি এলেই লুচি ভাজব। এখন তাহলে লুচিটা ভেজে ফেলা যাক, কি বল?

এ আবার বলতে। তোর সেই আমের টকমিষ্টি আচারটা আছে তো?

শ্রুতি বলল,—তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, নেকজান সব তৈরি আর গোছগাছ করে নেবে।

ওরা ঘরে তালা দিয়ে তিনজনে রাত দশটা নাগাদ বেরিয়ে চলে গেল জুনপুট সমুদ্রের দিকে।

কিছুটা এগিয়েই শ্রুতি মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠল,—ইস, কাজুবাদামের বরফিটা আনতে এমন ভুল হয়ে গেল।

নেকজান বলল,—খাবার পাতে পেলেই তো হল।

তুই এনেছিস?

স্কুল বাজার থেকে ফেরার পথে মা এনে রেখে গেছে।

শ্রুতি বলল,—ফলার আমাদের দারুণ জমবে নমিতাদি।

তুই সারাক্ষণ শুধু খাবার কথা ভেবে চলেছিস তাই না শ্রুতি?

শ্রুতি বলল,—তোমার গলায় আজ গান শুনব নমিতাদি, জ্যোৎস্নারাতের গান, নীলসাগরের গান।

তুই কি আমাকে খুব বড়ো গায়িকা ঠাওরালি?

যে কোনো ঋতুতে যে কোনো পরিস্থিতিতে ভিন্ন ঋতুর গানও গাওয়া যায়। যে গান মন ছুঁয়ে যায় সে গান কোনো ঋতুর বাধা মানে না, কোনো পরিবেশকে সমীহ করে থমকে দাঁড়ায় না।

ওরা ধানের খেতের শিশির ছুঁয়ে ছুঁয়ে জুনপুটের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে। বালিয়াড়ি পেরিয়ে সহজ রাস্তাটায় আর গেল না।

কোজাগরিতে গ্রামবাংলা কতখানি জেগে আছে তাই দেখতে দেখতে চলতে লাগল ওরা। কোথাও ধানখেতের ওপারের গ্রাম থেকে কাঁসর ঘণ্টা ঢোলকের সম্মিলিত বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে। জমিয়ে কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো হচ্ছে সেখানে।

দু এক জায়গায় দেখা গেল গ্রামের ছেলেমেয়েরা আলপথ দিয়ে গান গাইতে আর খুশি ছড়াতে ছড়াতে চলেছে।

BanglaBook.org

শ্রুতি বলল,—আমি ভাবতে পারি না নমিতাদি ছেলেমেয়েরা এখানে এমন করে আনন্দ উৎসবে মাতে! কলকাতা শহরেও যুবকযুবতীদের মেলামেশার এমন পরিবেশ সচরাচর পাওয়া দুর্লভ।

ওরা পথে আসতে আসতে প্রতিটি গ্রামকে জেগে থাকতে দেখল। কোথাও সংকীর্তনের বাজনা বাজছে, কোথাও শোনা যাচ্ছে দেবী লক্ষ্মীর জয়ধ্বনি।

বড়ো দুটো বাঁধ ডিঙিয়ে বিশাল দুটো জলাধারের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে ওরা একসময় এসে গেল সমুদ্রের ধারে।

সামনে তাকিয়ে দেখল কী অভূতপূর্ব আনন্দলীলা চলেছে সমুদ্রের বুকে। ঢেউয়ের ওপর কে যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে জ্যোৎস্নার কুচি।

নমিতাদির মনে খুশির বাঁধ ভেঙেছে। দু হাত ওপরে তুলে সাগর পাখিদের মতো ডানা মেলে বালুর জমিনে দৌড়োতে লাগল নমিতাদি। শ্রুতি তাকে অনুসরণ করল।

ইচ্ছে থাকলেও তাদের সঙ্গে যেতে পারল না নেকজান কারণ থলে ভর্তি খাবার আর পাত্রগুলো তার কাছেই রয়ে গেছে।

নেকজান দেখল তার পাগল দুটি দিদিমণি সমুদ্রতীর ধরে অনেকটা দূর গিয়ে একটা বালুর ঢিবির ওপর উঠে দাঁড়াল। তাদের চারদিকে ছোটো ছোটো বনঝাউয়ের গাছ।

নেকজান এগিয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে। সময়ে খাবার কথা না ভুলে যায়।

নেকজান যখন বালির ঢিবিটার কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে গান ধরেছে নমিতাদি।

"(ওই) মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে;
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, 'আয় চলে আয়',
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে"
বলে "আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা, হেথা নাইকো মৃত্যু নাইকো জরা,
হেথা বাতাস গীতিগন্ধ ভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে;
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে।"

মুগ্ধ হয়ে শ্রুতি গান শুনল নমিতাদির।

গান গাইবার সময় এমন সুরের সাগরে ডুবে যেতে সে তার পরিচিত আর কোনো গায়ককে দেখেনি।

কতক্ষণ পরে ঘোর কাটল নমিতাদির। এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চোখমুখের ছবি।

বলল,—তুই জ্যোৎস্না আর সমুদ্রের গান শুনতে চেয়েছিলি, এ গানে দুটোই পেয়ে গেলি।

মহাসিন্ধুর ওপারের সংগীত শুনলি আর নীলাকাশে চিরজ্যোৎস্নাও দেখলি।

আবেগে নমিতাদির কোমরটা জড়িয়ে ধরে শ্রুতি বলল,—সত্যিই নমিতাদি, তুমি নারীকুলের সম্পদ।

তাই বুঝি, বলে শ্রুতির পিঠে আলতো করে একটা চাপড় লাগাল নমিতাদি।

হু হু করে জ্যোৎস্না ভাঙা একটা হাওয়া বয়ে এল সমুদ্রের দিক থেকে। দুই কন্যার এলোচুল হাওয়ায় উড়ছে।

শ্রুতি বলল,—এবার এসো আমরা বালির ওপর বসে গল্প জমাই।

বনঝাউ-এর অনেকগুলো গাছ ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। কোনো কোনোটা কোমর অবধি কোনোটা-বা মানুষ সমান উঁচু। সারাক্ষণ শনশন একটা শব্দ উঠছিল।

নমিতাদি, এবার সীতার গল্পটা শুরু হোক।

BanglaBook.org

বড়ো গোপনীয় রে ভাই। সে এক রহস্যে ভরা গল্প।

বালিয়াড়ির নীচে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসেছিল নেকজান। দিদিমণিদের খাবার সময় হয়ে গেছে ভেবে সে ঘাড় কাত করে ওপর দিকে তাকাল।

চোখে পড়ে গেল শ্রুতির। সে হাতের ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলে গল্প শোনার আগ্রহে নমিতাদির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

গ্রামের নাম ধর সমুদ্রপুর। ওখানকার জমিদার ভুবনেশ্বর সামন্ত কয়েকখানা পরগণার অধীশ্বর ছিলেন। জমিদার হলেও তাঁর ঠাটবাট ছিল রাজার মতো। লোক লশকর, পাইক বরকন্দাজ, প্রজাদের আনাগোনায় গড়খাইওয়ালা বিশাল পুরী সবসময় গমগম করত।

জমিদার ভুবনেশ্বর তাঁর জীবদ্দশায় একটি উইল করেন। উইলে বলা ছিল, এ বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্ররাই কেবল জমিদারির মালিক হবে। একাধিক পুত্র থাকলে জ্যেষ্ঠ ছাড়া প্রত্যেকেই গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা পাবে।

উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সন্তানদের বিবাহ হবে। তারা কেবল পিতৃগৃহের পর্যাপ্ত হিরা মণিমাণিক্য ও স্বর্ণের অলংকার লাভ করবে।

কোনো পুরুষ সন্তান না থাকলে সমস্ত স্টেটের আয় প্রভু চন্দনেশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করা হবে।

ভুবনেশ্বর সামন্তের চতুর্থ পুরুষ, জগদ্দুর্লভ সামন্ত যখন সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তখন তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা।

জগদ্দুর্লভের সহোদর ভাই, যাঁরা উইল মতো অধিকার পেয়েছিলেন, তাঁরা রাজ-এস্টেট দখলের চক্রান্ত শুরু করে দিলেন।

এখন অপেক্ষা কেবল রাত্রির আগত সন্তানের জন্য।

কন্যা সন্তান হলে সে উইলের নিয়ম অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে না কিন্তু পুত্রের জন্ম হলে সে সম্পত্তির অধিকার লাভ করবে।

এ অবস্থায় রাজগৃহের বিচক্ষণ দেওয়ান রানির সঙ্গে পরামর্শে বসলেন।

তিনি রানিকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে তাঁর দুরবস্থার অন্ত থাকবে না।

রানি বললেন,—এ তো বিধাতার হাতে নায়েবমশাই। মানুষ কী করতে পারে!

বৃদ্ধ নায়েব বুঝিয়ে বললেন,—মা আপনি জানেন আপনার দুই দেবর কিরকম ধূর্ত এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ। আমি খবর পেয়েছি রাজগৃহে আগত সন্তানের দিকে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। আমাদের কর্মচারীদের ভেতর তারা অনেককেই হাত করে নিয়েছে। আপনি সুপুত্রের জননী হলে কোনো প্রশ্নই উঠবে না। কিন্তু কন্যা জন্মালে একটা উপায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সে ভার আমার ওপর কি নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে পারবেন?

রানি বললেন,—আপনি শুধু আমাদের এ এস্টেটের দেওয়ান নন, আপনি আমার পিতৃতুল্য। সুতরাং এস্টেটের কল্যাণে আপনি যা করবেন আমি তা সর্বান্তকরণে স্বীকার করে নেব।

দেওয়ানমশাই গোপনে গ্রামগ্রামান্তে চর নিযুক্ত করলেন।

যে সব মহিলারা রানির সঙ্গে একই সময়ে সন্তানের জন্মদান করবে তাদের ভেতর থেকে একটি পুত্রসন্তানকে তুলে আনতে হবে বহু অর্থের বিনিময়ে। তার কাছে দিতে হবে রানির কন্যাসন্তানটিকে।

একসময় ঘটনা তাই ঘটল. এক ঝড়ের রাতে, অমাবস্যার অন্ধকারে রানির ঘরে এক কন্যার আবির্ভাব হল।

BanglaBook.org

বৃদ্ধ নায়েব নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে রানির আঁতুড়ঘরে এনে রেখেছিলেন। কন্যা ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে নায়েবের স্ত্রী তাকে কোলে করে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর স্বামীর হাতে।

বাইরে অপেক্ষা করছিল সংবাদবাহী চর।

চর খবর এনেছিল সে রাতে তিনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাব ভেতর দুটি কন্যা সন্তান। কেবলমাত্র এক রজকের ঘরে একটি পুত্র জন্মলাভ করেছে।

বহু অর্থের বিনিময়ে রজকের গৃহে রাজকন্যাটিকে রেখে তার পুত্রকে নিয়ে আসা হল, রাজগৃহে।

শ্রুতি বলল,—সীতার বাবাও তো রজক। আমাদের সীতাই কি সেই ভাগ্যহত রাজকন্যা?

নমিতাদি বললেন,—অসম্ভব বুদ্ধিমতী তুই, —সঠিক তোর অনুমান।

সীতা তার দুর্ভাগ্যের কথা জানে নমিতাদি?

এখনও পর্যন্ত নয়, পরে কী হবে জানি না।

উৎসুক শ্রুতি নমিতাদির হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল,—তুমি এত কথা জানলে কী করে নমিতাদি?

সেটাও কি তোকে বলতে হবে?

অভিমানের সুরে শ্রুতি বলল,—বলা না বলা তোমার ইচ্ছের উপরই নির্ভর করছে।

নমিতাদি সত্যিই ভালোবাসেন মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে শ্রুতিকে।

এতটাই যখন বললাম তখন আমার জানার উৎসটাও বলছি। ওই জমিদারবাড়ির নায়েব আমার বড়ো মেসোমশাই। তিনি এ ঘটনাটা সবার কাছে গোপন রাখলেও আমার মাকে বোনের মতো ভালোবাসতেন বলে, শুধু তার কাছেই বলেছিলেন। ওঁরা জানতে পারেননি যে আমি আড়ালে থেকে ওঁদের কথাগুলো শুনেছি। তুই কাউকে না বললে এ কাহিনি তোর আর আমার ভেতর থেকে যাবে।

সেদিন সমুদ্রের ধারে বসে নেকজানের দেওয়া খাবার খেতে খেতে শ্রুতির মনটা বড়ো ভারী হয়ে উঠছিল। সে খেতে খেতে বলল,—ভাগ্যের কী বিচিত্র খেলা নতিদি। আর মেয়েটার নাম যিনিই রাখুন তিনি একটি সার্থক নামই দিয়েছেন। সীতা জনমদুখিনি এক নারী।

নমিতাদি আনমনে বললেন,—হয়তো দেখবি ওই পরমাসুন্দরী মেয়েটিকে কোনো রাজপুত্র বধূ করে তার ঘরে তুলে নিয়ে যাবে।

ওরা সেদিন বালির পাহাড় ডিঙিয়ে মাথায় শরতের শিশির মেখে ঘরে ফিরে এসেছিল।

পরের দিন থেকে কী যেন হয়ে গেল শ্রুতির। তার চোখ কেবলই ফিরে ফিরে দেখতে চাইত সেই ভাগ্যহীনা মেয়েটিকে।

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সারা মেদিনীপুর ছিল একটা সংগ্রাম-ভূমি।

শ্রুতি আসার আগে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সারা মেদিনীপুর।

সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়ে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইনের প্রতিবাদে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে জনতা মুখর হয়ে উঠেছিল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ওই দিনটি সমস্ত বাঙালিকে বাঁধা হয়েছিল রাখিবন্ধনের দ্বারা। বাঙালিকে আইনের বলে পৃথক করা চলবে না। তাই রাখির একই মিলনসূত্রে সেদিন সমস্ত বাঙালি বাঁধা পড়েছিল। রাখিবন্ধনের মন্ত্র ছিল,—'ভাই ভাই এক ঠাঁই'। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সেদিন

BanglaBook.org

সূর্যোদয়ের আগে স্নান করে একে অপরের হাতে হলুদ রঙের রাখি বেঁধে দিয়েছিল। সেদিন কাঁথি মহকুমার পথেঘাটেও সেই উন্মাদনা, সেই একত্বের বন্ধনদৃশ্য দেখা গিয়েছিল।

ইংরেজরা জেনেছিল মানসিক দিক থেকে বাঙালি জাতি অত্যন্ত সংঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী। তাই প্রধানত হিন্দু মুসলমানের ভেতরে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য বঙ্গভঙ্গ আইন প্রবর্তন করেছিল তারা।

কিন্তু সংঘবদ্ধ বাঙালি সেদিন রুখে দিয়েছিল ইংরেজদের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত।

এর ফল ফলেছিল সুদূরপ্রসারী।

সেদিন দেশজুড়ে ঘরে ঘরে অরন্ধনের ব্রত গ্রহণ করা হয়েছিল। আকাশ বাতাস কেঁপে উঠেছিল বন্দেমাতরম্ সংগীতের ধ্বনিতে।

যুবক যুবতীরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি গান গাইতে গাইতে সেদিন পথ প্রান্তর, জলস্থল, অন্তরিক্ষ ভাবের প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়েছিল!

'বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।

বাংলার ঘর, বাংলার হাট
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক হে ভগবান।

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক হে ভগবান।

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক,
এক হউক হে ভগবান।'

BanglaBook.org

এই স্বর্গীয় ভাবের স্ফুরণে ভাই এসে দাঁড়াল ভাইয়ের পাশে। তাদের কেউ পারবে না বিচ্ছিন্ন করতে।

এই বঙ্গভঙ্গের সূত্র ধরে ব্যাপক স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ বইতে লাগল।

স্বদেশি শিল্প তৈরির দিকে মন দিল দেশবাসী। দিকে দিকে গড়ে উঠল তাঁতশিল্প। বিলিতি সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্যাগ করে স্বদেশি তাঁতির হাতে বোনা ধুতি শাড়ি পরতে লাগল জনতা। ঘরে ঘরে বহু নতুন তাঁতের সৃষ্টি হল।

বিলিতি লবন আর ধবধবে দানাদার চিনির জায়গায় এল লালচে গুড়। নির্বাসিত হল বিলিতি প্রসাধন দ্রব্য। ঘরে ঘরে ভাঙা শুরু হল রেশমি চুড়ি। চারকায় কাটা মোটা সুতোর কাপড় পরতে লাগল সকলে।

সবার কণ্ঠে রজনীকান্তের গান,—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই।
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ওই পরের দোরে ভিক্ষা চাই।'

এরপর তৈরি হল স্বদেশি শিল্প ভাণ্ডার। যারা যারা দোকানে বিলিতি সামগ্রী রাখত তাদের দোকান থেকে সে সব বের করে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হল।

গ্রামের মধ্যে কোনো ফাঁকা জায়গায় বিলিতি বস্ত্র এনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। যে সব মেয়েদের মূল্যবান বিলিতি শাড়ি থাকত তারাও সমস্ত মায়া ত্যাগ করে সেগুলিকে আগুনে আহুতি দিতেন।

এরপর দিকে দিকে গ্রামে গ্রামে সৃষ্টি হতে লাগল বহু আখড়া। সেগুলি হল যুবকদের শরীর চর্চার কেন্দ্র।

মেদিনীপুর শহরে মিঞাবাজারের আখড়া, তমলুক শহরে রক্ষিতবাড়ির আখড়া আর কাঁথি শহরে 'বন্দে মাতরম্' গ্রাউন্ডের আখড়া, শহিদ ক্ষুদিরামের প্রেরণা-সঞ্জাত মুগবেড়িয়ার আখড়া প্রভৃতি শতশত যুবকের দেহ-মনকে লৌহকঠিন করে তুলেছিল।

নমিতাদির পুরো নাম ছিল নমিতা নন্দ। তাঁর বাড়ি ছিল কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত রামনগরে।

মুগবেড়িয়া ভগবানপুর থানার একটি গ্রাম। সেখানে প্রসিদ্ধ নন্দ পরিবারের জমিদার দিগম্বর নন্দ ছিলেন মনেপ্রাণে একজন বিপ্লবী। তাঁর আখড়ায় কিশোর যুবকেরা লাঠিখেলা, ছোরা খেলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। সেখানে সমাদরে আশ্রয় পেয়েছিলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম। তিনি কিছুদিন ওই অঞ্চলের কিশোরদের দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। নিজে কিশোর হয়েও তিনি কিশোরদের ওপর বিপ্লবের আগুন ছড়াতেন।

সেই মুগবেড়িয়ার সংলগ্ন গ্রাম ভূপতিনগরে ছিল নমিতাদির মামারবাড়ি। সেই সূত্রে তিনি বিপ্লবী ক্ষুদিরাম এবং তাঁর সঙ্গীসাথিদের সম্বন্ধে অনেক কথা জেনেছিলেন। শ্রুতি নমিতাদির মুখে বিপ্লবের নানা কাহিনি শুনত। তার মনে হত, বীরেন্দ্রনাথ এবং ক্ষুদিরাম প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সারা মেদিনীপুরকে ঘিরে এক জ্বলন্ত অগ্নিবলয় সৃষ্টি করে চলেছেন।

এক রোববার ঘরের দাওয়ায় চেয়ার পেতে বসে শ্রুতি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসখানা পড়ছিল। সামনে বিশাল পুষ্করিণী। তার ওপর দিয়ে প্রথম শীতের হাওয়া বয়ে এসে তার অনাবৃত মুখে শিরশিরে একটা অনুভূতির সঞ্চার করছিল। সঙ্গে সঙ্গে এক চিলতে উপভোগ্য রোদ্দুর আমগাছের পাতার আড়াল দিয়ে মাঝে মাঝে এসে পড়ছিল তার মুখে।

এমন সময়ে পাশের রাস্তায় এক মেয়ের গলায় আওয়াজ শুনতে পেল সে,—দিদিমণি, খেজুর রস লিব গো?

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাল শ্রুতি। খদ্দরের চাদরের একপ্রান্ত লুটিয়ে পড়ল দাওয়ায়। সেটিকে গায়ে জড়াতে জড়াতে হাতছানি দিয়ে মেয়েটিকে ডাকল নিজের বাসায়।

বউটি তারই বয়সি কিংবা দু এক বছরের ছোটোও হতে পারে। হাতে ধরা শিকেতে ঝুলছে একটা মাটির হাঁড়ি।

অবাক হয়ে তরুণীকে দেখতে লাগল শ্রুতি।

এক একটা সৌন্দর্য আছে যা স্থির হয়ে ফুলের মতো ফুটে থাকে। ভোমরা আকৃষ্ট হয়ে সেই ফুলের দিকে ছুটে যায়। তরুণী পদ্মমণির মুখখানা তেমনি একটা ম্যাগনোলিয়া ফুলের মতো ফুটে আছে।

BanglaBook.org

দেহখানা সুঠাম, একঢল কালো চুল কাঁধের ওপর দিয়ে প্রপাতের মতো ঝরে পড়েছে পিঠের ওপর।

শ্রুতি মেয়েটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না।

পদ্মমণি হেসে বলল,—কি দেখছ গো দিদিমণি?

তোমাকে দেখছি।

হি হি করে হেসে পদ্মমণি বলল,—গরিব-গুর্বার ঘরের বউ, তাকে দেখিবার কি অছি গো।

এবার সম্বিত ফিরে পেল শ্রুতি। সে চেঁচিয়ে ডাকল নেকজানকে দাওয়ায় একটা আসন পেতে দিয়ে যা তো।

ততক্ষণে হাতের কলসিটা দাওয়ায় বসিয়ে রেখে ফুঁ দিয়ে মাটির দাওয়ার অদৃশ্য ধুলো উড়িয়ে ধপ করে বসে পড়ল পদ্মমনি।

ভেতর থেকে আসন নিয়ে এসে দাঁড়াল নেকজান।

দুজনের চোখাচোখি হতেই পদ্মমনি জানতে চাইল, তুমি দিদিমনির ঠাই কাজ করো?

নেকজান হেসে মাথা নাড়ল।

পদ্মমনির চোখমুখের চেহারা মুহূর্তে বদলে গেল। সে বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল—নেকজানের মায়ের জুড়ি পাবে না দিদিমনি। চুপচাপ থাকে কিন্তু ভিতরে জ্বলছে আগুন। নিজে খটিকি খায়, এক পইসা কুনোদিন কারু কাছে চায়নি। নেকজান হইছে মার মতো। ন্যায়-অন্যায় বোধ খুব। বরের অত্যাচার সইকি ভাতকাপড়ের লাগি পড়ি রইলনি। গতর খটিকি খাবে তবু অপমান সইবে নি। বাহাদুর আছে নেকজান।

শ্রুতির হঠাৎ পাওয়া মেয়েটিকে ভারি পছন্দ হয়ে গেল। সে বলল,—কোন গাঁয়ে তোমার বাড়ি গো?

পেছনে ফিরে জুনপুট রাস্তার দিকে আঙুল তুলে বলল,—সরষেবেড়িয়া গেরামে আমার শশুরবাড়ি গো দিদিমণি।

তুমি বুঝি শীতকালের ভোরে রস বিক্রি করো?

আমার মানুষটা শিউলির কাজ করে। গাছের ডালপালা কেটে নামায়। খেজুর গাছ ছুলে, গ্যাজাল মেরে কলসি ঝুলিয়ে রাখে। ভোরবেলা গিয়ে হাঁড়ি নামিয়ে আনে। শহরের বাবুরা খেজুর রস খেতে ভারি পছন্দ করে। আমি একহাঁড়ি রস শহরে বেচে দিই। বাকি হাঁড়িগুলোর রস ফুটিয়ে ফুটিয়ে আমার রব গুড় তৈরি করে। হাটেবাজারে পালের বাড়ির পাটালির খুব নাম আছে। ওই গুড় আর ভাজা ছোলায় খুব সোন্দর ছোলার পাটালি হয়। একদিন তোমাকে খাইয়ে যাব দিদিমণি।

প্রথম দেখাতেই পদ্মমণি বলে ফেলল,— তুমাকে খুব ভালা লাগছে গো দিদিমণি।

তুমি কি আমাকে চেনো?

বাঃ তুমাকে চিনব নি, তুমি তো ইস্কুলের দিদিমণি গো।

তুমি জানলে কি করে?

ষড়ঙ্গীবাবুর বাড়িতে আমার বরের গুড় পাটালির খুব চাহিদা আছে গো। সউটি তোমাকে দেখছি।

শ্রুতি বলল,—তা হবে, আমি কিছুদিন ওখানে ছিলাম।

ও বাড়ির উমা দিদিমণি ইস্কুলে কাজ করে। তেনার ঘরে উঁকি দিয়ে তুমাকে দেখেছি দিদিমণি।

ঠিক দেখেছ। এখন মনে হচ্ছে, তোমার বাড়ির তৈরি পাটালি আমি আর উমাদি খুব তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছি। সেই উপাদেয় খাবারগুলো যে তোমার বাড়ির তা এতক্ষণে জানতে পারলাম। আজ খেজুর রস এনেছ, খুব ভালো, কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে ওই ছোলার পাটালি এনে দিতে

BanglaBook.org

হবে। আর ঝোলা গুড় যদি থাকে একটা শিশিতে করে এনে দিও। মুড়ির সঙ্গে খেতে খুব ভালো লাগে।

সেদিন খেজুর রস খাইয়ে গেল পদ্মমনি। শ্রুতি খুচরো পয়সা খুঁজছিল দাম দেবে বলে।

পদ্মমণি ঠিক আন্দাজ করেছে, দিদিমনি খুচরো খুঁজে পাচ্ছে না। সে বলল,—আজ তুমাকে দাম দিতে হবেনিগো দিদিমনি। আজ তুমার মুখ মিঠা করি গেলি, পাটালি যেদিন লি আসব সৌদিন দাম লিব।

পদ্মমণি চলে গেলে শ্রুতি নেকজানকে বলল,—তুই ওকে চিনিস?

নেকজান বলল,—ওকে কে না চেনে দিদিমণি? ছোটোবেলা থেকে আমার বয়সি পদ্মকে দেখছি। দারুয়ার ময়দানে যখন শাসমলসাহেবের মিটিং হত তখন লোকে লোকারণ্য। বাচ্চা-কাচ্চা, জোয়ান, বুড়োবুড়ি প্রতিটা ঘর থেকে এসে মাঠ ছেয়ে ফেলত। সাদা টুপি পরা স্বদেশিবাবুরা ঘিরে থাকত চারদিক।

শাসমলসাহেব বক্তৃতার মাঝে এক একবার থামতেন অমনি হাততালির শব্দে আকাশ বাতাস ফেটে যেত। সেখানে আমি আমার বয়সি এই মেয়েটাকে দেখেছি ওর মায়ের হাত ধরে মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দুগালে দুটো হাত দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত শাসমলসাহেবের মুখের দিকে।

একবার তো সভায় পুলিশের লাঠি চলল। অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হল শাসমলসাহেবকে। কত মানুষের হাত পা ভাঙল লাঠির ঘায়ে তার ঠিক নেই। আশপাশের গাঁয়ের মানুষরা পালিয়ে বাঁচল। আমরা তো ঝুপড়িতে ঢুকে পড়ে ফাঁকফোকর দিয়ে তাকিয়ে দেখছি।

সব যখন ফাঁকা হয়ে গেল তখন দেখলাম পদ্মমনি আর তার মা লাঠির ঘায়ে কাতরাচ্ছে। যে মানুষগুলো তাদের জন্য আমাদের পাড়া থেকে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই জল মুখে ঢেলে দিচ্ছে আহত মানুষগুলোর।

করিমচাচার বাড়িতে যখন জল আনতে এল তখন চাচা বলল,—মুসলমানদের ছোঁয়া জল কি হিন্দুরা খাবে?

পদ্মমণির মা বলল,—জলে কি হিন্দু মুসলমান চিহ্ন দেওয়া আছে গো?

আমার মা বলেছিল,—বুঝলি নেকজান, এরা হল সাচ্চা হিন্দু।

তারপর দিদি কতগুলো বছর কেটে গেছে, ওকে আর ওর মাকে কত দুঃখকষ্টের ভেতর পড়তে দেখেছি। তারপর সরষেবেড়িয়াতেই এক চাচার বাড়িতে ওর বিয়ে হয়েছে। শুনেছি বরটাকে ও খুব ভালোবাসে। চাষের কাজে বরের পাশে থেকে ও কাজ করে।

একটুতেই কিন্তু মাথা গরম, তখন আর রক্ষে নেই, চড়-চাপড়, কিল-ঘুসি মেরেই যাবে। হাসতে হাসতে পালিয়ে বাঁচবে লোকটা।

বউকে কী যে ভালোবাসে মানুষটা। একবার ম্যাজিকের আসর বসেছিল মাঠে। নগেন বকশিবাবু নিজের পরসা খরচ করে কলকাতা থেকে ম্যাজিক পার্টি এনেছিলেন। টিকিট কাটার ব্যাপার ছিল না। তাই সারা মাঠ জুড়ে থিকথিক করছিল লোক।

মাঝখানে একটা উঁচু মঞ্চে খেলা দেখানো হচ্ছিল। পেছনের লোকেরা অনেকেই দেখতে পাচ্ছিল না। ফাঁকফোকর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল।

আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম একটা লোক দুহাতে দুটো কালো রুমাল ঝাড়ল। তাতে কোনো কিছু ছিল না। পরে যখন সে রুমাল দুটোকে ভাঁজ করে হাতদুটোকে নীচে নামিয়ে আবার তুলে ঝাড়ল তখন দুটো সাদা পায়রা উড়ে গেল।

চারদিক থেকে টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার মতো চড়চড় করে হাততালির শব্দ উঠল।

একটা হাসির আওয়াজ শুনে আমি চোখ ফেরাতেই দেখি ডানদিকে বটগাছের ডালে অনেকগুলো লোক আগে থেকে উঠে বসে আছে। আর বটগাছের গুঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটা

BanglaBook.org

লোক। তার ডান কাঁধে বসে বাঁহাতে চুলের ঝুটিটা ধরে খিলখিল করে হাসছে যে মেয়েটা সে আর কেউ নয়, আমাদের এই পদ্মমনি।

ওর কোনো লজ্জাশরম নেই দিদি। ওর চলন বলন, কথা বলার ধরন সবই সোজাসাপটা, কারও তোয়াক্কাই রাখে না।

একটু থেমে নেকজান আবার বলল,—পৌষ সংক্রান্তির মেলায় একবার ও একটা কাণ্ড করে বসেছিল। ও লক্ষ্য করল, একটা লোক ওর পিছু নিয়েছে। প্রথমে তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করল। তারপর দেখল, ও যেখানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেখানে লোকটা এসে হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে দেখছে।

একটু উঁচু জায়গায় ও দাঁড়িয়েছিল, আমি মায়ের সঙ্গে সমুদ্রের দিকে যেতে যেতে ওকে দেখতে পেলাম। তখন ভিড় কিছু কম ছিল।

একটা লোক হঠাৎ ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

চেঁচিয়ে উঠল পদ্মমণি, এমনি করে আমার দিকে চেয়ে থাক যদি তাহলে এই দুটো আঙুল দেখছ ওই ড্যাবডেবে দুটো চোখই গেলে দেব।

লোকটা পালিয়ে ভিড়ে মিশে গেল।

শ্রুতির মনে হল পদ্মমণি মেয়েটি খাঁটি সোনা। সমুদ্রের মতো সদাচঞ্চল, কখনও বা খলখল খুশিতে ফেটে পড়ে হাসির খই ছড়ায়। আবার কখনও সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ-এর মতো ভেঙে পড়ে উদ্দাম আক্রোশে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

কে যেন বলছিল, ওর নাম পদ্মমণি না, ওর সঠিক নামকরণ হতে পারে পদ্মা। পদ্মার মতো ও লীলাবতী আবার পদ্মার মতোই প্রমত্ত।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগিতা আন্দোলনের ঢেউ উঠল। কংগ্রেসের ডাকে উকিল ব্যারিস্টাররা কোর্ট কাছারি বর্জন করতে লাগলেন। ইংরেজি স্কুল থেকে ছাত্র শিক্ষকরা বেরিয়ে এলেন গোলামখানায় পড়ব না, পড়াব না বলে। ছাত্রদের জন্য তৈরি হল জাতীয় বিদ্যালয়। সে এক উন্মাদনার সময়। সর্বত্র জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে জনসাধারণ।

মেদিনীপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন কাঁথি মহকুমার কলাগাছিয়া গ্রামের জমিদার জগদীশচন্দ্র মাইতি মহাশয়। বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলমহাশয় সেখানে গিয়ে স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন (১৯২১খ্রিঃ)।

প্রায় তিন বছর পরে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সেই স্কুল পরিদর্শনে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন চারণকবি মুকুন্দ দাসকে।

গ্রাম-গ্রামান্ত জুড়ে সে কি উন্মাদনা। মুকুন্দ দাসের দেশাত্মবোধক গানে দিকে দিকে প্রেরণার প্লাবন বয়ে চলল।

দেশজননীর বন্দনা গানে শুরু হয় বিদ্যালয়ের ক্লাস। পড়াশোনার ভেতর একটা ক্লাস থাকে চরকায় সুতো কাটার। স্কুল তখন চরকার ঘর্ঘর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। ছেলেদের হাতে বোনা সেই সুতো চলে যায় তাঁত বিভাগে। সেখানে স্কুলের তাঁতেই তৈরি হয় ধুতি আর শাড়ি। ছেলেরা সেই ধুতি ব্যবহার করে। শাড়ি আর ধুতি নিয়ে বিভিন্ন বাজারে তারা বিক্রি করতে চলে যায়। পথে গাইতে গাইতে যায় দেশাত্মবোধক গান।

আবার চলে দেশবিদেশের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের ক্লাস। বাংলা, অঙ্ক কোনোকিছুই বাদ যায় না।

স্কুল সংলগ্ন কৃষি জমি। জগদীশচন্দ্র বেশ কয়েক বিঘে জমি জাতীয় বিদ্যালয়কে দান করেছেন।

BanglaBook.org

উন্নততর ফসলের জন্য তিনি স্বয়ং শিক্ষা দেন ছাত্রদের। তাছাড়া সবজি ফলানোর জন্য খেত খামারও আছে। সামনের বিরাট পুষ্করিণীতে প্রচুর মাছ চাষ হয়। এসব করে স্কুলের ছাত্ররা উপযুক্ত লোকের তদারকিতে।

এইভাবে জাতীয় বিদ্যালয়টি স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কলাগাছিয়ায় আসার খবর পেয়ে কাঁথি থেকে অত্যুৎসাহী কয়েকজন দেশপ্রেমিক গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিল ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের দুই দিদিমনি। অত্যুৎসাহী শ্রুতি ছিল তাদের ভেতর একজন।

সেই যাত্রায় অন্তহীন প্রেরণার স্পর্শ তারাও লাভ করেছিল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতার একটি ছত্র এখনও শ্রুতির কানে বাজছে—ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করে অভিশক্ত সগর সন্তানদের যেমন সঞ্জীবিত করেছিলেন তেমনি জগদীশচন্দ্র গঙ্গাকে নিয়ে এসেছে গ্রাম- বাংলার বুকে। আপনারা অন্তত সেই পবিত্র জলধারার এক গণ্ডূষ পান করুন।

শিক্ষিকা দুজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের বিশাল পৈতৃক বাড়ির অন্দরমহলে।

বহু সমাদরের সঙ্গে বাড়ির মহিলারা এই দুজন শিক্ষিকাকে তিনদিন আশ্রয় দান করেছিলেন।

শ্রুতির স্মৃতিতে আজও অম্লান হয়ে আছে দুটি বালিকার মুখ। বড়টির নাম ছিল আতর আর ছোটর নাম ছিল গোলাপ। দুটি কন্যাই স্বর্গীয় সৌন্দর্য আর সৌগন্ধে পূর্ণ।

ওরা যখন কচি কচি হাতে জলখাবার নিয়ে আসত তখন শ্রুতি আর নমিতাদি তাদের আদরে সোহাগে ভরে দিত।

বহুদিন পর্যন্ত কলাগাছিয়ার সেই স্মৃতি অম্লান হয়েছিল শ্রুতির মনে।

অসহযোগিতা আন্দোলনের আটবছর পরের একটি দৃশ্য।

তখন স্বরাজ লাভের উন্মাদনায় কাঁপছে সারা দেশ। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ, মধ্যরাত্রি। বয়ে চলেছে পঞ্চনদীর অন্যতম স্রোতস্বতী শতদ্রু। তার পবিত্র জলধারা স্পর্শ করে লালা লাজপত নগরে জাতীয় কংগ্রেসের বেদিমূলে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হল।

এল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের নববর্ষের নবীন প্রভাত।

ভারতবাসীর প্রাণ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল।

স্বাধীনতার দাবি ঘোষিত হল গ্রামে গঞ্জে, শহরে নগরে, পথে প্রান্তরে, কোটি কোটি নরনারীর কণ্ঠে।

সেই ধ্বনি উত্থিত হল হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে আসাম পর্যন্ত। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সেই সমবেত কণ্ঠে স্বাধীনতার সংকল্পবাণী।

জনজাগরণের এই মহৎ সংগ্রামের নেতৃত্ব সেদিন ন্যস্ত হল জাতির নায়ক মহাত্মা গান্ধীর ওপর। নির্ভীক, কৃশতনু, অপ্রমের প্রাণশক্তির প্রতীক মহাত্মাজি সেদিন নিজের ওপর তুলে নিলেন সংগ্রাম পরিচালনার এই গুরুদায়িত্ব।

তিনি স্থির করলেন কোটি কোটি মানুষের কাছে প্রতিদিন অপরিহার্য যে লবণ তাকেই এই সংগ্রামের হাতিয়ার করতে হবে।

মুসলমান শাসনে কর বসানো হয়েছিল এই নিত্য ব্যবহার্য বস্তুটির ওপর কিন্তু ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই করের হার বহুগুণ বৃদ্ধি পেল।

রাজগৃহ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির যে লবণের অবাধ ব্যবহার তার ওপরে সাধ্যাতীত কর চাপিয়ে ইংরেজ বিপুল রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করছিল।

গান্ধীজি এই কর ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানতে চাইলেন।

BanglaBook.org

২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ, 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হল তাঁর প্রবন্ধ।

"বায়ু ও জলের ঠিক পরেই লবণকে জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু বলা যেতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তির রসনায় স্বাদ সৃষ্টির ইহাই একমাত্র বস্তু"।

"জল বাদ দিলে লবণের ন্যায় এমন অন্য কোনো বস্তু নাই, যার ওপরে ট্যাক্স বসিয়ে লক্ষ লক্ষ অনাহার ক্লিষ্ট মানুষকে রোগগ্রস্ত, অন্ধ, খঞ্জ, অঙ্গহীন এবং একান্ত অসহায় করে দেওয়া যায়।

লালসাগ্রস্ত ধূর্ত মানুষের কৌশল বলে সৃষ্ট এই করপ্রথা অপেক্ষা অমানুষিক আর কিছুই হতে পারে না।"

লবণ আইনের অত্যাচার কীভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল সে সম্বন্ধে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

"জনসাধারণ চড়া দরের জন্য লবণ ক্রয়ে অসমর্থ হইয়া সমুদ্রের জলে খড়কুটা ভিজাইয়া বাড়িতে আনিতে লাগিল এবং উহার ক্ষার ভাতে মাখাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল। এইজন্য এই সালে গভর্নমেন্ট আইন করেন যে সমুদ্রের জলে কিছু ভিজাইয়া তার ক্ষার করা অপরাধজনক।

নবাবদের আমলে যে দরে লবণ তৈয়ারী হইত তাহার উপর শতকরা আড়াই টাকা হইতে পাঁচ টাকা ট্যাক্স যোগ হইত। কিন্তু ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই ট্যাক্স ৫০০ হইতে ৬৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়।"

'অক্টোপাস রুপী' লবণ আইন বিত্তশালী রাজা মহারাজ থেকে দরিদ্রতম পথচারীকেও কঠিন বন্ধনে কবলিত করে রেখেছিল।

সাধারণ মানুষের অন্তরের বেদনার কথা জানতেন গান্ধীজি। তাই তিনি জনসাধারণের দৃষ্টি আর্কষণ করে তাদের গণসংগ্রামের সঙ্গী করতে উৎপীড়ন মূলক লবণ আইনকেই সংগ্রামের হাতিয়াররূপে বেছে নিয়েছিলেন।

গান্ধীজির এই দূরদর্শিতা অর্থগ্রহণে অসমর্থ রাজনীতিকরা ব্যঙ্গোক্তি করে বলেছিলেন, "লবণ জল জ্বাল দিলে যদি স্বরাজ অর্জন হয়, চায়ের জল জ্বাল দিলে কেন স্বরাজ হবে না।"

কেন্দ্রীয় রেভিনিউ বোর্ডের জনৈক সদস্য উপহাস করে বলেছিলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতিকে লবণ জল পাক করে সিংহাসন চ্যুত করার ধারণা অতি অদ্ভুত।"

এসব উপহাসের বিরুদ্ধে দৃঢ়চেতা গান্ধীজি তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। তিনি দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করলেন তাঁর লবণ আইনের কর্মসূচি।

গান্ধীজি স্থির করলেন, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সমুদ্র তীরবর্তী 'ডান্ডি' নামক স্থানে তিনি প্রথম লবণ আইন অমান্য করবেন।

সবরমতী আশ্রম থেকে দীর্ঘ পথ পদযাত্রা করে তিনি সদলবলে ডান্ডি পৌছবেন এবং শুরু করবেন লবণ সত্যাগ্রহ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই হবে তাঁর অহিংস সংগ্রামের প্রথম অস্ত্রনিক্ষেপ।

সারাদেশব্যাপী শুরু হয়ে গেল লবণ তৈরির মহাযজ্ঞ। অন্যান্য স্থানের মতো কাঁথি মহকুমাতেও উদ্দীপনার শেষ ছিল না। যে মহাকুমার মানুষ সমুদ্রের হাওয়ায় প্রতিদিন শ্বাস গ্রহণ করে, সমুদ্র যাদের আহারের সামগ্রী জোগায় সেই সমুদ্রজাত লবণ কর দিয়ে কিনতে হবে, এ কেমন কথা।

দিকে দিকে চলল লবণ সত্যাগ্রহ। মহকুমার সমস্ত থানা-অঞ্চলে লবণ তৈরির জন্য এক একটি ঘাঁটি তৈরি হল। লবণ জল থেকে লবণ তৈরির প্রক্রিয়া কোনো গৃহস্থেরই অবিদিত ছিল না।

প্রকাশ্যস্থানে স্বেচ্ছাসেবকরা গান্ধী টুপি পরে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের নরনারীকে যজ্ঞস্থলে আমন্ত্রণ করে আনত। তারপর তারা বক্তৃতার মাধ্যমে লবণ সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করত। যা সহজলভ্য যা নিজেদের অধিকারের তাকে অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে হবে এ আত্ম অবমাননা ছাড়া কিছু হতে পারে না।

BanglaBook.org

উল্লাসে নারীপুরুষ 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নির উত্তাপে তৈরি হতে লাগল প্রাণদায়ী নিত্য ব্যবহার্য লবণ।

শঙ্কিত হল ইংরেজ সরকার। তারা লবণ তৈরির ক্ষেত্রগুলিকে ঘিরে ফেলল। লাঠির আঘাতে ভাঙতে লাগল লবণ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হাঁড়িকুড়ি।

আন্দোলন ভাঙবার জন্য নির্বিচারে দমনপীড়ন চালাতে লাগল অহিংস অন্দোলনকারীদের ওপর।

কাঁথি মহকুমার ভেতর পিছাবনি ছিল সর্বপ্রধান লবণ তৈরির কেন্দ্র।

কাঁথি শহরের সাতমাইল দূরে যে স্থানে কাঁথি-দিঘা রাস্তা পিছাবনি খাল অতিক্রম করেছে সেস স্থানটিই পিছাবনি নামে পরিচিত।

লবণ সত্যাগ্রহের সময় কোনো পুল ছিল না পিছাবনি খালের ওপর। পারাপার করতে হত নৌকাযোগে। এই খাদটি কয়েকমাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাই এই খালের জলে সমুদ্রের জোয়ারভাটা চলে। এর জল যেমন লবণাক্ত, দুই তীরের মাটিও তেমনি লবণাক্ত।

কাঁথি মহকুমা শহর, জেলাশহর এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানের রাস্তাঘাটের সঙ্গে এই পিছাবনির বিশেষ যোগাযোগ ছিল। তাই লবণ সত্যাগ্রহীরা এই জায়গাটিকে লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচনা করে।

৬ এপ্রিল এখানে লবণ সত্যাগ্রহের দিন রূপে ঘোষিত হয়।

পুলিশ ও সত্যাগ্রহীরা কাঁথি-দিঘা রাস্তার দুই দিকে অবস্থান করতে থাকে।

রাস্তার পূর্বভাগে সরকারি তাঁবুর একটি দীর্ঘসারি দেখা যায়। রাস্তার পশ্চিমদিকে পিছাবনি হাটের সন্নিকটে একটি বটগাছের তলায় স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা লবণ তৈরির চুল্লি নির্মিত হয়। নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য গৃহগুলিতে স্থাপিত হয় কংগ্রেস শিবির।

৬ এপ্রিল ভোরবেলা ডা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৩৫জন সত্যগ্রহী কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের সত্যাগ্রহ শিবির থেকে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে পিছাবনি লবণ ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের হাতে আন্দোলিত হতে থাকে জাতীয় পতাকা।

সত্যাগ্রহীদের কণ্ঠে গান

'চলরে চলরে চল
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল,
চলরে চলরে চল।'

সেদিন কাঁথি থেকে পিছাবনি পর্যন্ত সাত মাইল রাস্তার দুদিকে কাতারে কাতারে সমবেত হল নরনারী। নারীরা শঙ্খধ্বনি করতে লাগল। সত্যাগ্রহীদের কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে দিল। জয়ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হতে লাগল।

স্বেচ্ছাসেবকদের পেছনে চলেছিল এক নারী। সে লবণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিল। আগে থেকেই তার যাবার খবর পেয়ে গিয়েছিল শ্রুতি আর নেকজান।

তারা স্বেচ্ছাসেবীদের যাত্রার একপাশে দাঁড়িয়েছিল মালা আর চন্দন নিয়ে।

নারীটি আর কেউ নয় তাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ পদ্মমণি। ওরা এগিয়ে গিয়ে পদ্মমণির কপালে বড় করে চন্দনের টিপ লাগিয়ে দিল।

নেকজান ভোরবেলা সাদা আর লাল ফুলে একটি মালা গেঁথে রেখেছিল, সেই মালা সে পরিয়ে দিল পদ্মমণির গলায়।

BanglaBook.org

স্কুলের ভেতর তখন ক্রমাগত আলোচনা চলছিল পিছাবনি লবণ কেন্দ্রের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে।

৭ এপ্রিল প্রথমদিনের সংগ্রহ করা কয়েক হাঁড়ি লবণজলকে চুল্লির আগুনে বসিয়ে লবণ তৈরি শুরু হল। সেই লবণ প্রস্তুত হলে এক পুঁটুলি লবণ নেতা সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে তুলে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছোঁ মেরে তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিলেন কাঁথির ভারপ্রাপ্ত সহঃ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সামসুদ্দোহা।

পরপর কয়েকদিন পুলিশের অত্যাচার চরমে উঠল। তারা লাঠির ঘায়ে লণ্ডভণ্ড করে দিল লবণ তৈরির ক্ষেত্রগুলিকে।

গ্রাম-গ্রামান্ত থেকে প্রতিদিনই জড়ো হতে লাগল নতুন নতুন স্বেচ্ছাসেবী। পুলিশের অত্যাচারও ক্রমে ক্রমে ভয়ংকর হয়ে উঠল। তারা সত্যাগ্রহীদের খদ্দরের পোশাক দেখলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। সেসব টেনে ছিঁড়ে দিত তারা। মাথায় গান্ধীটুপি দেখলেই প্রহার শুরু হয়ে যেত।

একদিকে অস্ত্রহীন অহিংস সত্যাগ্রহী অন্যদিকে সশস্ত্র অত্যাচারী পুলিশ বাহিনী।

ওরা শেষ পর্যন্ত নারীদের ওপরেও অত্যাচার শুরু করল। নানাভাবে শ্লীলতাহানি করতে লাগল তাঁদের।

এধরনের অত্যাচার চলতে লাগল মহকুমার সর্বত্র।

দুঃসংবাদ প্রতিমুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে কাঁথি শহরে। উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে উঠছে শহরবাসীরা।

কয়েকদিন পদ্মমণির কোনো খবর না পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল শ্রুতি। নেকজান তাকে প্রবোধ দিয়ে বলেছিল, পদ্মদিদির কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না দিদিমণি।

শ্রুতি উদ্বিগ্ন মুখে বলে, ক্ষতি হোক না হোক, একটা খবর তো চাই।

সে তুমি পেয়ে যাবে।

কী বলছিস তুই! এত স্বেচ্ছাসেবকের ভেতর তোর পদ্মদিদির খবর কেই বা আমাদের দিয়ে যাবে?

এবার নেকজান হেঁয়ালি ভরা গলায় বলল— আমার মন বলছে।

শ্রুতিকে অবাক করে নেকজানের কথাই সত্য হল।

রাত তখন প্রায় দশটা, খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিছানা নেবার উদ্যোগ করছে শ্রুতি আর নেকজান। এমনসময়ে টোকা পড়ল দরজায়।

নেকজান দরজার দিকে এগিয়ে যেতে শ্রুতি বলল,—তুই থাম আমি খুলছি।

প্রথমে পাশের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে শ্রুতি বলল,—কে?

আস্তে অথচ ভরাট গলার একটা আওয়াজ এল, দরজাটা খুলি দও।

হুড়মুড় করে হুড়কোটা খুলে শ্রুতি বলল,—পদ্মমণি। এসো এসো ভেতরে।

পদ্মমণি তখন প্রায় টলছিল। উশকোখুশকো চুলগুলো বুক আর পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে। কাপড় চোপড় যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া। মুখের ওপর অভুক্ত মানুষের ছাপ পড়েছে। শুধু চোখদুটো জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। হারিকেনের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল মনে হল।

শ্রুতি তাকে ধরে তার পাতা বিছানার ওপর বসাতে গেল, কিন্তু শ্রুতিকে বাঁধা দিয়ে পদ্মমণি বলল,—বিছানায় বসবনি দিদি, সাতদিনের ধুলা-মইলা কাপড় আর গায়ে জমছে। আমি পুকুরে গা ধুই আসি। একটা কাপড় দে তো নেকজান।

শ্রুতি সঙ্গে সঙ্গে আলনা থেকে তার একটা ধোয়া কাপড় আর সেমিজ নিয়ে নেকজানের হাতে দিয়ে বলল,—তুই পদ্মের সঙ্গে ঘাটে যা।

নেকজান আর পদ্ম একটা হারিকেন নিয়ে পুকুরঘাটের দিকে চলে গেল।

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে স্টোভ ধরিয়ে ভাত চাপিয়ে দিল শ্রুতি। পাগলি মেয়েটি কতদিন খায়নি কে জানে। একটা কিছুতে মেতে গেলেই নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়।

এখন স্বদেশি আন্দোলনের স্রোতে ও ভেসে চলেছে। আত্মীয়স্বজন সংসার কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করে না ও। সেই যে একদিন কিশোর বয়সে বীরেন শাসমলমশায়ের বক্তৃতা শুনেছিল দারুয়ার ময়দানে, সেদিন থেকে তার মনের ভেতর একটা আগুন জ্বলছে। যতদিন না দেশ স্বাধীন হয় ততদিন সে আগুন আর নিভবে না।

ভাত ফুটছে আর হাতের তালুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে বসে ভাবছে শ্রুতি।

দরজা ঠেলে ঢুকল নেকজান আর তার পেছনে শুকনো পোশাক পরা পদ্মমণি।

ঢুকতে ঢুকতেই বলল পদ্ম,—আঃ কী আরাম পাইলি গো দিদি। স্নান করি দেহটা জুড়িই গেল।

শ্রুতি বলল,—নেকজান, ভাতটা প্রায় হয়ে এসেছে, আলুদুটো ভাতে দিয়ে দিয়েছি, তুই ভাত নামিয়ে একটা ডিম ভেজে দে।

পদ্মমণি বলল,—কদিন একমুঠা ভাত খাইছি কি খাইনি, অত রাজভোগের দরকার আমার নেইগো দিদিমণি।

শ্রুতি মৃদু ধমক দিয়ে বলল,—তুমি থামো তো পদ্ম, নেকজান যা দেবে তাই খেয়ে নাও হাসিমুখে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হতে ঢং ঢং করে থানার ঘড়িতে দুটো বাজল।

শ্রুতি বলল,—এখন কথা না বলে শুয়ে পড়ো পদ্মমণি।

পদ্ম বিছানায় শুয়ে বলল,—ঘুমের কি কপাল আছে গো আমার দিদিমণি?

শ্রুতি বলল,—আবার কী?

কাল থিকে লতুন কাজ শুরু হবে গো।

সে আবার কী?

দারুয়ার মাঠে সব ভল্টুরা (ভলান্টিয়ার) জুটবে।

সেখানে আবার কী হবে?

হবে হবে, স্বদেশি বক্তিমা হবে, তার সঙ্গে লবণ জল থিকি লুন তৈরি হবে।

এরপর দারুয়ার ময়দানে যে নাটক ঘটল তার মধ্যমণি হল এই পদ্মরানি।

তিন-চারদিনের ভেতর ঘটে গেল দারুরা ময়দানের ঘটনাটি। সে এক অবিশ্বাস্য গল্পের মতো।

বহু স্বেচ্ছাসেবী এসে জড়ো হল দারুয়ার ময়দানে। বড়ো বড়ো নেতারা এসে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন।

কিন্তু এখানে বিশেষ কোনো প্রচার না করে লবণ আইন ভঙ্গের একটা পরিকল্পনা নিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবীরা।

পাকা কাঁঠালের গন্ধ পেলে দূর থেকে যেমন দলে দলে শেয়াল জুটে যায় গাছতলায় তেমনি খদ্দর পরা স্বদেশিদের দেখে তাদের ঘিরে রইল পুলিশের দল। যত বক্তৃতাই দিক সরকার গ্রাহ্য করবে না। কিন্তু লবণ আইন ভঙ্গ করে কেউ যদি নুন তৈরি যায় তাহলে সরকার তাদের সর্বশক্তি দিয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

জেল থেকে যে রাস্তাটা দারুয়া ময়দানের দিকে গেছে সেই রাস্তার শেষ থেকে শুরু হয়েছে দারুয়া গাঁ। এই গাঁয়ের প্রায় সবটাই বালিতে ভর্তি। কিছু কিছু অংশে কাজুবাদামের বাগান আর খানিকটা দূরে দূরে মান্ধাতা আমলের বট অশ্বত্থের গাছ। চারদিকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে বনস্পতিগুলি। বালির ঢিবির তলায় নীচের দিকে নেমে গেছে পথ। সেই সরু পথের দুদিকে কাঁটাবাঁশের ঝাড়। দিনের বেলাতেও আলোছায়ার আলপনা আঁকা হয় সরু পথের জমিনে।

গান্ধী টুপি পরে স্বেচ্ছাসেবীরা বসে আছে বট-অশ্বত্থ গাছের তলায়। মাঝে মাঝে স্বদেশি নেতারা আসছেন আর জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

BanglaBook.org

দূরে দূরে খাটি গেড়ে অর্ধচক্রাকারে পাহারা দিচ্ছে সেপাইরা। বক্তৃতা চলুক ক্ষতি নেই, কিন্তু কোনো ভাবেই লবণ আইন ভঙ্গ করতে দেওয়া হবে না। আগুন জ্বলতে দেখলেই স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে পুলিশ। আর যা করো নুন তৈরি কখনও না।

মূল পুলিশ ঘাঁটি জেলখানা থেকে একটু দূরে পথের ওপর। তারা পথের দুদিকে সারি সারি বেঞ্চি পেতে বসে আছে। তাদের লক্ষ্য দারুয়ার ময়দানে আগুনের শিখার দিকে। যদিও তারা জানে আশে-পাশে কোনো খাল নেই যার সঙ্গে লবণ সমুদ্রের জোয়ার ভাটার যোগ আছে।

লবণ জল আনতে হলে সেই সমুদ্র থেকে কয়েক মাইল হাঁটাহাঁটি করে কলসিতে ভরে আনতে হবে।

সে সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা কিন্তু ভাবছে না সেপাইরা।

দূর থেকে দেখা গেল একটি গ্রাম্য বধূ ময়দানের উত্তরপশ্চিম কোণ দিয়ে বালির পাহাড় ডিঙিয়ে প্রান্তরে নেমে এল। তার কাঁখে একটি কলসি। মাথায় আধঘোমটা কলসি কাঁখে বউটি লীলাভরে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসতে লাগল প্রান্তরের মাঝখানে।

চঞ্চল হয়ে উঠল সেপাই-এর দল, কলসিতে নিশ্চয়ই লবণ জল আছে। আর ওই জল জ্বালন দিয়ে ওরা নুন তৈরি করবে, তখন বেইজ্জত হয়ে যাবে ইংরেজ সরকার।

বন্দুক আর লাঠিসোঁটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল সেপাই-এর দল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বেচ্ছাসেবীদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দেবে।

এ কী! মেয়েটি কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের পাশ কাটিয়ে জেলখানার রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে লাগল।

সে যখন সেপাইদের কাছে এল তখন সেপাইরা উৎসুক হয়ে জানতে চাইল, কী আছে ওই কলসিতে?

মেয়েটি একমুখ হেসে শূন্য কলসিটা উপুড় করে দিল।

হেড কনস্টেবল জানতে চাইল, কোথায় চলেছিস?

সরকারি পুকুর থেকে জল নিয়ে যেতে হবে গো।

কোথায় বাড়ি তোর?

মহিষামুন্ডা।

আর এক সেপাই জিজ্ঞেস করল, তোর গ্রামে কি পুকুর নেই? সেখানে জল না নিয়ে এতদূর এসেছিস জল নিয়ে যেতে?

মেয়েটার চোখেমুখে আতঙ্ক। বলল,—দাস্তবমি হেইছি গো, সব পুকুরের জল খারাপ হিযাইছি। তাই সরকারি পুকুর থেইকে খাবার জল লি যাবা।

সেপাই বলল,ফেরার পথে কলসি দেখিয়ে নিয়ে যাবি।

মেয়েটি মাথা নেড়ে হেসে কলসি দোলাতে দোলাতে চলে গেল।

ফেরার পথে সে ভরা কলসি কাঁখে এগিয়ে এল সেপাইদের কাছে।

বড়ো চোখকা জল গো। আঁজলা পাতো ঢালি দিই।

একে সুন্দরী যুবতী মহিলা, তার ওপর জলদান করতে চাইছে। দু-তিনজন সেপাই আঁজলা ভরে জল খেল।

সেদিন মেয়েটি লীলাভরে ভরা কলসি কাঁখে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

পরের দিন আবার তার আবির্ভাব সেই একই ছন্দিত পদক্ষেপে।

এদিন সেপাইরা মেয়েটির সঙ্গে ঠাট্টা মশকরা জুড়ে দিলে।

BanglaBook.org

সেও কম যায় না রঙ্গরসিকতায়। এ অঞ্চলে মেয়েরা বেশ খোলামেলা। গাঁয়ের বউ বলে ঘোমটা দিয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে থাকে না। পরপুরুষের সামনে তামাক আর পানের খিলি দিতে এগিয়ে আসে।

দ্বিতীয় তৃতীয় দিন হাসি মশকরার ভেতর দিয়ে যাওয়া আসা চলল। এখন আর মেয়েটি সাধলেও পুরুষরা কলসির জল মিঠে কি লোনা পরীক্ষা করে দেখে না।

চতুর্থ দিন কাঁখের কলসি মাথায় নিয়ে ডান হাতখানা দাঁড়ের মতো হাওয়া টানতে টানতে এগিয়ে এল সে।

সেপাইরা দেখল মেয়েটির মুখ আজ বিষণ্ণ।

হেড কনস্টেবল জানতে চাইল,—আজ তোমার কী হল গো, মুখে হাসি নাই।

বায়ানির (কন্যাসন্তান) শরীর খারাপ। মন ভালো নেই গো।

যাও যাও তাড়াতাড়ি যাও,—সহানুভূতির সঙ্গে বলল হেড কনস্টেবল।

মেয়েটি চলে গেছে। তার দেহের গঠন, হাসি মশকরা নিয়ে চর্চা করছিল সেপাইরা।

তাদের ভেতর হঠাৎ একজন ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে দারুয়া ময়দানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল,—দেখ দেখ আগুনের শিখা উঠেছে।

সত্যিই তো! বিউগল ভীষণ শব্দে বেজে উঠল। চারদিক থেকে পাহারাদার সেপাইরা ছুটে চলল আগুন লক্ষ্য করে।

চুল্লিতে বসানো হয়েছে কলসি। তৈরি হচ্ছে আগুনের তাপে লবণ জল থেকে বিশুদ্ধ নুন।

মারমার শব্দ উঠেছে তখন। দু এক ঘা লাঠি পড়ে গেছে স্বেচ্ছাসেবীদের ঘাড়ে পিঠে। আত্মরক্ষার জন্যে পালাতে শুরু করেছে ভলান্টিয়াররা।

আগুন নিভিয়ে হাঁড়িকুড়ি ভেঙে দিয়েছে পুলিশ।

মার খেয়ে স্বেচ্ছাসেবীরা পিছু হটছে। যারা মাটিতে পড়ে যাচ্ছে তাদের বালির ওপর দিয়ে সরসর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবীরা।

কয়েকমুহূর্তের ভেতর শূন্য হয়ে গেল দারুয়া ময়দান।

বিউগল-এর আওয়াজ শুনে অফিসের কাজ ফেলে অকুস্থলে দৌড়ে এসেছে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বহু দুষ্কৃতির নায়ক সামসুদ্দোহা।

চিৎকার করে উঠল পুলিশসাহেব,—কে আনল এখানে সমুদ্রের জল?

একজন সেপাই বলল— হুঁজুর, একটা মেয়ে রোজ সরকারি পুকুর থেকে জল নিয়ে যেত। আমরা প্রায় প্রতিদিন পরীক্ষা করে নিতাম। ওদের গাঁয়ে নাকি ভেদবমি চলেছে, তাই খাবার জল নিয়ে যেত। আজ মেয়ের অসুখ বলে কলসি মাথায় কাঁদতে কাঁদতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেছে। মনে হয় হুজুর কাল রাতে কেউ পুকুরপাড়ে ঝোপের ভেতর লবণ জ্বলের একটা কলসি বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। সেইটা মাথায় করে আজ ও আমাদের ধোঁকা দিয়ে পালিয়েছে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠল পুলিশের বড়বাবু,—কোথায় পালাল সে হারামজাদি? পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাল?

একজন সেপাই এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে কাকে খুঁজছিল।

এই যে স্যার, মাগিটা বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

শোনামাত্র সেদিকে ছুটল বড়োকর্তাসহ সমস্ত সেপাই।

বিশাল বটগাছের মোটা কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। মুখে চোখে তার উদ্বেগের কোনো চিহ্নই নেই। সে শুধু তাকিয়ে ছিল তার ভাঙা কলসিটার দিকে।

শয়তানি, বলতে বলতে সামমুদ্দোহা তার সমস্ত সেপাইগুলোকে নিয়ে তেড়ে গেল সেদিকে।

BanglaBook.org

ভয় পেয়ে ছুটল না মেয়েটি। সে একেবারে নির্বিকার। পুলিশরা তার কাছে যেতেই সে আঙুল দেখিয়ে বলল,—দেখ দেখ, ভাঙা কলসির গায়ে লুনের দানা কেমন জমি যাইছে।

প্রথম শঙ্কর মাছের দু ঘা চাবুক পড়ল তার পিঠে। ছিঁড়ে গেল তার কাপড়। টকটকে লাল রক্ত ঝরে পড়ছে।

সামসুদ্দোহা হেঁকে বলল,—পিছমোড়া করে বাঁধো ওকে গাছের সঙ্গে। মাথাটা গাছের কাণ্ডের সঙ্গে ঠেকিয়ে দাও।

ওরা সেভাবেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল নির্ভীক ওই মেয়েটিকে।

নিজের হাতেই চাবুক চালাতে লাগল দ্দোহা।

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল অঙ্গবাস। উদোম দেহটা যেন রক্তবসনে ঢাকা। একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর। রক্তের সঙ্গে লেপটে জটার আকার ধারণ করেছে। মাথাখানা কাত হয়ে ঠেকে আছে ডান কাঁধের ওপর। জীবিত কি মৃত বোঝা যাচ্ছে না।

সূর্যাস্তের আকাশে কে যেন একরাশ রক্ত ছড়িয়ে দিল। কিছু পরে নেমে এল অন্ধকার।

দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করে ফিরে গেছে দুর্যোধন দুঃশাসনের দল। এখন কৃষ্ণা অঙ্গে তুলে নিয়েছে কৃষ্ণ-বাস।

সমস্ত দৃশ্যটাই দেখছিল তিনটি নারী। তারা অনুমান করেছিল এমন একটা ঘটনা আজ ঘটতে পারে।

প্রতিরাতে এসে পদ্মমণি শ্রুতিদের জানিয়ে যেত দিনের ঘটনাগুলো।

আজ যে ভয়ংকর একটা কিছু ঘটাবে সে তার আগাম আভাস দিয়ে গিয়েছিল শ্রুতি আর নেকজানের কাছে।

ওরা তিনজনে নাসরিন বিবির ঝুপড়ি থেকে ফাটা দেওয়ালের ফুটো দিয়ে তাকিয়েছিল কুরুক্ষেত্রের দিকে।

দুর্বৃত্ত সেপাইগুলো চলে যাবার পর অন্ধকার বালির ওপর দিয়ে তিনটি প্রাণী প্রায় হামা দিতে দিতে গিয়ে পৌঁছল বটগাছের তলায়।

সমুদ্রের হাওয়া তখন ঝলকে ঝলকে বয়ে আসছিল। বটগাছের পাতাগুলো শব্দ করছিল করতালি ধ্বনির মতো। একটি দুঃসাহসী নারীকে যেন বাহবা দিচ্ছিল বনস্পতি। আর দিকদিগন্তে সে সংবাদ বয়ে নিয়ে চলেছিল সমুদ্রের উদ্দাম হাওয়া।

অজ্ঞান, অচৈতন্য। বোঝা যাচ্ছিল না দেহে প্রাণ আছে কি নেই।

বহু কষ্টে ওরা বাঁধন খুলে একটা বিবসনা শবকে বালির ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এল নাসরিন বিবির ঝুপড়িতে।

অনেক পরিচর্যায় মাঝরাতে জ্ঞান ফিরল পদ্মমণির। সমস্ত দেহটা তখনও যন্ত্রণায় বেঁকেচুরে যাচ্ছিল।

তিনজনের পরামর্শে স্থির হল পদ্মমণিকে নাসরিন বিবির ঝুপড়িতে রাখা চলবে না। ধরা পড়ে যাবে সবাই।

কিন্তু এই ক্ষতবিক্ষত দেহটার যে আশু চিকিৎসার প্রয়োজন। শহরের হাসপাতাল ছাড়া ঘরে রেখে চিকিৎসা কী করে সম্ভব। আবার হাসপাতালে দিলে ঘটনা জানাজানি হয়ে যাবে। তখন জেল-হাসপাতালে পচে মরতে হবে।

নাসরিন বিবি বিচক্ষণ মহিলা। সে বলল,—দিদিমণি পদ্মকে আপাতত তোমার বাসায় তুলতে চাই। তোমাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ কেউ করবে না। তোমার শোবার ঘরের পাশের ছোট্ট কুঠরিতে পদ্মমণিকে রাখা হবে।

শ্রুতি বলল,—বিপদ এলেও আমি পদ্মমণিকে আগলে রাখব। কিন্তু চিকিৎসার কী হবে?

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল নাসরিন বিবি। বলল,—তোমরা গরমজল করে ওর শরীরটাকে ময়লা কাদা থেকে মুক্ত করো, আমি এখুনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনছি।

সবিস্ময়ে শ্রুতি বলল,—সব জানাজানি হয়ে যাবে যে।

ডাক্তার শিবশঙ্করবাবু তেমন ডাক্তার নয় গো দিদিমণি। দারুয়ার শেষপ্রান্তে যে বটগাছ, তার তলায় বসে রোজ সকাল থেকে বারোটা অবধি বিনি পয়সার গরির দুখীদের সবরকম চিকিৎসা করেন। পাঁচখানা গ্রামের লোক তেনাকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি বলে মনে করে।

ডাক্তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগলেও সেই মুহূর্তে এই ডাক্তারটিকে পাওয়া বিশেষ জরুরি বলে মনে করল শ্রুতি।

সে তাড়া দিয়ে বলল,—তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো ওঁকে নিয়ে এসো এখানে। কিন্তু এত রাতে কি উনি আসবেন? বাড়ির লোকেরাই বা তাঁকে ছেড়ে দেবেন কী করে? পদ্ম তো সাধারণ রোগী নয়।

নাসরিন বিবি দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে বলল,—ওর সংসার বলতে কিছু নেই দিদি। এখন চারদিকের হতদরিদ্র অসহায় আতুর মানুষগুলোই ওর পরিবারের লোকজন হয়ে গেছে।

সমুদ্রের হাওয়া যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল নাসরিন বিবিকে।

ঘন্টাখানেক লাগল ডাক্তার শিবশঙ্কর মিশ্রের শ্রুতির বাড়ি পৌঁছতে। বড়ো একটা ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে নাসরিন বিবি এল ডাক্তারবাবুর পেছন পেছন।

হারিকেনের আলোয় অর্ধচেতন রোগীকে দেখলেন তিনি। তখনও স্টোভে গরমজল ফুটছিল। উনি ব্যাগ থেকে বরিক কটন বের করে হালকা গরম জলে তাই ফেলে ব্যথার জায়গাটা আলতো করে মুছে নিতে বললেন।

ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগাতে লাগাতে বললেন,—ইংরেজরা যত বর্বর তাদের মোসাহেবগুলো যার শতগুণ বেশি। এদের জন্যই আজও আমরা পরাধীন হয়ে আছি।

ডা. মিশ্র তাঁর করণীয় যা কিছু করে যাচ্ছিলেন। মুখোমুখি তাঁর উল্টোদিকে বসে দরকার মতো সবকিছু এগিয়ে দিচ্ছিল শ্রুতি।

কী নিষ্ঠুর আর বর্বর ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সামসুদ্দোহার দলবল! চাবুকের ঘায়ে চামড়া ফেটে কোনো কোনো জায়গায় প্রায় কোয়ার্টার ইঞ্চি পর্যন্ত গভীর হয়ে গেছে। বেরিয়ে পড়েছে দগদগে মাংস।

ডা. মিশ্র আর শ্রুতি মিলে পদ্মমণির দশাসই শরীরটাকে ওষুধপত্র দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

অচেতন অবস্থায় পদ্মমণির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা কথা—মার, মার কত মারবি মার।

ডা. মিশ্র একবার উঠে দাঁড়ালেন, নিজেই এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণের খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। আবার এসে লাগলেন রোগীর পরিচর্যায়।

ছোট্ট ঘর বেশ গরম লাগছিল। শ্রুতি নেকজানকে বলল,— ও ঘর থেকে হাতপাখাটা নিয়ে এসে ডাক্তারবাবুকে হাওয়া কর।

ডা. মিশ্র বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার সব অভ্যেস আছে। বাইরে থেকে কেউ হারিকেনের আলোয় ভেতরটা দেখে ফেললে বিপদ ঘটে যাবে, তাই জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। আমি চলে গেলে ঘর অন্ধকার করে জানলাটা খুলে দেবেন। সমুদ্রের হাওয়া ওর শরীর জুড়িয়ে দেবে। সমুদ্র আমাদের কাঁথিবাসীর মা জানবেন।

অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করে ডা. মিশ্র উঠে দাঁড়ালেন। চুয়াল্লিশ পয়তাল্লিশ বছরের পূর্ণ যৌবনদীপ্ত শরীর। মুখখানা নিরুদ্বিগ্ন। অন্তরের ভাষা বোঝার ক্ষমতা কারও নেই।

BanglaBook.org

রাত শেষ হয়ে এসেছে, অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমাকে আমার ডেরায় ফিরে যেতে হবে।

ব্যাগের মধ্যে তিনি সব জিনিস গুছিয়ে নিয়েছেন।

নাসরিন বিবি এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত থেকে ব্যাগটা নিতে গেলে ডা. মিশ্র বললেন,—ফেরার পথে আমিই নিয়ে যাব তোমার আর আমার সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। শেষের রাতটুকু তোমরা সকলেই এখানে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করো। রোগীর জন্য চিন্তা কোরো না, তাকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। সকাল নটা দশটার আগে জাগবে না।

শ্রুতির দিকে ফিরে বললেন,—আপনি আপনার স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যান। স্কুলের কেউ যেন বুঝতে না পারে আপনি কোনো কিছুতে উদ্বিগ্ন। তাহলে সন্দেহ দানা বাঁধবে। জানবেন হাওয়াতেও খবর ছড়ায়। আমি আবার আসব তবে গভীর রাতে। কাকপক্ষীটিও যাতে জানতে না পারে এমন নিঃশব্দে আসব। রোগীর সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও কিন্তু বিশ্রাম করে নেবেন। নাহলে স্কুলের কাজ করতে পারবেন না।

অনেকগুলো কথা একটানা বলে ডাক্তারবাবু বাইরের দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

শ্রুতি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে পাল্লা মেলে ধরল।

ভারী ব্যাগখানা নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হলেন ডা. মিশ্র। বালির পথ তাই জুতোর আওয়াজ উঠল না।

ভোরের একটু আগে নাসরিন বিবি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তাকে যেতে হবে দারুয়ার শেষপ্রান্তে একটা কাঁটাবাঁশের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সিঁথির মতো সরু পথটা ধরে। পথের শেষেই ডাক্তারবাবুর একখানা কুটির, তারপর দিগন্ত ছুঁয়ে চাষের মাঠ।

নাসরিন বিবি ভোরবেলা ডাক্তারবাবুর ঘরের কাজ সেরে চা আর জলখাবার করে দেয়। ওই খাবার খেয়ে ডা. মিশ্র ব্যাগখানা নিয়ে বেরিয়ে যান বটগাছের তলার আস্তানায়।

নাসরিন বিবি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় একটা ফোল্ডিং চেয়ার টেবিল মাথায় করে।

বটগাছের তলায় চেয়ার পেতে, টেবিল সাজিয়ে দিয়ে ফিরে আসে ডাক্তারবাবুর ঘরে।

দিনের বেলার রান্নাবান্না সেরে সে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে হাজির হয় ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠীতে।

সেখানে পণ্ডিত দিবাকর বেদান্ত পঞ্চাননের বাসার কাজ সেরে ফিরে আসে নিজের ঝুপড়িতে।

এখন বড়ো একা হয়ে গেছে নাসরিন। মেয়েটা যে শ্রুতির কাছে একটা আশ্রয় পেয়েছে সেজন্যে সে মনে মনে বেশ খুশি আর স্বস্তিতে আছে।

বড়ো কম কথা বলে নাসরিন। যার যেমন দরকার তাকে গতর খাটিয়ে সাধ্যমতো সাহায্য করে দেয় সে। ছোট্ট শহরের প্রায় সব বাড়িতেই দরকার পড়লে নাসরিনের ডাক পড়ে।

নেকজানের ওপর পদ্মমণির তদারকির ভার দিয়ে স্কুলে বেরিয়ে গেল শ্রুতি।

পথে যেতে যেতে দেখল সারা শহরের জায়গায় জায়গায় মানুষজন জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। হাত নেড়ে উত্তেজিত হয়ে কেউ কেউ কথা বলছে।

একটা কথা শ্রুতির কানে ভেসে এল, কেউ বলছে ব্রিটিশ সরকার খুব জব্দ হয়ে গেছে। দারুয়ার ময়দানে কাল এক কলসি নুন তৈরি হয়েছে।

আর এক জায়গায় শুনল, দুধওয়ালি পদ্মমণিকে পুলিশ নাকি পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ভোরবেলা পদ্মমণির লাশ আনার জন্য স্বেচ্ছাসেবীরা দারুয়ার ময়দানের দিকে দৌড়েছিল, তারা মেয়েটার কোনো চিহ্নই পায়নি।

অন্যজন বলল, পুলিশই লোপাট করে দিয়েছে। হয়তো রাতারাতি পুড়িয়ে দিয়েছে লাশটা। গোলমালের ভয় আছে তো।

BanglaBook.org

স্কুলে পৌঁছেও শ্রুতি শুনল সেই একই জল্পনা।

নমিতাদি ক্লাসের একফাঁকে শ্রুতিতে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন,—ঘটনাটা ঘটেছে মুসলমান পাড়ার সামনে। নেকজান কিছু জানে?

নমিতাদির সামনে মিথ্যে কথাটা বলতে সংকোচ হচ্ছিল শ্রুতির, তবু বলল,—নেকজান তো আমার বাসাতেই আছে সারাদিন। ওর বাড়িতে থাকলে হয়তো জানতে পারত।

তা বটে। ওর মা হয়তো জানলেও জানতে পারে।

শ্রুতি বলল,—নাসরিন বিবি আমার বাড়িতে এলে কালকের ঘটনা সম্বন্ধে জানতে চাইব।

নমিতাদি বললেন,—শুনছি পুলিশ নাকি পদ্মমণির লাশটাকে পুড়িয়ে ফেলেছে।

শ্রুতি আবেগভরা গলায় বলল,—রাস্তায় আসতে আসতে শুনলাম, সামসুদ্দোহা নাকি ওকে বটগাছের সঙ্গে বেঁধে চাবুক মারতে মারতে মেরে ফেলেছে।

নমিতাদি আতঙ্কের একটা শব্দ তুলে বললেন—কী ভয়ংকর!

শ্রুতি বলল,—তাই যদি হয় তাহলে পদ্মমণি অমর হয়ে গেল।

মনটা ভীষণ ভরাক্রান্ত ছিল। স্কুলের ঘণ্টাগুলো যখন পড়ছিল তখন চমকে চমকে উঠছিল শ্রুতি। শেষ ঘন্টার অপেক্ষায় সে কানখাড়া করে ছিল।

ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা পড়তেই শ্রুতি টিচার্সরুমে না ঢুকে ক্লাস থেকে একেবারে পথে নেমে এল। দ্রুত পা চালিয়ে চলে এল বাসায়। মনে একটা ভয় ছিল এমন একজন রোগীর কখন কী ঘটে যায়।

আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে দিল নেকজান।

বুকের ভেতর ধকধক করছিল শ্রুতির। সে চাপা আতঙ্কে জানতে চাইল,—কি রে পদ্মমণি কেমন.....?

নেকজান বলল,—পুরো এক গ্লাস দুধ খাইয়েছি দিদি।

কিছু বলছিল?

না দিদি, মাঝে মাঝে শুধু লাল চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

ওষুধ ঠিকমতো খাইয়েছিস তো?

ডাক্তারবাবু যেমন বলে গিয়েছিলেন। মাঝে একবার যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, আমি ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।

শ্রুতি বলল,—তুই এখন বিশ্রাম কর আমি রোগীকে দেখছি।

তুমি কী যে বলো দিদিমণি। সারাদিন ইস্কুল করে ফিরলে, জলখাবার করে রেখেছি খাও। নিজে একটু বিশ্রাম নাও, রাতে দরকার হলে তো তোমাকে আমার সঙ্গে জাগতে হবে।

একটু থেমে আবার বলল নেকজান,—চারপাঁচ রাত যাত্রা হয় পুজোর সময়, রাত জেগে সব কটা পালা দেখার অভ্যেস আছে আমার। তুমি এখন হাতমুখ ধুয়ে শান্তিতে জলখাবারটা খেয়ে নাও।

যতদিন যাচ্ছে নেকজান আদেশের সুরে কথা বলতে শুরু করেছে শ্রুতির সঙ্গে।

তোমার এখনও স্নান হল না দিদিমণি, কখন খাবে আর ইস্কুল যাবে.....। চুল তো একেবারে ভিজে জবজব করছে বোসো তো গামছা দিয়ে মাথাটা মুছিয়ে দিই।

আদরের শাসন, বড়ো আন্তরিকতায় ভরা। তাই নেকজানকে বড়ো ভালো লাগে শ্রুতির।

ঠিক মাঝরাতে বাইরের দরজায় হালকা করাঘাতের শব্দ।

শ্রুতি বালিশে মুখ গুঁজে পড়েছিল। পদ্মমণির পায়ের তলায় শুয়ে আছে নেকজান।

চমকে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শ্রুতি। প্রায় নিঃশব্দে দরজাটা খুলে দিল।

BanglaBook.org

হারিকেনের আলোটা অনেক কমানো ছিল তাই তার স্বল্প আলো বিশেষ কারও চোখে পড়ছিল না।

নিঃশব্দে ডা. মিশ্র এসে ঘুমন্ত পদ্মমণিকে পরীক্ষা করে দেখলেন।

ঘুম ভেঙে গেছে পদ্মমণির। আজ তার চোখের লাল ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। সে মানুষ চিনতে আর ধীরে ধীরে কথা বলতে পারছে, যদিও মাঝেমাঝে কাতরাছে যন্ত্রণায়।

অনেকক্ষণ ডা. মিশ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইল পদ্মমণি। ধীরে ধীরে কথা বলতে পারছে, যদিও মাঝেমাঝে কাতরাছে যন্ত্রণায়।

অনেকক্ষণ ডা. মিশ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইল পদ্মমণি। ধীরে ধীরে তার চোখের ওপর থেকে সরে যাচ্ছিল একটা পর্দা।

ক্ষীণ কণ্ঠে একটা শব্দ বেরিয়ে এল—ডাক্তারবাবু।

মুখে কিছু না বলে ডা. মিশ্র পদ্মমণির কপালে হাত রাখলেন।

পদ্ম ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষ। সে যেন ঈশ্বর দর্শন করছে।

এবার কথা বললেন ডা. মিশ্র,—তুমি তো সুস্থ হয়ে গেছো গো! যারা তোমার গায়ে হাত তুলেছিল সেই পুলিশরাই এখন ফাঁপরে পড়ে গেছে। দেশের মানুষ বলছে পদ্মমণিকে না পেলে তারা সরকারি অফিস কাছারিতে আগুন ধরিয়ে দেবে। একা তুমি সারা পুলিশ মহলে আগুন ধরিয়ে দিলে। শাবাশ।

পদ্মমণির ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাস। ডাক্তারবাবুর মুখ থেকে আর তার চোখ সরে না। চোখের দু-প্রান্ত দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

ততক্ষণে ওষুধ দিয়ে ক্ষতের জায়গাগুলোকে ভালো করে ড্রেস করে দিলেন ডা. মিশ্র।

খুব লাগল?

নিশ্চয়ই কিছুটা লেগেছিল, তবু পদ্মমণি হেসে মাথা নাড়ল। তার একটুও লাগেনি।

এইভাবে রাতদিন চলল রোগীর অক্লান্ত সেবা আর পরিচর্যা।

এখন পদ্মমণির ঘা শুকিয়ে গেছে। সে নিজেই ঘরের ভেতর নড়াচড়া করছে।

ডা. মিশ্রের কিন্তু রাতে একবার করে তাকে দেখে যাবার বিরাম নেই। একজন অল্পবয়সি শিক্ষিকা যে এতখানি প্রাণঢালা সেবা করতে পারে কোনো প্রতিদানের আশা না রেখে, এ যেন ডাঃ মিশ্রের চিন্তারও বাইরে।

প্রতিরাতে শ্রুতির বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ডা. মিশ্র শ্রুতির দিকে ফিরে বলে যান,—সাবধানে থাকবেন।

শ্রুতি ডা. মিশ্রের দিকে কথাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে,—দেখবেন, পুলিশ যেন আপনাকে সন্দেহ না করে।

ডা. মিশ্র রহস্যময় হাসি হেসে উত্তর দেন,—এই অন্ধকারের পথটুকু পেরোতে পারলে ডা. মিশ্র কাউকে পরোয়া করে না। পুলিশ আমাকে ছুঁতে এলেই জানে তারা অনেক বড়ো বিপদ ডেকে আনবে। দশখানা গাঁয়ের লোকের ধাক্কা সামলানোই তাদের দায় হয়ে উঠবে।

আড়াই মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ পদ্মমণি।

পদ্ম ভোর হওয়ার আগেই চলে যাবে তার বুড়িমার কাছে গাঁয়ের বাড়িতে।

পরিকল্পনা মতো সে রাতে পদ্মের বিদায় উপলক্ষ্যে একটা ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল।

শ্রুতি গতরাতে ডা. মিশ্রকে সেই ভোজে যোগ দেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছিল।

ডাক্তার বলেছিলেন—নিশ্চয়ই আসব, তবে আমার ভোজের মেনুটা নাসরিন বিবির কাছ থেকে জেনে নেবেন।

BanglaBook.org

আবদারের সুরে শ্রুতি বলেছিস,—আগে আসুন তো, আপনি কতবড়ো খাইয়ে তা আগেই আমার জানা হয়ে গেছে।

ডাক্তার হাত নেড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিলেন।

শেষের রাতে যোগ দিয়েছিলেন ডাক্তার। উপহার হিসেবে সঙ্গে এনেছিলেন, এক প্যাকেট ওষুধ আর একটি গরম চাদর।

ওষুধ ব্যবহারের পদ্ধতি বলে দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন,—এ চাদরখানায় মাখানো আছে আমার বোনের স্মৃতি। লন্ডন থেকে পড়া শেষ করে ফেরার সময় ওর জন্যে এই চাদরখানা কিনে এনেছিলাম। ফিরে এসে আর তাকে দেখতে পাইনি। সামনে শীত, চাদরটা খুবই গরম। তোমার গায়ে থাকলে মনে করব আমার বোনটা বেঁচে আছে।

পদ্মমণি গড় হয়ে প্রণাম করে বলেছিল— একে আমি পুজো করব দাদা, গায়ে দিতে পারব না।

শেষে ডা. মিশ্র বলেছিলেন,—তুমি যতদিন পারো নিজের বাড়িতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। মা ছাড়া প্রতিবেশীদের কেউ যেন জানতে না পারে। আরও কিছুদিন গেলে তবে আত্মপ্রকাশ করবে।

সেদিন বীরেনবাবুর কোনো সভায় গিয়ে তোমার অত্যাচারের কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা কোরো। তবে কোথায় লুকিয়ে ছিলে সেকথা যেন ফাঁস না হয়। তাহলে তোমার শ্রুতিদিদি বিপদে পড়ে যাবে।

এতদিন পরে পুলিশ আর সাহস করে তোমার দিকে হাত বাড়াবে না। তাছাড়া আমাদের বীরেন্দ্র-কেশরী তোমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

সেই জনসভায় তুমি পুলিশের যে অত্যাচারের কাহিনি শোনাবে তা প্রকাশ পাবে কাঁথির বিখ্যাত 'নীহার' পত্রিকায়। সে খবর আমি কলকাতার সব পত্রিকায় যাতে ছাপা হয় তার ব্যবস্থা করব।

বিদায়ের রাতটা ছিল বড়োই বেদনা ভারাক্রান্ত। দীর্ঘ কয়েকমাস রাত্রি জাগরণের ভেতর অসীম ক্লান্তি থাকলেও শ্রুতি একে দেশ সেবার একটা ব্রত বলে গ্রহণ করেছিল। সে ভেতরে ভেতরে দেশের কাজ করার জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিল।

সহসা তার মাথাটা আপনিই নত হয়ে এল ডা. মিশ্রের পায়ে।

ডা. মিশ্র শ্রুতির মাথায় হাত রেখে বললেন,— আবার দেখা হবে।

সেদিনটা ছিল জন্মাষ্টমীর ছুটি।

হরিসভায় নানারকম অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হচ্ছিল। কীর্তনিয়ার দল সংকীর্তন করতে করতে পথ-পরিক্রমা করে ফিরছিল।

পথের ধারে বটগাছের তলায় বহু পুতুলের সমাবেশ। বটগাছের বাঁধানো বেদিতে অর্ধচন্দ্রাকারে কৃষ্ণের জন্মলীলার মূর্তিগুলি বড়ো জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল।

পেছনে একটি পটে আঁকা ছিল সঞ্চরণমান তালতাল মেঘ। তার থেকে ঝরে পড়ছিল অজস্র ধারায় বৃষ্টি। তার তলা দিয়ে মূর্তিতে গড়া বাসুদেব চলেছেন সদ্যোজাত কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে নন্দগৃহের উদ্দেশ্যে। তার পেছনে ছাতা ধরে আছে ফণা-মেলা বাসুকি নাগ।

নন্দগৃহেও জন্মেছেন এক কন্যা। শিশুকৃষ্ণকে নন্দগৃহে রেখে কন্যাসন্তানটিকে বাসুদেব নিয়ে চলে যাবেন কংসের কারাগারে।

ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই ঘুরে ঘুরে কৃষ্ণলীলার মূর্তিগুলি উপভোগ করছে আর তারিফ করছে প্রাণখুলে।

নেকজান সকালেই শ্রুতিকে নিয়ে গিয়েছিল সেই অনুষ্ঠান দেখাতে।

হিন্দুদের এই জন্মাষ্টমী লীলাকাহিনিতে নেকজানকে মৃদু গলায় কিন্তু সবিস্তারে বুঝিয়ে দিচ্ছিল শ্রুতি।

BanglaBook.org

যখন বাসুদেব ফিরে এল কারাগারে এবং কংসের হাতে ভোর হলেই নিহত হবে কন্যাটি, —একথা শোনামাত্র বুক চাপড়ে হায় হায় করতে লাগল নেকজান।

আক্ষেপ করে বলতে লাগল,—এই সুন্দর মেয়েটাকে আছড়ে মারবে কংস,—কী পাষাণ প্রাণ গো!

ফেরার পথে নেকজানকে প্রবোধ দিয়ে বলতে লাগল শ্রুতি,—এমন ঘটনা আমাদের ঘরেও ঘটতে পারে নেকজান। তবে এখানে কারাগার কিংবা কংস নাও থাকতে পারে।

শ্রুতির মনে সেই মুহূর্তে কী সীতার বেদনাময় ঘটনাটা মনে পড়ে গিয়েছিল।

ওরা ঘরে ফিরে এসে নারকেল আর তালের ফুলুরি তৈরি করেছিল প্রচুর।

হঠাৎ শ্রুতির মনে পড়ে গেল ডাক্তার মিশ্রের কথা। বড়ো ইচ্ছে করল তার ডাক্তারবাবুকে কটা নাড়ু খাওয়ায়।

সে অমনি নেকজানকে বলল,—তুই একবারটি দৌড়ে যা তো, ডাক্তারবাবুকে কটা নাড়ু-আর ফুলুরি দিয়ে আসবি।

মুখের কথা খসামাত্র নেকজান ছুটল ডাক্তারবাবুর ডেরার দিকে এক প্যাকেট খাবার নিয়ে।

সেই মুহূর্তে নমিতাদি ঢুকলেন শ্রুতির ডেরায়। কীরে, কী করছিস?

শ্রুতি বলল,—গোপালকৃষ্ণকে খাওয়ানোর জন্য নাড়ু তৈরি করছি।

নমিতাদি হেসে বললেন,—অত বাচ্ছা কী নাড়ু খেতে পারবে রে?

শ্রীভগবানের নামে প্রতিদিন কত প্রসাদ দেওয়া হয় কিন্তু সে প্রসাদ তো খায় আমাদের মতো ভক্তজন।

নমিতাদি এবার হাত পেতে বললেন,— দে তো কটা ফুলুরি, এবছর খাওয়া হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি একটা জামবাটি করে বেশ কয়েকটা ফুলুরি এনে নমিতাদির কাছে বসিয়ে দিল।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে নমিতাদি বললেন, অ্যাতো খাব?

বলো তো আমি ভাগ বসাই তোমার বাটিতে! আয় আয় বলে শ্রুতিকে কাছে টেনে নিলেন নমিতাদি!

খেতে খেতে নমিতাদির হঠাৎ কী ভাবোদয় হল। বললেন,—তুই তো কোনোদিনই সংসার পাতবিনে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিস।

শ্রুতি বলল,—সংসারধর্ম সকলের সয় না নমিতাদি।

আচমকা বলে বসলেন নমিতাদি,—তুই একটা ফুটফুটে সুন্দর মেয়েকে তোর কাছে সারাজীবন রেখে দিতে পারবি?

কৌতুক কথা ভেবে শ্রুতি বলল,—পাচ্ছি কোথায় বলো?

সত্যি রে, তুই রাজি থাকলে আমি তোকে একটা এনে দেব। ধর, বাসুদেব—কৃষ্ণের বদলে মহামায়াকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছিলেন, আমি যদি পথ থেকে সেই মেয়েটিকে চেয়ে এনে তোর কাছে পৌঁছে দিই, তাহলে যত্ন করে প্রতিপালন করবি তো?

কী যে হেঁয়ালি করো!

খুব সিরিয়াস একটা কথা বলছি। তুই চাইলে আমি সীতাকে তোর হাতে তুলে দিতে পারি।

সবিস্ময়ে বলল শ্রুতি,—কীরকম? তার বাবাই বা ছাড়বে কেন?

আরে ওই লোকটার তো একগন্ডা ছানাপোনা, সবার মুখে দুবেলা দু-মুঠো অন্ন তুলে দেবার ক্ষমতাই নেই। সে শুধু টাকা চায়। সীতাকে নেবার সময় নায়েব মশাই-এর হাতে অনেকগুলো টাকা দিয়েছিলেন রানিমা যাতে তার হতভাগ্য মেয়েটা কষ্টে না পড়ে। টাকার জন্যে যে নিজের ছেলেকেও কাছ ছাড়া করতে পারে সে টাকা পেলে সীতাকেও বেচে দেবে।

BanglaBook.org

সংশয় নিয়ে বলল শ্রুতি,—এ আবার হয় নাকি?

জোর দিয়ে বললেন নমিতাদি,—এই ঘটনা ঘটতে চলেছে।

কীরকম!

আমি বড়ো মেশোমশাইয়ের কাছে খবর পেয়েছি, রানিমা সীতার জন্যে গোপনে চোখের জলে ভাসেন। ভাবেন, কাজটা বড়ো নিষ্ঠুরের মতো হয়ে গেছে। তিনি মেসোমশাইকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, কোনো সৎ মানুষের ঘরে মেয়েটাকে তুলে দেওয়া যায় না? সীতার সারাজীবনের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি যেমন প্রচুর টাকা দেবেন তেমনি সীতার স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার জন্য রজককেও দেবেন প্রচুর। ওই গরিব লোভী লোকটা টাকা পেলে বর্তে যাবে।

বড়ো গোপনে কথা হল দুজনের ভেতর। ভীষণ উত্তেজিত শ্রুতি। প্রাণঢালা ভালোবাসা দিয়ে সে সীতাকে আপনজনের মতো কাছে টেনে নিবে। এ প্রস্তাবটা তার কাছে ঈশ্বরের নির্দেশ বলে মনে হল।

আমি রাজি, নমিতাদি। ওকে পাওয়ার জন্য আমি লোভী মানুষটাকে কয়েকহাজার টাকা দিতেও রাজি আছি।

তার কোনো দরকার হবে না। অনেক অনেক পেলে মানুষটার লোভ বেড়ে যাবে।

একদিন শ্রুতির মানসকন্যাটি এসে পৌঁছল শ্রুতির ডেরায়। সবাই জানল, দুঃখী মানুষটা একগণ্ডা পোষ্যকে খাওয়াতে পারে না, তাই শ্রুতির কাছে অনুনয় করে মেয়েটাকে রেখে গেছে।

এতে কোনোদিক থেকে কোনো কথাই উঠল না।

পাঁচজনে বলাবলি করতে লাগল,—মেয়েটার কপাল ফিরে গেল।

মহাকাল সাগরে বয়ে চলেছে ঘটনার স্রোত। সেদিকে তাকিয়ে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নেওয়া ছাড়া মানুষের করণীয় আর কিছুই নেই।

পাঁচবছর পরের ঘটনা। নাসরিন বিবির মুখে শ্রুতি প্রথম জানতে পারল ডা. মিশ্র বেশ কয়েকদিনের জন্য কলকাতা যাওয়ার তোড়জোড় করছেন।

অকারণে মনটা খারাপ হয়ে গেল শ্রুতির। একটা অদৃশ্য বাঁধনে মানুষটি বেঁধে ফেলেছিল ওদের সবাইকে। হয়তো প্রতিদিন দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না তবু শ্রুতির মনে হত সমুদ্রের হাওয়া বয়ে এলে যেন ডা. মিশ্রের নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়।

একদিন সে নাসরিন বিবিকে বলেছিল, বটগাছের চিকিৎসাকেন্দ্রে যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবু কি স্নানখাওয়া সব সেরে নেন?

নাসরিন বিবি বলেছিল,—উনি তো যোগীপুরুষ, ডাক্তার সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কীরকম?

শেষরাতে যখন আকাশে শুকতারা দেখা দেয় তখন একটা তোয়ালে আর লুঙি হাতে নিয়ে উনি হেঁটে চলে যান সমুদ্রে। রোজ ওঁর সমুদ্রস্নান করা চাই। লাল সূর্যটি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওই দীর্ঘ চেহারার মানুষটি লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত হেঁটে ফিরে আসেন। একদিন সমুদ্রে যেতে না পারলে উনি হাঁফিয়ে ওঠেন।

আমি একদিন জানতে চেয়েছিলাম,—বাবা, রোজ আপনি এত কষ্ট করেন কেন?

উনি হেসে বলেছিলেন,—আমি যখন সমুদ্রের জলে ডুব দিই তখন আমার মনে হয়, আমার হারানো মা তাঁর অগাধ স্নেহের ঢেউ দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলেছেন। এই সমুদ্র মায়ের কাছ থেকে আমি সমস্ত মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছি। আমি যখন যতটুকু কাজ করি ততটুকু করি আমার মায়ের নির্দেশে।

BanglaBook.org

কথাগুলো শুনে শ্রুতি যেন মানুষটাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করল।

ডা. মিশ্র কলকাতা থেকে ফিরলেন প্রায় মাস দেড়েক পরে। উৎকণ্ঠিত শ্রুতি তাঁকে দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠল।

সে নেকজানকে বলল,—তুই একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে পারিস? বলবি, আজ রাতে দিদি আপনাকে তাঁর বাসায় খেতে বলেছেন।

নেকজান বলল,—তিনদিন ডাক্তাবাবু এসেছেন দিদি, কিন্তু বটতলার ডাক্তাখানায় যাননি। মা বলছিল, চুপচাপ নিজের বিছানায় শুয়ে থাকেন।

উদ্বিগ্ন শ্রুতি বলল,—তুই একবার আমাকে ওঁর বাসায় নিয়ে যেতে পারবি?

নেকজান বলল,—রাত নটা নাগাদ যখন আমাদের পাড়া শুনশান হয়ে যাবে তখন চুপিচুপি তোমাকে নিয়ে যাব ওঁর ডেরায়।

কথামতো ব্যবস্থা হল। প্রায় রাত সাড়ে নটায় ওরা দুজনে এসে পৌঁছল ডাক্তারবাবুর বাড়িতে।

পেছনে বাঁশগাছের ঝাড়, সামনে একটা অনেক কালের জামগাছ তার মাঝে টিনে ছাওয়া ছোট্ট একখানা বাড়ি। বিন্দুমাত্র আড়ম্বরের চিহ্ন নেই কোথাও।

ভেতরে একটা আলো জ্বলছিল। তার ক্ষীণ রশ্মি এসে পড়ছিল দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের উঠোনে।

ভেজানো দরজাটা আস্তে আস্তে টানলো নেকজান। ভেতরের আলোটা ছড়িয়ে পড়ল উঠোনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে।

ডা. মিশ্র বালিশের ওপর কনুই ঠেকিয়ে গালে হাত চেপে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলেন।

সোজা হয়ে বিছানায় উঠে বসে বললেন,—কী ব্যাপার নেকজান? তোমার দিদি ভালো আছে তো?

মৃদু হেসে এবার ঘরে ঢুকল শ্রুতি।

আরে এসো এসো।

দেওয়ালের গায়ে একটা বেঞ্চ দেখিয়ে বললেন,—বোসো ওখানে।

মৃদু হেসে অতিথির দিকে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার।

শ্রুতি অনুযোগের সুরে বলল,—কতদিন আপনি কলকাতা চলে গেলেন, কোনো খবরই পাইনি। তারপর শুনলাম আপনি বটতলার ডাক্তারখানাতেও যাচ্ছেন না। কী ব্যাপার বলুন তো?

মায়ের বারণ—হাসলেন ডাক্তার।

হেঁয়ালি রাখুন। আসল কথাটা বলুন তো?

ডাক্তার বললেন,—সবকিছু একসঙ্গে জেনে নেবে? ঘটনাগুলো কতকাল ধরে আমি পুষে রেখেছি পাঁচমিনিটে আমি তোমার কাছে সব উজাড় করে দেব ভাবলে কী করে?

অভিমানের সুরে শ্রুতি বলল,—বলা না বলা আপনার ইচ্ছে শুধু জানতে চাই বটতলায় যাচ্ছেন না কেন?

ও এজন্য তুমি উদ্বিগ্ন, তাই চলে এসেছে খোঁজ নিতে। ওখানে গেলে দেখতে পেতে বটগাছের গায়ে একটা কাগজ সাঁটা, তাতে লেখা আছে—ডাঃ মিশ্র বিশেষ কারণে এখন আসতে পারছেন না। উনি এলে আবার নোটিশ পাবেন।

ডাক্তারের দিকে ঝুঁকে শ্রুতি বলল,—এখন আসল কারণটা কী দয়া করে বলুন, উদ্বেগে রাখবেন না আমাকে।

নেকজান পাশের ঘরে ঢুকে কী যেন সব পরিষ্কার করছিল।

BanglaBook.org

ডাক্তারবাবু বললেন,—যদি বিচলিত না হও তাহলে সত্যটা আজ তোমার কাছে স্পষ্ট করে বলি।

বুকের ভেতর কেমন তোলপাড় হতে লাগল শ্রুতির তবু সে বলল,—আপনি বলুন, আমি সত্যটা জানতে চাই।

কিছুদিন ধরে আমি বুঝতে পারছিলাম, শরীরে শক্তি হারাচ্ছি। সামান্য কাজ করলেও ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। আমি ডাক্তার, সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল কয়েকটা লক্ষণ দেখে। কলকাতা গিয়েছিলাম কনফার্ম হতে।

অস্ফুট একটা শব্দ করে শ্রুতি বলল,—কিসের সন্দেহ? কোনও অসুখ?

লাং ক্যান্সার।

শ্রুতি কথা বলতে পারছিল না, ঝিমঝিম করছিল তার সারা শরীর। বেঞ্চ ছেড়ে একবার উঠে দাঁড়াল তারপর আবার বসে পড়ল বেঞ্চে। দৃষ্টি পাথরের মতো স্থির। সে তাকিয়েছিল ওই বিস্ময়কর মানুষটির দিকে।

কোনো ভয় মানুষটিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, মুখে আগের মতো সদা প্রসন্নতা।

এতক্ষণে শ্রুতি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল।

বলল,—এর কি কোনো চিকিৎসা নেই?

ডাক্তার বললেন,—বিশেষজ্ঞরা বলে দিয়েছেন বড়ো অ্যাডভান্সড স্টেজে আমি ওঁদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি। তাঁরা অবশ্য নিয়মমতো চিকিৎসা শুরু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি পরিণাম জানতাম বলে শেষ কটা দিন আমার এই শান্তির নীড়ে ফিরে এসেছি।

শ্রুতির মনে হল ডা. মিশ্রের বিছানার ওপর বসে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ও উঠে গিয়ে অসংকোচে ডাক্তারের হাত ধরে বলল,—আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন দাদা, আমি আপনার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই।

সত্যিই ডাক্তার হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে কনুইতে ভর রেখে বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়লেন।

এখন ডাক্তারের মুখখানা বড় শুকনো মনে হচ্ছে শ্রুতির। ডাক্তার চোখ বন্ধ করে হাঁফাচ্ছেন।

একসময় চোখ বন্ধ অবস্থায় আঙুলের ইঙ্গিতে টেবিলের ওপর জলের গ্লাসটা দেখিয়ে দিলেন।

শ্রুতি উঠে গিয়ে জলের গ্লাস আর পাশে রাখা চামচটা নিয়ে এল।

হাঁ করুন, আমি জলটা মুখে ঢেলে দিচ্ছি।

কয়েক চামচ জল খাওয়ার পর ডাক্তার মাথা নেড়ে জানালেন, আর তাঁর দরকার নেই।

পরক্ষণেই তিনি নিঃসাড়ে কেমন ঘুমিয়ে পড়লেন।

অকথিত একটা ভালোবাসা শ্রুতি মনে মনে উজাড় করে দিয়েছিল এই মহান ডাক্তারের চরণে। সে ডাক্তারের শেষের কটা দিন ভরিয়ে তুলল তার সেবা দিয়ে।

কেবল স্কুলের সময়টুকু ছাড়া সে সারাক্ষণ হাজির থাকত ডাক্তারের পাশে।

এতবড় অসুখের মাঝেও ডাক্তার সারাক্ষণ নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতেন।

একদিন বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে আছেন ডাক্তার। শ্রুতি আস্তে আস্তে বলল,—কিছু কষ্ট হচ্ছে?

চোখ খুললেন ডা. মিশ্র। ম্লান একটুকরো হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বললেন,—খু-উ-ব কষ্ট হচ্ছে। কতদিন মায়ের কাছে যাইনি। বড়ো ইচ্ছে করে সমুদ্রে ভেসে যাই। মন চাইলেও এদুটি চরণ চলে না।

আবার কথা বন্ধ। আবার তাকালেন।

তুমি গান গাইতে পারো শ্রুতি?

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এখন আর সংকোচ নেই। শ্রুতি মাথা নেড়ে জানাল, সে গান জানে।

রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা জানো?

বলুন, কোন গান।

ডাক্তার বললেন,—আমার বড় প্রিয় গান,—

"সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণি হে কর্ণধার—"

বুক ঠেলে একটা কান্না উঠে আসতে চাইছিল শ্রুতির। তবু সে গাইতে লাগল গানটা।

গান থামলে কতক্ষণ পরে চোখ খুললেন ডাক্তার। চোখে যেন তাঁর ভাসছে একটা ছবি —নীল সাগরে তাঁর শায়িত দেহটাকে নিয়ে ভেসে চলেছে একটা তরণি। অন্ধকার গগনে জ্বলছে জ্যোতির ধ্রুব তারকা।

অবসানের এই মহান ছবিটা দেখতে দেখতে ডাক্তার নীরব হয়ে গেলেন।

শ্রুতি কতক্ষণ সেই নিস্পন্দ চরণ দুটিতে কপাল ঠেকিয়ে বসে রইল। তার দুগাল বেয়ে তখন অশ্রুর বন্যা বয়ে চলেছে।

●